হযরত ইমাম গায্যালী (র)

সৌভাগ্যের পরশমণি

চতুর্থ খণ্ড ঃ পরিত্রাণ

আবদুল খালেক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অভিমত

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায্যালী (র) ছিলেন ইসলাম জগতের অদ্বিতীয় আলিম ও অসামান্য খোদাপ্রেমিক ওলী। তাঁর রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' অন্যতম। এই গ্রন্থখানি তীরকতপন্থীদের পথপ্রদর্শক। ইহাতে আছে মানসিক রোগসমূহের সম্যক পরিচয় এবং উহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্য এই ব্যাপারে কামিল-মুরশিদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

গ্রন্থখানি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া খোদাপ্রেমিক ও জ্ঞানানুরাগীদের পিপাসা মিটাইয়া আসিতেছে। বাংলা ভাষায়ও ইহার অভ্রান্ত অনুবাদ প্রকাশের তীব্র অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রিয় বন্ধু মৌলভী আবদুল খালেক বি.এ. (অনার্স) সাহেব বাংলা ভাষাভাষীদের এই অভাব পূরণে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

দোয়া করি, এই অনুবাদ গ্রন্থ 'সৌভাগ্যের পরশমণি' আল্লাহর দরবারে কবূল হউক এবং গ্রন্থকার ও অনুবাদকের পরিশ্রম ও নেক উদ্দেশ্য সফল হউক। আমীন!

আহ্‌কার
আবদুল ওহ্‌হাব
মুহ্‌তামিম
হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা
বড়কাটরা, ঢাকা

সূচিপত্র

সৌভাগ্যের পরশমণি

চতুর্থ খণ্ড ঃ পরিত্রাণ

সূচনা

যে সকল গুণ লাভ করিলে মানব নাজাত (পরিত্রাণ) পাইতে পারে তৎসমুদয় এই খণ্ডে বর্ণিত হইবে এবং দশটি অধ্যায়ে ইহা সমাপ্ত হইবে। যথা ঃ

প্রথম অধ্যায়— তওবা (অনুতাপের সহিত আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন)।

দ্বিতীয় অধ্যায়— ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা।

তৃতীয় অধ্যায়— ভয় ও আশা।

চতুর্থ অধ্যায়— দরিদ্রতা ও সংসারের প্রতি উদাসীনতা।

পঞ্চম অধ্যায়— নিয়্যত (সংকল্প), ইখলাস (ইবাদতে বিশুদ্ধতা) এবং সিদ্‌ক (সততা)।

ষষ্ঠ অধ্যায়— মুহাসাবা (প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ) ও মুরাকাবা (প্রবৃত্তির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা)।

সপ্তম অধ্যায়— তাফাক্কুর (সৎচিন্তা করা)।

অষ্টম অধ্যায়— তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা) ও তাওহীদ।

নবম অধ্যায়— মহব্বত, শওক (অনুরাগ) ও রিযা (প্রসন্নতা)।

দশম অধ্যায়— মৃত্যু-স্মরণ ও পরকালের অবস্থা।

প্রথম অধ্যায়

তওবা

ধর্মপথ-যাত্রীদের প্রথম ধাপ–প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, তওবা (অনুতাপের সহিত আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন) মুরীদগণের সর্বপ্রথম পদ-বিক্ষেপ এবং ধর্মপথ-যাত্রীদের যাত্রা আরম্ভ। তওবা ব্যতীত মানবের অন্য কোন গতি নাই। কারণ, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নিষ্পাপ থাকা একমাত্র ফিরিশতাগণের পক্ষেই সম্ভবপর। অপরপক্ষে চিরকাল পাপে ডুবিয়া থাকা শয়তানের কার্য। গুনাহ্‌র কাজ পরিত্যাগপূর্বক অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও তদীয় সন্তান মানবগণের কার্য। যে-ব্যক্তি কৃত গুনাহ হইতে তওবা করিয়াছে, সে হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের সহিত নিজের সম্বন্ধ ঠিকভাবে পাতিয়াছে। আর যে ব্যক্তি চিরজীবন পাপকার্যে অতিবাহিত করিল, সে শয়তানের সঙ্গে স্বীয় সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়া লইল।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কেবল ইবাদতে লিপ্ত থাকা মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কেননা, সে বুদ্ধিহীন ও অপূর্ণ অবস্থায় জন্মলাভ করে এবং সর্বপ্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা মানব-হৃদয়ে শয়তানের অস্ত্ররূপ লোভ-লালসা সংযোগ করিয়া দিয়া থাকেন। মানব মনে অভিলাষ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিবার পর বুদ্ধি-বৃত্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। বুদ্ধি অভিলাষ-প্রবৃত্তির দুশমন এবং ফিরিশতাগণের মৌলিক নূরের সমজাতীয়। কিন্তু বুদ্ধির বহু পূর্বে মানব মনে অভিলাষ-প্রবৃত্তি জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া সে (বুদ্ধি) আসিয়া দেখিল যে, অভিলাষ-প্রবৃত্তি ইতঃপূর্বেই মানুষের হৃদয়-রাজ্যটি ভালরূপে দখল করিয়া লইয়াছে এবং মনও ইহাতে অভ্যস্ত ও আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় তওবা ও মুজাহাদা (প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর সাধনা) দ্বারা হৃদয়-রাজ্যটিকে শয়তান ও প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্ত করত অধিকার করিয়া লওয়া বুদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। সুতরাং তওবা মানুষের জন্য নিতান্ত জরুরী এবং ধর্মপথ-যাত্রীর প্রথম ধাপ। তৎপর বুদ্ধির আলোকে এবং শরীয়তের নূরে জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেলে মানুষ যখন কুপথ ও সুপথ চিনিতে পারে, তখন তওবা ব্যতীত তাহার পক্ষে আর কিছুই কর্তব্য থাকে না। কারণ, কুপথ হইতে সুপথে ফিরিয়া আসাকেই তওবা বলে।

তওবার ফযীলত ও সওয়াব– প্রিয় পাঠক, অবগত হও, আল্লাহ্ তা'আলা সকলকেই তওবা করিতে আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ

تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র সমীপে তওবা কর যেন তোমরা কৃতকার্য হইতে পার।" (সূরা নূর, ৪ রুকূ, ১৮ পারা)

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়ের (অর্থাৎ কিয়ামতের) পূর্ব পর্যন্ত তওবা করিবে, তাহার তওবাও কবূল হইবে।" তিনি অন্যত্র বলেন– "অনুতপ্ত হওয়াকেই তওবা বলে।" তিনি আর বলেন– "গল্পগুজব হইতেছে এমন রাস্তায় দণ্ডায়মান হইয়া থাকিও না। কারণ, এমন স্থলে দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপর পথচারীকে দেখিয়া হাসি-ঠাট্টা করে এবং পথচারিণী নারীর সহিত অশ্লীল উক্তি করে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য দোযখ ওয়াজিব না হইয়া পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সেই স্থান পরিত্যাগ করে না। কিন্তু সে যদি তওবা করে (তবে তাহার গুনাহ্ মাফ হইতে পারে।)" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমি প্রত্যহ সত্তর বার তওবা ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিয়া থাকি।" তিনি অন্যত্র বলেন– "যে ব্যক্তি গুনাহ্ করিয়া তওবা করে, আল্লাহ লেখক-ফিরিশতাকে সেই গুনাহ্‌র কথা ভুলাইয়া দেন, সেই ব্যক্তির হস্তপদ, যে-অঙ্গ গুনাহ করিয়াছিল, ইহাকে ভুলাইয়া দিয়া থাকেন এবং যে-স্থানে গুনাহ করা হইয়াছিল সেই স্থানকেও ভুলাইয়া দেন, যেন সে যখন (কিয়ামত দিবসে বিচারার্থ) আহ্‌কামুল হাকিমীন আল্লাহ্‌র দরবারে উপনীত হয় তখন সেই পাপের কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়।" তিনি আরও বলেন–"প্রাণ কণ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবূল করেন।"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি দিবসে গুনাহ করিয়া রজনীতে তওবা করে এবং যে-ব্যক্তি রজনীতে গুনাহ করিয়া দিবসে তওবা করে, তাহাদের তওবা কবূল করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণার হস্ত বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। যত দিন পর্যন্ত পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় না হইবে তত দিন পর্যন্ত তাঁহার করুণার হস্ত এইরূপ প্রসারিত থাকিবে।"

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমি সমস্ত দিনে এক শত বার তওবা করিয়া থাকি।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–" কোন ব্যক্তিই নিষ্পাপ নহে, কিন্তু যে-ব্যক্তি তওবা করে সে সকল পাপীর মধ্যে উত্তম।" তিনি বলেন–"যে ব্যক্তি গুনাহ করিয়া তওবা করে সে এমন (বেগুনাহ্) হইয়া যায় যেন সে গুনাহ্ই করে নাই।" তিনি আরও বলেন–"গুনাহ করিয়া তদ্রূপ গুনাহ্র ত্রি-সীমায় পুনরায় না যাওয়াকে তওবা বলে।"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন– "হে আয়েশা, আল্লাহ্ বলেন – إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যাহারা নিজেদের ধর্মকে পৃথক পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে এবং দলে দলে বিভক্ত হইয়াছে (তাহাদের সহিত আপনার কোনই সংশ্রব নাই)।" এই আয়াতে বিদ্'আতী লোকদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল গুনাহগারের তওবা কবূল করিয়া লন; কিন্তু বিদ্'আতী লোকদের তওবা কবূল করেন না। আল্লাহ্ বলেন– "আমি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাহারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন–"হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম আকাশে উন্নীত হইলেন। তথা হইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, দুনিয়াতে জনৈক পুরুষ এক নারীর সহিত যিনা (ব্যভিচার) করিতেছে। তিনি তাহাদের জন্য বদ্দু'আ করিলেন। ইহাতে তাহারা মরিয়া গেল। তৎপর অপর এক ব্যক্তিকে গুনাহে লিপ্ত দেখিত পাইয়া তাহার জন্যও বদ্দো'আ করিলেন। (এমন সময়) আল্লাহ্ তা'আলা ওহী অবতীর্ণ করিলেন,–'হে ইবরাহীম, আমার বান্দাকে ক্ষমার চক্ষে অবলোকন কর। হয়ত তাহারা তওবা করিবে এবং আমি কবূল করিব, অথবা ক্ষমা চাহিবে আমি মাফ করিয়া দিব; কিংবা তাহাদের বংশে এমন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে যাহারা আমার ইবাদত করিবে–এই তিনটির কোন একটি ত হইবে। তুমি কি জান না যে, আমার নাম সবূর (ধৈর্যশীল)?"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "গুনাহ্র দরুন আল্লাহ তা'আলা যে-ব্যক্তিকে অনুতপ্ত দেখিতে পান, ক্ষমা চাহিবার পূর্বেই তিনি তাহাকে মাফ করিয়া

দিয়া থাকনে।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"পশ্চিম দিকে একটি দরজা আছে ইহার প্রস্থ সত্তর কি চল্লিশ বৎসরের রাস্তা। পৃথিবী ও আকাশ সৃজন অবধি এই দরজা তওবা গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত আছে এবং পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত ইহা খোলা থাকিবে।" তিনি অন্যত্র বলেন– "প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে মানুষের আমল (অনুষ্ঠিত কার্যাবলী) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। (ইতিমধ্যে) যে-ব্যক্তি তওবা করে তাহার তওবা কবূল হয় এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাকে মাফ করা হয়। কিন্তু যাহাদের হৃদয় হিংসায় ভরপুর তাহারা গুনাহ্গার অবস্থায়ই থাকিয়া যায়।"

মানব তওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, ইহা একটি উপমা দ্বারা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ্ ওয়া সাল্লাম বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন–"বান্দা তওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সরলপ্রাণ পল্লীবাসী অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে, হিংস্র জন্তু-পরিপূর্ণ কোন জঙ্গলে যাইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন। তাহার একটি উটও আছে যাহার পৃষ্ঠে তাহার সমস্ত পাথেয় ও খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে। কিন্তু সে জাগ্রত হইয়া দেখে যে উটটি নাই। সে উঠিয়া গিয়া এদিক-সেদিক উটের অনুসন্ধান করে (কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না। বরং উটের অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করিতে করিতে) ক্ষুৎ-পিপাসায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। জীবনে সে নিরাশ হইয়া বলে–'আমি নিজ স্থানে যাইয়া মৃত্যুর জন্য শয্যা গ্রহণ করি।' তৎপর ঐ পল্লীবাসী ব্যক্তি এই স্থানে ফিরিয়া আসে এবং মৃত্যু অবধারিত জানিয়া শিয়রে হস্ত স্থাপনপূর্বক মূর্ছিত হইয়া পড়ে। কিন্তু তন্দ্রা ভঙ্গ হইলে স্বীয় হারানো উটটি সে তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিতে পায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে কর্তব্য। তাহার বলা উচিত–"হে আল্লাহ্, তুমি আমার প্রভু এবং আমি তোমার গোলাম।' কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে সে ভুলক্রমে বলে, 'হে আল্লাহ্, 'তুমি আমার গোলাম এবং আমি তোমার প্রভু।' অতএব পানাহার, মাল-আসবাব সব কিছু পাইয়া এই পল্লীবাসী যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, (বিপথগামী ভ্রান্ত) মানব তওবা করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসিলে আল্লাহ্ তা'আলা তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।"

তওবার হাকীকত– জ্ঞানের আলোক ও ঈমানের নূর হইতে তওবার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই নূরের জ্যোতিতে মানব দেখিতে পায় যে, গুনাহ মারাত্মক বিষ। সে যখন বুঝিতে পারে যে, সে এই বিষ বহু পরিমাণে পান

করিয়াছে এবং ইহার প্রভাবে এখন তাহাকে বিনাশ পাইতে হইবে, তখন তাহার হৃদয়ে তীব্র অনুতাপ ও ভীষণ ভয় জাগরিত হয়। যেমন যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে বিষ পান করে, সে ইহা জানামাত্র অনুতাপ ও মৃত্যুভয়ে অস্থির হইয়া উঠে এবং বমি করিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য গলার মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া দেয়। বমি করিয়া ফেলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও উদরে বিষের লেশমাত্র রহিল কিনা, এই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করে যাহাতে বিষের প্রতিক্রিয়া শরীর হইতে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ গুনাহ্‌গার ব্যক্তি যখন উপলব্ধি করিতে পারে যে, 'আমি প্রবৃত্তির কুহকে পড়িয়া বিষমিশ্রিত মধু পান করিয়াছি–ইহা ত সেই সময় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু এই গুনাহ্‌ই পরিশেষে সর্পের ন্যায় দংশন করিয়া আমার বিনাশ সাধন করিবে,' তখন সেই গুনাহ্‌গারের হৃদয়ে অনুতাপ ও ভয়ের অগ্নি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠে। কারণ, সেই সময় সে নিজকে ধ্বংসের মুখে দেখিতে পায়। আবার কোন গুনাহ্‌র বাসনা তাহার অন্তরে উদিত হইলে ইহার জ্বালায় সে দগ্ধ হইতে থাকে। এই জ্বালা গুনাহ্‌গারের অন্তরে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনয়ন করে। অনুতাপানলের তেজে অভিলাষ-প্রভৃতি জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়া অুনতাপ-অনুশোচনার আকার ধারণ করে। অতীত পাপের ক্ষতিপূরণের জন্য সে তখন সচেষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতে কখনও পাপের দিকে যাইবে না বলিয়া দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে।

অনুতাপের অগ্নি যে কেবল হৃদয়রাজ্যের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে, তাহাই নহে, বরং ইহা বাহ্য অবস্থা এবং হাবভাব ও চাল-চলন পর্যন্ত বদলাইয়া দেয়। হঠকারিতার পোশাক বিদূরিত করিয়া ইহার স্থলে বিনয়ের পোশাক পরাইয়া দেয়। ইতঃপূর্বে সেই ব্যক্ত আত্মগর্ব, আপাত মধুর আমোদ-প্রমোদ ও মোহে নিমগ্ন থাকিত, এখন গতজীবনের অনুতাপ-অনুশোচনায় তাহার আপাদমস্তক জর্জরিত এবং তাহার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত থাকে। তখন সে গাফিল লোকদের সাহচর্যে থাকিত, কিন্তু এখন সে আরিফগণের (চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের) সাহচর্যে থাকিতে ভালবাসে।

বাস্তবপক্ষে সচেতন অনুতাপকেই তওবা বলে। জ্ঞান ও ঈমানের নূর হইতেই ইহার উৎপত্তি। তৎপর ইহা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া অন্তর ও দেহ-রাজ্যের রূপ একেবারে বদলাইয়া দেয় এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে পাপ ও অবাধ্যতার দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও বাধ্যতার কার্যে লিপ্ত করিয়া রাখে।

তওবা সর্বদা সকলের উপর ওয়াজিব–প্রিয় পাঠক, প্রত্যেকের উপর তওবা ওয়াজিব কেন, বুঝিয়া লও। বালিগ হওয়ামাত্র কাফির ব্যক্তির পক্ষে কুফর হইতে তওবা করা ওয়াজিব। তৎপর যে-মুসলমান সন্তান কেবল মাতা-পিতার অন্ধ অনুকরণ করে এবং মুখে ঈমানের কালেমা আওড়ায় কিন্তু তাহার অন্তর ইহা হইতে এমন গাফিল (অন্যমনস্ক, উদাসীন) থাকে যে, ইহার কোন প্রভাবই তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না, তবে এইরূপ গাফ্‌লত হইতে তওবা করা তাহার পক্ষে ওয়াজিব। এইরূপে তওবা করিতে হইবে যেন তাহার হৃদয় ঈমানের হাকীকত সম্বন্ধে অবগত ও সচেতন হইয়া ওঠে।

আমাদের উপরিউক্ত কথার উদ্দেশ্য এই নহে যে, প্রতিটি মুসলমান সন্তানকে আকায়িদের সমস্ত দলীল-প্রমাণ শিক্ষা করিতে হইবে। কেননা ইহা সকলের জন্য ওয়াজিব নহে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, ঈমানরূপ বাদশাহকে প্রতিটি মুসলমান সন্তানের হৃদয়ে অপ্রতিহত ও প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে, যেন তাহার হৃদয়-রাজ্যে একমাত্র ঈমানের হুকুমতই (শাসন) কায়েম থাকে। মানব-শরীরে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত যখন ঈমান-বাদশাহ্‌র আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ে এবং ইহার কোন স্থানেই শয়তানের শাসন না চলে, কেবল তখনই বুঝা যাইবে যে, মানবদেহে ঈমানের বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মানুষ যখন পাপকার্যে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার ঈমান কামিল (পূর্ণ) থাকে না। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি যিনা ও চুরি করে, সে যিনা ও চুরি করিবার কালে মুমিন থাকে না।" এই হাদীসের অর্থে এই বুঝিও না যে, তদ্রূপ পাপ কার্যের সময় সেই ব্যক্তি কাফির হইয়া যায়। কিন্তু ঈমানের বহু শাখা প্রশাখা আছে। যিনা যে জীবন-সংহারক মারাত্মক বিষ ইহা উপলব্ধি করাও ঈমানের অন্যতম শাখা। সুতরাং হলাহল বিষকে মারাত্মক জানিয়া কেহই কখনও পান করে না। তবুও পান করিলে বুঝা যাইবে যে, যিনা যে মারাত্মক বিষ, এই ঈমান ও বিশ্বাসকে তৎকালে প্রবৃত্তি-রাজ পরাস্ত করিয়া দিয়াছিল, অথবা তাহার গাফ্‌লতের (অমনোযোগিতার) দরুন ঈমান তখন লুপ্তপ্রায় ছিল, কিংবা ঈমানের নূর কাম-প্রবৃত্তির অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, সর্বপ্রথমে কুফ্‌র (খোদা-দ্রোহিতা) হইতে তওবা করা ওয়াজিব। তৎপর যে-সকল মুসলমান সন্তান অপরের

দেখাদেখি অন্ধ অনুকরণ করত মুখে ঈমানের কালেমা আওড়াইয়া নামের মুসলমান হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেও তদ্রূপ ঈমান হইতে তওবা করিয়া পূর্ণ ঈমান লাভ করা ওয়াজিব। আবার এইরূপ তওবা করিয়াও হয়ত মানুষ পাপ হইতে একেবারে মুক্ত থাকিতে পারিবে না। এমতাবস্থায় গুনাহ্ হইতে তওবা করা ওয়াজিব হইয়া পড়িবে। তৎপর সে নিজের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লইতে পারিলেও তাহার হৃদয়ে হয়ত পাপের বীজ লুক্কায়িত থাকিবে, যেমন ভোজন লালসা, কথন-লোভ, ধন-মানের আসক্তি, হিংসা, অহংকার, রিয়া প্রভৃতি মারাত্মক প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া থাকিতে পারে। এই সমস্তই মনের মলিনতা ও পাপের মূল। সুতরাং তৎসমুদয় হইতে তওবা করা ওয়াজিব যাহাতে প্রতিটি প্রবৃত্তিই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং বুদ্ধি ও শরীয়ত বিধানের আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে। (কারণ এইগুলি মূলে বিনষ্ট হইতে পারে না এবং মানব এইজন্য আদিষ্টও হয় নাই।) তবে প্রবৃত্তিসমূহকে আজ্ঞাধীন করিতে দীর্ঘ দিনের কঠোর সাধনা ও অসীম আত্ম-নিগ্রহের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আবার কোন ব্যক্তি এই সকল হইতে পাক-পবিত্র হইলেও নানা অমূলক সন্দেহ, নফসের প্ররোচনা এবং অন্যায় চিন্তা উদিত হইয়া তাহার পদস্খলন ঘটাইতে পারে। এবংবিধ সকল বিষয় হইতে তওবা করাও ওয়াজিব। (এই ব্যাপারে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেও এক কঠিন সমস্যা তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ আল্লাহ্র যিকির হইতে গাফিল থাকে।) অথচ আল্লাহ তা'আলাকে ভুলিয়া জীবনের একটি মুহূর্তও অপচয় করা সকল ক্ষতির মূল। সুতরাং ইহা হইতেও তওবা করা ওয়াজিব। আর যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, সে সর্বদাই আল্লাহ্র যিকির ও চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং নিমেষের জন্যও আল্লাহ্র যিকির হইতে উদাসীন হয় না, তথাপি তাহার সম্মুখে ক্রমোন্নতির বিভিন্ন ধাপ বাকী থাকে। এই ক্রমোন্নতির পথের প্রত্যেক পূর্ববর্তী ধাপ পরবর্তী উন্নততর ধাপের তুলনায় ক্ষতিজনক এবং পরবর্তী ধাপে আরোহণ যখন সম্ভবপর তখন সন্তুষ্টচিত্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কেবল ক্ষতিই ক্ষতি। সুতরাং এইরূপ ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তদ্রূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা হইতে তওবা করত ক্রমোন্নতির দিকে অবিশ্রান্তভাবে অগ্রসর হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে বলিয়াছেন, তিনি

প্রত্যহ সত্তর বার তওবা করেন, ইহাও সম্ভবত এই শেষোক্ত কারণেই হইয়া থাকিবে। কেননা অনবরত উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার কাজ ছিল। তিনি যে ধাপেই উপনীত হইতেন, ইহা পূর্ববর্তী ধাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেখিতে পাইতেন এবং তথা হইতে পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার অতীত অবস্থা বর্তমান অবস্থার তুলনায় মূল্যহীন ও অসম্পূর্ণ। তাই তিনি অনুতাপের সহিত তওবা করিতেন। বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য একটি উপমা গ্রহণ করা যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি একটি কার্য সম্পন্ন করত ইহার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়া আনন্দিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝিতে পারিল সেই সময়ে সে একটি স্বর্ণ মুদ্রা লাভ করিতে পারিত, অথচ মাত্র একটি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সে দুঃখিত না হইয়া পারে না। তৎপর সে একটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া তদপেক্ষা অধিক লাভের আর কিছুই হইতে পারে না ভাবিয়া খুব আনন্দিত হইল। কিন্তু ইহার পর সে জানিতে পারিল যে, এই সময়ে সে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের হীরক লাভ করিতে সক্ষম হইত। সুতরাং সে আবার দুঃখিত হয় এবং স্বীয় ত্রুটি স্বীকারপূর্বক লজ্জিত হয় ও তওবা করে। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলিয়াছেন ঃ

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

অর্থাৎ "সাধারণ পুণ্যবান লোকদের নিকট যাহা পুণ্যের কাজ বলিয়া পরিগণিত তাহাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।"

প্রশ্ন ঃ– এ স্থলে কেহ হয়ত বলিবে কুফর ও গুনাহ্ হইতে তওবা করার পর উন্নততর মরতবায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং উদাসীনতা হইতে তওবা করা অতিরিক্ত কর্মের অন্তর্ভুক্ত, ওয়াজিব নহে। এমতাবস্থায় ইহাকে ওয়াজিব বলা হইল কেন?

উত্তর ঃ–ওয়াজিব দুই প্রকার। জাহিরী ফত্ওয়া অনুসারে অনুকূল শরীয়তের বিধানসমূহ প্রতিপালন করা প্রথম প্রকারের ওয়াজিব। এই বিধানগুলি মানিয়া চলিলে পরস্পর স্বার্থের সংঘাতে দুনিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে না এবং জগদ্বাসী সুচারুরূপে জীবিকা নির্বাহ করিয়া যাইতে পারিবে। আর এই শ্রেণীর ওয়াজিবগুলি প্রতিপালন করিয়া গেলে মানুষ দোযখের আযাব হইতেও

অব্যাহতি পাইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজিবগুলি প্রতিপালন করিয়া চলা জনসাধারণের ক্ষমতার বহির্ভূত। এইগুলি লংঘন করিলে দোযখের আযাবের ভয় না থাকিলেও পরকালে উচ্চ মরতবা লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইবে এবং তজ্জন্য অপরিসীম মানসিক যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ভূতল হইতে নক্ষত্রলোকের উচ্চতা যতদূর, আখিরাতে কোন কোন লোককে তদ্রূপ উন্নত দেখিয়া বহু পুণ্যবান লোককেও অসীম বেদনা পাইতে হইবে। নিজেদের অসম্পূর্ণতাই এমন যাতনার একমাত্র কারণ। তাই যাহাতে সেইরূপ যাতনা পাইতে না হয় তজ্জন্য তওবা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজিব বলা হইয়াছে।

একবার চিন্তা করিয়া দেখ, নিজের সমশ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে উচ্চ সম্মানে বিভূষিত দেখিলে অপরের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং সংসার তখন তাহার নিকট নিতান্ত সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয়, হৃদয় ক্ষোভানলে দগ্ধ হইতে থাকে। যদিও দুনিয়ার বিচারে তাহাকে বেত্রাঘাত, হস্ত কর্তন বা অর্থ-দণ্ড ভোগ করিতে হয় না, তথাপি তদপেক্ষা অধিক মানসিক যাতনা তাহাকে সহ্য করিতে হয়। পরকালের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। সকলকেই সেই দিন অনুতাপ-অনুশোচনা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ইবাদত করে নাই সে তজ্জন্য অনুশোচনা করিবে এবং যে ব্যক্তি ইবাদত করিয়াছে কিন্তু অধিক পরিমাণে অতিরিক্ত ইবাদত করিয়া পরকালে উন্নত মরতবা লাভে বঞ্চিত থাকিবে, তাহাকেও অনুতাপ-অনুশোচনায় তীব্র মানসিক যাতনা ভোগ করিতে হইবে। এইজন্যই কিয়ামত-দিবসকে يَوْمُ التَّغَابُنِ অর্থাৎ 'গতানুশোচনার দিন' বলা হয়। আর এই কারণেই সকল নবীরই এই তরীকা ছিল যে, তাঁহারা সম্ভাব্য কোন প্রকার ইবাদত হইতেই বিরত থাকেন নাই যেন কিয়ামতের দিন স্বীয় ত্রুটির জন্য অনুতাপ-অনুশোচনা করিতে না হয়। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছাপূর্বক ক্ষুধিত থাকিতেন, যদিও তিনি অবগত ছিলেন যে, আহার করা হারাম নহে। তিনি ক্ষুধার এমন তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেন যে, একদা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলেন—"আমি রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র উদরে হাত বুলাইলাম এবং তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হউক— আপনি যদি দুনিয়াতে তৃপ্তির সহিত আহার করেন তবে কি কোন ক্ষতি আছে?' রাসূলে

মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—'আমার উলূল আযম (চরম উন্নত অধ্যবসায়ের অধিকারী) ভ্রাতাগণ ইতঃপূর্বে আল্লাহ্‌র সমীপে উপনীত হইয়া মহান গৌরবের উৎকৃষ্ট সম্মানে পুরস্কৃত হইয়াছেন। দুনিয়া হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের উচ্চ মরতবা অপেক্ষা আমার মরতবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বলিয়া আমার আশংকা হয়। প্রিয় ভ্রাতাগণ অপেক্ষা মর্যাদায় কম থাকার চেয়ে দুনিয়াতে এই কয়টা দিন ধৈর্যধারণ করিয়া থাকাকে আমি অধিক পছন্দ করি।" উক্ত প্রশ্নকারী এ স্থলে কি বলিতে চাহে?

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম একদা এক খণ্ড প্রস্তরের উপর মস্তক স্থাপনপূর্বক শয়ন করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় শয়তান তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল— "আপনি ত দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এখন তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছেন।" হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি করিয়াছি?" শয়তান বলিল—"আপনি প্রস্তরের উপর মাথা রাখিয়া বালিশের সুখ ভোগ করিতে চাহিতেছেন।" হযরত প্রস্তরটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এই লও, দুনিয়ার সহিত ইহাও আমি তোমার জন্য পরিত্যাগ করিলাম।" একদা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পাদুকায় নূতন ফিতা লাগানো হইয়াছিল। ইহার উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইলে ইহা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। তজ্জন্য নূতন ফিতা খুলিয়া লইয়া পূর্বের পুরাতন ফিতা লাগাইয়া দিবার আদেশ দিলেন।

একদা হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দুগ্ধ পান করিলেন পানের পর তাঁহার মনে দুগ্ধ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় গলদেশে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া এমনভাবে বমি করিলেন যে, বমন করিতে করিতে দুধের সহিত তাঁহার প্রাণ পর্যন্ত বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। আচ্ছা, উপরিউক্ত প্রশ্নকারীই-বা এ স্থলে কি বলিবে? তাঁহার কি জানা নাই যে, একমাত্র সন্দেহ অবলম্বনে সাধারণ ফতওয়া অনুসারে বমন করা ওয়াজিব নহে? সর্বসাধারণের জন্য শরীয়তে সহজসাধ্য সরল ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাদের ফত্ওয়া এক প্রকার, আর মহামান্য সিদ্দীকগণ নিজেদের জন্য যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, ইহা অন্য প্রকার। এমতাবস্থায় সর্বসাধারণের সহিত তাঁহাদের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? মানব জাতির মধ্যে সিদ্দীকগণই আল্লাহ্ তা'আলার সম্যক পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকল বিষয় অবগত আছে এবং আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হইতে হইলে যে সকল বাধাবিঘ্ন ও

বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হয়, ইহাও তাঁহারা ভালরূপে জানেন। ইহা মনে করিও না যে, সিদ্দীকগণ অনর্থক তদ্রূপ কষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তোমরা কেবল সাধারণ ফত্ওয়া অনুযায়ী চলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিও না, বরং ধর্ম-বিষয়ে নেতৃস্থানীয় বুযুর্গগণের অনুসরণ করিয়া চল।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, কোন অবস্থাতেই মানুষ তওবা না করিয়া থাকিতে পারে না।

বৃথা সময় অপচয়জনিত অপরিসীম অনুশোচনা–সর্বাবস্থায়ই মানবের পক্ষে তওবা করা উচিত, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত আবূ সুলায়মান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–"মানুষ যদি অন্য কোন কারণে রোদন না করিয়া কেবল জীবনের যে সময়টুকু সে বৃথা নষ্ট করিয়াছে, এইজন্যই রোদন করে, তবুও কিয়ামত পর্যন্ত রোদন করিলেও ইহা শেষ হইবে না।" এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি অতীতকাল বৃথা নষ্ট করিয়া তাহার ভবিষ্যত জীবনও বৃথা অপচয় করিতে বসিয়াছে, তাহার দুরবস্থার কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? একবার ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি নিজের অমূল্য রত্ন নষ্ট করিয়া ফেলিল, সে অবশ্যই রোদন করিবে। আবার রত্ন নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাকে বিপদ ও আযাবে নিপতিত হইতে হয় তবে তাহার রোদন ও অনুশোচনার পরিসীমাই থাকিবে না। জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস এক একটি অমূল্য রত্ন। ইহার বিনিময়ে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করা যাইতে পারে। এই অমূল্য পরমায়ু যদি কেহ পাপকার্যে ব্যয় করে এবং ইহা তাহার জীবননাশের কারণ হইয়া উঠে এবং সে উহা অবগত হয়, তবে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে? কিন্তু মানব তাহার সর্বনাশের কথা এমন সময় জানিতে পারিবে যখন শত অনুতাপ-অনুশোচনায়ও কোন লাভ হইবে না। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ –

অর্থাৎ "আর আমি তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছি, মৃত্যু আসিবার পূর্বেই তাহা হইতে ব্যয় কর। (যদি তাহা না কর এবং মৃত্যু আসিয়া পড়ে তবে মুমূর্ষু ব্যক্তি) তখন বলিবে–"হে প্রভু, আমাকে সামান্য সময় অবকাশ দিলে না কেন?" (সূরা মুনাফিকূন, ২ রুকূ, ২৮ পারা)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বুযুর্গগণ বলেন–"মৃত্যুকালে মানুষ মৃত্যুর ফিরিশতাকে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারে যে, এখনই সে পরলোকগমন করিবে। তখন মানব অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে এবং মৃত্যুর ফিরিশতার নিকট এক দিনের অবকাশ প্রার্থনা করে, যেন সে গুনাহ্র জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইতে পারে। কিন্তু ফিরিশতা তাহার কথা শুনিবে না এবং বলিবে–'হে মানব, তোমাকে বহু দিনের অবসর দেওয়া হইয়াছিল। এখন তোমার পরমায়ুর একটি দিনও বাকী নাই, তোমার নির্দিষ্ট মৃত্যুর সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।' তৎপর মানুষ এক ঘণ্টার সময় প্রার্থনা করে। কিন্তু ফিরিশতা তখন এইরূপ বলে, 'তোমার জীবনের বহু ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে। এখন আর এক ঘন্টাও বাকী নাই।" এমতাবস্থায় মানুষ নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়ে এবং তখন তাহার ঈমানও স্থির থাকে না। যাহার অদৃষ্টে সৃষ্টির আদিম সময়ে দুর্ভাগ্য নির্ধারিত আছে, সে ঈমানে সংশয় ও অস্থিরতা লইয়াই এই সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে এবং পরকালের অসীম দুর্ভোগে নিপতিত হয়। অপর পক্ষে সৃষ্টির আদিম কালে যাহার অদৃষ্টে সৌভাগ্য নির্ধারিত আছে, তাহার মূল ঈমান অটুট থাকে। এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ –

অর্থাৎ "আর সেই সকল লোকের জন্য তওবা নাই যাহারা তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত মন্দ কার্য করিতে থাকে, তখন সে বলেন–'নিশ্চয়ই আমি এখন তওবা করিলাম।' (সূরা নিসা, ৩ রুকূ, ৪ পারা)

বুযুর্গগণ বলেন–"প্রত্যেক মানুষের সহিত আল্লাহ তা'আলার দুইট গুপ্ত রহস্য রহিয়াছে। প্রথমটি এই যে, সে যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন আল্লাহ বলেন–'হে মানব, আমি তোমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমানতস্বরূপ তোমাকে পরমায়ু দান করিয়াছি। সাবধান, মৃত্যুর সময় ইহা কিরূপভাবে আমাকে ফিরাইয়া দাও তাহাই আমি দেখিব।' দ্বিতীয় রহস্যটি এই যে, মৃত্যুকালে আল্লাহ মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন–'হে বান্দা, যে আমানত তোমার নিকট রাখিয়াছিলাম, ইহা দ্বারা কি করিয়াছ? যদি ভালরূপে ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার পাইবে।

আর যদি ইহা বৃথা নষ্ট করিয়া থাক, তবে দোযখ তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে এবং তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত থাক।"

তওবা কবূল হওয়ার বিবরণ– তওবা কবূলের জন্য কতকগুলি শর্ত রহিয়াছে। এইগুলি যথারীতি পালন করিয়া তওবা করিলে তওবা অবশ্যই কবূল হইয়া থাকে। আন্তরিকতার সহিত তওবা করিয়া ইহা কবূল হইবে কিনা ভাবিয়া সন্দেহ পোষণ করিও না। বরং শর্তাবলী যথারীতি পালন করিয়া তওবা করা হইল কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ কর। যে ব্যক্তি আত্মার যথার্থ পরিচয় লাভ করিয়াছে, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অবগত হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কি প্রকারে তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং কোন্ বস্তু আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে পর্দার সৃষ্টি করে, ইহা জানিতে পাইয়াছে, সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারে যে, গুনাহ্‌র দরুনই পর্দার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং তওবা দ্বারা পর্দা বিদূরিত হয়। আর আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে মানবের সম্মুখে যে পর্দা উপস্থিত হয় তাহা সরিয়া যাওয়ার নামই তওবা কবূল হওয়া।

বাস্তবপক্ষে মানবাত্মা ফিরিশতাজাতির সমশ্রেণীর এক পবিত্র রত্ন বিশেষ। আত্মা প্রথমে অতি স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় থাকে। দুনিয়ার পাপ-পঙ্কিলতা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া না ফেলিলে ইহাতে আল্লাহ্‌র প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। আর মানব পাপ করিলে তজ্জনিত অন্ধকার আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ইবাদত করিলে আবার অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয় এবং ইহা পাপের অন্ধকার বিদূরিত করে। এমতাবস্থায় তওবা আসিয়া পাপের অন্ধকার দূর করিয়া দিলে আত্মা নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা লাভ করে। কিন্তু বহু দিন ধরিয়া বরাবর পাপকার্য করিয়া চলিলে ইহার মলিনতা আত্মার অভ্যন্তর ভাগে গাঢ়ভাবে বসিয়া যায় এবং ইহা দূর করিবার কোন উপায় থাকে না। এই অবস্থায় উপনীত হইলে মরিচা-ধরা দর্পণের ন্যায় আত্মা তওবার উজ্জ্বলতা গ্রহণ করে না। অথচ এই শ্রেণীর লোক রসনায় তওবার বাক্য উচ্চারণ করিয়াই মনে করে আমি তওবা কারিয়াছি।

তওবা কবূল হওয়া সম্বন্ধে হাদীস ও বুযুর্গগণের উক্তি–মলিন বস্ত্র সাবান দিয়া ধৌত করিলে যেমন ইহা পরিষ্কার হইয়া যায়, তদ্রূপ ইবাদতের আলোকেও পাপজনিত অন্ধকার বিদূরিত হইয়া হৃদয় পাক-পবিত্র হইয়া উঠে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"মন্দ কার্য

ঘটিয়া গেলে অবিলম্বে সৎকার্য কর; তাহা হইলে সৎকার্য মন্দ কার্য মিটাইয়া দিবে।" তিনি বলেন–"গুনাহ্‌র স্তূপ আকাশ পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিলেও তওবা কর; কারণ তবুও তওবা কবূল হইয়া থাকে।" তিনি অন্যত্র বলেন–"এমন লোকও হইবে যে পাপের কারণে বেহেশতে যাইবে।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"ইহা রাসূলাল্লাহ, ইহা কিরূপে হইবে?" তিনি বলিলেন–"কেহ পাপ করিয়া এত অধিক অনুতপ্ত হয় যে, বেহেশতে প্রবেশ লাভ করা পর্যন্ত এই অনুতাপের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে।" (অর্থাৎ গুনাহ্ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে এমনভাবে তওবা করেন যে, এই অনুতাপানলে সর্বদা দগ্ধ হইতে থাকে এবং পুনরায় গুনাহ্ করিতে পারে না। কাজেই অবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করে।) "বুযুর্গগণ বলেন–"তওবাকারী লোকদের সম্বন্ধে শয়তান বলে–'হায়! আমি যদি তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত না করিতাম!"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"পানি যেমন মলিন বস্ত্র ধুইয়া পরিষ্কার করে, পুণ্যও তদ্রূপ পাপ ধুইয়া ফেলে। তিনি অন্যত্র বলেন–"শয়তান অভিশপ্ত হইবার সময় বলিল–'হে আল্লাহ্, তোমার গৌরবের শপথ, মানুষের প্রাণ তাহার দেহ-পিঞ্জর হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমি তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইব না।' ইহার উত্তরে আল্লাহ্ বলিলেন–'আমি আমার গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি, যে পর্যন্ত তাহার প্রাণ দিল হইতে বহির্গত না হইবে, সেই পর্যন্ত আমিও তাহার তওবার দরজা উন্মুক্ত রাখিব।" এক হাবশী রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি অনেক গুনাহ করিয়াছি। আমার তওবাও কি কবূল হইবে?" তিনি বলিলেন–"হাঁ, কবূল হইবে।" ইহা শুনিয়া হাব্শী প্রস্থান করিল। কিন্তু কিছুদূর গমনের পর ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, গুনাহ করিবার কালে আল্লাহ্ কি দেখিতেছিলেন?" হযরত বলিলেন–"হাঁ, তিনি দেখিতেছিলেন।" ইহা শুনিয়া হাব্শী এক চীৎকার করত ভূতলে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

হযরত ফুযাইল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা কোন এক পয়গম্বরকে বলিয়াছিলেন–'আমার গুনাহ্গার বান্দাগণকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাহারা তওবা করিলে আমি কবূল করিব এবং সিদ্দীকগণকে ভয় প্রদর্শন কর যে, আমি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহাদের কেহই আযাব হইতে

বাঁচিতে পারিবে না।" হযরত তলাক ইব্নে হাবীব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– "আল্লাহ্ সম্বন্ধে মানবের কর্তব্য এত অধিক যে, কিছুতেই সে উহা যথার্থভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না। অতএব প্রত্যুষে তওবার সহিত শয্যাত্যাগ করা এবং রজনীতে তওবার সহিত শয্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।" হযরত হাবীব ইব্নে আবূ সাবিত (র) বলেন–"কিয়ামত দিবস মানবের সম্মুখে পাপসমূহ উপস্থিত করা হইবে। যে ব্যক্তি পাপ দেখিয়া সভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিবে, 'আমি ইহার জন্য সর্বদা ভয় পাইতাম,' তবে আল্লাহ্ তা'আলা এই ভয়ের কারণে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি অত্যন্ত পাপী ছিল। সে তওবা করিতে চাহিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে তাহার তওবা কবূল হইবে কি না, সে জানিত না। লোকে তাহাকে এক শ্রেষ্ঠ আবিদের সন্ধান দিল। পাপী ব্যক্তি এই আবিদের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল–"আমি ঘোর পাপী। নিরানব্বইজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে আমি অকারণে হত্যা করিয়াছি। আমার তওবা কবূল হইবে কি?" আবিদ বলিলেন–"না।" তখন সেই ব্যক্তি উক্ত আবিদকেও হত্যা করিয়া নরহত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ করিল। তৎপর লোকে তাহাকে এক শ্রেষ্ঠ আলিমের সন্ধান দিল। সে এই আলিমের নিকট গমন করত জিজ্ঞাসা করিল–"আমার তওবা কবূল হইবে কি?" আলিম উত্তর দিলেন– "হাঁ, কবূল হইবে।" তবে তোমার বাসস্থান ফাসাদে পরিপূর্ণ। ইহা পরিত্যাগপূর্বক অমুক স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে। সে স্থানে পুণ্যবান লোকগণ বাস করেন।" ইহা শুনিয়া পাপী লোকটি সেই স্থানের উদ্দেশ্য রওয়ানা হইল। কিন্তু পথিমধ্যেই সে মরিয়া গেল। তাহার আত্মা বেহেশ্‌তে লইয়া যাওয়া হইবে, কি দোযখে ফেলিতে হইবে, ইহা লইয়া আযাবের ও রহমতের ফিরিশতাদের মধ্যে মতভেদ হইল। উভয় ফিরিশতা তাহাকে দাবি করিতে লাগিল। আল্লাহ তা'আলা পাপীর গৃহ এবং পুণ্যবান লোকগণের আবাসস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব মাপিবার আদেশ দিলেন। মাপিয়া দেখা গেল, মৃতদেহ ঠিক মধ্যপথ হইতে অর্ধহস্ত পরিমাণ পুণ্যবান লোকগণের নিকটবর্তী রহিয়াছে। তখন রহমতের ফিরিশতা তাহার আত্মা লইয়া গেল।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে বুঝা গেল যে, পাপের পাল্লা একেবারে পাপশূন্য হওয়া নাজাতের (পবিত্রাণের) জন্য শর্ত নহে। বরং পাপের পাল্লা অপেক্ষা পুণ্যের পাল্লা একটু ভারী হইলে, এমন কি একটু ঝুঁকিয়া পড়িলেই নাজাত পাওয়া যাইবে।

কবীরা ও সগীরা গুনাহ–পাপ হইতে তওবা করিতে হয়। পাপ যত ছোট হয়, তওবাও তত সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু ছোট পাপেও হঠকারিতা করিলে তওবা কঠিন হইয়া পড়ে। হাদীস শরীফে আছে, ফরয নামাযে কবীরা গুনাহ ব্যতীত আর সকল গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হইয়া যায় এবং এক জুম'আ হইতে অপর জুম'আ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ ব্যতীত সমস্ত গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ –

অর্থাৎ "যে কবীরা গুনাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে দূরে থাকিলে আমি তোমাদের সগীরা গুনাহ মাফ করিয়া দিব।"

কবীরা গুনাহ্‌র বিবরণ–কি কি কাজ করা কবীরা গুনাহ তাহা জানিয়া লওয়া ফরয। কবীরা গুনাহ্‌র সংখ্যা সম্বন্ধে সাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, কবীরা গুনাহ সাতটি, কেহ-বা তদপেক্ষা অধিক, আবার কেহ-বা অল্প বলিয়াছেন।

হযরত ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, কবীরা গুনাহ সাতটি। কবীরা গুনাহ প্রায় সত্তরটি বলিয়াও অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

হযরত আবূ তালিব মক্কী রাহমাতুল্লাহি বলেন–"আমি হাদীস ও সাহাবীগণের উক্তি সংকলন করিয়া 'কুওয়াতুল কুতুব' নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, কবীরা গুনাহ সত্তরটি। ইহার মধ্যে চারটি হৃদয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, যথাঃ– (১) কুফর (খোদাদ্রোহিতা), (২) পাপে হঠকারিতার সংকল্প, যদিও লঘু পাপই হউক না কেন, যেমন কেহ মন্দ কাজ করে, ইহা হইতে তওবা করিবার ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করে না, (৩) আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, (৪) আল্লাহ্ সব মাফ করিয়া দিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার ক্রোধের ভয় না করিয়া নিশ্চিত থাকা। চারটি কবিরা গুনাহ্ রসনার সহিত সম্বন্ধ রাখে। যথাঃ– (১) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাহার ফলে কাহারো প্রাপ্য নষ্ট হয়, (২) সচ্চরিত্র নর-নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করা, যে দোষের জন্য শরীয়ত মতে শাস্তি প্রদান ওয়াজিব, (৩) মিথ্যা শপথ করা, কারণ ইহার ফলে কেহ স্বীয় ধন বা অপর কোন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয়, (৪) যাদুমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করা। তিনটি কবীরা

গুনাহ উদরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। যথাঃ– (১) মদ্যপান ও মাদক দ্রব্য সেবন, (২) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, (৩) সুদ খাওয়া। দুইটি কবীরা গুনাহ গুপ্তাঙ্গের সহিত সম্পর্কে রাখে। যথাঃ– (১) যিনা (ব্যভিচার), (২) লাওয়াতাত (পুংমৈথুন)। দুইটি কবীরা গুনাহ হস্ত দ্বারা সম্পন্ন হয়। যথাঃ– (১) নরহত্যা, (২) চুরি করা, যাহাতে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব। একটি মহাপাপ পায়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে। তাহা হইল কাফিরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা। অবশ্য অবস্থাভেদে পলায়ন করা দুরস্তও আছে। কাফির মুসলমানের দ্বিগুণের অধিক না হইলে অর্থাৎ এক মুসলমানের সঙ্গে দুই কাফির বা দশ মুসলমানের বিরুদ্ধে বিশ কাফির যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মুসলমানের পক্ষে পৃষ্ঠভংগ দিয়া পলায়ন করা কবীরা গুনাহ। কাফির মুসলমানের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইলে পলায়ন জায়েয। একটি কবীরা গুনাহ সমস্ত দেহের সহিত সম্পর্ক রাখে। ইহা হইল মাতাপিতাকে দুঃখ দেওয়া।

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, যে কয়টি গুনাহ্‌র পরিচয় দেওয়া হইল, তন্মধ্যে কতকগুলির জন্য শরীয়ত মতে শাস্তি প্রদান ওয়াজিব এবং অপরগুলির জন্য কুরআন শরীফে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। এইজন্য এগুলি কবীরা গুনাহ্। ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসমুদয়ের বর্ণনা সম্ভবপর নহে। লোকে অবগত হইয়া যেন কবীরা গুনাহ্ হইতে অতি সতর্কতার সহিত বিরত থাকে, এইজন্যই উহার পরিচয় দেওয়া হল।

পরপীড়নের পাপ ও ইহা মোচনের উপায়– প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, সগীরা গুনাহ্ হঠকারিতা করিয়া বারবার করিলে ইহা কবীরা গুনায় পরিণত হয়, যদিও এই কথা বলা হইয়াছে যে, ফরয নামাযে সগীরা গুনাহ্‌র কাফ্ফারা হয়ে যায়। অপর পক্ষে ইহাতে কোনই মতভেদ নাই যে, অত্যাচারপূর্বক অন্যের প্রতি কানাকড়ি পরিমাণ যুলূম অত্যাচার করিলেও ইহা প্রকৃত মালিককে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত ফরযকার্য সম্পাদনে ইহা কখনও মাফ হয় না। মানুষের প্রতি অত্যাচারজনিত পাপ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যে অবহেলাজনিত পাপ মাফ পাইবার অধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মানবের ত্রিবিধ আমলনামা– হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মানুষের তিনটি আমলনামা থাকে। ইহার একটিতে শিরক গুনাহ্ লিপিবদ্ধ হয়। এইগুলি মাফের অযোগ্য। অপরটিতে আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কজনিত পাপ

লিপিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্‌র অপার রহমে এইগুলি মাফ হইয়া যাইতে পারে। অপর আমলনামাটিতে অন্যের প্রতি অত্যাচার-অবিচারজনিত পাপ লিপিবদ্ধ হয়। এই পাপসমূহ মাফ হইবার আশা নাই। যে কার্য দ্বারা কোন মুসলমানকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া হয়, তাহাও এই শেষোক্ত আমলনামাতে লিপিবদ্ধ করা হয়–ইহা কাহাকেও শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দিয়া, আর্থিক ক্ষতি করিয়া, মানসম্ভ্রম নষ্ট করিয়া বা লোকের ধর্ম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে ধর্ম-বহির্ভূত নব নব প্রথা প্রচলিত করিয়াই হউক অথবা পাপের প্রতি লোকের সাহসিকতা বৃদ্ধি পায় এমন কথা বলিয়াই হউক না কেন।

সগীরা গুনাহ্ কবীরা গুনায় পরিণত হওয়ার কারণ–সগীরা গুনায় লোকের আশা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করিয়া দিবেন। কিন্তু কতিপয় কারণে উহা কবীরা গুনায় পরিণত হয় এবং ইহার বিপদও কঠিন হইয়া পড়ে। ছয়টি কারণে সগীরা গুনাহ্ কবীরা গুনায় পরিণত হয়।

প্রথম কারণ– হঠকারিতা করিয়া সগীরা গুনাহ বারবার করিতে থাকা; যেমন–সর্বদা গীবত (পরনিন্দা) করা, সর্বদা রেশমী বস্ত্র পরিধান করা বা ক্রীড়াকৌতুক প্রণোদিত হইয়া গানবাদ্য শ্রবণ করা। কারণ, অনবরত গুনাহ্ করিতে থাকিলে হৃদয় অত্যন্ত মলিন হইয়া পড়ে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে নেক কার্য সর্বদা হইতে থাকে, তাহা অল্প হইলেও উত্তম।" ইহার উদাহরণ এইরূপ যে, বিন্দু বিন্দু পানি প্রস্তরের একই স্থানে অনবরত পড়িত থাকিলে প্রস্তরেও ছিদ্র হইয়া যায়। কিন্তু সমস্ত পানি একবারে প্রস্তরের উপর ঢালিয়া দিলে তদুপরি কোনই চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না।

যাহা হউক, সগীরা কি কবীরা, যে-কোন গুনাহ্ সংঘটিত হওয়ামাত্র আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ইহার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা উচিত এবং তদ্রূপ কার্য পুনরায় না করিবার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে সর্বদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকা আবশ্যক। বুযুর্গগণ বলেন–"কবীরা গুনাহ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ইহা সগীরা গুনায় পরিণত হয়। আবার সগীরা গুনাহ জিদ ধরিয়া বারবার করিতে থাকিলে ইহা কবীরা গুনাহ হইয়া পড়ে।"

দ্বিতীয় কারণ–গুনাহকে ক্ষুদ্র মনে করিলে এবং তুচ্ছজ্ঞানে উপেক্ষার চক্ষে দেখিলে সগীরা গুনাহ্ কবীরা গুনাহ্ হইয়া যায়। কিন্তু পাপকে গুরুতর মনে করিলে ইহা লঘু হইয়া পড়ে। ভয় ও ঈমানের কারণেই পাপকে গুরুতর মনে

করা যাইতে পারে। ইহা আত্মাকে এইরূপ বাঁচাইয়া রাখে যে, পাপের অন্ধকার হৃদয়ে বিস্তার লাভ করিতে পারে না। অপরপক্ষে পাপকে তুচ্ছজ্ঞান করা উদাসীনতা ও পাপের প্রতি আসক্তির কারণেই হইয়া থাকে। পাপকে তুচ্ছ মনে করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, পাপ হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে। বস্তুত মনের সহিতই কাজের সম্বন্ধ এবং যাহা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, ইহাই অনেক বড় হইয়া পড়ে।"

হাদীস শরীফে আছে যে, মুসলমান স্বীয় পাপকে তাহার উপর পাহাড়-স্বরূপ মনে করে এবং কখন ভাঙ্গিয়া তাহার উপর পতিত হয়, এই ভয়ে সে সর্বদা ভীত থাকে। কিন্তু মুনাফিক পাপকে মাছির ন্যায় ধারণা করে এবং বিবেচনা করে, এখন নাকের উপরে বসিতেছে, পরক্ষণেই উড়িয়া যাইবে। বুযুর্গগণ বলেন, যে ব্যক্তি নিজ পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং আশা করে যে, সমস্ত পাপই এইরূপ তুচ্ছ হউক, তাহার পাপ ক্ষমা করা হইবে না। এক পয়গম্বর আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল—"পাপের ক্ষুদ্রতার প্রতি লক্ষ্য করিও না, আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কারণ তুমি মহান আল্লাহ্র আদেশ লঙ্ঘন করিলে।" মানব যতই আল্লাহ্র মহত্ত্ব অধিক পরিমাণে অবগত হইতে পারে ততই ক্ষুদ্র পাপকে বড় বলিয়া বুঝিতে পারে।

একজন সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—"তোমরা এমন কাজ কর যাহাকে তোমরা পশমের ন্যায় হালকা মনে কর। কিন্তু আমরা প্রতিটি কাজকে পর্বতসম মনে করি। আর সকল পাপেই আল্লাহ্র ক্রোধ লুক্কায়িত আছে এবং যে পাপকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা হয়, হয়ত ইহাতেই (আল্লাহ্র ক্রোধ) রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ—

অর্থাৎ "তোমরা ইহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট ইহা গুরুতর।" (সূরা নূর, ২ রুকূ, ১৮ পারা)

তৃতীয় কারণ—পাপ কার্যে আনন্দ পাওয়া ও গর্ব করা এবং ইহাকে নিজের লাভ ও বিজয় বলিয়া মনে করা। এইরূপ পাপী লোক হয়ত অন্যায় করত গর্ব করিয়া বলে—"আমি অমুককে ধোঁকা দিয়াছি—অমুককে খুব ভর্ৎসনা করিয়াছি—অমুকের ধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছি—অমুককে খুব গালি দিয়া

অপমানিত করিয়াছি—তর্কবিতর্কে অমুককে খুব যাতনা দিয়াছি এবং তাহার সহিত অত্যন্ত রাগ করিয়াছি" এবং এবংবিধ আরও বহু কথা বলিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ পাপ কার্য করিয়া আনন্দ পায় এবং বাহাদুরি করে তবেই বুঝা যায় যে, তাহার হৃদয় পাপের মলিনতায় জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই পাপেই যে বিনাশ হইবে। পাপ করিয়া এইরূপ আনন্দ অনুভব করিলে সগীরা গুনাহ্ কবীরা গুনায় পরিণত হয়।

চতুর্থ কারণ—আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন পাপ গোপন রাখেন, আর পাপী ইহাকে আল্লাহ্র করুণা মনে করিয়া নির্ভয় হইয়া পড়ে তবে লঘু পাপও মহাপাপে পরিণত হয়। পাপ গোপন থাকিলে এই ভাবিয়া ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ্ পাপ কার্যে ঢিল দিলেন এবং ইহাতে পাপের বোঝা ভারি করিয়া অচিরেই তাহাকে ডুবিয়া মরিতে হইবে।

পঞ্চম কারণ—পাপ করত নিজেই ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা যে পাপ স্বাভাবিক আবরণে ঢালিয়া রাখেন, তাহা ছিন্ন করিয়া দেওয়া। ইহাতে যদি অপর লোক গুনাহ্র দিকে আকৃষ্ট হয় এবং পাপ কার্য করে তবে ইহার বোঝাও পাপ প্রকাশককে বহন করিতে হইবে। আর পাপী ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে পাপের দিকে উৎসাহ প্রদান করে এবং পাপ কার্যের উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া দেয়, এমন কি অপর লোকে তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া পাপে লিপ্ত হয়, তবে এইরূপ পাপী ব্যক্তি দ্বিগুণ পাপী হইবে। প্রাচীন বুযুর্গগণ বলেন—"মুসলমানের দৃষ্টিতে পাপকে সহজ ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিয়া তোলা অপেক্ষা অধিক বিপদের আর কিছুই নাই।"

ষষ্ঠ কারণ—আলিম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দ্বারা পাপের অনুষ্ঠান। তাহাদিগকে পাপ কার্য করিতে দেখিলে পাপ কার্যের প্রতি সর্বসাধারণ লোকের সাহসিকতাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কারণ তখন লোকে মনে করে যে, এইরূপ কার্য অন্যায় হইলে অমুক আলিম বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কখনই ইহা করিত না। কোন আলিম রেশমী পোশাক পরিধান করিলে, রাজপুরুষদের নিকট যাতায়াত করিলে ও তাহাদের দান গ্রহণ করিলে, নিজের ধন ও মানের গর্ব করিলে এবং তর্ক-বিতর্ককালে প্রতিপক্ষের প্রতি অসদ্ব্যবহার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিলে তাহার শিষ্যগণও তাহার অনুসরণ করিবে এবং তাহারাও উস্তাদের ন্যায়ই হইয়া পড়িবে। এই শিষ্যগণও যখন পরিণামে শিক্ষকতার কার্য করিবে তখন তাহাদের

শিষ্যগণও শিক্ষকের অনুসরণ করত তদ্রূপ গর্হিত কার্য করিতে থাকিবে। পরবর্তীকালে প্রতিটি শহর বা গ্রামের লোক তাহাদের কোন না কোন একজনের ভক্ত হইয়া পড়িবে এবং এই প্রকারে গ্রামকে গ্রাম ও শহরকে শহর ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। দেশে যত লোক উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণে পাপ কার্য করিবে, সকল পাপ প্রাথমিক আলিম বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইবে। (কিন্তু ইহাতে অনুসরণকারীদের পাপের বোঝা মোটেই কমিবে না।)

এই কারণেই বুযুর্গগণ বলেন–"যে ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুনাহ্ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় সে-ই ভাগ্যবান।" এমন লোকও আছে যাহার মৃত্যুর পর তাহার পাপ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। বানী ইসরাঈলের একজন আলিম তওবা করিয়াছিল। এই উপলক্ষে তৎকালীন পয়গম্বরের (আ) নিকট আল্লাহ্ তা'আলা ওহী অবতীর্ণ করিলেন–"সে আলিমকে বলিয়া দাও, তোমার গুনাহ্ কেবল তোমার ও আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিতাম। এখন তুমি একাকী তওবা করিলে বটে; কিন্তু যে সম্প্রদায়কে তুমি পথভ্রষ্ট করিয়া ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিলে তাহারা পূর্বের মতই পাপ করিয়া চলিয়াছে। ইহার কি করিবে? (অর্থাৎ তাহার অনুসরণকারিগণ পূর্ববৎ পাপ করিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় তাহাদের সমান পাপ আসিয়া এই আলিমের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইতেছে। এই পাপের পথ বন্ধ হইবে কিরূপে?)

উপরিউক্ত কারণেই আলিমদের বিপদ অনেক। তাঁহাদের এক গুনাহ্ সহস্র গুনাহ্র সমান এবং তাঁহাদের এক ইবাদত সহস্র ইবাদতের সমান। কেননা যে আলিমের অনুসরণ করিয়া যত লোকে ইবাদত করে তাহাদের সকলের সওয়াবের সমষ্টি সেই আলিমের আমলনামাতে লিপিবদ্ধ হয়। এইজন্য আলিমের পক্ষে একেবারে গুনাহ্ না করা ওয়াজিব। ঘটনাচক্রে কোন গুনাহ্ হইয়া পড়িলে, ইহা অতি সাবধানতার সহিত গোপন রাখা কর্তব্য। এমন কি, আলিম কোন মুবাহ্ (নির্দোষ) কাজ করিলেও যদি উদাসীনতার দরুন পাপ কাজে জনসাধারণের সাহস বৃদ্ধি পায়, তবে তদ্রূপ মুবাহ কাজ পরিত্যাগ করা আলিমের পক্ষে উচিত। আল্লামা যহ্রী (র) বলেন–"আমি পূর্বে হাসি-ঠাট্টা করিতাম। কিন্তু এখন লোকে যখন আমার অনুসরণ করে তখন মৃদু হাস্য করাও আমার পক্ষে জায়েয নহে।"

আলিমগণের ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করাও মহাপাপ। কারণ এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা শুনিলে অনেক লোক বিপদগামী হইয়া পড়ে এবং গুনাহ্র কাজে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সর্বসাধারণের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখাই যখন ওয়াজিব, এমতাবস্থায় ভাবিয়া দেখ, আলিমগণের দোষ-ত্রুটি গোপন করা কত বড় ওয়াজিব।

প্রকৃত তওবার শর্ত ও নির্দশন

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ– অনুতাপ ও তওবার সূচনা এবং পরিদৃশ্যমান দৃঢ় ও সংকল্প ইহার পরিণতি।

অনুতাপ–অনুতাপের অভ্যন্তরীণ নিদর্শন তওবাকারীর জ্বলন্ত পরিতাপ ও অপরিসীম মনস্তাপ এবং বাহিরের নিদর্শন বিলাপ ও ক্রন্দন। কারণ যে-ব্যক্তি নিজকে ধ্বংসের মুখে দেখিতে পায়, সে কিরূপে বেদনাক্লিষ্ট ও দুঃখভারাক্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারে? কাহারও পুত্র যদি রোগাক্রান্ত হয় এবং কোন অমুসলমান চিকিৎসক যদি বলে যে, রোগীর অবস্থা বিপদজনক এবং তাহার বাঁচিবার আশা করা যায় না তবে পিতা কিরূপ যাতনানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। আর সকলেই জানে যে, নিজের প্রাণ নিজের সন্তান অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের কথা অমুসলমান চিকিৎসকের কথা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য এবং আখিরাতে বিনাশের ভয় মৃত্যুভয় অপেক্ষা অধিক কঠিন। অপর পক্ষে গুনাহ্র দরুন আল্লাহ্র ক্রোধের সঞ্চার হওয়া যেরূপ প্রমাণিত সত্য, রোগের কারণে মরিয়া যাওয়া তত প্রমাণিত সত্য নহে। পাপ পাপীর মনে ভয় ও দুঃখ-যন্ত্রণার উদ্রেক না করিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, পাপের আপদ সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাসই জন্মে নাই।

মোটের উপর কথা এই যে, অনুতাপানল যত প্রখর হয়, পাপ ততই পুড়িয়া বিনষ্ট হয়। কারণ পাপ করিলে মানব-হৃদয়ে মরিচা পড়ে এবং অনুতাপের বহ্নি ব্যতীত আর কিছুই ইহা দূর করিতে পারে না। অনুতাপের তেজ মানবাত্মাকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করিয়া তুলে। তওবাকারীদের সংসর্গ অবলম্বনের জন্য হাদীস শরীফে আদেশ আছে, কেননা তাহাদের হৃদয় অত্যন্ত স্বচ্ছ হইয়া থাকে। যাহার

হৃদয় যত স্বচ্ছ, তাহার পাপও তত কম হয় এবং পূর্বে তাহার নিকট পাপকার্য মধুর বলিয়া বোধ হইয়া থাকিলে এখন ইহা পরিবর্তিত হইয়া বিস্বাদ ও তিক্ত বলিয়া মনে হয়। বানী ইসরাঈল বংশের একজন পয়গম্বর এক পাপীর তওবা কবূলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অনুরোধ করিলেন। আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন–"আমার প্রতাপের শপথ, আকাশের সমস্ত ফিরিশতা তাহার জন্য অনুরোধ করিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনে পাপের আনন্দ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ তাহার তওবা কবূল করিব না।"

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, পাপ অতীব প্রলোভনের বস্তু হইলেও তওবাকারীর জন্য ইহা বিষমিশ্রিত মধুস্বরূপ। যে-ব্যক্তি একবার বিষমিশ্রিত মধু পান করিয়াছে, দ্বিতীয় বার ইহার কল্পনাও হৃদয়ে উদিত হইলে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। বিষের ভয়ে মধু লোভ সহজেই দমন হইয়া যায়। এই বিরাট পরিবর্তন কেবল এক শ্রেণীর পাপের সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সর্বপ্রকার পাপের মাধুর্যই এই অনুতাপের প্রভাবে তিক্ত হইয়া উঠে। কারণ, যে-পাপ সে করিয়াছে, ইহাতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি আছে বলিয়াই ইহা তাহার নিকট বিষতুল্য এবং সর্বপ্রকার পাপের সম্বন্ধেই এই নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য।

দৃঢ় সংকল্প (ইরাদা)– তওবাকারীর হৃদয়ে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে তাহার মনে যে দৃঢ় সংকল্প জন্মে, ইহা বর্তমান, ভবিষ্যত এবং অতীত, এই তিন কালের সঙ্গেই সম্বন্ধ রাখে। অনুতাপজনিত এই সংকল্প বর্তমান কালে সমস্ত পাপ হইতে বাঁচাইয়া তাহাকে কর্তব্যকার্যে ব্যাপৃত করিয়া রাখে। তওবাকারী ভবিষ্যতের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প করিয়া লয় যে, সে সকল গুনাহ্ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। আর সে আল্লাহ্‌র সহিত ভিতর-বাহিরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় যে, সে কখনও পাপের ত্রিসীমায় যাইবে না এবং কর্তব্য কর্মে আর ত্রুটি-বিচ্যুতি করিবে না; যেমন যে-রোগী জানিতে পারিয়াছে যে, ফল খাইলে তাহার ক্ষতি হইবে, সে ইহা ভক্ষণ না করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। আর এইরূপ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতে সে কখনও ইতস্তত করিবে না, যদিও অসম্ভব নহে যে, প্রবৃত্তি তাহার উপর পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিতে পারে।

যে-ব্যক্তি তিনটি বিষয়ে অভ্যস্ত না হইয়াছে বা অভ্যস্ত হইবার ক্ষমতা না রাখে, সে তওবা করিতে পারে না। উহা হইল নির্জনতা অবলম্বন, চুপ থাকা এবং হালাল দ্রব্য ভক্ষণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সন্দেহজনক দ্রব্যাদি হইতে হস্ত

সঙ্কুচিত করিতে না পরিবে, সেই পর্যন্ত তাহার তওবা পূর্ণ হয় না। অপর পক্ষে, যে-পর্যন্ত সে লোভ-লালসা পরিত্যাগ না করিবে, সেই পর্যন্ত সে সন্দেহজনক দ্রব্য হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন যে, কোন দ্রব্যের উপর প্রবল লোভ জন্মিলে কষ্টেসৃষ্টে ইহার উপর হইতে সাতবার হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইতে পারিলে উহা পরিত্যাগ করা সহজ হইয়া পড়ে।

তওবাকারীর সংকল্পের সহিত অতীত কালের সম্বন্ধ এইরূপ থাকে যে, সে অতীত পাপের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রস্তুত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য ও মানুষের প্রতি কর্তব্যকার্যগুলির মধ্যে কি কি ত্রুটি করা হইয়াছে, সে ইহা বাহির করিয়া লয়।

আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালনের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ– আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত; যথাঃ– (১) ফরয কাজ সম্পন্ন করা এবং (২) পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা।

ফরযকার্যে ত্রুটির ক্ষতিপূরণ–বালেগ হওয়ার পর হইতে অদ্যাবধি প্রতিটি দিন সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ইহার মধ্যে যদি নামায কাযা হইয়া থাকে, নাপাক বস্ত্র লইয়া নামায পড়া হইয়া থাকে, নামাযী ব্যক্তির নিয়ত দুরস্ত ছিল না বা মূল বিশ্বাসে সন্দেহ ও দোষত্রুটি ছিল ইত্যাদি কারণে যে সকল নামায দুরস্ত হয় নাই, উহার কাযা আদায় করিতে হইবে। যে তারিখ হইতে তুমি ধনবান বলিয়া গণ্য হইয়াছ, নাবালেগ থাকিলেও তদবধি যথারীতি হিসাব করিয়া যাকাত দেওয়া হয় নাই, অপাত্রে দেওয়া হইয়াছে বা স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসনপত্র (অলংকারাদি) তোমার অধিকারে ছিল, অথচ উহার যাকাত দেওয়া হয় নাই, সেই সকলেরই হিসাব করিয়া যাকাত দিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তদ্রূপ বালেগ হাওয়ার পর হইতে রমযান শরীফের যতগুলি রোযা কাযা হইয়াছে, রোযার নিয়ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছ বা শর্তপালনপূর্বক যথারীতি রোযা রাখ নাই, ততগুলি রোযারও কাযা আদায় করিবে। যে রোযাগুলি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে, উহার ত কাযা আদায় করিবেই এবং যেগুলিতে তোমার সন্দেহ থাকিবে এইগুলি সম্বন্ধে যেদিকে তোমার ধারণা প্রবল হইবে তদনুযায়ী কাজ করিবে। (অর্থাৎ যদি প্রবল ধারণা হয় যে, রোযা নষ্ট হইয়াছে তবে কাযা আদায় করিবে, অন্যথায় নহে।) প্রকৃত কথা এই যে, গভীরভাবে চিন্তার পর যতগুলি রোযা ঠিকভাবে আদায় হইয়াছে বলিয়া দৃঢ়

বিশ্বাস জন্মিবে ততগুলি বাদ দিয়া বাকীগুলির কাযা আদায় করিবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মনের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করাও দুরস্ত আছে।

অন্যান্য পাপের ক্ষতিপূরণ–বালেগ হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি চক্ষু, কর্ণ, হস্তপদ, রসনা, উদর প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কি কি পাপ করিয়াছ, ভাবিয়া দেখিবে। যিনা, পুংমৈথুন, চুরি, মধ্যপান প্রভৃতি যে সকল পাপের জন্য শরীয়তে শাস্তি নির্ধারিত আছে তদ্রূপ কবীরা গুনাহ্ করিয়া থাকিলে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করিবে। কিন্তু এইরূপ পাপ করিয়া বিচারকের নিকট যাইয়া পাপ স্বীকারপূর্বক শাস্তি গ্রহণ করত প্রায়শ্চিত্ত করা ওয়াজিব নহে। বরং স্বীয় পাপ গোপন রাখিয়া অধিক পরিমাণ ইবাদত ও তওবা করত তদ্রূপ পাপের ক্ষতিপূরণ করা আবশ্যক। আর না-মুহার্‌রামের (যাহার সহিত জীবনে কখনও বিবাহ জায়েয) প্রতি দৃষ্টিপাত, বিনা ওযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ, নাপাক অবস্থায় মসজিদে উপবেশন, গানবাজনা শ্রবণ ইত্যাদি সগীরা গুনাহ্ হইয়া থাকিলেও তদ্রূপ ইবাদত এবং তওবা করিবে। আর এই শ্রেণীর গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারার জন্য তদ্‌বিপরীত কাজ করিবে। কারণ, সৎকাজ সগীরা গুনাহ্ মিটাইয়া দেয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ –

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই পুণ্য পাপকে মিটাইয়া দেয়।" (সূরা হূদ, ১০ রুকূ, ১২ পারা।) কিন্তু সগীরা গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারার উদ্দেশ্যে যে সৎকার্য করা হয়, তাহা ঠিক উহার বিপরীত এবং বিশেষ বলবান ও পরিমাণে যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

গানবাজনা শ্রবণের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কুরআন শরীফ শ্রবণ এবং ইলম চর্চার মজ্‌লিসে যোগদান করিবে। নাপাক অবস্থায় মসজিদে উপবেশন করার কাফ্‌ফারা ইবাদত ও ই'তিকাফ দ্বারা আদায় করিবে। মধ্যপানে যে পাপ হয়, ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজকে তোমার প্রিয় হালাল পানীয় দ্রব্য পানে বঞ্চিত রাখিয়া তাহা গরীবদিগকে দান করিয়া দিবে। মোটের উপর কথা এই যে, পাপ করিলে হৃদয়ে যে-মলিনতা জন্মে, ইহার বিপরীত সৎকার্য করিলে ইহা হইতে উৎপন্ন আলোকে সেই মলিনতা দূর হইয়া যায়। এমন কি, দুনিয়াতে যতগুলি আনন্দ উপভোগ করিয়াছ, ইহার প্রত্যেকটির বিপরীত এক একটি কষ্ট সহ্য করিয়া উহার কাফ্‌ফারা আদায় করিবে। কারণ দুনিয়ার আনন্দ ও আরাম ভোগে

দুনিয়ার প্রতি মন আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং কষ্ট ভোগ করিলে দুনিয়ার প্রতি মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এইজন্যই হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, মুসলমানের প্রতি যে-দুঃখ অবতীর্ণ হয়, এমন কি যে-কাঁটা তাহার পায়ে বিদ্ধ হয়, ইহাতেও তাহার গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইয়া থাকে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "কতকগুলি পাপ এমন আছে, কষ্ট ভোগ ব্যতীত যাহার অন্য কোন কাফ্‌ফারাই নাই।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন– "যে ব্যক্তি অনেক পাপ করিয়াছে, অথচ ইহা কাফ্‌ফারা হইতে পারে, সেই পরিমাণ ইবাদত সে করে নাই, তেমন লোকের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলা দুঃখ-কষ্ট সৃজন করিয়া দিয়া থাকেন যাহাতে ইহা গোনাহর কাফ্‌ফারা হইয়া যায়।"

প্রিয় পাঠক, এ-স্থলে বলিতে পার যে, এইরূপ দুঃখের উপর লোকের হাত নাই। অনেক সময় লোকে দুনিয়ার কাজ করিতে যাইয়া দুঃখিত হয়; ইহা স্বয়ং পাপ। সুতরাং ইহা অপর পাপের কাফ্‌ফারা হইবে কিরূপে? উত্তর এই–যে কার্য বা ঘটনা মানব-মনে ঘৃণা সঞ্চার করে, ইহাই তাহার জন্য মঙ্গলজনক। তদ্রূপ কার্য বা ঘটনা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতই হউক, তাহাতে কোনই আসে যায় না। কারণ, দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে যদি লক্ষ্যবস্তু পাওয়ার আনন্দ ভোগে আসিত, তবে মানব দুনিয়াকেই বেহেশ্‌ত বলিয়া মনে করিত।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আমার শোক-কাতর বৃদ্ধ পিতাকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন?" হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বলিলেন–"একশত জন পুত্র নিহত করা হইয়াছে, এমন জননীর যেরূপ শোক হইয়া থাকে, তদ্রূপ শোকে তাঁহাকে রাখিয়া আসিয়াছি।" হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন– "সেই শোক-দুঃখের বিনিময়ে তিনি কি পাইবেন?" হযরত জিব্‌রাঈল আলায়হিস সালাম বলিলেন– "একশত জন ইমাম ও শহীদের সওয়াব তাঁহাকে প্রদান করা হইবে।"

বান্দার প্রতি যুলুমের কাফ্‌ফারা–বান্দার প্রতি যে যুলুম করা হইয়াছে, ইহার কাফ্‌ফারা আদায় করিবার জন্য যত লোকের সহিত সাংসারিক কাজকারবার করিয়াছ, উহার হিসাব করিয়া দেখিবে, এমন কি কাহার সহিত কিরূপে উপবেশন করিয়াছ, কিভাবে কথা বলিয়াছ, ইহাও হিসাব করিয়া লইবে। তোমার নিকট কাহারও প্রাপ্য থাকিলে, তুমি কাহাকেও দুঃখ দিয়া

থাকিলে বা কাহারও গীবত করিয়া থাকিলে, এই পাপের বোঝা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিবে। যাহা ফিরাইয়া দেওয়ার উপযোগী তাহা ফিরাইয়া দিবে এবং যাহা ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা মাফ লইবে। কাহাকেও হত্যা করিয়া থাকিলে, হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। তাহারা প্রতিশোধও লইতে পারে বা ক্ষমাও করিতে পারে। কাহারও নিকট ঋণী থাকিলে ঋণদাতাকে তালাশ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। সওদাগর ও তহশীলদারদের পক্ষে ইহা বড় কঠিন কাজ। কারণ, তাহাদিগকে অসংখ্য লোকের সাহিত আদান-প্রদান করিতে হয়। বিশেষত গীবতের ব্যাপার আরও কঠিন। কেননা, যাহাদের গীবত করা হইয়াছে, ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাহাদের সকলকে তালাশ করিয়া বাহির করা বড় দুষ্কর।

উপরিউক্ত উপায়ে হকদারের হক আদায় করিতে অক্ষম হইলে অধিক পরিমাণে ইবাদত করা ব্যতীত এই পাপ হইতে মুক্তি পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। ইহকালে এত অধিক ইবাদত করিয়া লইবে যেন কিয়ামতের দিন এই ইবাদত দ্বারা উক্ত প্রকার ঋণ পরিশোধের পরও নিজের নাজাত পাওয়ার উপযোগী ইবাদত বাকী থাকে।

সর্বদা তওবার বিবরণ– যে ব্যক্তির পাপ হইয়াছে, তাহাকে অতি শীঘ্র ইহার ক্ষতিপূরণ ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য তৎপর হওয়া আবশ্যক। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন— পাপ করার পর আট প্রকার কার্য করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চারিটি মনের সহিত এবং চারিটি শরীরের সহিত সম্বন্ধ রাখে। যে-চারিটি কার্য মনের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা এই–(১) তওবা বা তওবার সংকল্প; (২) তদ্রূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প; (৩) সেই পাপের কারণে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, এই ভয় ও (৪) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা পাইবার আশা পোষণ করা। যে চারিটি কার্য শরীরের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এই– (১) দুই রাক'আত তওবার নামায পড়া; (২) সত্তর বার ইস্তিগ্ফার এবং একশত বার

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ –

এই কলেমা পড়া (৩) সামান্য হইলেও গরীবদিগকে কিছু দান করা এবং (৪) একদিন রোযা রাখা।

কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন—পাপ কার্য সংঘটিত হওয়ামাত্র ওযু-গোসল করত যথারীতি পবিত্র হইয়া মসজিদে যাইয়া দুই রাক'আত নামায পড়িবে।

হাদীস শরীফে আছে–"গোপনে গুনাহ্ করিয়া থাকিলে ইবাদতও গোপনে কর এবং প্রকাশ্যে গুনাহ্ করিয়া থাকিলে ইবাদতও প্রকাশ্যে কর। ইহাতে গুনাহর কাফ্ফারা হইবে।"

অন্তরের সহিত ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) না করিয়া কেবল মুখে বলিলে কোন লাভ হয় না। ইস্তিগ্ফারের সময়ে বিলাপ, ভয় এবং অনুতাপ ও লজ্জার সহিত ক্ষমতা প্রার্থনা করিলে আন্তরিক ইস্তিগ্ফার হইয়া থাকে। তদ্রূপ করিতে পারিলে তওবার ইচ্ছা মযবুত না হইলেও পাপমুক্তির আশা করা যায়। মন অন্যমনস্ক থাকিলেও মৌখিক ইস্তিগ্ফার একেবারে নিষ্ফল নহে। ইহাতে অন্য কোন লাভ না হইলেও রসনা বেহুদা উক্তি হইতে বাঁচিয়া থাকিবে এবং চুপ থাকা অপেক্ষা ইস্তিগ্ফারের কলেমা মুখে উচ্চারণ করা কত ভাল। কারণ জিহ্বা মঙ্গলজনক বাক্য উচ্চারণে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে মানুষ নিরর্থক বাক্যালাপ অপেক্ষা ইস্তিগ্ফারের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।

হযরত আবূ ওসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির জনৈক মুরীদ একদা তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন–"কোন কোন সময় আমার জিহ্বা আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত হইয়া পড়ে যদিও মন ইহার প্রতি আকৃষ্ট থাকে না।" উত্তরে তিনি বলিলেন–"তোমার একটি অঙ্গকে যে আল্লাহ্ তাঁহার যিকিরে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, এইজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

আন্তরিকতাবিহীন তওবাকারীর প্রতি শয়তানের ধোঁকা–এ স্থলে শয়তান বিষম ধোঁকা দিয়া বলিতে থাকে– "তুমি যখন সর্বান্তঃকরণে যিকির করিতে পার না, তখন মুখে কতকগুলি যিকিরের শব্দ উচ্চারণ করা অন্যায় ও বে-আদবী। কাজেই এমন যিকির বন্ধ কর।" শয়তানের এই প্রবঞ্চনার উত্তর দিতে যাইয়া মানব তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের প্রথম দলই অগ্রবর্তী। এই দলের লোক শয়তানের প্রশ্নের উত্তরে বলে–"তুই সত্য বলিয়াছিস। বেশ, আমি তোকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগে সর্বান্তঃকরণে যিকির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" এই দল শয়তানের কাঁটা ঘায়ে লবণ ছিটা দিয়া থাকে। দ্বিতীয় দল যালিম। তাহারা শয়তানকে উত্তর দিয়া বলে–"তুমি সত্যই বলিয়াছ। অবশ্যই রসনা সঞ্চালন নিষ্ফল।" এই কথা বলিয়া যিকির পরিত্যাগ করত তাহারা চুপ থাকে এবং মনে করে, তাহারা বুদ্ধিমানের কাজ করিল। অথচ বাস্তবপক্ষে তাহারা শয়তানের অনুকূল ও অনুরক্ত হইল। তৃতীয় দল স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া শয়তানকে উত্তর দেয়–"যদিও মনেপ্রাণে যিকির করিতে

পারি না তবুও রসনাকে আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত রাখা ত চুপ থাকা অপেক্ষা ভাল। যেমন বাদশাহী পোদ্দারী অপেক্ষা ভাল এবং পোদ্দারী মেথরের কাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব যে-ব্যক্তি বাদশাহী করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে পোদ্দারী কাজও পরিত্যাগপূর্বক মেথরের কাজ গ্রহণ করা জরুরী নহে।"

তওবা করিতে অনিচ্ছার প্রতিকার—যে ব্যক্তি তওবা করিতে চায় না, তাহার প্রতিকার এই—পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, সে কি কারণে পুনঃ পুনঃ পাপ কাজ করে এবং কেনই-বা সে তওবা করে না। ইহার পাঁচটি কারণ রহিয়াছে। প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক প্রতিকার ব্যবস্থা আছে।

প্রথম কারণ—আখিরাতে বিশ্বাস না করা বা আখিরাত সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা। বিনাশন খণ্ডের দশম অধ্যায়ে ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ—লোভ-লালসার প্রবলতা সংবরণ করিতে না পারা এবং সংসারের আনন্দ উপভোগে মত্ত হওয়া। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ে পরকালের ভয় উদয় হয় না এবং অনেক লোকের পক্ষে সাধারণত লোভ-লালসাই বিষম অন্তরায় হইয়া থাকে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আল্লাহ্ তা'আলা দোযখ সৃষ্টি করিয়া জিবরাঈল আলায়হিস্ সালামকে দেখিতে বলিলেন। তিনি দেখিয়া বলিলেন—'তোমার শপথ, দোযখের পরিচয় পাইলে কেহই উহার দিকে যাইবে না।' তৎপর আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের চতুর্দিকে প্রলোভনের বস্তুসমূহ সৃজন করিয়া জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে পুনরায় দেখিতে বলিলেন। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম দেখিয়া বলিলেন— 'কোন লোকই দোযখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। (অর্থাৎ লোভ-লালসায় আকৃষ্ট হইয়া দোযখে প্রবেশ করিবে।)' ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌ত সৃজন করত হযরত জিবরাঈলকে (আ) দেখিতে আদেশ করিলেন। তিনি দেখিয়া নিবেদন করিলেন—'বেহেশতের পরিচয় পাইলে সকলেই ইহার দিকে দৌড়াইয়া আসিবে।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের চারি পার্শ্বে বেহেশতের পথ-প্রতিবন্ধকস্বরূপ প্রবৃত্তির কাম্য বস্তুসমূহের পরিপন্থী বিরক্তিকর এবং ক্লেশজনক ও তিক্ত কার্যকলাপের সৃষ্টি করিয়া আবার দেখিতে আদেশ দিলেন। তিনি দেখিয়া বলিলেন—'তোমার প্রতাপের শপথ, বেহেশতের পথে যে সকল দুঃখ-কষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ, ইহাতে আমার ভয় হইতেছে যে, কেহই বেহেশতে যাইবে না।"

তৃতীয় কারণ—আখিরাতের আরাম-আয়েশকে লোকে কেবল ভবিষ্যতের অঙ্গীকার বলিয়া মনে করে এবং দুনিয়াকে নগদ ভাবিয়া ইহার প্রতি শীঘ্র আসক্ত হইয়া পড়ে। কেননা, যাহা বাকী, তাহা চক্ষের অন্তরালে থাকে এবং যাহা চক্ষের দৃষ্টিতে পতিত হয় না, তাহা মন হইতেও দূরে সরিয়া থাকে।

চতুর্থ কারণ—দীর্ঘসূত্রিতা। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা তওবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করে। কিন্তু কাজের বেলায় 'এখন না, তখন করিব' ভাবিয়া অনর্থক বিলম্ব করে। এমন সময় লোভ-লালসা উপস্থিত হইলে বলে, "এখন ত ইহা ভোগ করিয়া লই; তৎপর তওবা করিয়া লইব।"

পঞ্চম কারণ—পাপের দরুন দোযখে যাইতে হইবে, ইহা না ভাবিয়া বরং আল্লাহ্ মাফও করিয়া দিতে পারেন, এইরূপ মনে করা। মানুষ সর্বদা নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করে এবং লোভ-লালসা প্রবল হইয়া উঠিলে বলে, 'ইহা চরিতার্থ করিয়া লই; আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করিয়া দিবেন।'

এ-স্থলে উল্লিখিত পাঁচটি কারণভেদে তওবা করিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির প্রতিকার-ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। প্রথম কারণ অর্থাৎ আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস দূর করিবার ব্যবস্থা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আখিরাতকে বাকী মনে করে এবং দুনিয়াকে নগদ ভাবিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়—আখিরাতকে চক্ষুর অগোচরে বলিয়া মন হইতেও দূরে রাখে, তাহার প্রতিকার এই ঃ—মনে কর, যাহা নিশ্চয়ই আসিবে, তাহা এখনই আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, যখন চক্ষু মুদিত হইল ও মৃত্যু ঘটিল, তখনই আখিরাত নগদ হইয়া পড়িল। আজই মৃত্যু ঘটিতে পারে এবং এই মুহূর্তেই বাকী নগদ হইয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে যে দুনিয়াকে তুমি নগদ বলিয়া মনে করিতে ইহাই অতীত স্বপ্নবৎ হইয়া যাইবে। তৎপর যে-ব্যক্তি দুনিয়ার লোভ-লালসা ও সুখাস্বাদের সামান্য উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিতেছে না, তাহার ভাবিয়া দেখা উচিত, সে দোযখের অগ্নি কিরূপে সহ্য করিবে? আবার বেহেশতের অপরিসীম সুখভোগের লোভ সে কিরূপে সংবরণ করিবে? দেখ, রোগীর পক্ষে সুশীতল পানি সর্বাপেক্ষা লোভনীয় হইলেও যদি কোন অমুসলমান চিকিৎসকও পানিকে অনিষ্টকর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে, তবে আরোগ্য লাভের আশায় সে পানি পান পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের উক্তি অনুযায়ী আখিরাতের চিরস্থায়ী বাদশাহীর আশায় দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুর আনন্দের লোভ-লালসা পরিত্যাগ করা কত শ্রেয়।

যে-ব্যক্তি তওবা করিতে বিলম্ব করে, তাহাকে বলা উচিত–"তুমি কিসে ভুলিয়া রহিয়াছ? অদ্য তওবা না করিয়া কল্য করিবে বলিয়া কেন বিলম্ব করিতেছ? কল্যকার দিন তোমার ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে; তুমি অদ্যই মরিয়া যাইতে পার।" এইজন্যই হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, পাপ পরিত্যাগ করিতে বিলম্বকারীকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক–"তুমি তওবা করিতে বিলম্ব করিতেছ কেন? তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, অদ্য পাপকর্ম পরিত্যাগ করা কঠিন, কল্য সহজ হইবে, তবে এমন অসম্ভব কল্পনা তোমার মন হইতে দূর করিয়া ফেল। কারণ, অদ্য যেমন কঠিন, কল্যও তেমন কঠিন থাকিবে। আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন দিন সৃজন করেন নাই, যে-দিন লোভনীয় বস্তু পরিত্যাগ করা সহজ।

তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, কল্য পাপ বর্জন করা সহজ হইবে, তবে তোমার উদাহরণ এইরূপ—মনে কর, এক ব্যক্তিকে একটি চারা গাছ সমূলে উপড়াইয়া ফেলিতে আদেশ করা হইল। কিন্তু সে বলে– "গাছটি অত্যন্ত মযবুত; কিন্তু আমি নিতান্ত দুর্বল। আমি সবল হইলে এক বৎসর পর গাছটি উৎপাটন করিয়া ফেলিব।" এমন ব্যক্তিকে তাহার উত্তরে বলা যাইবে–"হে নির্বোধ, আগামী বৎসর বৃক্ষ অধিকতর মযবুত এবং তুমি আরও দুর্বল হইয়া পড়িবে। তদ্রূপ তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিলে কু-প্রবৃত্তিরূপ বৃক্ষও দিন দিন মযবুত হইতে থাকিবে এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণে তোমার শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। অতএব যত তাড়াতাড়ি এই বৃক্ষ উৎপাটন কর, উৎপাটন-কার্য ততই তোমার পক্ষে সহজ হইবে।"

যে-ব্যক্তি নিজে মুসলমান বলিয়া ভরসা করিয়া বলে–"আমি মুসলমান; আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানকে মাফ করিয়া দিবেন।" তেমন ব্যক্তিকে আমরা বলিব–"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মাফ নাও করিতে পারেন। তুমি ইবাদত না করার দরুন তোমার ঈমানরূপ বৃক্ষ দুর্বল হইয়া যাইতে পারে এবং অন্তিমকালে মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে ইহা সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইতে পারে। কারণ ঈমানরূপ বৃক্ষ ইবাদতরূপ পানিতে জীবিত থাকিয়া বর্ধিত ও শক্তিশালী হয়। পানি না পাইলে ইহার পক্ষে মরিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।" যে-ব্যক্তি অনেক পাপ করিয়াছে এবং ইবাদত করে নাই, সে এমন রোগীতুল্য যাহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যে-কোন মুহূর্তে সে মরিতে পারে। এমন দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোক ঈমান লইয়া মরিতে পারিলেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম রহমতে

তাহাকে মাফ করিয়া দিতে পারেন অথবা মাফ না করিয়া তাহাকে শাস্তিও দিতে পারেন। এমতাবস্থায় শুধু সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া কর্তব্যকার্যে অবহেলা করত বসিয়া থাকা নিতান্ত বোকামি নয় কি?

যে-ব্যক্তি ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া কর্তব্যকার্যে শৈথিল্য করে, তাহাকে এমন লোকের সহিত তুলনা করা যায়, যে নিজের যথাসর্বস্ব বিনষ্ট করিয়া নিজের পরিবারবর্গকে অনাহারে রাখে এবং বলে–"হয়ত তাহারা কোন জনশূন্য শহরে যাইয়া তথাকার লুক্কায়িত ধন সংগ্রহ করিতে পারিবে।" অথবা তদ্রূপ ব্যক্তিকে এমন লোকের সহিত তুলনা করা চলে, যে দেখিতেছে, তাহার শহরে ডাকাত দল আসিয়া শহরবাসীদের সমস্ত ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে; অথচ সে তাহার ধন লুকাইতেছে না, বরং প্রকাশ্যভাবে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিতেছে এবং মনে করিতেছে–"হয়ত ডাকাত আমার গৃহে আসিয়াই মরিয়া যাইবে বা লুণ্ঠন করিবে না; অথবা অন্ধ হইয়া যাইবে এবং আমার গৃহ দেখিতে পাইবে না।" এই সমস্তই সম্ভবপর। (কিন্তু এইরূপ যে হইবে, ইহার নিশ্চয়তা কি? পরকালে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাইবার আশাও তদ্রূপ সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করত সতর্কতা অবলম্বন না করা নিতান্ত মূর্খতা।

একাধিক পাপে লিপ্ত ব্যক্তির তওবা–যে ব্যক্তি একাধিক পাপে লিপ্ত, সমস্ত পাপ হইতে এক সঙ্গে একেবারে তওবা না করিয়া এক একটি পাপ হইতে তওবা করা তাহার পক্ষে জায়েয কিনা, এই সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন–"একই ব্যক্তি যিনা হইতে তওবা করিয়া মদ্যপান হইতে তওবা করিবে না, ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ, পাপ মনে করিয়া সে যদি যিনা হইতে তওবা করে, তবে মদ্যপানও তদ্রূপ পাপ। অধিক পরিমাণে মদ্যপান হইতে তওবা করত অল্প পরিমাণে পান করা যেমন ইহাও তদ্রূপ। কেননা উভয়ই সমভাবে হারাম। পাপের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। কিন্তু একাধিক পাপে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে এক একটি করিয়া পাপ পরিত্যাগ করা অসম্ভব নহে। কারণ, কেহ হয়ত যিনাকে মদ্যপান অপেক্ষা অধিক মন্দ জানিয়া যাহা অধিক মন্দ, ইহাই সর্বাগ্রে বর্জন করে। আবার কেহ হয়ত মদ্যপানকে যিনা হইতে অধিক মন্দ মনে করে; কেননা ইহা যিনা ও অন্যান্য পাপে লিপ্ত করে। আবার কেহ-বা গীবতকে মধ্যপান অপেক্ষা অধিক মন্দ বুঝে; কেননা গীবতের পাপ অপর লোকের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং মদ্যপানকে কেবল স্বয়ং তাহার সহিত

সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করে। কোন লোক অপরিমিত মধ্যপান হইতে বিরত থাকে: কিন্তু মূল মধ্যপান হইতে বিরত হয় না। এমন লোকে মনে করে–"আমি যত অধিক মধ্যপান করিব তত অধিক পাপ হইবে। আমি মদ্যপান একেবারে বর্জন করিতে পারি না, কিন্তু অধিক পরিমাণে পান বর্জন করিতে পারি। শয়তান আমাকে একটি কাজে প্রলোভন দিয়া জয়ী হইয়াছে বলিয়া অপরটিতে সে আমাকে পরাস্ত করিতে পারে না, ইহাতেও শয়তানের অনুসরণ করা আমার পক্ষে জরুরী নহে।"

ফলকথা, উপরিউক্ত উপায়ে ক্রমশ পাপ পরিত্যাগ করাও সম্ভবপর। হাদীস শরীফে আছে اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ – অর্থাৎ "তওবাকারী আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র।" এবং আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ – অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারিগণকে ভালবাসে।" এই উভয় পবিত্র বাক্যে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি সমস্ত গুনাহ্ হইতে তওবা করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং যে সকল আলিম বলেন–"সকল পাপ একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া বিশেষ বিশেষ পাপ পরিত্যাগ করা জায়েয নহে"–তাঁহারা আল্লাহ্‌র এইরূপ প্রিয়পাত্রদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। অন্যথায় তওবা করিলেই সগীরা গুনাহ্ মাফ হইয়া যায় এবং গুনাহ্ লোপ পায়। সকল পাপ হইতে একসঙ্গে একেবারে তওবা করা দুষ্কর এবং তওবা সাধারণত ক্রমশই হইয়া থাকে। তওবা করিবার সুযোগ যতটুকু ঘটে, সওয়াবও ততটুকুই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা

ধৈর্যের ফযীলত–প্রিয় পাঠক, অবগত হও, ধৈর্য (সবর) ব্যতীত তওবা সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না। এমন কি কোন ফরয কাজ সুচারুরূপে আদায় করা এবং পাপ পরিত্যাগ করা ধৈর্য ব্যতীত সম্ভবপর নহে। এই জন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 'ঈমান কি জিনিস' জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সবরকেই ঈমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপর এক হাদীসে তিনি বলেন–"সবর ঈমানের অর্ধেক।"

সবরের এত অধিক ফযীলত যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা সত্তর বারেরও অধিক ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং মানুষের চরম উন্নতি সবরেই নিহিত আছে বলিয়াছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا –

অর্থাৎ "যখন তাহারা সবর করিয়াছে তখন আমি তাহাদের মধ্য হইতে নেতৃবৃন্দ সৃষ্টি করিয়াছি–তাহারা আমার আদেশে (অপরকে) সৎপথ প্রদর্শন করে।" (সূরা সিজদা, ৩ রুকূ, ২১ পারা।)

আল্লাহ তা'আলা সবরের জন্য অনন্ত পুরস্কার নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ –

অর্থাৎ "সবরকারিগণই তাদের অগণিত সওয়াব পরিপূর্ণভাবে পাইবে।" (সূরা যুমর, ২ রুকূ, ২৩ পারা।)

আবার আল্লাহ তা'আলা সবরকারীদের সহিত থাকিবার অঙ্গীকার করিয়া বলেন ঃ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - অর্থাৎ "আর আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে (সহায়করূপে) আছেন।" (সূরা বাকারাহ্ ৩৩ রুকূ, ২ পারা।) আরও লক্ষ্য কর, আশীর্বাদ (সালাত), রহমত এবং হিদায়াত–এই তিনটি অমূল্য বস্তু সবরকারিগণকে ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা এক সঙ্গে অপর কাহাকেও দান করেন নাই। আল্লাহ বলেন ঃ

أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ - وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ 'এই সকল লোকের প্রতি তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আশীর্বাদ এবং রহমত। আর এই সকল লোক হিদায়াত প্রাপ্ত।" (সূরা বাকারাহ্, ১৯ রুকূ, ২ পারা)

সবরের অপর এক শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইহাকে বড় ভালবাসেন এবং তাঁহার প্রিয় বন্ধুগণকে ব্যতীত অপর কাহাকেও ইহা দান করেন না। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, "আল্লাহ তোমাদিগকে যে সকল বস্তু দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে সবর এবং ইয়াকীনই (দৃঢ় বিশ্বাস) মাত্রায় সবচেয়ে অল্প। যাহাদিগকে এই দুইটি জিনিস একত্রে প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, (নফল) নামায-রোযা অল্প মাত্রায় করিলেও তাহাদের কোন ভয় নাই। হে আমার বন্ধুগণ, আজ তোমরা যে অবস্থায় আছ যদি এই অবস্থায় ধৈর্যের সহিত স্থির থাক এবং এই অবস্থা হইতে ফিরিয়া না যাও, তবে আমার নিকট যত প্রিয় হইবে, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তোমাদের সকলের ইবাদত সমষ্টির সমান ইবাদত কর তথাপি তোমরা আমার নিকট তত প্রিয় হইবে না। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে যে, আমার (ওফাতের) পর দুনিয়ার পথ তোমাদের জন্য প্রশস্ত হইবে (অর্থাৎ দুনিয়ার উন্নতির পথ খোলা হইবে) এবং তোমাদের একজন অপর জনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবে ও ঈমানদার লোক তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। আর (সেই অবস্থায়) যে-ব্যক্তি সবর করিবে এবং (সবরের) সওয়াব পাইবার আশা রাখিবে, তাহাকে পূর্ণমাত্রায় সওয়াব দেয়া হইবে। (অতএব) তোমরা সবর কর; কেননা, দুনিয়া চিরকাল থাকিবে না। কিন্তু আল্লাহ্র প্রদত্ত সওয়াব চিরকাল থাকিবে।"

এই কথা বলিয়া রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিম্নলিখিত আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ - وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا -

অর্থাৎ "যাহা তোমাদের নিকট আছে, তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহর নিকট যাহা আছে, তাহা স্থায়ী থাকিবে। নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে, যাহারা সবর করিতেছে, তাহাদের পুণ্যফল তাহারা যাহা করিত তাহা অপেক্ষা উত্তমরূপে দিব।" (সূরা নহল, ১৩ রুকূ, ১৪ পারা।)

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"বেহেশ্তের ধনভাণ্ডারসমূহের মধ্যে সবর একটি ধনভাণ্ডার।" তিনি অন্যত্র বলেন–"সবর মানুষ হইলে সে অত্যন্ত দয়ালু হইত।" তিনি আরও বলেন–"আল্লাহ তা'আলা সবরকারিগণকে ভালবাসেন।" ওহী যোগে হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামকে আদেশ দিলেন–"আমার স্বভাবের অনুকরণ কর। আমার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, আমি সবরকারী।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন–"অকৃতকার্য হইয়া যে-পর্যন্ত তোমরা সবর করিতে না পারিবে সে-পর্যন্ত সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আনসারদের এক দলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমরা কি ঈমানদার?" সেই কওমের লোকেরা নিবেদন করিল–"হাঁ, আমরা ঈমানদার।" হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "(তোমরা যে মুমিন ইহার) নিদর্শন কি?" তাহারা আরয করিল–"আমরা নি'আমত পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, দুঃখ কষ্টে সবর করি এবং আল্লাহ্র বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন–"আল্লাহর শপথ, তোমরা পরিপক্ক মুসলমান।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন–"দেহের যেমন মস্তক থাকে ঈমানেরও তদ্রূপ মস্তক আছে; সবর ঈমানের মস্তক। মস্তক ব্যতীত যেমন দেহ হইতে পারে না, সবর ব্যতীত তদ্রূপ ঈমান থাকিতে পারে না।"

সবরের হাকীকত–সবর কেবল মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। অন্য জীবজন্তুর সবর নাই। এজন্যই ইহারা অসম্পূর্ণ। ফিরিশ্তাগণের পক্ষে সবরের আবশ্যকতা নাই; কেননা তাঁহারা কামিল এবং তাঁহাদের উপর প্রবৃত্তির কোন অধিকার নাই। পশুগণ প্রবৃত্তির বশীভূত এবং একমাত্র প্রবৃত্তির তাড়নায়ই ইহারা পরিচালিত

হইয়া থাকে। অপরদিকে ফিরিশ্‌তাগণ সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর থাকেন এবং এই পথে তাঁহাদের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। অতএব, প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার কষ্টও তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমত মানবকে পশু স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পানাহারের লোভ, সৌন্দর্যের লালসা ও খেলাধুলার অভিলাষ তাহার উপর চাপাইয়া দিয়েছেন। তৎপর যৌবনের প্রারম্ভে ফিরিশ্‌তাদের নূরের ন্যায় একটি নূর মানবের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং ইহার সাহায্যে সে কার্যের কারণ ও ফলাফল বুঝিতে পারে। বরং আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তখন দুইজন করিয়া ফিরিশ্‌তা পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন। পশুগণ এই সকল হইতে বঞ্চিত থাকে। উক্ত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের একজন মানুষকে ভালমন্দ বুঝাইয়া দিয়া সৎপথ দেখাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ফিরিশ্‌তাদের নূরের সমশ্রেণীর একটি নূর মানবের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইহার সাহায্যে যে কার্যকারণ ও শেষ পরিণাম অবগত হয়। ইহাছাড়া সে নিজের ও আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করে। সে আরও অবগত হয় যে, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কালে সাময়িক আনন্দ পাইলেও ইহাই পরিণামে বিনাশ ও ধ্বংসে নিপতিত করে; ইহার আরাম ও সুখ নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তজ্জনিত দুঃখকষ্টে বহুদিন পর্যন্ত যন্ত্রণা দিতে থাকে। এইরূপ বোধশক্তি প্রাণীর ভাগ্যে কখনো ঘটে না; শুধু মানুষের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু এইরূপ বোধশক্তি লাভ করাই মানবের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কারণ, যে-ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিয়াছে, অথচ ইহাকে দমন করার ক্ষমতা তাহার নাই, এমতাবস্থায় তদ্রূপ উপলব্ধিতে তাহার কি লাভ? পীড়িত ব্যক্তি যদি বুঝে যে, পীড়া তাহার পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু পীড়া দূর করিতে সে অসমর্থ, তবে এই জ্ঞান তাহার কি উপকার করিবে? এইজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা মানবের সহিত অপর এক ফিরিশ্‌তা নিযুক্তি করিয়া দিয়াছেন যেন মানুষ তাঁহার শক্তি ও সাহায্যে যাহাকে সে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং জন্মকাল হইতে খায়েশের (প্রবৃত্তির) অনুসরণ করিয়া চলিবার মানবের যেমন একটি শক্তি ছিল, যৌবনের প্রারম্ভে আল্লাহ্ তাহাকে তদ্রূপ আর একটি শক্তি প্রদান করিলেন যাহাতে সে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ করত ভবিষ্যত ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। খায়েশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি ফিরিশ্‌তা-বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত এবং খয়েশের অনুসরণ করিয়া চলিবার শক্তি শয়তান-বাহিনীর অন্তর্গত। খায়েশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি ধর্ম-কর্মে প্রেরণা যোগায় এবং খায়েশের অনুসরণ করিয়া চলিবার শক্তিই প্রবৃত্তিকে কু-কর্মে প্ররোচনা দেয়।

মানবের অন্তররাজ্যে এই দুই পরস্পর-বিরোধী বাহিনীর সংঘর্ষ লাগিয়া রহিয়াছে। ফিরিশ্‌তা-বাহিনী মানবকে প্রবৃত্তির অনুসরণ হইতে বাধা প্রদান করে এবং শয়তান-বাহিনী তাহাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে উত্তেজিত করে। মানব বেচারা এই দুই বিদ্যমান সৈন্যদলের টানা-হেঁচড়ার মধ্যে পড়িয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে হয়রান রহিয়াছে। শয়তান-সৈন্যের সহিত যুদ্ধকালে ফিরিশ্‌তা-সৈন্য যদি ধর্মপথে দৃঢ়পদ থাকে এবং নিজের স্থান হইতে হটিয়া না যায়, তবে এইরূপ দৃঢ়তা-স্থিরতাকে 'সবর' বলে। আবার স্বস্থানে স্থির থাকিয়া শয়তান-সৈন্যকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দিতে পারিলে এই বিজয়কে 'যফর' বলে। মানুষের অন্তররাজ্যে শয়তান-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালু রাখাকেই 'জিহাদে নফস' অর্থাৎ প্রবৃত্তির সহিত জিহাদ বলে। ফলকথা, খাহেশের উত্তেজনার বিরুদ্ধাচরণে ধর্মপথে অটল অচল থাকাকেই সবর বলে। এই দুই বিরোধী সৈন্যদলের সংঘর্ষ যেখানে নাই, সেখানে সবরেরও আবশ্যকতা নাই। ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে ধর্ম-প্রেরণার বিরোধী শক্তি নাই। এইজন্য তাঁহাদের সবরেরও আবশ্যকতা নাই। আর পশু ও শিশুদের মধ্যে প্রবৃত্তি-বিরোধী শক্তি নাই বলিয়াই তাহাদের সবর করার শক্তিও নাই।

উপরে যে-দুই ফিরিশ্‌তার কথা বর্ণিত হইল তাহাদিগকেই 'কিরামান কাতিবীন' বলে। যাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলা চিন্তা ও যুক্তি অনুসন্ধানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারে যে, কারণ ব্যতীত কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না এবং যে-স্থানে কোন নূতন বস্তু দেখা যায়, তথায় নূতন কারণের সমাবেশেই ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুইটি বিরোধী বস্তু পাওয়া গেলে বুঝা যাইবে যে, দুইটি বিরোধী কারণেই উহার উদ্ভব হইয়াছে। মানব দেখে যে, পশু ও শিশুগণ হিদায়াত ও মা'রিফাত (জ্ঞান) হইতে বঞ্চিত থাকে এবং এইজন্যই ইহারা ভাল-মন্দ পরিণাম বুঝিতে পারে না। আর ইহাদের সবরের ক্ষমতাও থাকে না। যৌবনের প্রারম্ভে মানব হিদায়াত ও মা'রিফাত লাভ করিয়া থাকে। এই দুইটি নূতন পদার্থ অবশ্যই দুই কারণের প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। উপরিউক্ত দুইটি ফিরিশ্‌তাই এই দুইটি কারণেরই অভিব্যক্তি। মানুষ তখন আরও জানে যে, হিদায়াতই মুখ্যবস্তু এবং প্রথমে হিদায়াত লাভ করিলে তদনুযায়ী আমল করিবার শক্তি ও ইচ্ছার উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব যে ফিরিশ্‌তার কারণে হিদায়াত হয়, তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। বক্ষের দক্ষিণ

পার্শ্বে তাঁহার স্থান। এ-স্থলে বক্ষ বলিতে তোমার নিজকেই বুঝায়; কেননা, ফিরিশ্তাদ্বয়কে তোমার পরিদর্শকরূপেই নিযুক্ত করা হইয়াছে।

হিদায়াত ও মা'রিফাত লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যদি তোমাকে সৎপথ প্রদর্শনের নিমিত্ত নিয়োজিত দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ফিরিশ্তার উপদেশ মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, তবে তুমি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলে। কারণ, তুমি তাঁহাকে বেকার করিয়া রাখ নাই। তাহা হইলে তোমার আমলানামায় একটি পুণ্যও লেখা হইবে। পক্ষান্তরে তুমি যদি তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করত তাঁহাকে বেকার করিয়া দেও এবং পশু ও শিশুদের মত তুমি কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে বঞ্চিত থাক, তবে তুমি এই ফিরিশ্তা ও তোমার নিজের প্রতি অন্যায় করিলে এবং এই অন্যায়ের পাপ তোমার আমলানামায় লিপিবদ্ধ হইবে।

এইরূপে তুমি ফিরিশ্তা হইতে যে ক্ষমতা লাভ কর, তাহা যদি খায়েশের বিরুদ্ধাচরণে প্রয়োগ কর বা প্রয়োগের চেষ্টা কর, তবে সওয়াব পাইবে; অন্যথায় গুনাহ্ হইবে। এই পাপ-পুণ্য তোমার আমলনামায় ও তোমার মানসপটে লিপিবদ্ধ হইবে। কিন্তু মন ইহা জানিতে পারিবে না। এই দুই ফিরিশ্তা এবং তাঁহাদের লিখনের সহিত জড়-জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। এইজন্য চর্মচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। মৃত্যু ঘটিলে যখন চর্মচক্ষু আর থাকিবে না এবং আধ্যাত্মিক জগত দর্শনের উপযুক্ত চক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখন এই পাপ-পুণ্যের আমলনামা তোমার সঙ্গেই দেখিতে পাইবে এবং কিয়ামতে সুগ্রা (ক্ষুদ্র কিয়ামত) সম্বন্ধে অবগত হইবে। কিন্তু ইহার বিস্তারিত বিবরণ কিয়ামতে কুব্রার দিন অর্থাৎ মহাবিচারের দিন জানিতে পারিবে। মৃত্যুই কিয়ামতে সুগরা যেমন রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ – অর্থাৎ "যে যখন মরিল তখনই তাহার কিয়ামত হইল।" মহাকিয়ামতে যাহা ঘটিবে, ইহার আভাস মৃত্যুকালে ক্ষুদ্র কিয়ামতেও পাওয়া যায়। 'ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার সংকুলান হইবে না।

প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধে সবরের আবশ্যকতা– মোটের উপর কথা এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সবরের আবশ্যক এবং দুইটি বিরোধী সৈন্যদল থাকিলেই যুদ্ধ বাঁধে। মানবের অন্তররাজ্যে দুইটি বিপক্ষ সৈন্যদলের সমাবেশ রহিয়াছে। একটি দল ফিরিশ্তা-সৈন্য এবং অপরটি শয়তান-সৈন্য। এই দুই দলে যুদ্ধ বাধিলে ইহাতে

লিপ্ত হওয়া ধর্মপথের প্রথম পদবিক্ষেপ। কারণ, শৈশবকাল হইতে মানবের হৃদয়রাজ্য শয়তান-সৈন্যের অধিকৃত এবং যৌবনের প্রারম্ভে মাত্র ফিরিশ্তা-সৈন্যের উৎপত্তি হয়। অতএব শয়তান-সৈন্যদলকে পরাজিত না করিলে সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। সবরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না হইলে ইহাকে পরাস্ত করা চলে না। তাই যে-ব্যক্তি এই যুদ্ধে ব্যাপৃত হয় না, সে আপন অন্তর-রাজ্যটি শয়তানের হস্তে সমর্পণ করে। অপরপক্ষে যে-ব্যক্তি নিজের খায়েশকে পরাভূত করিয়া লইল, সে শরীয়তের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িল এবং নিজের হৃদয়-রাজ্যটি দখল করিয়া লইতে সমর্থ হইল। যেমন রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِيْ عَلٰى شَيْطَانِيْ فَاَسْلَمْ –

অর্থাৎ "কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে আমার শয়তানের উপর জয়ী হইতে সাহায্য করিয়াছে। তৎপর সে মুসলমান হইয়া পড়িয়াছে।"

মানব স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধে কখনও পরাস্ত হয়, আবার কখনও জয়ী হইয়া থাকে। এইরূপে তাহার অন্তর-রাজ্যটি কখনও প্রবৃত্তির অধীনে, আবার কখনও-বা শরীয়তের অধীনে থাকে। কিন্তু সবর করিতে না পারিলে এবং অচল অটলভাবে স্থির থাকিতে না পারিলে হৃদয়-রাজ্য দখলে রাখা যায় না।

সবর অর্ধ ঈমান ও রোযা অর্ধ সবর হওয়ার কারণ– ঈমান একটি একক পদার্থ নহে, বরং ইহা নানা প্রকার এবং বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এইজন্যই হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, ঈমান সত্তরেরও অধিক অংশে বিভক্ত। ইহার শ্রেষ্ঠতম অংশ কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং পথিকের কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশ্যে রাস্তা হইতে খড়কুটা সরাইয়া দেওয়া ইহার ক্ষুদ্রতম অংশ। ঈমান নানা ভাগে বিভক্ত এবং ইহার শাখা-প্রশাখা বহু হইলেও ইহার প্রকৃত সত্তা তিন ভাগেই বিভক্ত; যথা ঃ–(১) পরিচয় জ্ঞান, (২) মনের অবস্থা এবং (৩) আমল (অনুষ্ঠান)। ঈমানের সর্বস্তরে এই তিনটি বস্তু অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ তওবার বিষয় ভাবিয়া দেখ। তওবার হাকীকত হইল অনুশোচনা। ইহা মনের একটি অবস্থা। পাপ যে বিষের ন্যায় প্রাণ-সংহারক এবং পাপ বর্জন করত ইবাদতে লিপ্ত থাকিলে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এই জ্ঞান হইতেই মনের তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এ-স্থলে পাপের পরিচয় জ্ঞান, অন্তরের

অনুতপ্ত অবস্থা এবং আমল (সৎকার্যের অনুষ্ঠান), এই তিনটির সমাবেশের নাম ঈমান। ঈমান এই তিনটি বিষয়েরই অভিব্যক্তি। তথাপি ঈমান বলিতে কোন কোন সময় কেবল পরিচয় জ্ঞানকেই বিশেষরূপে বুঝায়; কেননা ইহাই মূল বস্তু এবং ইহার প্রভাবেই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয় ও তৎপর তদনুযায়ী আমল (কার্য) হইয়া থাকে। সুতরাং পরিচয়-জ্ঞান হইল ঈমানরূপ বৃক্ষের কাণ্ড ; এই জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ের যে অবস্থান্তর ঘটে, ইহাকে শাখা এবং পরিবর্তিত মানসিক অবস্থার প্রভাবে যে সৎকার্য অনুষ্ঠিত হয়, ইহাকে এই বৃক্ষের ফল বলা চলে।

আবার গোটা ঈমানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা ঃ– দীদার (দর্শন লাভ) এবং কির্দার (আমল বা কার্য)। সবর ব্যতীত কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এইজন্য সবরকে ঈমানের অর্ধেক বলা চলে। দুই শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতার জন্য মানুষের পক্ষে সবর করা আবশ্যক। এক শ্রেণী হইল বাসনা-কামনা, লোভ-লালসা এবং অপর শ্রেণী ক্রোধ। রোযা রাখিলে বাসনা-কামনার উত্তেজনার বিরুদ্ধে সবর করা হয় বলিয়া রোযাকে অর্ধেক সবর বলা হয়।

অপরদিকে সবরকে অর্ধেক ঈমান বলা হইয়াছে। কার্যই দেখা হয় এবং কার্যেই ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখ-কষ্টের সময় সবর করা এবং নি'আমত পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মুসলমানের কাজ। এইজন্যই ঈমানের একভাগ সবর এবং অপর ভাগ শুকর (কৃতজ্ঞতা)। এই মর্মে অন্য হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রিয় পাঠক, তুমি যদি সবরকে অত্যন্ত কঠিন ও নিতান্ত দুষ্কর ভাবিয়া ইহাকেই মূল ঈমানরূপে ধরিয়া লও, তবে সবর অপেক্ষা দুঃসাধ্য কাজ আর কিছুই দেখিবে না। কারণ, হাদীস শরীফে সবরকে গোটা ঈমান বলা হইয়াছে। যেমন সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঈমান কি বস্তু?" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "সবর।" অর্থাৎ ঈমানের মধ্যে সবর অপেক্ষা কঠিন আর কিছুই নাই। হজ্ব সম্বন্ধে বলিতে যাইয়াও রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম একস্থানে ঠিক এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। হজ্বের প্রধানতম কাজটিকেই গোটা হজ্ব বলিয়াছেন; যেমন, তিনি 'আরফাকে' হজ্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, আরফার কার্যগুলি সুসম্পন্ন না হইলে হজ্ব বাতিল হয়, কিন্তু অন্য কাজ ছুটিয়া গেলে হজ্ব বিনষ্ট হয় না। ঈমানের বেলায় সবরের অবস্থাও ঠিক এইরূপ।

সর্বদা সবরের আবশ্যকতা–প্রবৃত্তির স্বপক্ষ বা বিপক্ষ ভাব বা বস্তু হইতে মানব-মন কখনও শূন্য হইতে পারে না। সুতরাং এই উভয় অবস্থায়ই তাহার জন্য সবরের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

অভিলষিত বস্তু সম্পর্কে সবরের আবশ্যকতা– ধন-দৌলত, মান-সম্মান, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি মানুষ পাইতে চায়। সুতরাং এই সকল বাঞ্ছিত বস্তু হইতে সবর করা অন্যান্য বিষয়ে সবর করা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক। প্রবৃত্তির প্রলোভন হইতে নিজেকে রক্ষা না করিয়া দুনিয়ার ধনসম্পদ ও আরাম-আয়াশে লিপ্ত হইলে মন উহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং মানব হৃদয় গর্বিত ও অবাধ্য হইয়া উঠিবে। বুযুর্গগণ বলেন–"দুঃখ-কষ্টের সময় ত সকলেই সবর করে; কিন্তু সুখের সময় সিদ্দীকগণ ব্যতীত আর কেহই সবর করে না।" সাহাবাগণের (রা) সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে এবং পর্যাপ্ত ধন জমা হইলে তাঁহারা বলিতেন–"আমরা যে পর্যন্ত দুঃখ-কষ্টে ছিলাম সে পর্যন্ত সবরকারী ছিলাম। এখন সম্পদ ও ক্ষমতা পাওয়ার পর আমরা পূর্বের ন্যায় সবর করিতে পারি না।" এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ –

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমাদের ধন এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) ফিত্না (পরীক্ষা)।" (সূরা তাগাবুন, ২ রুকূ, ২৮ পারা।) মোটকথা এই যে, ধন ও ক্ষমতা লাভ করিয়া সবর করা নিতান্ত দুষ্কর। যাহাকে আল্লাহ্ ধন ও প্রভুত্ব দান করেন না, কিন্তু সে সবর করিতে পারে, এমন ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক স্বীয় আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। সম্পদের প্রতি আসক্ত না হওয়া, ইহার কারণে আমোদ-আহলাদ না করা, ইহাকে ধার করা পদার্থের ন্যায় বিবেচনা করত শীঘ্রই ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া মনে করা, এমন কি ইহাকে হিতকর বলিয়া মনে না করিয়া বরং ইহার কারণে পরকালে উচ্চমর্যাদা লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইবে বলিয়া বিবেচনা করাই সম্পদে সবর। আর ধন, স্বাস্থ্য ইত্যাদির যাবতীয় সম্পদ লাভ করত যে আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক উহা দান করিয়াছেন তৎপ্রতি কর্তব্য পালনার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে লিপ্ত হওয়া উচিত। উপরিউক্ত প্রত্যেকটি স্থলেই সবরের আবশ্যকতা আছে।

প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ বস্তু সম্পর্কে সবরের আবশ্যকতা–প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ বস্তু তিন প্রকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকারের বস্তু মানবের ক্ষমতার মধ্যে আছে; যথাঃ–ইবাদত করা বা পাপ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় প্রকারের বস্তুসমূহের উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নাই; যেমন, বিপদাপদ ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারের বস্তুগুলির উৎপত্তির মূল কারণের উপর কাহারও হাত নাই। কিন্তু উহার প্রতিশোধ লওয়া এবং ইহা দমন করার ক্ষমতা মানুষের আছে; যথা–অপরের প্রদত্ত দুঃখকষ্ট।

প্রথম প্রকারের বস্তু যাহা মানুষের আয়ত্তে আছে, তন্মধ্যে ইবাদত কার্য সম্পন্ন করিবার সময় সবর করা নিতান্ত আবশ্যক। কেননা, কোন কোন ইবাদত আলস্যের কারণে দুষ্কর হইয়া উঠে; যেমন নামায, হজ্ব প্রভৃতি। সবর ব্যতীত এই সমস্ত ইবাদত করা সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক ইবাদতের জন্যই ইহার আদিতে এবং অন্তে সবরের আবশ্যক। ইবাদতের প্রারম্ভেই একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করার নিয়ত এবং অন্তর হইতে রিয়া বিদূরিত করিয়া লইতে হয়। এই সবর নিতান্ত দুঃসাধ্য। ইবাদত করিবার কালে ইহা যথা-নিয়মে আদবের সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য সবরের দরকার, যাহাতে শরীয়ত-বিরুদ্ধ কোন কাজের দরুন ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ না হয়। যেমন নামায পড়িবার সময় এ-দিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করা এবং সাংসারিক কোন বস্তুর চিন্তা না করা। ইবাদত কার্য শেষ করিয়া ইহা প্রকাশের লোভ ও অহংকার দমনের জন্য সবরের নিতান্ত প্রয়োজন। আবার সবর ব্যতীত গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকাই যায় না। পাপের ইচ্ছা যত প্রবল এবং ইহা করা যত সহজ, ধৈর্য ধারণপূর্বক ইহা হইতে বিরত থাকা তত কঠিন। এইজন্যই রসনার পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা বড় কঠিন। কেননা, রসনা সঞ্চালন করা নিতান্ত সহজ। মন্দকথা বলিতে মানুষ ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। মন্দকথা শয়তানের সৈন্যের অন্তর্গত। এই কারণেই মিথ্যা বলা, আত্ম-প্রশংসা ও অপরকে ভর্ৎসনা করিবার কালে রসনা অতি দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। যে কথা শুনিলে অন্য লোকে চমৎকৃত হয় বা কান পাতিয়া শুনিতে ভালবাসে, তদ্রূপ কথা হইতে বক্তাকে বিরত থাকিতে হইলে অতিকষ্টে তাহাকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে হয়। আর মজলিসে বসিলে এইরূপ খোশ বাক্যালাপ হইতে বিরত থাকা অসম্ভবই হইয়া উঠে। কিন্তু নির্জন বাস অবলম্বন করিলে মানুষ এইরূপ আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু যাহার উপর তাহার কোন হাত নাই–যেমন অপরের হস্ত ও বাক্য দ্বারা কষ্ট প্রদান–এমন কি প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হইলেও এরূপ স্থলে পূর্ণ সবরের আবশ্যক। এই সকল স্থানে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না লওয়া বা প্রতিশোধ গ্রহণের সময়-সীমা অতিক্রম না করার জন্য পূর্ণ সবরের আবশ্যকতা রহিয়াছে। একজন সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"ঈমানদার লোকের পক্ষে অপরের প্রদত্ত দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলে এমন ঈমানকে আমরা (পূর্ণ) ঈমান বলিয়া মনে করি না।" এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

دَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ –

অর্থাৎ "তাহাদের প্রদত্ত কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন।" (সূরা আহযাব, ৬ রুকূ, ২২ পারা।) অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً –

অর্থাৎ "তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তাহাতে আপনি সবর করুন এবং সৎভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিন।" (সূরা মুয্‌যাম্মিল, ১ রুকূ, ২৯ পারা।) আল্লাহ্ পুনরায় বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি জানি যে, তাহারা যাহা বলিতেছে তজ্জন্য আপনার অন্তঃকরণ সঙ্কীর্ণ হইতেছে। অনন্তর আপনি স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা প্রশংসাসহ বর্ণনা করুন।" (সূরা হাজর, ৬ রুকূ, ১৪ পারা।)

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গরীব-দুঃখীদের মধ্যে ধন বিতরণ করিতেছিলেন। এমন সময় এক বক্তি বলিয়া উঠিল–"এ-বিতরণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইতেছে না।" অর্থাৎ ন্যায়বিচারের সহিত বিতরণ

করা হইতেছে না। না'ঊযুবিল্লাহি মিন যালিক। ইহা শুনিয়া হযরতের (সা) নূরানী চেহারা লোহিত বর্ণ ধারণ করিল এবং দুঃখের সহিত তিনি বলিলেন–"আমার ভাই মূসার (আ) উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক। লোকে তাহাকে আমা অপেক্ষা অধিক কষ্ট দিয়াছিল। কিন্তু তিনি উহা সহ্য করিয়াছিলেন।" আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ - وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ -

অর্থাৎ "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ লও তবে সেই পরিমাণ প্রতিশোধ লও যেরূপ তোমাদিগকে কষ্ট দিয়াছে। আর যদি (প্রতিশোধ না লইয়া) সবর কর তবে অবশ্য উহা সবরকারীদের জন্য উত্তম।" (সূরা নহল, ১৬ রুকূ, ১৪ পারা।)

ইঞ্জিল কিতাবে আছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলিয়াছেন–"যে-সকল পয়গম্বর আমার পূর্বে আগমন করিয়াছিলেন, 'হস্তের পরিবর্তে হস্ত কাটিয়া ফেল, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু নষ্ট কর, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত ভাঙ্গিয়া দাও।' আমি তাঁহাদের এই বিধান রহিত করিতেছি না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, অনিষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট করিও না; বরং কেহ তোমার ডান গালে চড় মারিলে তুমি তাহার নিকট বাম গাল ফিরাইয়া দিয়া বল–'ভাই, এই গালেও একটি চড় লাগাইয়া দাও।' কেহ তোমার পাগড়ী কাড়িয়া লইলে তোমার জামাটিও তাহাকে দিয়া দাও। কেহ তোমাকে বিনা পারিশ্রমিকে এক মাইল লইয়া গেলে তুমি তাহার সহিত দুই মাল চলিয়া যাও।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে দান কর। যে তোমার অনিষ্ট করে, তুমি তাহার মঙ্গল কর।" কিন্তু সিদ্দীকগণ ব্যতীত অপর কেহই এইরূপ সবর করিতে পারে না।

প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ তৃতীয় প্রকারের বস্তু পরিহার করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। ইহা হইল আসমানী বিপদাপদ। আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত কোন স্থানেই ইহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই; যেমন–সন্তান-সন্ততির মৃত্যু, ধনের বিনাশ, চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যংগের ক্ষতি এবং আসমানী বালা-মসীবত। এবংবিধ বিপদাপদে সবরে যত সওয়াব ও ফযীলত আছে, অন্য কোন সবরে তত নাই।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, কুরআন শরীফে তিন প্রকার সবরের কথা বর্ণিত আছে। প্রথম, ইবাদতে সবর; ইহার সওয়াবের তিন শত সোপান। দ্বিতীয়, হারাম পরিত্যাগে সবর; ইহার সওয়াবের ছয় শত সোপান। তৃতীয়, বিপদাপদে সবর; ইহার সওয়াবের নয় শত সোপান। সিদ্দীকগণের মর্তবায় উপনীত না হইলে কেহই বিপদাপদে সবর করিতে পারে না। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন–"আমি যাহাকে রোগগ্রস্ত করি, সে যদি সবর করে এবং অপরের সম্মুখে এই রোগের অভিযোগ না করে, তবে সুস্থ করিলে এই সবরের বিনিময়ে তাহাকে আমি পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চর্ম-মাংস দান করি। আর তাহাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লইলে আমার রহমতের সহিত উঠাইয়া লইয়া থাকি।" হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ, যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া একমাত্র তোমার জন্য সবর করে, ইহার প্রতিদানে যে কি পাইবে?" উত্তরে আল্লাহ বলেন– "আমি তাহাকে ঈমানের পরিচ্ছদ পরাইয়া দেই এবং কখনও ইহা ফিরাইয়া নেই না।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"সবরের সহিত সচ্ছলতা ও শান্তি প্রতীক্ষায় থাকা ইবাদত।" তিনি অন্যত্র বলেন–"যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করে, আল্লাহ তাহার দু'আ কবূল করিয়া থাকেন। দু'আ এই–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اَللّٰهُمَّ اٰجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَعْقِبْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁহারই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করিব। ইয়া আল্লাহ, আমার বিপদের প্রতিদান দাও এবং ইহার বিনিময়ে আমাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত কর।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ্ হযরত জিব্‌রাঈল আলায়হিস্ সালামকে বলিয়াছেন–হে জিব্‌রাঈল, আমি যাহার দৃষ্টিশক্তি হরণ করি, ইহার বিনিময়ে আমি তাহাকে কি দান করিয়া থাকি, তাহা তুমি জান কি? ইহার বিনিময় এই যে, আমি তাহাকে আমার দর্শন (দীদার) দান করি।"

এক বুযুর্গ এক টুকরা কাগজে নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কোন বিপদে পড়িলেই পকেট হইতে বাহির করিয়া তিনি ইহা দেখিতেন। আয়াত এই ঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا -

অর্থাৎ "আর আপনি স্বীয় প্রভুর আদেশের জন্য সবর করুন। অনন্তর নিশ্চয়ই আপনি আমার চক্ষুর সম্মুখে আছেন।" (সূরা তূর, ২ রুকূ, ২৭ পারা) হযরত ফতেহ্ মুসেলীর (র) পত্নী একদা আছাড় খাইলেন ইহাতে তাঁহার একটি অঙ্গুলী ভাংগিয়া গেল। কিন্তু তিনি হাসিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনার আংগুলে কি বেদনা হইতেছে না?" উত্তরে তিনি বলিলেন-"সওয়াবের আনন্দে আমি বেদনা ভুলিয়া গিয়াছি।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, রোগে অভিযোগ না করা এবং বিপদ গোপন রাখা আল্লাহকে মহান বলিয়া জানার অন্যতম নিদর্শন। এক রাবী বলেন যে, তিনি হযরত আবূ হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনিব হযরত সালিম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রণক্ষেত্রে আহত অবস্থায় ভূপতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"আপনি পানি চাহেন কি?" তিনি উত্তরে বলেন-"আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া নিয়া শত্রুর নিকটবর্তী করিয়া রাখুন এবং আমার ঢালে পানি রাখিয়া দিন। কারণ, আমি রোযা রাখিয়াছি,; সূর্যাস্ত পর্যন্ত জীবিত থাকিলে পানি পান করিব।"

রোদনে বা দুঃখিত হওয়াতে সওয়াব নষ্ট হয় না—বিপদে পতিত হইয়া রোদন করিলে বা দুঃখিত হইলে সবরের সওয়াব নষ্ট হয় না। কিন্তু শোকে অধীর হইয়া পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করিলে, চীৎকার করিয়া রোদন করিলে এবং অতিমাত্রায় অভিযোগ করিলে সওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পুত্র হযরত ইব্রাহীম রাযিয়াল্লাহু আন্হু ইন্তিকাল করিলে হযরত (সা) কাঁদিতে লাগিলেন দেখিয়া সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন-"হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি ত রোদন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" হযরত (সা) বলিলেন- "এই ক্রন্দন স্নেহের নির্দশন। স্নেহশীল ব্যক্তির প্রতিই আল্লাহ দয়া করিয়া থাকেন।" বুযুর্গগণ বলেন-"কাহারও উপর বিপদ পড়িলে শোকের কারণে তাহার বাহ্য আকৃতিতে যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে, তবে এমন সবরকে সব্রুন্ জমীল (সর্বাঙ্গসুন্দর সবর) বলে।"

শোকের সময় হারাম আচরণ—দুঃখে অস্থির হইয়া পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করা, মুখে চাপড় মারা এবং চীৎকার করিয়া রোদন করা হারাম। এমন কি শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজের বাহ্য অবস্থা পরিবর্তন করা, চাদর দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখা বা পাগড়ী ছোট করা ইত্যাদিও সঙ্গত নহে। বরং তোমার মনে করা উচিত যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতীক্ষা না করিয়া স্বীয় অভিপ্রায়ে যাহাকে ইচ্ছা সৃজন করেন বা দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লন। এমতাবস্থায় তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে অসন্তুষ্ট হওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নহে।

সবরের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—হযরত আবূ তাল্হা রাযিয়াল্লাহু আন্হুর পত্নী হযরত রমীযা উম্মে সলীম রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন-"আমার স্বামী বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমার পুত্র ইন্তিকাল করেন। আমি তাহার মুখ চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। আমার স্বামী ফিরিয়া আসিয়া পীড়িত পুত্রের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম-'অন্যান্য রাত্র অপেক্ষা আজ বেশ ভাল।' তৎপর আমি খাদ্য দ্রব্য আনয়ন করিলাম। আমার স্বামী আহার করিলেন। আমি নিজ দেহকে অন্যান্য রজনী অপেক্ষা অধিক সুন্দর সাজে সজ্জিত করিলাম। এমন কি স্বামী আমার সহিত কাম-বাসনা চরিতার্থ করিলেন। তৎপর আমি স্বামীকে বলিলাম-'আমি অমুক প্রতিবেশীকে একটি দ্রব্য ধারস্বরূপ দিয়াছিলাম। আমি যখন ইহা ফেরত চাহিলাম তখন সে কাঁদিতে লাগিল।' আমার স্বামী বলিলেন-'বড় আশ্চর্যের কথা! এমন প্রতিবেশী নিতান্ত নির্বোধ।' পরিশেষে আমি স্বামীকে বলিলাম-'তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপঢৌকনস্বরূপ একটি ধার-করা বস্তুর ন্যায় তোমার নিকট ছিল। এখন তিনি এই শিশুকে ফেরত লইয়াছে।' ইহা শুনিয়া স্বামী বলিলেন-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁহারই দিকে আমরা ফিরিয়া যাইব। প্রাতে তিনি সমস্ত ঘটনা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করিলেন। হযরত (সা) বলিলেন-'গত রাত্রিকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য শুভ করুক। কি উত্তম রজনী ছিল!' হযরত (সা) আবার বলিলেন-'আবূ তাল্হার (রা) পত্নী রমীযাকে (রা) আমি বেহেশ্তে দেখিয়াছি।"

এ-পর্যন্ত যাহা বলা গেল ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, প্রত্যেক অবস্থায়ই মানুষের পক্ষে সবরের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

বেহুদা চিন্তা হইতে অব্যাহতির উপায়–মানুষ সকল বাসনা-কামনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিলেও শত সহস্র বেহুদা চিন্তা ও অমূলক খেয়াল হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র যিকির হইতে বিরত রাখে। এই সকল চিন্তা নির্দোষ হইলেও মানব জীবনের পুঁজিস্বরূপ পরমায়ু বৃথা অপচয় করিয়া তাহার বিরাট ক্ষতি করে। নামাযের মধ্যে এইরূপ চিন্তা আসিলে এই দিকে মনোযোগ না দিয়া বরং নিবিষ্টচিত্তে সুন্দরভাবে নামায আদায় করিবার প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে। বেহুদা চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মানুষকে এমন কাজে লিপ্ত হইতে হয় যাহা মনকে তদ্রূপ চিন্তা হইতে টানিয়া নিজের দিকে ব্যাপৃত করিতে পারে।

হাদীস শরীফে আছে যে, চিন্তাশূন্য যুবককে আল্লাহ্ শত্রু বলিয়া মনে করেন। ইহা এই উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, যে-যুবক অবসর বসিয়া থাকে, সে বেহুদা চিন্তা হইতে অব্যাহতি পায় না এবং শয়তান তাহার নিকটেই অবস্থান করে ও অমূলক খেয়াল তাহার মনে স্বীয় গৃহ তৈয়ার করিয়া লয়। আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাও বেহুদা চিন্তা হইতে অব্যাহতি না পাইলে উহা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত কোন ব্যবসা বা চাকরি অবলম্বন করা উচিত। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে নির্জনে বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। বরং যে-ব্যক্তি মনকে কাজে লাগাইতে পারে না, তাহার উচিত দেহকে কাজে লিপ্ত রাখা।

সবর অবলম্বনের উপায়–সবর অবিভাজ্য বস্তু নহে; বরং ইহা বহু ভাগে বিভক্ত। সবর অবলম্বনের ব্যাপারে ইহার প্রত্যেক বিভাগেই নূতন নূতন কাঠিন্য ও ক্লেশের সম্মুখীন হইতে হয় এবং প্রত্যেকটির প্রতিকারও পৃথক পৃথক আছে। তথাপি জ্ঞান ও অনুষ্ঠানমূলক উপায়ই উহার প্রকৃষ্ট প্রতিকার। বিনাশন খণ্ডে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই সবর অবলম্বনের উপায়। কিন্তু এ-স্থলে উদাহরণস্বরূপ একটি ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হইবে, যেন ইহাকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ও কার্যে আবশ্যকমত লোকে তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ধর্মপ্রেরণার সংঘর্ষ বাঁধিলে যদি ধর্মপ্রেরণা অটল থাকে, তবে ইহাকে সবর বলে। ইহা ধর্ম ও প্রবৃত্তি, এই দুইয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিয়া যে-ব্যক্তি একটিকে জয়ী করিবার ইচ্ছ করে, তাহার উচিত যে, যাহাকে বিজয়ী করিবার ইচ্ছা থাকে, ইহাকে বল ও সাহায্য

দ্বারা শক্তিশালী করা এবং যাহাকে পরাস্ত করিবার ইচ্ছা থাকে, ইহাকে দুর্বল করিয়া দেওয়া এবং ইহার সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া।

প্রবৃত্তি দমন করা আবশ্যক–কাহারও হৃদয়ে কামভাব যদি এত প্রবল হইয়া উঠে যে, কাম-বাসনা চরিতার্থ না করিয়া থাকিতে সে অক্ষম হয়, তবে সম্ভবপর হইলে স্বীয় চক্ষুকে কুদৃষ্টি হইতে এবং হৃদয়কে তদ্রূপ খেয়াল হইতে বাঁচাইয়া রাখা তাহার কর্তব্য। ইহা না পারিলে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে কামভাব দুর্বল হইয়া পড়ে।

তিনটি উপায়ে কামভাবকে দুর্বল করা যায়।

প্রথম উপায়–যদি বুঝা যায় যে, উপাদেয় খাদ্য হইতে কামভাব প্রবল হইতেছে, তবে ঐরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিয়া ইহাকে আর সাহায্য করিবে না। রোযা রাখিতে আরম্ভ করিবে এবং রজনীতে অল্প পরিমাণে শুষ্ক রুটি আহার করিবে; গোশ্ত ও বলকারক খাদ্য কখনও ভক্ষণ করিবে না।

দ্বিতীয় উপায়–যে সকল কারণে কাম-বাসনা উত্তেজিত হইয়া উঠে, উহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে। সুন্দর মূর্তি দর্শনে যদি কামাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তবে নির্জনবাস অবলম্বন করিবে। হারাম দর্শন হইতে স্বীয় চক্ষুকে হেফাযতে রাখিবে এবং যে-স্থানে যুবক-যুবতীর সমাগম হয়, সেখানে কখনও দণ্ডায়মান হইবে না।

তৃতীয় উপায়–হালাল উপায়ে কাম-বাসনা শান্ত করিবে যেন হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার। বিবাহ দ্বারা হালাল উপায়ে কামভাব শান্ত হইতে পারে। বিবাহ ব্যতীত অধিকাংশ লোক হারাম কামভাব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

প্রবৃত্তি অবাধ্য পশুতুল্য। পশুকে বশীভূত করিতে হইলে উহার আহার বন্ধ করিয়া দিতে হয় বা উহার দৃষ্টি হইতে আহার একেবারে সরাইয়া রাখিতে হয় অথবা যে-পরিমাণ আহার দিলে ইহা শান্ত থাকে, সেই পমিরাণ দিতে হয়। প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিতেও এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হয়। এ পর্যন্ত প্রবৃত্তিকে দুর্বল করিবার উপায় বর্ণিত হইল।

ধর্মপ্রেরণাকে শক্তিশালী করা আবশ্যক–দুই উপায়ে ধর্মপ্রেরণাকে বলবান করিয়া তোলা যায়। **প্রথম উপায়**–প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিলে যে উপকার হয়, মনকে ইহার প্রলোভন প্রদান এবং প্রবৃত্তির প্রলোভনের বিরুদ্ধে সবর

করিলে যে-সওয়াব পাওয়া যায়, ইহা যে সকল হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তৎপ্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইলে যে-সুখ লাভ হয়, তাহা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং প্রবৃত্তির প্রলোভনে সবর করিলে ইহার বিনিময়ে চিরস্থায়ী রাজত্বের অধিকারী হওয়া যায়, এই বিশ্বাস যত দৃঢ় হইবে, ধর্মপ্রেরণাও তত বলবান হইয়া উঠিবে। **দ্বিতীয় উপায়**–ধর্মপ্রেরণাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিবে; তাহা হইলে ইহা সাহসী হইয়া উঠেবে। কোন ব্যক্তি বলবান হইতে চাহিলে স্বীয় ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং বলসাধ্য কাজ করা তাহার উচিত। এইরূপ করিলে সে ক্রমশ বলবান হইয়া উঠিবে। যে-ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা অধিক বলবান ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, সর্বাগ্রে তাহার অপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তির সহিত কুশ্তি করিয়া নিজ শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কেননা এই উপায়েই শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কারণেই যাহারা শ্রমসাধ্য কাজ করে, তাহারা ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইয়া ওঠে। সবর সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে সবর করিয়া চলিলে ক্রমশ গুরুতর কাজেও সবর করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

শুক্র (কৃতজ্ঞতা)

শুক্রে ফযীলত–শুক্র একটি শ্রেষ্ঠ স্তর। ইহার মর্তবা অত্যন্ত উচ্চ এবং যে-সে লোক এই উন্নত মর্তবায় পৌছিতে পারে না। এইজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ –

অর্থাৎ "আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্প লোকই শুক্র করে।" (সূরা সাবা, ২ রুকূ, ২২ পারা।) শয়তান মানুষের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল ঃ

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তাহাদের (মানুষের) অধিকাংশকেই তুমি কৃতজ্ঞ পাইবে না।" (সূরা আ'রাফ, ২ রুকূ, ৮ পারা।)

যে-সকল গুণে মানুষ পরিত্রাণ পায়, উহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার প্রথম শ্রেণীর গুণ ধর্মপথে চলিবার সূচনাস্বরূপ মাত্র। এই শ্রেণীর গুণ অর্জন করা মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; যেমন–তওবা, সবর, আল্লাহ্র ভয়, যুহ্দ (সংসারের প্রতি উদাসীনতা), দরিদ্রতা, মুহাসাবা (কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ)। এই গুণগুলি উহাদেরও বহু উর্ধ্বে এক বিরাট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সহায়ক মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণসমূহ অপর কোন কাজের সূচনা বা সহায়করূপে নহে, বরং স্বয়ং ঐগুলি অর্জন করাই মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য; যেমন মহব্বত, শওক (আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য উদ্গ্রীব থাকা), রেযা (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকা), তাওহীদ, তাওয়াক্কুল এবং শুক্রও এই শ্রেণীর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। যাহা স্বয়ং মানুষের কাম্য, তাহাই আখিরাতেও তাহার সঙ্গে থাকিবে এবং শুক্রও মানুষের চিরসহচররূপে বিদ্যমান রহিবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ –

অর্থাৎ "আর তাহাদের শেষ দু'আ এই যে, সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রভু।" শুক্র সম্বন্ধে গ্রন্থের শেষ ভাগে লেখা উচিত ছিল। কিন্তু সবরের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকায় এ-স্থানেই লেখা হইল।

শুক্র যে শ্রেষ্ঠ গুণ, ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় যিকিরের সহিত একত্র করিয়া ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ –

অর্থাৎ "তোমরা আমার যিকির কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণে রাখিব আর তোমরা আমার শুক্র কর এবং আমার অকৃতজ্ঞ হইও না।" (সূরা বাকারাহ্, ১৮ রুকূ, ২ পারা) রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি আহার করিয়া আল্লাহ্র শুক্রিয়া আদায় করে, তাহার মরতবা রোযাদার এবং সবরকারীর মরতবার সমতুল্য।" তিনি আরও বলেন–"কিয়ামতের দিন, 'প্রশংসাকারিগণ দণ্ডায়মান হউক' এই বাণী বিঘোষিত হইলে যাহারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র শুক্র করে, কেবল তাহারাই উঠিবে।" ধন জমাইতে নিষেধ করিয়া যখন এই আয়াত নাযিল হইল–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ –

তখন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, তবে আমরা কোন্ ধন সঞ্চয় করিব?" তিনি উত্তরে বলিলেন–"শুক্রকারীর হৃদয়, যিকিরকারীর রসনা এবং ঈমানদার পত্নী।" অর্থাৎ দুনিয়াতে এই তিন জিনিস লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাক। ঈমানদার পত্নী আল্লাহ্র যিকিরে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পুরুষকে সাহায্য করিয়া থাকে, এই জন্যই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত ইব্নে মাস্উদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"শুক্র ঈমানের অর্ধেক।" হযরত আতা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার নিকট গমনপূর্বক রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিস্ময়কর অবস্থার কিছু বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন–"হযরতের এমন কোন্ অবস্থা ছিল যাহা বিস্ময়কর নহে?" তৎপর তিনি বলিতে লাগিলেন–"এক রজনীতে রাত্রিকালের পোশাক পরিধান করত তিনি আমার নিকট আগমন করিলেন এবং আমার সহিত আমার বিছানায় শয়ন করিলেন। তাঁহার নূরানী দেহ আমার অনাবৃত শরীরের সহিত মিলিত ছিল, এমতাবস্থায় তিনি বলিলেন– হে আয়েশা, আল্লাহর ইবাদতের জন্য আমাকে যাইতে দাও। আমি আরয করিলাম–'যদিও আমি কামনা করি যে, আমি আপনার নিকটে থাকি, তথাপি বিস্‌মিল্লাহ আপনি গমন করুন।' হযরত (সা) উঠিয়া মশক হইতে পানি লইয়া ওযু করিলেন এবং ইহাতে অল্প পরিমাণে পানি ব্যবহার করিলেন। ইহার পর তিনি নামাযে লিপ্ত হইলেন এবং সংগে সংগে রোদন করিতেছিলেন। এইরূপে প্রভাত হইয়া গেল এবং হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহাকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকিতে আসিলেন। আমি হযরত (সা)-এর নিকট নিবেদন করিলাম–'হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিষ্পাপ করিয়াছেন। তথাপি আপনি রোদন করেন কেন?' হযরত (সা) বলিলেন–'আমি কি শুক্র গুযার (কৃতজ্ঞ) বান্দা নহি? আমার উপর এই (নিম্নলিখিত) আয়াত নাযিল হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমি রোদন না করিয়া থাকিতে পারি কিরূপে?" আয়াতখানা এই–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ
لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ –

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবস ও রজনীর গমনাগমনে বুদ্ধিমানের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে; যাহাদের অবস্থা এই যে, তাহারা দাঁড়াইয়া, উপবেশন করিয়া এবং শয়ন করিয়াও আল্লাহ্র যিকির করে।" (সূরা আলে ইম্রান, ২০ রুকূ, ৪ পারা।)

যাঁহারা তদ্রূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইহা লাভের আনন্দে তাঁহারা রোদন করিয়া থাকেন, সে রোদন ভয়ের জন্য হয় না। যেমন বর্ণিত আছে যে, একজন পয়গম্বর একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, ইহা হইতে অনেক পরিমাণে পানি বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রস্তরটিকে বাকশক্তি দান করিলেন। তখন প্রস্তরটি বলিল ঃ

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ – (অর্থাৎ মানুষ ও পাথর দোযখের ইন্ধন হইবে), যে সময় এই আয়াত নাযিল হইয়াছে, সেই হইতে ভয়ে আমি রোদন করিতেছি। পয়গম্বর (আ) পাথরটির জন্য দু'আ করিলেন–"হে আল্লাহ, এই পাথরের ভয় দূর করিয়া দাও।" এই দু'আ কবূল হইল। কিছুদিন পর এই পয়গম্বর (আ) সে প্রস্তরের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে দেখিলেন প্রস্তরটি হইতে পূর্বের ন্যায় পানি প্রবাহিত হইতেছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–"এখন তুমি রোদন করিতেছ কেন?" প্রস্তর বলিল–"পূর্বে ভয়ে কাঁদিতেছিলাম। এখন কৃতজ্ঞতার আবেগে কাঁদিতেছি।" মানুষের হৃদয়ও এইরূপ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মানব হৃদয় প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের রোদন করা উচিত। কখনও শোকে অভিভূত হইয়া, আবার তখনও-বা আনন্দের আবেগে তাহাকে রোদন করিতে হইবে। তবেই তাহাদের হৃদয় কোমল হইবে।

শুকরের হাকীকত–ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ধর্মপথে ক্রমোন্নতির তিনটি মৌলিক উপকরণ আছে; যথা ঃ–(১) জ্ঞান, (২) মানসিক অবস্থা ও (৩) কর্ম। তন্মধ্যে জ্ঞানই মূল উপকরণ। অন্তররাজ্যে জ্ঞানের উদয় হইলেই মনে

এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়। মনের এই অবস্থাই কর্মের প্রেরণা যোগায় এবং তৎপর কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। সর্ববিধ সুখ-সম্পদ একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পাওয়া যায়, এই জ্ঞান হইতেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং সুখ-সম্পদ লাভের আনন্দ হৃদয়ে এক প্রকার অবস্থার সৃষ্টি করে। তৎপর আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা ঠিক ঠিক সেই কার্যে ব্যয় করিলে কর্ম সম্পাদিত হয়। অন্তর ও রসনা, এই উভয়ের সহিত কর্মের সম্বন্ধে রহিয়াছে। এই সকল বিষয় ভালরূপে অবগত না হইলে শুকরের হাকীকত বুঝা যাইবে না।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞানের পরিচয়–তুমি যে সম্পদ পাইয়াছ, তাহা একমাত্র আল্লাহই দান করিয়াছেন এবং অন্য কেহই তাঁহার শরীক নাই, এই জ্ঞানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞান বলে। সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন মধ্যবর্তী উপকরণের উপর দৃষ্টি নিপতিত হইলে এবং সম্পদ প্রদান ব্যাপারে এই মধ্যবর্তী উপকরণের কোন অধিকার আছে বলিয়া মনে করিলে শুকর ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হইল। বাদশাহ যদি তোমাকে উপঢৌকনস্বরূপ পোশাক দান করেন এবং এই দানের মধ্যে উযীরের অনুগ্রহও কিছু অনুভব কর, তবে বাদশাহ্‌র প্রতি তুমি পূর্ণভাবে কৃতজ্ঞ হইতে পারিবে না, বরং এই কৃতজ্ঞতা বাদশাহ ও উযীরের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গেল এবং পোশাক প্রাপ্তির আনন্দ পুরাপুরিভাবে বাদশাহ্‌র জন্য হইল না। তুমি যদি মনে কর যে বাদশার আদেশে পোশাক পাইয়াছ, কিন্তু এই আদেশ কাগজ ও কলমের মাধ্যমে হইয়াছে, তবে কৃতজ্ঞতার কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ, তুমি বুঝিলে যে, কাগজ-কলম অপরের আজ্ঞাধীন এবং দানকার্যে উহাদের কোনই অধিকার নাই। তুমি যদি মনে কর যে, খাজাঞ্চীর মাধ্যমে উপঢৌকন পাইলে তাহাতেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোন ত্রুটি হয় না। কারণ, খাজাঞ্চীও আজ্ঞাধীন এবং তাহারও নিজস্ব ক্ষমতা নাই। সে বাদশাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে না এবং আদেশ ব্যতীত কিছু দিতেও পারে না। খাজাঞ্চীও কলমের ন্যায় আজ্ঞাধীন।

ঠিক তদ্রূপ যদি মনে কর যে, পৃথিবীর সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বারিধারা হইতে জন্মে এবং বারিধারা মেঘের কারণে হইয়া থাকে; আর অনুকূল বাতাসের দরুন নৌকাডুবি হইতে পরিত্রাণ পাও বলিয়া ভাব তবে ঠিক ও সংগত উপায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল না। কিন্তু যদি মনে কর যে, মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস,

চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি লেখকের হস্তস্থিত কলমের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন, কলম যেমন নিজে নিজে কিছুই করিতে পারে না, এই সকল বস্তুও নিজ ক্ষমতায় কিছুই করিতে পারে না, তবে কৃতজ্ঞতাতে কোন ত্রুটি হয় না। অন্যের হাত হইতে কোন দ্রব্য পাইয়া তাহাকেই দাতা বলিয়া জানা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা এবং শুকরের মরতবা হইতে দূরে পর্দার অন্তরাল হওয়ার নিদর্শন। অন্যের নিকট হইতে কোন বস্তু পাইলে বরং মনে করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর এক দণ্ডধারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এই দণ্ডধারী বলপ্রয়োগে তোমাকে ইহা দিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করিয়াছে। সে ত ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সর্ববিধ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। তাহার ক্ষমতা থাকিলে সে কপর্দকও তোমাকে দিত না।

যাহাকে দণ্ডধারী বলা হইল ইহা ইরাদা বা ইচ্ছা। আল্লাহ তা'আলা ইহা দাতার মনে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই ইচ্ছা সৃজনপূর্বক তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, দান করিলেই সে ইহকালের সৌভাগ্য লাভ করিবে। দুনিয়া বা আখিরাতের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই দাতা তোমাকে দিয়াছে। বাস্তবপক্ষে সে নিজে নিজেকেই দিয়াছে, তোমাকে কিছুই দেয় নাই। কারণ, দাতা তোমাকে যাহা দিয়াছে, ইহার বিনিময়ে সে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের উপায় করিয়া লইয়াছে। দাতার উপর দণ্ডধারী নিযুক্ত করিয়া আল্লাহই নিঃস্বার্থভাবে তোমাকে ঐ বস্তু দান করিয়াছেন।

সুতরাং যাহার হাত হইতে কিছু পাওয়া যায়, সে উল্লেখিত খাজাঞ্চীর ন্যায় এবং খাজাঞ্চী আবার আদেশ-লেখকের হস্তস্থিত কলমের ন্যায় মধ্যবর্তী কারণমাত্র। উহাদের কাহারও নিজের স্বাধীন ক্ষমতা নাই। অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলা দাতার হৃদয়ে ভবিষ্যত মঙ্গললাভের আশা সৃষ্টি করত তদ্দ্বারা বলপ্রয়োগে দাতাকে বাধ্য করিতেছেন, তুমি যখন ভালরূপে উহা বুঝিতে পারিবে তখন তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সমর্থ হইবে। বরং উপলব্ধিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। যেমন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মুনাজাতে আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ, তুমি হযরত আদম আলায়হিস সালামকে নিজ হস্তে সৃজন করিয়াছ এবং তাঁহার প্রতি অমুক অমুক অনুগ্রহ করিয়াছ। কি প্রকারে তিনি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন?" আল্লাহ বলিলেন–"আদম (আ) হৃদগতভাবে জানিয়াছিল, সমস্ত সম্পদই সে আমা হইতে পাইয়াছে এবং তাহার এই জ্ঞানই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা।"

ঈমান চিনিবার বহু পন্থা আছে। ইহার প্রথম পন্থা তাক্‌দীস অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থে যে-সকল গুণ আছে এবং মানুষের কল্পনা ও খেয়ালে আসে, তৎসমুদয় হইতে আল্লাহ্‌কে পাকপবিত্র বলিয়া জানা। সুব্‌হানাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি) বাক্য এই অর্থই প্রকাশ করে। দ্বিতীয় তাওহীদ অর্থাৎ এই বিশ্বাস করা যে, উক্ত পবিত্রতার সহিত আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন অংশী নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য নাই) কলেমা এই অর্থই প্রকাশ করে। তৃতীয়, তাহ্‌মীদ অর্থাৎ এই জানা যে, বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই আল্লাহ্ হইতে হয় এবং সমস্তই তাহার প্রদত্ত নি'আমত। ইহাই আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র) বাক্যের অর্থ। এই তিনটির মধ্যে শেষোক্তটিই সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, অপর দুইট জ্ঞান ইহারই অধীন। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"একবার 'সুব্‌হানাল্লাহ' বলিলে দশটি সওয়াব, একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলিলে বিশটি সওয়াব এবং একবার 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ্' বলিলে ত্রিশটি সওয়াব পাওয়া যায়।" এই কলেমাসমূহ শুধু মুখে উচ্চারণ করিলেই তদ্রূপ সওয়াব হয় না, বরং এইগুলি যে নিগূঢ় তত্ত্ব বহন করে, ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করত উচ্চারণ করিলেই সেইরূপ সওয়াব হইয়া থাকে। ইল্‌মে শুক্‌র অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞানের ইহাই প্রকৃত অর্থ যাহা এ-পর্যন্ত বর্ণিত হইল।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অবস্থার পরিচয়–কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান হৃদয়ে জন্মিলে অন্তরে যে-আনন্দ হয়, তাহাকে উহার (কৃতজ্ঞতার) হাল বা অবস্থা বলে। কারণ, লোকে কাহারও নিকট হইতে কোন সম্পদ পাইলে তাহার প্রতি আনন্দিত হয়। এই আনন্দ তিনটি কারণে হইতে পারে। **প্রথম কারণ**–যে বস্তুর অভাবে লোকে অসুবিধা ভোগ করে, ইহা পাইয়া তাহার অভাব বিদূরিত হইলে সে আনন্দিত হয়। এইরূপ আনন্দকে কৃতজ্ঞতা বলা চলে না। কারণ, মনে কর, বাদশাহ্ সফরের আয়োজন করত তাঁহার ভৃত্যকে একটি অশ্ব দান করিলেন। এমতাবস্থায় ভৃত্য যদি এই কারণে আনন্দিত হয় যে, তাহার একটি অশ্বের অভাব ছিল এবং ইহা এখন মোচন হইল, তবে এইরূপ আনন্দকে বাদ্‌শাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা বলিয়া গণ্য হইবে না। কেননা, কোন মরুপ্রান্তরে অশ্ব পাইলেও ভৃত্যের তদ্রূপ আনন্দ হইত। **দ্বিতীয় কারণ**– অধিক পাওয়ার আশা; যেমন বাদশাহ্ ভৃত্যকে অশ্ব দান করিলেন। ইহাতে তাহার প্রতি বাদশাহ্‌র অনুগ্রহদৃষ্টি আছে ভাবিয়া সে আরও অধিক লাভের আশায় আনন্দিত হইল। এমতাবস্থায়

কোন বিজন প্রান্তরে অশ্ব পাইলে তাহার এইরূপ আনন্দ হইত না। কেননা, এ-স্থলে দাতার কারণে এবং তাহার নিকট হইতে অধিক পাওয়ার লোভে ভৃত্যের আনন্দ হইয়াছে, দাতার জন্য আনন্দ হয় নাই। এইরূপ আনন্দকে মোটামুটিভাবে ত কৃতজ্ঞতার মধ্যে গণ্য করা যায়, কিন্তু ইহা ত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ। **তৃতীয় কারণ**–কেবল দাতার উদ্দেশ্যে। ভৃত্য যদি অশ্ব পাইয়া এই ভাবিয়া আনন্দিত হয় যে, এই সুযোগে সে বাদ্‌শাহ্‌র সঙ্গে গমন করিবে এবং বাদ্‌শাহ্‌র দর্শন লাভে চরিতার্থ হইবে এবং ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন উদ্দেশ্যই না থাকে, তবে এই আনন্দ একমাত্র বাদ্‌শাহ্‌র জন্যই হইবে। এই প্রকার আনন্দকেই পূর্ণ কৃতজ্ঞতা বলে।

তদ্রূপ যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন বস্তু পাইয়া আনন্দিত হয়, আল্লাহ্‌কে পাইবার সুযোগ হইল ভাবিয়া আনন্দিত হয় না, এমন আনন্দকে কৃতজ্ঞতা বলে না। অপরপক্ষে যে-দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, ইহাকে যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও করুণার নিদর্শন মনে করিয়া আরও অধিক পাওয়ার লোভে আনন্দিত হয়, তবে এই আনন্দকে কৃতজ্ঞতা বলা হইবে বটে, কিন্তু ইহা ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। আবার আল্লাহ্‌র দানকে ধর্মকার্যের সুযোগ-সুবিধা মনে করত আনন্দিত হইয়া ইলম ও ইবাদতে লিপ্ত হইলে এবং প্রকৃত দাতা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিলে তবে ইহাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা বলে।

প্রকৃত শুক্‌রের নিদর্শন–প্রকৃত ও পূর্ণ শুক্‌রের নির্দশন এই— দুনিয়ার যে সকল বস্তু ইবাদতকার্যে বিঘ্ন ঘটায় তৎপ্রতি মন বিরক্ত হইয়া উঠা এবং এই সমস্ত জিনিসকে সম্পদ বলিয়াই মনে না করা; বরং তদ্রূপ বস্তু হইতে বঞ্চিত হওয়াকে সম্পদ মনে করিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সুতরাং যে বস্তু ধর্মপথে সাহয়ক ও সাহায্যকারী না হয় ইহা পাইয়া আনন্দিত হওয়া উচিত নহে। এইজন্যই হযরত শিব্‌লী (র) বলেন– "প্রাপ্ত বস্তুর দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত না করিয়া একমাত্র দাতার দিকে দৃষ্টিপাত করাকেই শুক্‌র বলে।" যে-ব্যক্তি চক্ষু, উদর, কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে আনন্দ পায় না, তাহার পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।

অতএব, উপরে সম্পদ লাভে আনন্দিত হওয়ার যে-তিনটি কারণ বর্ণিত হইল, অন্ততপক্ষে ইহার দ্বিতীয় কারণ অবলম্বনে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে; কেননা, প্রথম কারণ অবলম্বনে আনন্দিত হওয়াকে কৃতজ্ঞতাই বলে না।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক আমলের পরিচয় –অন্তর, রসনা এবং দেহ দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক আমল হইয়া থাকে। সকলের মঙ্গল কামনা করিলে এবং অন্যের সম্পদ দর্শনে ঈর্ষা না করিলে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সকল অবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আল্‌হামদুলিল্লাহ বলা ও আল্লাহ্‌র জন্য আনন্দ প্রকাশ করা রসনার কৃতজ্ঞতা। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি কেমন আছ?" ঐ ব্যক্তি উত্তর দিলেন–"আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌, ভাল আছি।" হযরত (সা) বলিলেন–"আমি এই উত্তরই চাহিয়াছিলাম।" আল্লাহ্‌র প্রশংসাসূচক বাক্যে উত্তর পাইবার উদ্দেশ্যেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ একে অন্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, যেন উত্তরদাতা ও শ্রবণকারী উভয়েই সওয়াব পাইতে পারেন।

কুশল জিজ্ঞাসা করাতে বিপদাপদে নিপতিত বলিয়া অভিযোগ করিরে পাপী হইতে হয়। একজন অসহায় দুর্বল মানবের পক্ষে অপর একজন নিতান্ত নিঃস-হায় অক্ষম ব্যক্তির নিকট পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অপেক্ষা বড় অন্যায় আর কি হইতে পারে? বিপদাপদে পতিত হইয়াও আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক। কেননা উহাই হয়ত সৌভাগ্যের কারণ হইতে পারে। যদি ধন্যবাদ দিতে না পার তবে অন্ততপক্ষে বিপদে সবর করা উচিত।

শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্‌র নি'আমত মনে করিয়া যে-কাজের জন্য যে-অঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখিলে দেহ দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আখিরাতের কাজের জন্য সৃজন করিয়াছেন এবং তোমাকে আখিরাতের কাজে লিপ্ত দেখিতেই তিনি পসন্দ করেন। তুমি যদি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় কাজে নিযুক্ত রাখ, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইল; কিন্তু তাঁহার প্রিয় কার্য বলিতে ইহা বুঝিও না যে, তদ্রূপ কার্যে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ বা লাভ আছে। বরং ইহাই মনে রাখিবে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় কার্য করিলে তোমার নিজেরই মঙ্গল হইবে। বান্দার মঙ্গল সাধনই তাঁহার প্রিয় কাজ। ইহার উদাহরণ এই যে, মনে কর, কোন এক গোলামের দুরবস্থা দেখিয়া তাহার উপর বাদশাহ্‌র কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। গোলাম বাদশাহ হইতে বহু দূরে। কিন্তু বাদশাহ একটি অশ্ব ও কিছু পাথেয় তাহার নিকট প্রেরণা করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, গোলাম অশ্বে আরোহণ করত পাথেয় সামগ্রী ভোগে বাদশাহ্‌র দরবারে আগমনপূর্বক

তাঁহার নৈকট্যপ্রাপ্ত অনুচররূপে গণ্য হইয়া বাদশাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহ ও অসীম সম্মানের অধিকারী হইবে। সে-গোলাম দূরে থাকিলে বা দরবারে আসিলে বাহশাহ্‌র কোন লাভ-লোকসান নাই। কারণ, সে আসিলে বাদশাহ্‌র রাজ্য বৃদ্ধি পাইবে না এবং না আসিলেও কোন দেশ অধিকারচ্যুত হইয়া যাইবে না। দরবারে আসিলে গোলামেরই মঙ্গল হইবে বলিয়া তিনি তাহার আগমন কামনা করেন। কারণ, বাদশাহ দাতা ও দয়ালু হইলে সকলের মঙ্গল সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে এবং নিঃস্বার্থভাবে কেবল তাহাদের জন্যই এই মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, ইহাতে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির কোন মতলব তাঁহার থাকে না। সেই গোলাম যদি অশ্বারোহণে বাদশাহ্‌র দরবারের দিকে রওনা করে এবং পাথেয় ব্যবহার করিতে থাকে তবে সে অশ্ব ও পাথেয় উভয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। গোলাম যদি অশ্বারোহণে বাদশাহ্‌র দরবারের বিপরীত দিকে গমন করিতে থাকে এবং দরবার হইতে আরো দূরে সরিয়া পড়ে, তবে সে অকৃতজ্ঞ হইল। আবার যদি সে দরবার হইতে আর দূরেও যায় না এবং নিকটবর্তীও হয় না, পূর্বস্থানেই বসিয়া বসিয়া অশ্ব এবং পাথেয় প্রদানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দেয় তবে ইহাও অকৃতজ্ঞতার মধ্যেই পরিগণিত। কিন্তু ইহা পূর্বোক্ত অকৃতজ্ঞতার ন্যায় তত জঘন্য নহে।

তদ্রূপ আল্লাহ্‌র দানসমূহ তাঁহার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় ইবাদত-কার্যে ব্যয় করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ইহা না করিয়া এইগুলি পাপ কার্যে অপচয় করত আল্লাহ্‌ হইতে অধিকতর দূরে সরিয়া পড়িলে তবে ঘোর অকৃতজ্ঞতা করা হয়। আবার নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে ঐ দানগুলি ব্যয় করত ইহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিলেও অকৃতজ্ঞতা করা হয়। কিন্তু পাপকার্যে ব্যয়ের ন্যায় ইহা তত জঘন্য হইবে না।

আল্লাহ্‌র প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য চিনিবার আবশ্যকতা— যখন বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌-প্রদত্ত প্রতিটি সম্পদ তাঁহার প্রিয় কার্যে ব্যয় করিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র অপ্রিয় কার্য হইতে প্রিয় কার্যসমূহ পৃথক করিয়া লইতে না পারিলে কেহই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে পারে না। আবার এই জ্ঞানও নিতান্ত সূক্ষ্ম। কোন্‌ উদ্দেশ্যে কোন্‌ জিনিস সৃজন করা হইয়াছে, তাহা না জানিলে কোন্‌ কার্য আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং কোন্‌টি অপ্রিয় নির্ণয় করা যায় না। এ-স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইবে। বিস্তৃত বিবরণ 'ইয়াহ্‌ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই সমুদয়ের সংকুলন হইবে না।

সম্পদের অকৃতজ্ঞতা

আল্লাহ্ তা'আলা যে-উদ্দেশ্যে যে-বস্তু সৃজন করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইলে এবং তিনি যে-কার্য সম্পাদনের জন্য যে পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই কার্যে উহা প্রয়োগ না করিয়া অন্য উদ্দেশ্যে উহার অপব্যবহার করিলে সম্পদের অকৃতজ্ঞতা করা হয়। আল্লাহ্-প্রদত্ত বস্তু তাঁহারই প্রিয় কার্যে ব্যয় করিলে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, আর অপ্রিয় কার্যে ব্যয় কিরলে অকৃতজ্ঞতা হয়। কোন্ কাজটি আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং কোনটি অপ্রিয়, একমাত্র শরীয়তই তাহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। অতএব আল্লাহ্-প্রদত্ত সম্পদ তাঁহার নির্দেশানুসারে তাঁহারই ইবাদতে ব্যয় করা আবশ্যক।

যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাঁহাদের সম্মুখে এক প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। সেই পথে তাঁহারা পর্যবেক্ষণ, যুক্তি-প্রমাণ এবং ইলহাম (আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হৃদয়ে উদ্ভূত ইঙ্গিত) দ্বারা প্রত্যেক কার্যের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। সাধারণ লোক হয়ত বুঝিবে, আল্লাহ্ তা'আলা মেঘকে বারিবর্ষণের উদ্দেশ্যে সৃজন করিয়াছেন। আবার বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্য হইল ঘাস উৎপন্ন করা এবং ঘাস সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবজন্তুর আহারের সংস্থান করা। সে মনে করিতে পারে যে, দিবা রাত্রির পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য সূর্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে রাত্রি বিশ্রাম ও আরামের জন্য এবং দিবাভাগ জীবিকা অর্জন ও পার্থিব অন্যান্য কাজের জন্য নির্ধারিত হইতে পারে। সৃষ্টির এবংবিধ প্রকাশ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছে। ইহা ছাড়া সূর্যের সৃষ্টির মধ্যে এমন রহস্য রহিয়াছে যাহার সন্ধান সকল লোকে জানে না। গগনমণ্ডলে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র বিরাজ করিতেছে যাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণ লোক অবগত নহে। যেমন সকলেই জানে যে, হস্ত ধারণের নিমিত্ত, পদ গমনের জন্য এবং চক্ষু দেখিবার জন্য, কিন্তু হৃৎপিণ্ড এবং প্লীহা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হইয়াছে এবং চক্ষুগোলকের উপর কি কারণে দশটি পর্দা রাখা হইয়াছে, ইহা হয়ত সকলে জানে না।

যাহাই হউক, সৃষ্টি-রহস্যের কতকগুলি সূক্ষ্ম, আবার কতকগুলি নিতান্ত সূক্ষ্ম। অসাধারণ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কেহই এই সমস্ত বুঝিতে পারে না। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা অত্যন্ত বিস্তৃত। তথাপি সংক্ষেপে এতটুকু জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে আখিরাতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন—দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। পার্থিব পদার্থের মধ্যে যাহা মানুষের আবশ্যক, তাহা আখিরাতের পথে কাজে লাগিবে বলিয়াই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা কখনও মনে করা উচিত নহে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল জিনিসই মানবের জন্য সৃজন করিয়াছেন। এইরূপ বিবেচনা করিলে যে বস্তুতে তোমার কোন উপকার দেখিতে পাইবে না, ইহার সম্বন্ধে হয়ত বলিয়া ফেলিবে—"আল্লাহ্ ইহা কেন সৃষ্টি করিয়াছেন?" যেমন বলিতে পার—"আল্লাহ্ তা'আলা মশা-পিপীলিকাকে কেন সৃষ্ট করিয়াছেন? কি উদ্দেশ্যেই-বা তিনি সাপ বানাইলেন?" তদ্রূপ পিপীলিকাও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে—"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ কেন সৃষ্টি করিলেন? মানুষ বিনা কারণে আমাদিগকে পদদলিত করিয়া হত্যা করে।" মানুষ যেরূপ বিস্ময় প্রকাশ করে, পিপীলিকাও তদ্রূপ বিস্ময় প্রকাশ করে।

যাহাই হউক, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই স্বীয় বদান্যতায় সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃজনকালে প্রত্যেক পদার্থ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, খনিজদ্রব্য প্রভৃতিকে নিতান্ত সুন্দর আকার দান করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের উপযোগী সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা দান করিয়াছেন। কেননা তাঁহার কার্যে কেহই বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না এবং তাঁহার মহান দরবারে কৃপণতারও স্থান নাই। সৃষ্টির মধ্যে কোন কোন পদার্থে পূর্ণতা, শোভা ও সৌন্দর্য যে সম্যকরূপে বিকশিত হয় না, ইহা কারণ এই যে, তদ্রূপ পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত উহারা ছিল না, উহাদের মধ্যে ঐ গুণসমূহের পরিপন্থী গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত উক্ত বিপরীত গুণাবলী অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহাদের মধ্যে নিহিত ছিল। কারণ অগ্নি কখনও পানির শীতলতা ও আর্দ্রতা গ্রহণ করিতে পারে না; কেননা কোন উষ্ণ দ্রব্যই শীতলতা গ্রহণ করে না। ইহার কারণ এই যে, শীতলতা উষ্ণতার বিপরীত। পক্ষান্তরে উষ্ণ দ্রব্যের উষ্ণতাও ইহা সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ইহার উষ্ণতা নষ্ট করিয়া দেওয়াও ক্ষতি।

বাস্তবপক্ষে যে আর্দ্রতা হইতে আল্লাহ্ মাছি সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্দারা মাছি সৃজন করিবার কারণ এই যে, এই আর্দ্রতার পূর্ণ বিকাশই হইল মাছি (অর্থাৎ ইহা চরম বিকাশপ্রাপ্ত হইলে মাছি হওয়ারই উপযোগী, অন্য কিছু হওয়ার উপযোগী নহে) এবং যে আর্দ্রতা এইরূপ পূর্ণতা লাভের উপযুক্ত, তিনি ইহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই। কেননা বঞ্চিত রাখিলেও কৃপণতা হইত। মাছির জীবন ও শক্তি, অনুভূতি ও গতি এবং চমৎকার আকৃতি ও বিস্ময়কর

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। এইজন্যই সেই আর্দ্রতার আদিম অবস্থায় এইগুলির কিছুই ছিল না। এইজন্যই সেই আর্দ্রতার তুলনায় মাছি চরম বিকশিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত। যে আর্দ্রতার চরম পরিণতি মাছি, ইহা হইতে মানুষ সৃষ্টি না করিবার কারণ এই যে মানব সৃষ্টির জন্য আবশ্যক গুণাবলী ধারণ করিবার শক্তি ও যোগ্যতা সে আর্দ্রতার ছিল না। কারণ, মক্ষিকা-প্রসূ আর্দ্রতার মধ্যে যে সকল গুণ আছে, উহা মানুষের প্রয়োজনীয় গুণের বিপরীত। (সুতরাং মানবের উপযোগী গুণাবলী মক্ষিকা-প্রসূ আর্দ্রতার মধ্যে বিকাশ পাইতে পারে না।) অথচ মক্ষিকার জন্য যে পদার্থের প্রয়োজন ছিল, তাহা হইতে ইহা বঞ্চিত রহে নাই।

মক্ষিকার জন্য পাখা, চুল, হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ, মস্তক, উদর, অন্নস্থলী, পাকস্থলী, অন্নের অসার ভাগ বাহির হইবার স্থান প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আবশ্যক। উহা ছাড়া ক্ষুদ্রত্ব, পরিচ্ছন্নতা এবং লঘুত্ব ইহার দেহের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা মাছিকে এই সকলই দান করিয়াছেন। মাছির জন্য দর্শনশক্তি আবশ্যক। কিন্তু ইহার মস্তক নিতান্ত ক্ষুদ্র হওয়াতে চক্ষের ধূলিবালি পরিষ্কার করিয়া ইহা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ রাখিবার জন্য পলকের আবশ্যক। অথচ মক্ষিকার পলক নাই। সুতরাং ইহার পরিবর্তে মক্ষিকাকে চক্ষু পরিষ্কার করিবার জন্য দুইটি অতিরিক্ত হস্ত দান করা হইয়াছে। ধূলি পড়িবামাত্র মক্ষিকা সেই হস্ত দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলে এবং তৎপর হস্ত দুইটি পরস্পর ঘর্ষণ করত হস্ত সংলগ্ন ধূলিবালি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলার করুণা যে সৃষ্টির সকলের উপর রহিয়াছে, কেবল মানুষের উপর সীমাবদ্ধ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই এতগুলি কথা বলা হইল। পোকামাকড়, কীটপতঙ্গেরও যাহা কিছু আবশ্যক তৎসমুদয় ইহাদের প্রত্যেককেই তিনি পূর্ণমাত্রায় দান করিয়াছেন। এমন কি হস্তীর যে-আকৃতি পোকামাকড়কেও তিনি সেই আকৃতিতে সৃজন করিয়াছেন। কোন পোকামাকড়ই মানবের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বরং তোমরা যেমন তোমাদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছ, তদ্রূপ প্রত্যেক প্রাণীই তাহার নিজের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কারণ, সৃষ্টির প্রারম্ভে তোমার এমন কোন সম্পর্ক বা যোগ্যতা ছিল না যাহার দরুন তুমি সৃষ্ট হওয়ার দাবি করিতে পারিতে। অপর কোন বস্তু বা প্রাণীরও তদ্রূপ কোন দাবি ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার করুণা-সাগর অতল অসীম। এই সমুদ্রে তুমিও ডুবিয়া রহিয়াছ এবং পিপীলিকা, মক্ষিকা, হস্তী, মোরগ ইত্যাদি সকলেই ডুবিয়া আছে। তন্মধ্যে অপূর্ণটিকে পূর্ণটির জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছে। বিশ্বে সকল সৃষ্টির মধ্যে

মানুষ সর্বাধিক পূর্ণ। সুতরাং ইচ্ছায় হউক কি অনিচ্ছায় হউক, অধিকাংশ বস্তু মানুষের জন্য উৎসৃষ্ট রহিয়াছে। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে এবং সমুদ্রের অতল তলে এমন অনেক পদার্থ আছে যাহা একেবারে মানুষের অধিকারের বাহিরে। কিন্তু তৎসমুদয়ের বাহ্য আকৃতি এবং আভ্যন্তরিক গঠনের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলার তদ্রূপ করুণাই পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের নির্মাণে আল্লাহ্ তা'আলা যে কি অপরিসীম শিল্প-নৈপুণ্য ও কারুকার্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে মানব শক্তি একেবারে শ্রান্ত এবং অক্ষম হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সমুদ্রে সন্তরণ করিতে যাইয়া জ্ঞানিগণ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ-সকলের বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তৃত।

উল্লিখিত কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য এই–তোমরা নিজদিগকে জগতে এইরূপ সর্বপ্রধান বলিয়া ভাবিও না যাহাতে অন্যান্য সকলই তোমাদের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে থাক এবং যে-জিনিসে তোমাদের কোন উপকার নাই, ইহা সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ কর—"আল্লাহ্ কেন সৃজন করিলেন? ইহার সৃষ্টির পশ্চাতে ত কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই।" যখন তুমি অবগত হইয়াছ যে, পিপীলিকা তোমার জন্য সৃষ্ট নহে, তখন ইহাও জানিয়া রাখ যে, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ ইত্যাদি কিছুই তোমার জন্য সৃষ্ট নহে। যদিও ঐরূপ বহু বস্তু হইতে তুমি উপকার পাইয়া থাক, তথাপি তৎসমুদয় তোমার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। যেমন মক্ষিকা হইতে তোমরা উপকার পাইয়া থাক, তথাপি ইহা তোমাদের জন্য সৃষ্ট নহে। মক্ষিকাকে পচাগলিত দুর্গন্ধময় পদার্থ খাইয়া ফেলিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে যেন দুর্গন্ধ হ্রাস পায়। তদ্রূপ মক্ষিকা কসাই হইতে উপকার পাইয়া থাকে; তবুও কসাইকে মক্ষিকার জন্য সৃজন করা হয় নাই। তোমরা মনে কর, তোমাদের জন্য সূর্য প্রত্যহ উদিত হয়। মাছি কসাইর দোকান হইতে রক্ত ও আবর্জনাদি যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পাইবে, এইজন্য কসাই দোকান খুলে, এই ধারণা এবং তোমাদের জন্য সূর্য প্রত্যহ আকাশে উঠে এই বিবেচনা উভয়টিই সমান ভ্রান্তিমূলক। যদিও কসাইর দোকানের অনাবশ্যক বস্তু মাছির জীবিকা এবং ইহার জীবন ধারণের উপায়, তথাপি কসাই তাহার নিজ কাজে লিপ্ত থাকে এবং মাছি কি করিতেছে, সেইদিকে মোটেই খেয়াল করে না। (কারণ, মাছির জন্য সে দোকান খুলে নাই; তাহার দোকান খোলার অন্য উদ্দেশ্য আছে।) তদ্রূপ সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনার্থ গগনমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। সে ভ্রমেও তোমাদের কথা মনে করে না। অবশ্য ইহা ঠিক

যে, সূর্যের আলোকে তোমাদের নয়নে দৃষ্টিক্ষমতা জন্মে এবং ইহারই উত্তাপে অতিরিক্ত অংশে মৃত্তিকা নাতিশীতোষ্ণ হইয়া থাকে; আর মৃত্তিকার এই নাতিশীতোষ্ণতার দরুনই বীজ হইতে অঙ্কুর, বৃক্ষ, পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হয় যাহা হইতে তোমরা আহার্য পাইয়া থাক।

উপরিউক্ত কথাগুলি যদি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পার তবেই যে-সকল বস্তুর সহিত তোমাদের কোন সংস্রব নাই, শুক্রের অর্থ বর্ণনাকালে তৎসমুদয়ের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের উল্লিখিত আলোচনা সার্থক হইবে।

যে-সকল বস্তুর সহিত মানবের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, সমস্তের কথা বলাই অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম–চক্ষু। চক্ষু দুটি কাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে–(১) ইহার সাহায্যে তুমি স্বীয় অভাব মোচনের পথ অবগত হইতে পার; (২) চক্ষুর সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্য শিল্পনৈপূণ্য ও বিচিত্র কারুকার্য পর্যবেক্ষণপূর্বক তাঁহার পরিচয় ও শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হইতে পার। চক্ষু দ্বারা কোন গায়র-মুহার্‌রামের (যাহার সহিত জীবনে কখনও বিবাহ দুরস্ত এমন নারীর) প্রতি দর্শন করিলে, চক্ষু যে আল্লাহ্-প্রদত্ত একটি নি'আমত, ইহার অকৃতজ্ঞতা করা হইবে। আবার ভাবিয়া দেখ, সূর্যের আলোক ব্যতীত তুমি দেখিতে পাও না এবং আকাশ-পৃথিবীও সূর্য ব্যতীত সম্ভবপর নহে। কেননা, সূর্য আছে বলিয়াই দিবারাত্র সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব, গায়র-মুহার্‌রামের প্রতি দর্শন করিলে শুধু যে চক্ষু ও সূর্যরূপ সম্পদেরই অকৃতজ্ঞতা হইল তাহাই নাহে, বরং তৎসঙ্গে ভূমণ্ডল এবং গগনমণ্ডল সমস্ত সম্পদেরই অকৃতজ্ঞতা করা হইল। একজনই হাদীস শরীফে উক্ত আছে–"যে ব্যক্তি পাপ করে, আকাশ-পৃথিবী তাহার লা'নত করে" দ্বিতীয়–হস্ত। হস্তের সাহায্যে তুমি নিজের কাজ করিবে, আহার করিবে, অপবিত্রতা দূর করিবে ইত্যাদি কার্যের জন্য আল্লাহ তা'আলা হস্ত দান করিয়াছেন। হস্ত দ্বারা পাপ করিলে হস্তরূপ সম্পদের অকৃতজ্ঞতা হইবে। এমনকি ডান হাত দ্বারা যদি এস্তেঞ্জা কর এবং বাম হাত দ্বারা কুরআন শরীফ ধর তবুও নি'আমতের নাশুক্‌রী হইবে। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়বিচার পছন্দ করেন এবং উত্তমের জন্য উত্তম ও অধমের জন্য অধম ব্যবহার করিলে ন্যায়বিচার করা হয়। কিন্তু ডান হস্তে এস্তেঞ্জা ও বাম হস্তে কুরআন শরীফ ধরিলে তুমি আল্লাহ তা'আলার যাহা প্রিয়, তাহার বিপরীত কাজ করিলে। দুই হস্তের মধ্যে অধিকাংশ লোকের একটি হস্তকে অধিক বলবান

করিয়া সৃজন করা হইয়াছে এবং ইহাই (অর্থাৎ ডান হস্ত) উত্তম। আবার মানবের কাজও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত– কতকগুলি উত্তম, আর কতকগুলি অধম। যে সকল কাজ উত্তম তাহা ডান হাতে এবং অধমগুলি বাম হাতে করা উচিত। তাহা হইলেই সুবিচার করা হইবে। অন্যথায় পশুদের ন্যায় অজ্ঞানতা ও অবিচারের কাজ হইবে। কেবলার দিকে থুথু ফেলিলে কেবলা ও অপর সকল দিকের অকৃতজ্ঞতা হয়। কারণ, মর্যাদায় সকর দিক সমান নহে। তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি দিককে গৌরববান্বিত করিয়াছেন, যাহাতে ইবাদতকালে সেই দিকে মুখ করিলে তোমরা শান্তি ও আরাম লাভ কর এবং সেই গৌরবান্বিত দিকে যে-গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে ইহাকে স্বীয় নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ কা'বা শরীফ। ইহাকে বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র গৃহ বলে।)

পক্ষান্তরে তোমাদের জন্য অধম কাজও আছে, যেমন পায়খানায় যাওয়া, থুথু ফেলা ইত্যাদি এবং উত্তম কাজও আছে, যথা, ওযু করা, নামায পড়া প্রভৃতি। এই উভয় প্রকারের কাজ সমান ভাবিয়া করিলে পশুতুল্য জীবন যাপন করা হইবে এবং বুদ্ধিরূপ অমূল্য সম্পদ যাহা হইতে সুবিচার ও কর্ম-কৌশল পাওয়া যায় তাহার এবং কেবলার হক নষ্ট করা হইবে। এইরূপে বিনা কারণে বৃক্ষের শাখা বা কলি ছিন্ন করিলে, হস্ত এবং বৃক্ষ উভয়েরই অপব্যবহার হইবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা শাখা-প্রশাখা, শিরা-উপশিরা বৃক্ষদেহের পোষণোপ-যোগী আহার্য গ্রহণের জন্য সৃজন করিয়াছেন এবং বৃক্ষের আহার্য-গ্রহণের ক্ষমতা ও অপরাপর শক্তি এইজন্য পয়দা করা হইয়াছে যে, ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হইবে। তুমি ডাকাতি করিয়া বৃক্ষের শাখা-পল্লব ছিন্ন করিয়া ফেলিলে অকৃতজ্ঞতা হইল। কিন্তু তোমার পূর্ণতার জন্য ইহার প্রয়োজন হইলে বৃক্ষের পূর্ণতাকে তোমার পূর্ণতার উদ্দেশ্যে বিসর্জন দিতে হইবে। কারণ, অপূর্ণের পক্ষে পূর্ণের জন্য সমর্পিত হওয়াও ন্যায়বিচার। তোমার আবশ্যক হইলেও যদি অপর ব্যক্তির অধিকারভুক্ত বৃক্ষ হইতে শাখা-পল্লব ছিড়িয়া লও তথাপি অকৃতজ্ঞতা হইবে। কেননা বৃক্ষ যাহার অধিকারে আছে সর্বাগ্রে তাহার অভাব মোচন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

বাস্তবপক্ষে কোন জিনিসই মানুষের অধিকারে নহে। সমস্ত দুনিয়া একটি বিছানো দস্তরখানাস্বরূপ এবং দুনিয়ার সম্পদসমূহ ইহার উপর স্থাপিত আহার্য সামগ্রীতুল্য। আল্লাহ্‌র বন্দা মানবগণ যেন এই দস্তরখানে তাঁহারই

মেহমানস্বরূপ খাইতে বসিয়াছে; তাহাদের কেহই দস্তরখানে স্থাপিত কোন বস্তুর মালিক নহে। কিন্তু প্রতিটি লুকমা সকল মেহমানের জন্য যথেষ্ট নহে; সুতরাং যে-ব্যক্তি যে-লুকমা হাতে তুলিয়া লইয়াছে বা মুখ দিয়াছে, তাহা কাড়িয়া লওয়ার অধিকার অপর কাহারও নাই। মানুষ কেবল এতটুকু দ্রব্যেরই অধিকারী। যেখানে অন্য মেহ্মানের হাত পৌঁছিতে না পারে, এমন স্থানে খাদ্যদ্রব্য সরাইয়া রাখিয়া দেওয়ার অধিকার যেমন কোন মেহমানের নাই, তদ্রূপ অপর অভাবগ্রস্তকে বঞ্চিত করিয়া আবশ্যকের অধিক ধন সঞ্চিত করা এবং ধনাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখার অধিকার কাহারও নাই কিন্তু প্রকাশ্য ফত্ওয়া মতে এইরূপ কোন আদেশ নাই। কারণ, কি পরিমাণ ধনে একজনের অভাব মোচন হইতে পারে, তাহা জানা যায় না। অভাব মোচনের পর উদ্বৃত্ত ধনে কাহারও অধিকার নাই, এই রহস্য উদঘাটন করিয়া দিলে একে অপরের ধন কাড়িয়া লইবে এবং বলিবে–"অমুকের এই ধনের আবশ্যকতা নাই।" প্রয়োজনের অনুরোধে তদ্রূপ বিধান পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হেকমতের বিপরীত; কেননা ধন জমাইয়া আটকাইয়া রাখা নিষেধ।

ধনসম্পদের মধ্যে বিশেষভাবে খাদ্যশস্যাদি গোলাজাত করিয়া রাখা নিষিদ্ধ। কারণ ইহাই মানুষের জীবনধারণের উপায়। উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে যে-ব্যক্তি খাদ্যশস্য গোলাজাত করিয়া রাখে, সে আল্লাহ্র লা'নতে নিপতিত হইবে। যে-ব্যবসায়ী খাদ্যশস্য ধার দিয়া তদ্বিনিময়ে সুদরূপে দুইগুণ, দেড়গুণ বা আসলের অতিরিক্ত শস্য আদায় করে, সেইব্যক্তিও আল্লাহ্র অভিশাপগ্রস্ত। কেননা খাদ্যশস্য মানবের আহার্যবস্তু। অতএব খাদ্যশস্যের ব্যবসা করিতে যাইয়া ইহা গোলাজাত করিয়া ফেলিলে অভাবগ্রস্ত লোকদের নিকট ইহা শীঘ্র পৌঁছিতে পারে না।

স্বর্ণ-রৌপ্য আবদ্ধ রাখাও হারাম। কারণ, দুইটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণ-রৌপ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। **প্রথম উদ্দেশ্য**–ধনের মূল্য নির্ণয়। কয়জন গোলামের বিনিময়ে একটি অশ্ব পাওয়া যায় বা একজন গোলামের পরিবর্তে কতগুলি বস্ত্র খরিদ করা চলে, ইহা প্রথমে কেহই স্থির করিতে পারে না। এবংবিধ দ্রব্যাদির পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় সংসার; নিত্য প্রয়োজনীয়। অতএব যাহার সাহায্যে সমস্ত জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা যায়, এমন একটি দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া পড়ে। আল্লাহ তা'আলা এই মূল্য-নির্ণয় কার্য নির্বাহের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যকে বিচারকরূপে সৃষ্টি-করিয়াছেন। যে-ব্যক্তি এই স্বর্ণ-রৌপ্যকে

জমাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে যেন মুসলমানদের বিচারককে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। আর যে-ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্যের পানপাত্র প্রস্তুত করে, সে যেন মুসলমানের বিচারককে বেহারা ও জোলার কাজ করিতে আদেশ দিল। কারণ, পানি হেফাযতে রাখিবার জন্যই পানিপাত্রের আবশ্যক এবং মাটি ও তামা দ্বারাও এই কাজ চলিতে পারে। **দ্বিতীয় উদ্দেশ্য**–স্বর্ণ-রৌপ্য মূল্যবান দুর্লভ বস্তু। ইহাদের বিনিময়ে যে-কোন পদার্থ পাওয়া যায় এবং সকলেই উহা পাইতে ভালবাসে। কারণ, যাহার নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য থাকে, সে সব কিছু করিতে পারে। কাহারও নিকট হয়ত বস্ত্র আছে, কিন্তু তাহার খাদ্যের আবশ্যক অথবা তাহার নিকট খাদ্যদ্রব্য আছে, কিন্তু তাহার হয়ত বস্ত্রের আবশ্যক অথবা যাহার নিকট খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহার হয়ত বস্ত্রের প্রয়োজনই নাই বা বস্ত্রের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবে না। ক্রয়-বিক্রয়ে এই সকর অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণ-রৌপ্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সকলের জন্য লোভনীয় করিয়াছেন। এই কৌশলেই দুনিয়াতে ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

বস্তুত স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং কোন অভাব মোচনের যোগ্য নহে। (কেননা খাদ্যরূপে উহা ভক্ষণ করা যায় না, বস্ত্ররূপে পরিধান করা চলে না।) মোটের উপর কথা এই যে, উহার বিনিময়ে অভাব মোচনের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এমতাবস্থায় যদি কেহ লাভের উদ্দেশ্যে স্বর্ণের এবং রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার খোলে তবে উহারা আবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের সুবিধার যে উদ্দেশ্যে এই মূল্যবান ধাতু দুইটি সৃষ্টি করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য রহিত হইয়া গেল। (তাই স্বর্ণ-রৌপ্যের তদ্রূপ কারবার শরীয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে।) সুতরাং শরীয়তের কোন বিধানকে উদ্দেশ্যহীন ও অযৌক্তিক বলিয়া কখনও মনে করা সঙ্গত নহে। বরং ইহার প্রত্যেকটি বিধান যেমন হওয়া উচিত ছিল তদ্রূপই হইয়াছে। তবে কতকগুলি বিষয়ের উদ্দেশ্য এত সূক্ষ্ম যে পয়গম্বরগণ ব্যতীত অন্য উহা বুঝিতে পারে না। আবার কতকগুলি উদ্দেশ্য এমন যে, শ্রেষ্ঠ পরিপক্ক আলিমগণ ব্যতীত অপর লোকে উহা জানিতে পারে না। অপরিপক্ক আলিমগণ পরিপক্ক আলিমগণের অনুসরণ করে এবং তাহারা প্রায় সাধারণ লোকেরই তুল্য।

আলিমগণ ঐসকল বিষয়ের উদ্দেশ্য অবগত হইলে সাধারণ লোকের নিকট যাহা মকরূহ তাহাকে তাঁহারা হারাম বলিয়া মনে করেন। যেমন, এক বুযুর্গ

ভুলক্রমে প্রথমে স্বীয় বাম পদে জুতা পরিধান করিলেন। তৎপর এই ভুল ধরা পড়িলে উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি কয়েক বস্তা গম গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। সাধারণ লোক বিনা কারণে কোন বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিলে, কেবলার দিকে থুথু ফেলিলে বা বাম হাতে কুরআন শরীফ ধরিলে আমরা তত আপত্তি করি না, যেমন বিশিষ্ট লোকের বেলায় করিয়া থাকি। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা এই প্রকার বেআদবী করে সৎস্বভাবে পূর্ণতা লাভ করে নাই বলিয়াই তাহারা তদ্রূপ করিয়া থাকে। কেননা তাহারা প্রায় পশুতুল্য এবং ভালমন্দ ততটা বুঝিতে অক্ষম। আল্লাহ তা'আলার কোন্ কার্যে কি উদ্দেশ্য রহিয়াছে ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে না।

যে-সকল মূর্খ বড় বড় গুনাহ্র কাজ করে সামান্য ত্রুটির জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করা বৃথা। যদি কোন মূর্খ ব্যক্তি একজন স্বাধীন লোককে ধরিয়া আনিয়া ঠিক জুম'আর নামাযের আযানের সময় বিক্রয় করে, তবে আযানের সময় বিক্রয় মকরূহ বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ, সেই সময়ে ক্রয়-বিক্রয় মকরূহ হইলেও একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া বিক্রয় করা তদপেক্ষা গুরুতর পাপ। আবার যে ব্যক্তি মসজিদের মেহরাবের মধ্যে পশ্চিম দিকে পিঠ দিয়া পায়খানা করিয়াছে, তাহাকে পশ্চিম দিকে পিঠ দিয়া পায়খানা করিয়াছে বলিয়া তিরস্কার করা বৃথা। কারণ মসজিদে পায়খানা করার পাপ, পশ্চিম দিকে পিঠ করিয়া পায়খানা করার পাপ অপেক্ষা অনেক গুরুতর। এইজন্যই জনসাধারণের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করা হয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্যেই প্রকাশ্য ফত্ওয়ার আদেশগুলি নিতান্ত সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরকালের পথের পথিকের পক্ষে প্রকাশ্য ফতওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বরং সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করা উচিত। তাহা হইলে ন্যায়বিচার ও জ্ঞানে ফিরিশতাদের প্রায় সমতুল হওয়া যায়। অন্যথায় জনসাধারণের মত কর্তব্য কার্যে শিথিলতা অবলম্বন করিলে মানুষ পশুর শ্রেণীতেই থাকিয়া যায়।

নি'আমতের হাকীকত

হিতাহিত বস্তুর শ্রেণী বিভাগ—মানুষের দিক হইতে চিন্তা করিলে আল্লাহ্র সমুদয় সৃষ্ট বস্তু চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। **প্রথম শ্রেণী**—যাহা ইহপরকালে হিতকর; যেমন—ইলম ও সৎস্বভাব। বাস্তবপক্ষে দুনিয়াতে এই দুইটিই সম্পদ। **দ্বিতীয় শ্রেণী**—যাহা উভয় জগতে অনিষ্টকর; যেমন—মন্দ স্বভাব ও অজ্ঞতা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইটিই মানবের বিপদ। **তৃতীয় শ্রেণী**—যাহা ইহকালে আরাম দেয়; কিন্তু পরকালে কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। দুনিয়ার ধনৈশ্বর্যের আধিক্য এবং ইহা উপভোগে মত্ত হওয়া, এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মূর্খগণ এইরূপ ধনৈশ্বর্যের উপভোগকে নি'আমত মনে করে; কিন্তু জ্ঞানী ও আরিফ (চক্ষুষ্মান) ব্যক্তি উহাকে বিপদ জ্ঞান করে। ইহার উদাহরণ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সম্মুখে বিষমিশ্রিত মধুতুল্য। সেই ব্যক্তি মূর্খ হইলে এই মধুকে বিষমিশ্রিত জ্ঞান না করিয়া লোভ-নীয় দ্রব্য বলিয়া মনে করিবে; কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাকে বিনাশের কারণ বলিয়া জানিবে। **চতুর্থ শ্রেণী**— যাহা এ-জগতে দুঃখ-কষ্ট প্রদান করে বটে কিন্তু পরকালে ইহার কারণে আরাম ও আনন্দ লাভ হয়। রিয়াযত ও মুজাহাদা অর্থাৎ সদ্গুণ অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আরিফগণ উহাকে বুদ্ধিমান রোগীর নিকট তিক্ত ঔষধস্বরূপ নি'আমত বলিয়া মনে করেন; কিন্তু মূর্খেরা উহাকে বিপদ বলিয়া জানে।

মঙ্গলামঙ্গলের পরিচয়—দুনিয়ার অধিকাংশ বস্তুতে মঙ্গল ও অমঙ্গল বিজড়িত রহিয়াছে। কিন্তু যে-বস্তুতে ক্ষতি অপেক্ষা লাভ অধিক, ইহাই নি'আমত (সম্পদ)। এই লাভ বা ক্ষতির অবস্থা লোকের অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। অভাব মোচনের পরিমিত ধনে ক্ষতি অপেক্ষা অধিক মঙ্গল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন অধিকাংশ লোকের পক্ষে মঙ্গল অপেক্ষা অধিক অমঙ্গলের কারণ হইয়া পড়ে। অল্প ধনও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

কেননা, ইহা তাহার মনে লোভ জন্মাইয়া দেয়। সামান্য ধনও তাহার না থাকিলে সে লোভ ও লালসার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। আবার এমন কামিল লোকও আছেন যে, ধনৈশ্বর্যও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তি অভাবের সময় অভাবগ্রস্তদিগকে স্বীয় ধন বিতরণ করিয়া দিয়া থাকেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, একই বস্তু অবস্থা বিশেষে একজনের জন্য নি'আমত; কিন্তু অপরের জন্য ইহাই বিপদস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

হিতাহিতের মাত্রা—লোকে যে-বস্তুকে হিতকর বলিয়া জানে, ইহা তিন প্রকারের হইতে পারে; যথা—বস্তুটি স্বতই হিতকর অথবা বর্তমানে আনন্দদায়ক কিংবা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক। আবার যে বস্তুকে লোকে মন্দ জানে তাহারও তিনটি অবস্থা; যথা ঃ– বস্তুটি বর্তমানে অপ্রিয়, ভবিষ্যতে ক্ষতিকর বা ইহা স্বয়ং মন্দ।

যে-বস্তুর মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি অবস্থা একত্রে পাওয়া যায় অর্থাৎ বর্তমানে যাহা আনন্দদায়ক, ভবিষ্যতে হিতকর এবং স্বয়ং বস্তুটি মঙ্গলজনক, তাহাই অবিমিশ্র কল্যাণজনক পদার্থ। এরূপ পদার্থ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার বিপরীত অজ্ঞানতা অবিমিশ্র মন্দ, ইহা বর্তমানে অপ্রিয়, ভবিষ্যতে ক্ষতিকর এবং স্বয়ং বস্তুটিও মন্দ।

অবগত হও, ইলম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হিতকর জিনিস আর নাই। তবে যাহার হৃদয়ে কোন প্রকার রোগ নাই, তাহার জন্যই ইল্ম সর্বোৎকৃষ্ট। অজ্ঞানতা বর্তমানে কষ্টদায়ক ও অপ্রিয়। কারণ যে-ব্যক্তি কোন বিষয়ে অজ্ঞাত, অথচ সে জানিবার ইচ্ছা করে, এমতাবস্থায় সে স্বীয় অজ্ঞানতার যাতনায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অজ্ঞানতা অনিষ্টকর। কিন্তু ইহা বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন অনিষ্ট করে না, কেবল অন্তরে কদর্যতা সৃষ্টি করে; অর্থাৎ অজ্ঞানতা হৃদয়ের আকার নিতান্ত কুৎসিত করিয়া তুলে। আর বাহির-শরীরের ক্ষতি অপেক্ষা আত্মার আভ্যন্তরিক ক্ষতি অধিক অনিষ্টকর।

আবার কোন কোন কাজ মঙ্গলজনক; অথচ উহা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়; যেমন সমস্ত হস্ত অকর্মণ্য হইয়া যাওয়ার ভয়ে কেবল পচনশীল ক্ষতযুক্ত আঙ্গুল কাটিয়া ফেলা। এমন কতকগুলি বিষয়ও আছে, যাহা এক হিসাবে মঙ্গলজনক, অথচ অন্য হিসাবে অনিষ্টকর। যেমন, মাল-বোঝাই নৌকা ডুবিবার উপক্রম হইলে জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে মাল বাহির করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া।

আনন্দের শ্রেণী বিভাগ—লোকে সাধারণত বলিয়া থাকে যাহা ভাল লাগে, যাহা হইতে আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই নি'আমত। কিন্তু এ-কথা ঠিক নহে। বরং সুখ ও আনন্দের তিনটি শ্রেণী আছে। **প্রথম শ্রেণী**—এই শ্রেণীর আনন্দ নিতান্ত জঘন্য। পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগের আনন্দ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অধিকাংশ লোক এই প্রকার কার্যকে আনন্দদায়ক মনে করিয়া উহাতে লিপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা দুনিয়াতে যে সকল কাজ করে তৎসমুদয় কেবল এই শ্রেণীর আনন্দ লাভের জন্যই করিয়া থাকে। এই আনন্দ যে নিতান্ত জঘন্য, ইহার প্রমাণ এই যে, সমস্ত পশুপক্ষী ইতর জন্তুও উহা উপভোগে সমান অধিকারী। বরং এ-বিষয়ে ইতর জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক বাড়িয়া গিয়াছে। কেননা ইহারা মানুষ অপেক্ষা অধিক আহার ও যৌন-সম্ভোগ করে। এমন কি মাছি পিপীলিকা এবং কীটপতঙ্গও এ-শ্রেণীর আনন্দে মানুষের সমান অধিকারী।

এতএব যে-ব্যক্তি একমাত্র পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগে নিজকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, সে শুধু নিকৃষ্ট ইতর প্রাণীর ন্যায় নিকৃষ্ট আনন্দ উপভোগের জন্যই বাঁচিয়া থাকে। **দ্বিতীয় শ্রেণী**— অপরের উপর প্রাধান্য ও নেতৃত্বের আনন্দ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তেজনা ও ক্রোধের পরিতৃপ্তিতে এই আনন্দ লাভ হয়। এই প্রকার আনন্দ, পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগজনিত আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও হীন ও জঘন্য আনন্দের মধ্যে পরিগণিত। কারণ ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তুও এরূপ আনন্দের অধিকারী; ইহাদেরও অপরের উপর প্রাধান্য স্থাপন এবং আক্রমণের লোভ জন্মিয়া থাকে। **তৃতীয় শ্রেণী**—ইল্‌ম ও হিক্‌মত (সূক্ষ্ম তত্ত্ব), আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান এবং তাঁহার সৃষ্টির বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের জ্ঞান লাভজনিত আনন্দ। এই শ্রেণীর আনন্দ উপভোগের অধিকার সাধারণ মানুষের নাই; ফিরিশ্‌তাগণ ইহা উপভোগ করিয়া থাকেন। যে-ব্যক্তি এই শ্রেণীর আনন্দ লাভ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারে না এবং তিনিই কামিল (সিদ্ধপুরুষ)।

যে-ব্যক্তি ইল্‌ম হিক্‌মত, আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান এবং তাঁহার বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের কোনটিতেই আনন্দ পায় না, সে অসম্পূর্ণ ও তাহার হৃদয় কঠিন রোগে আক্রান্ত; সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অধিকাংশ মুসলমান প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর আনন্দে লিপ্ত; অথচ তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর বস্তুতেও আনন্দ লাভ করে। প্রতিপত্তি লাভের আনন্দ এবং কাম-বাসনা চরিতার্থ করার সুখও তাহারা পাইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞানের আনন্দ যাহার প্রবল হইয়া উঠে, তাহার অপর সকল প্রকার আনন্দ দুর্বল ও লুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ ব্যক্তি কামিল লোকের শ্রেণীর নিকটবর্তী। পক্ষান্তরে উপরিউক্ত প্রথম দুই শ্রেণীর আনন্দ যাহার উপর প্রবল এবং তৃতীয় শ্রেণীর আনন্দ যে অনায়াসে লাভ করিতে পারে না, অথচ শেষোক্ত আনন্দকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য সে চেষ্টা না করে, তবে সে-ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীর নিকটবর্তী। ইহাই পুণ্যের পাল্লা ভারী বা হালকা হওয়ার সারমর্ম।

নি'আমতের শ্রেণীবিভাগ

পরকালের সৌভাগ্য প্রকৃত নি'আমত— প্রকৃত নি'আমত পরকালের সৌভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা অপর নি'আমত লাভের উপকরণ নহে, বরং স্বয়ং মানুষের অভীষ্ঠ বস্তু। ইহার চারিটি ভাগ আছে। **প্রথম**—চিরস্থায়ী

জীবন, যাহার ধ্বংস নাই। **দ্বিতীয়**—অনন্ত সুখ, যাহার মধ্যে সুখ-দুঃখের লেশমাত্র নাই। **তৃতীয়**—ইল্‌ম ও কাশ্‌ফ (দিব্যদৃষ্ট) যাহা মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে একেবারে মুক্ত। **চতুর্থ**—পূর্ণ পরিতৃপ্তি, যাহাতে অভাব ও আকাঙ্ক্ষা নাই। এই চারিটির সারমর্ম হইল সর্বদা আল্লাহ্-দর্শনের আনন্দ উপভোগ করা এবং কখনও ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। ইহাই প্রকৃত নি'আমত।

পার্থিব বস্তু কখন নি'আমত—দুনিয়াতে যে-সকল বস্তুকে নি'আমত জ্ঞান করা হয় তৎসমুদয় আখিরাতের উপরিউক্ত নি'আমত লাভের উপকরণমাত্র। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন— اَلْعَيْشُ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ – অর্থাৎ "পরকারের সুখই প্রকৃত সুখ।" এই বাক্য তিনি একবার অপরিসীম কষ্ট ও কঠিন নিপীড়নে পড়িয়া বলিয়াছিলেন। দুনিয়ার কষ্ট যেন হৃদয়ে তীব্র যাতনা না দেয় এবং মনের শান্তি অক্ষুণ্ন থাকে, এই উদ্দেশ্যেই তখন তিনি উহা বলিয়াছিলেন। আর একবার ঠিক ঐ বাক্য তিনি পরম আনন্দের সময় বিদায় হজ্জে বলিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম তখন পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল; তিনি উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট ছিলেন; সমস্ত লোকের দৃষ্টি তাঁহার দিকে নিবদ্ধ ছিল এবং লোকে তাঁহার নিকট নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। ধর্মের পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া তিনি সেই কালেমা উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এবার ইহা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দুনিয়ার আনন্দের দিকে যেন মন নিবিষ্ট না হয়। এই সময় এক ব্যক্তি বলিলেন— "হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট পূর্ণ নি'আমত প্রার্থনা করিতেছি।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"পূর্ণ নি'আমত কাহাকে বলে তুমি জান কি?" সে ব্যক্তি জানে না বলিয়া স্বীকার করিল। তখন হযরত (সা) বলিলেন— "বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাই পূর্ণ নি'আমত।"

বাস্তবপক্ষে দুনিয়ার যে-সকল পদার্থ আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায় হয় না সেইগুলি প্রকৃত নি'আমত নহে।

আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপকরণ—আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপকরণ ষোলটি। তন্মধ্যে চারিটি মনের সহিত এবং চারিটি শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে; চারিটি শরীরের বাহিরের এবং অবশিষ্ট চারিটি ঐ বারটিকে একত্র সমাবেশ করিয়া থাকে।

মনের সহিত সম্পর্কিত উপকরণ—ইল্‌মে মুকাশাফাহ্ (দিব্য দর্শনজ্ঞান), ব্যবহারিক জ্ঞান, পবিত্রতা এবং ন্যায়বিচার, এই চারিটি মনের সহিত সম্পর্কিত। (১) আল্লাহ ও তাঁহার গুণাবলী, ফিরিশ্‌তা এবং পয়গম্বরগণের যথার্থ পরিচয় লাভকে এ-স্থলে ইল্‌মে মুকাশাফাহ্ বলা হইল (২) এই গ্রন্থের বিনাশন খণ্ডে ধর্মপথে যে-সকল সংকটময় স্থানের কথা বর্ণিত হইয়াছে; ইবাদত ও ব্যবহার খণ্ডে যে পাথেয়ের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে এবং অত্র পরিত্রাণ খণ্ডে ধর্মপথের মঞ্জিলসমূহ সম্বন্ধে যে-বর্ণনা চলিতেছে, তৎসমুদয় সম্যকরূপে উপলব্ধি করাকেই ব্যবহারিক জ্ঞান বলে। (৩) লোভ-লালসাদি, কুপ্রবৃত্তি ও ক্রোধের শক্তি চূর্ণ করিয়া দেওয়া এবং পূর্ণ সৎস্বভাব অর্জন করার নাম পবিত্রতা। (৪) ন্যায়বিচার একটি লোভ-লালসা কামাদি প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে না; কারণ এইরূপ করাও অনিষ্টকর। আবার এই প্রবৃত্তিসমূহের বশীভূত হইয়া সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবে না। কেননা প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে অবশেষে ইহা চরম অবাধ্য হইয়া উঠিবে। বরং সর্বদা সততা ও মিতাচারের তুলাদণ্ডে ওযন করিয়া চলিবে। যেমন আল্লাহ বলেন—

اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ - وَاَقِيْمُو الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ –

অর্থাৎ "তোমরা যেন পরিমাপ-কার্যে সীমা অতিক্রম না কর এবং ন্যায়ভাবে ওযন ঠিক কর, আর ওযনে কম করিও না।" (সূরা আর রাহমান, রুকূ ১, ২৭ পারা)

শরীরের সহিত সম্পর্কিত উপকরণ— শরীরের সহিত যে চারিটি নি'আমতের সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাদের সাহায্য ব্যতীত উপরিউক্ত মনের সহিত সম্পর্কিত উকরণসমূহ পূর্ণ হইতে পারে না। শরীরের সহিত সম্পর্কিত উপকরণসমূহ এই—স্বাস্থ্য, বল, সৌন্দর্য এবং দীর্ঘ পরমায়ু। পরকালের সৌভাগ্য অর্জনে স্বাস্থ্য, বল এবং দীর্ঘ পরমায়ুর আবশ্যকতা কাহারও অবিদিত নহে। কারণ, এই তিনটির অভাবে জ্ঞান, সৎকার্য, সৎস্বভাব এবং যে-সকল আন্তরিক গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু সৌন্দর্য এবং সুগঠনের আবশ্যকতা কম। তথাপি অধিকাংশ স্থলে সুন্দর

লোকের অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। ধন এবং প্রতিপত্তির প্রভাবে লোকে যেমন অপরের সাহায্য পায়, ভক্তিভাজন সুন্দর আকৃতির প্রভাবেও তদ্রূপ সাহায্য পাওয়া যায়। যাহা দুনিয়ার কাজে সাহায্য করে, তাহা আখিরাতের কাজেও সহায়ক হইয়া থাকে। কারণ, দুনিয়ার অভাব মোচন হইলে লোকে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া পরকারের কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে। দুনিয়া আখিরাতেরই শস্যক্ষেত্র। আবার বাহিরের সৌন্দর্য আন্তরিক সৎস্বভাবের পরিচায়ক। কেননা, শারীরিক সৌন্দর্য আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্যোতি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের উপর ইহা চমকিতে থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে শারীরিক সৌন্দর্যে সুশোভিত করেন, তিনি তাহার আন্তরিক স্বভাবও সুন্দর করিয়া দিয়া থাকেন। এইজন্যই বুযুর্গগণের উক্তি এই যে, মন্দ লোক স্বীয় কুস্বভাবের তুলনায় কখনই অধিক সুন্দর আকৃতি পাইতে পারে না। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"সুন্দর লোকের নিকট তোমার প্রয়োজনীয় বস্তু চাও।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"কোন স্থানে দূত পাঠাইতে হইলে উত্তম নাম-বিশিষ্ট ও সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট লোক পাঠাও।" ফকীহ্গণ বলেন– "ইল্ম, কুরআন শরীফ পাঠ এবং পরহেযগারী গুণে সকলেই সমান হইলে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সে-ই নামাযের ইমামতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।"

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, এ স্থলে সেই সৌন্দর্যের কথা বলা হইতেছে না যাহা দর্শন করিলে কামভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে। কেননা, ইহা রমণীদের গুণবিশেষ। বরং যাহার দেহ উন্নত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সুসমঞ্জস ও সুগঠিত, দেখিলে দর্শকের মনে ভক্তির উদ্রেক হয়, বিরক্তি জন্মে না, এমন লোককেই সুন্দর বলা হইয়াছে।

শরীরের বাহিরের উপকরণ–শরীরের বাহিরে অথচ শরীরের পক্ষে দরকারী চারটি সম্পদ পরকালের সৌভাগ্য অর্জনের উপকরণ। উহা এই– (১) ধন, (২) সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, (৩) স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং (৪) বংশমর্যাদা।

পরকালের কাজে এই কারণে ধনের আবশ্যকতা দেখা দেয় যে, ধনহীন দরিদ্র ব্যক্তিকে জীবিকা অর্জনে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতে হয়। সুতরাং জ্ঞানার্জন ও সৎকার্য সম্পাদনে সে যথেষ্ট সময় পায় না। অতএব অভাব মোচনের উপযোগী ধন ধর্মজীবনের একটি নি'আমত। সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকিলে সর্বদা লোকচক্ষে হীন ও তুচ্ছ থাকিতে হয় এবং শত্রুর

অনিষ্ট হইতেও নিরাপদে থাকা যায় না। এইজন্যই সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের আধিক্য বহু আপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"প্রত্যুষে শয্যাত্যগের সময় যদি শরীর সুস্থ, মন ভয়শূন্য এবং সেই দিনের আহারের সংস্থান থাকে, তবে যেন সমস্ত দুনিয়া তাহার হস্তগত হইয়াছে।" কিন্তু সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত এই অবস্থা লাভ করা যায় না। হযরত (সা) আরও বলেন ঃ

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلٰى تَقْوَى اللّٰهِ الْمَالُ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্র জন্য পরহেযগারীর পথে ধন কি উৎকৃষ্ট সহায়ক।"

স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি লোককে বহু কার্যে ব্যাপৃত হইতে অবসর দিয়া থাকে এবং জীবনে সহায়ক হয়। এইজন্যই পরিবারবর্গকে নি'আমত বলা হইয়াছে। পত্নী পুরুষকে অন্যায় কাম-প্রবৃত্তির আপদ হইতে নির্ভয় করিয়া দেয়। এইজন্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"নেককার স্ত্রী ধর্মকার্যে পুরুষের বড় সহায়ক হইয়া থাকে।" দুনিয়ার ধনদওলত জমা করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইলে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু জিজ্ঞাসা করিলেন–"আমরা তবে কোন্ ধন সঞ্চয় করিব?" রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন–"যিকিরকারী রসনা, কৃতজ্ঞ হৃদয় এবং ধর্মপরায়ণা স্ত্রী।"

সুসন্তান দুনিয়াতে মাতাপিতাকে বহু সৎকার্যে সাহায্য করিয়া থাকে এবং মাতাপিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাদের পাপ মোচনের জন্য দু'আ করেন। নেককার সন্তানসন্ততি পুরুষের জন্য হস্ত, পদ ও পাখাস্বরূপ। কেননা তাহাদের দ্বারা বহু জরুরী কাজ নির্বাহ হয়। ইহপরকালে এইরূপ উপকৃত হওয়া এক বড় নি'আমত। কিন্তু মাতাপিতা যখন সন্তানসন্ততির আপদ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং তাহাদের জন্য নিজেদের সকল শক্তি দুনিয়া অর্জনে অপচয় না করে, কেবল তখনই সন্তানসন্ততি নি'আমতরূপে পরিগণিত হয়।

বংশমর্যাদাও একটি নি'আমত। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিলে লোকে স্বভাবতই সম্মান প্রদর্শন করে। এই কারণেই সম্মানিত কুরাইশ বংশের জন্য নেতৃত্ব নির্ধারিত ছিল। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"পবিত্র স্থানে বীজ বপন কর এবং অপবিত্র আবর্জনা স্তূপে উদ্ভূত সবুজ

বৃক্ষ পরিত্যাগ কর।” লোকে জিজ্ঞাসা করিল–“হে “আল্লাহ্‌র রাসূল, আবর্জনা-স্তূপে উদ্ভূত সবুজ বৃক্ষ কি?” হযরত (সা) উত্তরে বলিলেন–“নিকৃষ্ট বংশসম্ভূতা সুন্দরী নারী।”

উচ্চবংশে এ-স্থলে সাংসারিক ধনৈশ্বর্যবান প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বড়লোকের বংশকে বুঝাইতেছে না; বরং ধর্মপরায়ণ পরহেযগার লোক ও আলিমগণের বংশকে বুঝাইতেছে। পূর্বপুরুষগণের স্বভাব-চরিত্র সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রবেশ করে এবং মূল ভাল হইলে শাখা-প্রশাখাও ভাল হইয়া থাকে। এইজন্যই ধর্মপরায়ণ লোকের বংশে জন্মলাভও এক বড় নি'আমত। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا – অর্থাৎ “আর তাহাদের উভয়ের পিতা সৎ ছিল।” (সূরা কাহাফ, ১০ রুকূ, ১৬ পারা)

উল্লিখিত উপকরণসমূহকে সমাবেশ করিবার উপকরণ– উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বারটি উপকরণ একত্র সমাবেশ করিবার জন্য আরও চারটি উপকরণ আবশ্যক। উহা–(১) সৎপথের সন্ধান (হিদায়েত), (২) সৎপথে চলার উৎসাহ (রুশ্‌দ); (৩) চেষ্টা (তাশদীদ) এবং (৪) সাহায্য (তাঈদ)। এই চারটিকে সমবেতভাবে তাওফীক বলে। উপরিউক্ত বারটি উপকরণ থাকিলেও তাওফীক ব্যতীত কোন ফলই হয় না। এ স্থলে ‘তাওফীক’ শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র বিধানের সহিত মানুষের ইচ্ছার মিল হওয়া। (অর্থাৎ মানবের ইচ্ছা ও আল্লাহ্‌র বিধান পরস্পর বিরোধী না হওয়া।) সৎ ও অসৎ উভয়টিতেই আল্লাহ্‌র বিধান ও মানুষের ইচ্ছা মিলিয়া যাইতে পারে, তথাপি ব্যবহারত সৎকার্যে পরস্পরের মিল হওয়াকেই তাওফীক বলে। চারটি বস্তুতে তাওফীক পূর্ণতা লাভ করে। যথা–

(১) হিদায়েত। সকলের জন্যই হিদায়েত নিতান্ত আবশ্যক। পরকালের সৌভাগ্যলোলুপ ব্যক্তিকে সবাগ্রে নিজের গন্তব্যপথের সন্ধান লইতে হইবে। কেননা, সুপথ না চিনিয়া বিপদকে সুপথ বলিয়া মনে করিলে লক্ষ্যস্থলে কখনও পৌঁছা যায় না। কাজেই পথের সন্ধান না পাইলে পাথেয় সংগ্রহ করা বৃথা। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা যে পথের সন্ধান ও পাথেয় দান করিয়াছেন, এই উভয় অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى –

অর্থাৎ “তিনিই আমাদের প্রভু যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহাদের স্ব স্ব আকৃতি দান করিয়াছেন, তৎপর সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন।” (সূরা তাহা, ২রুকূ, ১৬ পারা)। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى – অর্থাৎ “তিনিই আল্লাহ যিনি ঠিক ঠিক পরিমাণ অনুযায়ী সব কাজ করিয়াছেন; অনন্তর সৎপথ দেখাইয়াছেন।” (সূরা আ'লা, ১ রুকূ, ৩০ পারা)

হিদায়েতের তিনটি শ্রেণী আছে।

প্রথম শ্রেণী – ভালমন্দের পার্থক্য বুঝিতে পারা। আল্লাহ তা'আলা সকল বুদ্ধিমান লোককেই ভাল-মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। কেহ কেহ বুদ্ধিবলে ভালমন্দ চিনিতে পারে; আবার কেহ কেহ-বা পয়গম্বরগণের উপদেশক্রমে ভালমন্দ বুঝিয়া লইতে সমর্থ হয়। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ – “আর আমি তাহাকে দুইটি পথ দেখাইয়াছি।”

অর্থাৎ আমি মানবকে বুদ্ধি দ্বারা ভাল ও মন্দ, এই দুইটি পথ চিনিয়া লইবার ক্ষমতা দান করিয়াছি। (সূরা বালাদ, ১ রুকূ, ৩০ পরা)। কিন্তু নিম্ন আয়াতে বুদ্ধিবলে সৎপথে সন্ধান পাওয়ার কথা বর্ণিত হয় নাই; বরং পয়গম্বরগণের উপদেশক্রমে সৎপথ লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى –

অর্থাৎ “আর যে সামূদ জাতি ছিল, আমি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়া-ছিলাম। অনন্তর তাহারা পথ পাওয়া অপেক্ষা পথভ্রষ্ট থাকাকে পছন্দ করিল।” “সূরা হামীম সিজদা, ২ রুকূ, ২৪ পারা)

যাহারা পয়গম্বরগণের উপদেশ গ্রহণ করে নাই, তাহারা হিংসা ও অহঙ্কার অথবা সংসারের মোহে মুগ্ধ থাকার কারণেই আলিম ও পয়গম্বরগণের উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করে নাই। অন্যথায় সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সৎপথের সন্ধান লাভে সমর্থ।

দ্বিতীয় শ্রেণী–ইহা বিশেষ হিদায়েত। ধর্ম-বিষয়ে মুজাহাদা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা ক্রমশ লাভ হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় তত্ত্বের পথ মানবের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। মুজাহাদার (সৎস্বভাব অর্জনের নিমিত্ত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর সাধনার) ফলস্বরূপই এইরূপ হিদায়েত লাভ হইয়া

থাকে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا –

অর্থাৎ "যাহারা আমার রাস্তায় মুজাহাদা করিয়াছে, অবশ্যই আমি তাহাদিগকে হিদায়েত করিব।" (সূরা আন্‌কাবূত, ৭ রুকূ, ২১ পারা) এ-স্থলে আল্লাহ্ এ-কথা বলেন যে, কঠোর পরিশ্রম করিলে তিনি মানুষকে স্বীয় পথ দেখাইয়া থাকেন; ইহা বলেন নাই যে, মানুষ পরিশ্রম না করিলেও তিনি তাহাকে হিদায়েত করিয়া থাকেন। আল্লাহ এই সম্বন্ধে অন্যত্র বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى –

অর্থাৎ "যাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের হিদায়েত অধিক-মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।" (সূরা মুহাম্মদ, ২ রুকূ, ২৬ পারা)

তৃতীয় শ্রেণী–এই শ্রেণীর হিদায়েত অতীব অসাধারণ। নবূয়ত ও বিলায়েতের ঊর্ধ্বজগতে এই হিদায়েতের নূর সৃষ্ট হইয়া থাকে। (অর্থাৎ নবী ও খাস ওলীগণ এই হিদায়েত লাভ করিয়া থাকে।) এই পথ প্রদর্শন স্বয়ং আল্লাহ্‌র দিকে; তাঁহার পথের দিকে নহে। ইহা এমনভাবে হইয়া থাকে যে, নিজে নিজে এতটুকু পৌঁছিবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। এই প্রকার হিদায়েতই নিছক হিদায়েত, যেমন এই আয়াত হইতে বুঝা যায় ঃ

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى –

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), আপনি লোকদিগকে বলিয়া দিন যে, আল্লাহ্‌র হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত।" (সূরা বাকারাহ, ১৪ রুকূ, ১ পারা) এই হিদায়েতকে আল্লাহ্ জীবন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ

অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি মৃত ছিল আমি তাহাকে তৎপর জীবিত করিয়াছি (অর্থাৎ যে পথভ্রষ্ট ছিল আমি তাহাকে হিদায়েত করিয়াছি) এবং তাহার জন্য একটি নূর সৃজন করিয়াছি। ইহার প্রভাবে সে মানুষের মধ্যে চলাফেলা করে।" (সূরা আন্'আম, ১৫ রুকূ, ৮ পারা)

(২) **রুশ্‌দ**। সৎপথের সন্ধান মিলিলে ইহা অবলম্বনে চলার উৎসাহকে রুশ্‌দ বলে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ – অর্থাৎ "অবশ্যই আমি ইব্‌রাহীমকে (আ) প্রথম হইতেই রুশ্‌দ্ (সৎপথে চলিবার উৎসাহ) দান করিয়াছি।" (সূরা আম্বিয়া, ৫ রুকূ, ১৭ পারা) মনে কর, এক বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ধন রক্ষণাবেক্ষণের উপায় শিক্ষা করিল। এমতাবস্থায় সে যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও শিক্ষানুযায়ী কাজ না করে তবে তাহার পথপ্রাপ্তির উৎসাহ (রুশ্‌দ) আছে বলিয়া বলা যাইবে না। (ধনের হেফাযতের উপায় জানাকে বলে হিদায়েত, আর সেই উপায় অনুযায়ী ধনের হেফাযত করিবার ইচ্ছাকে বলে রুশ্‌দ।)

(৩) তাশ্‌দীদ। মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় শীঘ্র অভিষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শরীর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সহজে আনন্দের সহিত সঞ্চালন করাকে তাশ্‌দীদ বলে। সুতরাং মারিফাত (জ্ঞান) হিদায়েতের ফল, ইচ্ছা রুশ্‌দের ফল এবং শক্তি ও অঙ্গাদির সঞ্চালন তাশ্‌দীদের ফল।

(৪) তাঈদ (সাহায্য)। গায়েবী (অদৃশ্য) সাহায্যকে তাঈদ বলে। অঙ্গ সঞ্চালনের শক্তিকে প্রকাশ্যভাবে এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে অপ্রকাশ্যভাবে এই সাহায্য পাওয় যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ – অর্থাৎ "তাহাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি সাহায্য করিয়াছি।" (সূরা বাকারাহ্, ১১ রুকূ, ১ পারা)

ইসমত (পাপ হইতে রক্ষা করা) তাঈদের প্রায় সমঅর্থবোধক। মানবের অন্তরে এমন একটি অদৃশ্য শক্তির উদ্ভব হওয়াকে ইস্‌মত বলে যাহা তাহাকে পাপ কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখে। অবশ্য কোথা হইতে এই শক্তি উপস্থিত হয়, তাহা সে ভালরূপে অবগত নহে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ –

অর্থাৎ "অবশ্যই সেই স্ত্রীলোক (জুলাইখা) তাঁহার (হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের) প্রতি মন্দ ইচ্ছা করিয়াছিল এবং তিনিও (হযরত ইউসুফ আ) আল্লাহ্‌র প্রমাণ দেখিতে না পাইলে তাহার দিকে (মন্দ) ইচ্ছা করিতেন। (সূরা ইউসুফ, ৩ রুকূ, ১২ পারা)

উপরিউক্ত ষোল প্রকার সম্পদ পরকালের পাথেয়রূপে পরিগণিত; কিন্তু অন্যের সাহায্য ব্যতীত উহারা কোন হিত সাধন করিতে পারে না। অপরপক্ষে যে সকল বস্তুর সাহায্য আবশ্যক, ইহারাও একাকী সাহায্য করিতে পারে না; ইহাদেরও অপরের সাহায্য আবশ্যক। আবার এই শেষোক্ত বস্তুও অন্য পদার্থের সাহায্য ব্যতীত কোনই সাহায্য দিতে পারে না। এই প্রকারে এক বস্তুর জন্য অপর বস্তুর আবশ্যক। আবার ইহার জন্য অন্য বস্তু। এইরূপে যোগ-সাহায্যের একটি শিকল বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই শিকলের শেষ প্রান্ত অবশেষে ঘুরিয়া আসিয়া আল্লাহ্‌র অসীম কৌশল দর্শনে বিস্ময়াভিভূত ব্যক্তিগণের পথপ্রদর্শক, নিখিল বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচ্ছত্র সম্রাট, সকল কারণের আদি কারণ, সর্বব্যাপী আল্লাহ্ তা'আলার উপর গিয়ে পড়ে। যেরূপ কৌশলের সহিত এই আবশ্যকতার শিকল জোড় লাগানো হইয়াছে, উহার ব্যাখ্যা নিতান্ত বিস্তৃত। সুতরাং একটু আভাসমাত্র দিয়াই এ-স্থলে ইহা সমাপ্ত করা হইল।

সম্পদ ও বিপদে কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটির কারণ—দুইটি কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মানুষের ত্রুটি হইয়া থাকে।

প্রথম কারণ– আল্লাহ্‌র-প্রদত্ত নি'আমত (সম্পদ) সম্বন্ধে অজ্ঞতা। কেননা, আল্লাহ্‌র নি'আমত অসংখ্য ও অগণিত। যেমন আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا –

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ্‌র নি'আমত গণনা করিতে যাও তবে গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না।" (সূরা ইব্‌রাহীম, ৫ রুকূ, ১৩ পারা) আল্লাহ্-প্রদত্ত নি'আমতসমূহের মধ্যে যাহা মানবকে আহার্যরূপে দান করা হইয়াছে তাহার কিছু আলোচনা 'ইয়াহ্ইয়াউল্ উলূম' গ্রন্থে করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইবে যে আল্লাহ্‌র সমস্ত নি'আমতের পরিচয় লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এগুলির আলোচনার স্থান হইবে না।

দ্বিতীয় কারণ— আল্লাহ্‌র যে-সমস্ত নি'আমত সর্বব্যাপী এবং সকলেই অনায়াসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়া থাকে, তৎসমুদয়কে লোকে নি'আমত বলিয়া মনে করে না এবং তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। এই যে বায়ু যাহা জীবাত্মাকে সাহায্য করিতেছে এবং হৃদয়-কোটরে প্রবেশপূর্বক ইহার উষ্ণতার

তেজ খর্ব করিয়া সমতা বিধান করিতেছে, এক মুহূর্তের জন্য যদি তাহার অভাব হয় তবে মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না। অথচ মানুষ ইহাকে নি'আমত বলিয়াই মনে করিতেছে না। এইরূপ লক্ষ লক্ষ নি'আমত রহিয়াছে যাহাদিগকে নি'আমত বলিয়া লোকে কল্পনাও করে না। কোন ব্যক্তিকে যদি পূতিগন্ধময় কূপে বা উত্তপ্ত হাম্মামখানায় কিছুক্ষণের জন্য আবদ্ধ রাখা যায় অথবা তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবেই বায়ু কি অমূল্য পদার্থ, সে বুঝিতে পরিবে। যাহার চক্ষু উঠে নাই বা বিদীর্ণ হয় নাই, সে নীরোগ সুস্থ চক্ষুর শুক্রিয়া আদায় করে না। এইরূপ ব্যক্তিকে এমন দাসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যে, মার খায় নাই। কাজেই সে প্রহারের যন্ত্রণা বুঝিতে পারে না। কেননা, দাসের পৃষ্ঠে চাবুক না পড়িলে সে অবাধ্য ও কর্তব্যকর্মে শিথিল হইয়া পড়ে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়—আল্লাহ্-প্রদত্ত নি'আমতসমূহকে অন্তরের সহিত স্মরণ করাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়। 'ইয়াহ্ইয়াউল-উলূম' গ্রন্থে কতক নি'আমতের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত চিনিয়া লইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কেবল কামিল লোকদের কাজ। অপূর্ণ ও স্বল্পবুদ্ধি লোকের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ঃ– এইরূপ ব্যক্তি প্রত্যহ সরকারী হাসপাতাল, জেলখানা ও কবরস্থানে গমন করিবে। তাহা হইলে বালা-মুসীবতে নিপতিত লোকদের অবস্থা দেখিয়া সে নিজের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মূল্য বুঝিয়া হয়ত আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যাপৃত হইবে। কবরস্থানে যাইয়া মনে করিতে হইবে, মৃত লোকেরা আশা করিতেছে যে, যদি তাহাগিকে একদিনের জন্যও জীবিত করিয়া দুনিয়াতে পাঠানো হইত হবে তাহারা স্ব স্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষতিপূরণ করিবার সুযোগ পাইত। অথচ তাহাদিগকে এই অবকাশ দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু আমি কি নির্বোধ! জীবনের বহুদিন হাতে পাইয়াও ইহার মূল্য বুঝিতেছি না!

মানুষ বায়ু, সূর্য, চক্ষু ইত্যাদি সর্বজনমূলভ সাধারণ নি'আমতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। বরং কেবল ধন বা যাহা একমাত্র সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে উপভোগ করে তাহাকেই নি'আমত বলিয়া মনে করে। ইহা মানবের মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, নি'আমত সর্বব্যাপী সর্বজনসুলভ সাধারণ হওয়ার দরুন নি'আমতের শ্রেণী হইতে বহির্ভূত হয় না।

তৎপর চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, মানুষ যে-সমস্ত নি'আমত ব্যক্তিগতভাবে উপভোগ করে, ইহার সংখ্যাও কম নহে। মানুষ মাত্রেই মনে

করে, তাহার ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর কাহারও নাই এবং তাহার স্বভাবের ন্যায় সৎস্বভাব অপর কেহই লাভ করে নাই। এইজন্যই মানুষ অপরকে নিজের ন্যায় চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান মনে করে না। এমতাবস্থায় অপরের দোষ অনুসন্ধানে লিপ্ত না হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও সৎস্বভাবের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই তাহার কর্তব্য। আবার কেহই একেবারে দোষমুক্ত নহে; অপরে না জানিলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ দোষ সম্বন্ধে অবগত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দোষ গোপন রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ যদি মানবের দোষ প্রকাশ করিয়া দিতেন এবং যে সমস্ত মন্দ খেয়াল ও অসৎ চিন্তা তাহার হৃদয়ে উদিত হয়, উহা অপরকে জানিতে দিতেন, তবে অপরিসীম অপমানের কারণ হইত। আল্লাহ তা'আলা যে দোষ-ত্রুটি অন্যের চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, ইহা সকলের জন্যই এক বড় নি'আমত। তজ্জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

যে-সম্পদ পাওয়া যায় নাই, সর্বদা ইহার চিন্তা করা উচিত নহে। নতুবা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। বরং যে-সকল নি'আমত পাওয়ার তোমার কোন অধিকার ছিল না, উহা যে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক অযাচিতভাবে দান করিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই তোমার কর্তব্য। এক ব্যক্তি কোন বুযুর্গের নিকট যাইয়া স্বীয় দরিদ্রতা উল্লেখ্য করত দুঃখ প্রকাশ করিল। বুযুর্গ বলিলেন—"দশ হাজার টাকার বিনিময়ে তুমি কি তোমার চক্ষু বিদীর্ণ হইতে দিবে?" সেই ব্যক্তি বলিল"না।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমার হস্ত, পদ, কর্ণ নষ্ট করিয়া প্রত্যেকের পরিবর্তে দশ হাজার টাকা দিলে তুমি সম্মত আছ কি?" সে উত্তর দিল–"না" তিনি পুনরায় বলিলেন–"তোমার বুদ্ধির বিনিময়ে দশ হাজার টাকা পাইতে চাও কি?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল–"না।" অবশেষে বুযুর্গ বলিলেন–"তোমার নিকট অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকার ধন ত আছে; এমতাবস্থায় কেন দরিদ্রতার অভিযোগ করিতেছ?"

নিজের অবস্থার বিনিময়ে অপরের অবস্থা গ্রহণ করিতে বলিলে অধিকাংশ লোকেই ইহাতে সম্মত হইবে না। সুতরাং বুঝা যায় যে, একজনকে আল্লাহ্ যে-খাস্ নি'আমত দান করিয়াছেন, অন্যকে তাহা প্রদান করেন নাই। অবস্থা যদি ইহাই হয় তবে সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞ থাকাই আবশ্যক।

বিপদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ–বিপদাপদেও শুক্র করা উচিত। কারণ, কুফ্র ও গুনাহ ব্যতীত এমন কোন বিপদ নাই যাহা একেবারে মঙ্গলশূন্য। কিন্তু

তুমি ইহা জান না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মঙ্গল সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবগত আছে। বিপদাপদে পতিত হইলে পাঁচটি কারণের যে-কোন একটি কারণে তোমাকে অবশ্যই শুক্র করিতে হইবে।

প্রথম কারণ–দুনিয়ার কার্যে বিপদ হইলে ধর্মকার্যে বিপদ হয় নাই বলিয়া শুক্র করা আবশ্যক। এক ব্যক্তি হযরত সহল তস্তরীর (র) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল–"আমার গৃহে চোর প্রবেশ করত সমস্ত ধন চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন–"শয়তান তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তোমার ঈমান অপহরণ করিলে তুমি কি করিতে?" (অর্থাৎ তোমার ঈমান যে চুরি করে নাই তজ্জন্য শুক্র কর।)

দ্বিতীয় কারণ–যাহা অপেক্ষা কঠিন বিপদ বা রোগ হইতে পারে না, এমন কোন বিপদ বা রোগ নাই। অতএব কোন বিপদ বা রোগ উপস্থিত হইলে তদপেক্ষা কঠিন বিপদ বা রোগ যে হয় নাই, এইজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যে-ব্যক্তি হাজার বেত্রাঘাতের উপযুক্ত তাহাকে এক শত বেত্রাঘাত করিয়া মুক্তি দিলে দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। এক ব্যক্তি ভুলবশত একজন বুযুর্গের মাথার উপর এক টুকরি ছাই ফেলিয়া দিল। ইহাতে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন–"আমি আগুনের উপযুক্ত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার উপর মাত্র ছাই নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ইহা আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ।"

তৃতীয় কারণ–দুনিয়াতে মানুষের উপর যে সকর বিপদাপদ আসে, উহা পরকালের জন্য রাখিয়া দিলে পরে তাহাকে তজ্জন্য নিতান্ত কঠিন আযাব ভোগ করিতে হইত। সুতরাং দুনিয়ার সামান্য বিপদ ভোগ করিয়া আখিরাতের কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তি পাইলে কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা যাহার সহিত দুনিয়াতে কঠোরতা করিয়াছেন, আখিরাতে তাহার প্রতি কঠোরতা করা হইবে না।" বিপদে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কাজেই মানুষ নিষ্পাপ হইয়া গেলে পরকালে আবার তাহার আযাব কিসের? চিকিৎসক তোমাকে তিক্ত ঔষধ সেবক করাইলে ও তোমাকে অপারেশন করিলে উহাতে কষ্ট হইলেও তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, এই সামান্য কষ্ট স্বীকারের পরিবর্তে তুমি রোগের ভীষণ কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবে।

চতুর্থ কারণ–মানুষের ভাগ্যে যে-সকল বিপদ আসিবে, উহা সৃষ্টির প্রারম্ভেই অদৃষ্টলিপিতে লিখিত রহিয়াছে। এইগুলি অবশ্যই ঘটিবে। সুতরাং এক একটি বিপদ পার হইতে পারিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। হযরত শায়খ আবূ সাঈদ (র) গর্দভের পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া বলিলেন–"আলহাম্‌দুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"এ-স্থলে আল্লাহ্‌র প্রশংসাসূচক বাক্য বলার কারণ কি?" তিনি বলিলেন–"গর্দভপৃষ্ঠ হইতে পতিত হওয়ার বিপদ আমি পার হইয়া গেলাম" অর্থাৎ আমার ভাগ্যে এই বিপদ লিপিবদ্ধ ছিল এবং ইহা অবশ্যই সংঘটিত হইত। তাই ইহা নির্বিঘ্নে পার হইতে পারিলাম বলিয়া আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলাম।

পঞ্চম কারণ–ইহকালের বিপদে দ্বিবিধ কারণে পরকালের মঙ্গল হয়। প্রথমত সাংসারিক বিপদের বিনিময়ে যে অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ইহা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার মহব্বত সব পাপের মূল। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে ইহাই বেহেশ্‌তের ন্যায় মনোরম হইয়া উঠে এবং পরকালকে কারাগার বলিয়া মনে হয়। দুনিয়াতে যাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা বিপদ চাপাইয়া দিয়াছে, তাহারা সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে; দুনিয়াকে কারাগারতুল্য জ্ঞান করে এবং মৃত্যুকেই ইহা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করে। আবার দুনিয়ার সকল বিপদই আল্লাহ্-প্রদত্ত শাসন ও সতর্ক বাণীস্বরূপ। সন্তানের ত্রুটি দর্শনে পিতা যেমন স্নেহবশত তাহার ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য শাসন করেন এবং বুদ্ধিমান পুত্রও সেই শাসনকে মঙ্গলের হেতু মনে করিয়া পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ্-প্রদত্ত বিপদকেও সেই চক্ষে দেখা কর্তব্য।

বিপদাপদের ফযীলত– হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, তোমরা পানাহারের বস্তু যোগাইয়া যেমন রোগীর তত্ত্বাবধান করিয়া থাক, আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ বিপদাপদ দ্বারা স্বীয় বন্ধুগণের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল–"আমার ধন চোরে লইয়া গিয়াছে।" তিনি বলিলেন– "যাহার চুরি হয় না এবং শরীর রোগাক্রান্ত হয় না, তাহার মধ্যে মঙ্গল নাই। আল্লাহ যাহাকে ভালবাসেন, তাহার উপর বিপদ অবতীর্ণ করেন।" অন্যত্র তিনি বলেন যে, মর্যাদার তারতম্যানুসারে বেহেশ্‌তে আসনের বহু শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি এমন উন্নত স্তর আছে যে, মানুষ স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা ততদূর পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বিপদাপদে নিপতিত করিয়া তাহাকে তদ্রূপ মরতবায় উন্নীত করিয়া লয়।

একবার রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন–"মুমিনের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার বিধান দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। তাহাকে সম্পদ দিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হন এবং ইহাতে তাহারও মঙ্গল হইয়া থাকে, আবার তাহার উপর বিপদ চাপাইয়া দিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হন এবং ইহাতেই তাহার মঙ্গলও নিহিত থাকে।" অর্থাৎ মুমিন বিপদে সবর এবং সম্পদে শুক্‌র করে। এই উভয় অবস্থাই তাহার জন্য মঙ্গলজনক।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"সুস্থ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন বিপদগ্রস্ত লোকদের মরতবা দর্শন করিয়া বলিবে–'আহা, আমার শরীরের গোশ্‌ত যদি (দুনিয়াতে) নরুন দ্বারা কাটিয়া ফেলা হইত!" একজন পয়গম্বর (আ) নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, তুমি কাফিরদিগকে নি'আমত দান কর এবং মুমিনদের উপর বিপদ অবতীর্ণ কর; ইহার কারণ কি?" উত্তরে আল্লাহ্ বলেন–"মানুষের সম্পদ ও বিপদ সমস্তই আমার। মুমিনের পাপ হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে পাপ হইতে পাক পবিত্র হইয়া সে আমার দর্শন লাভ করুক, ইহাই আমি চাই। সুতরাং দুনিয়াতেই বিপদাপদ দ্বারা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইয়া থাকি। আর কাফিরগণ দ্বারাও সৎকর্ম সম্পন্ন হয়। কিন্তু পার্থিক সম্পদ দান করত তাহাদের সেই সৎকর্মের পুরস্কার শোধ করিয়া দিতে চাই। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, (মৃত্যুর পর) তাহারা যখন আমার দরবারে উপস্থিত হইবে। তখন যেন তাহাদের কোন প্রাপ্য না থাকে এবং আমি তাহাদিগকে উত্তমরূপে শাস্তি দিতে পারি।"

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهٖ – (যে ব্যক্তি মন্দ কার্য করিবে, সে তজ্জন্য প্রতিফল পাইবে) এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, (পাপ করিলেই শাস্তি পাইতে হইবে) আমরা কিরূপে উহা হইতে পরিত্রাণ পাইব?" উত্তরে তিনি বলিলেন–"তোমরা কি পীড়িত ও দুঃখগ্রস্ত হও না? মুমিনের পাপের ইহাই প্রতিফল।" হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের একটি সন্তান প্রাণত্যাগ করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এমতাবস্থায় দুইজন ফিরিশতা বাদী ও বিবাদীরূপে তাঁহার নিকট আগমন করিল। বাদী এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, আমি ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়াছিলাম। কিন্তু বীজ অংকুরিত হইলে বিবাদী পদদলিত করিয়া উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বিবাদী উত্তর করিল যে, বাদী ঠিক রাজপথের উপর বীজ বপন করিয়াছিল এবং রাস্তা অতিক্রম করিবার কালে ঐ অংকুরগুলি বাঁচাইয়া বাম

বা ডান পার্শ্ব দিয়া চলিবার উপায় ছিল না। এইজন্য যাতায়াতে অংকুরগুলি পদদলিত হইয়া নষ্ট হইয়াছে। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম বাদীকে বলিলেন- "তুমি কি জান না যে, লোকে রাস্তা দিয়া চলাফেরা করে? তুমি রাজপথে বীজ বপন করিলে কেন?" বাদী উত্তর দিল- "আপনি কি জানেন না যে, মানুষ মৃত্যুর রাজপথের উপর আছে? আপনি স্বীয় পুত্রের মৃত্যুতে শোকবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন কেন?" ইহা শুনিয়া হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় পুত্রের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন–"বৎস, আমার অগ্রে তুমি চলিয়া গেলে আমার পুণ্যের পাল্লাতে তোমাকে পাইব; আর তোমার আগে আমি গেলে তুমি আমাকে তোমার পুণ্যের পাল্লায় পাইবে; কিন্তু তোমাকে আমার পুণ্যের পাল্লায় পাইতে আমি পছন্দ করি।" ইহা শুনিয়া পুত্র বলিলেন–"আব্বাজান, আপনি যাহা পছন্দ করেন, আমিও তাহাই পছন্দ করি।" হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু স্বীয় কন্যার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বলিলেন–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - (আমরা আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিব।) সতর অর্থাৎ যাহা আবৃত করা আবশ্যক তাহা ঢাকা পড়িল, খরচ কমিল এবং নগদ সওয়াব পাওয়া গেল।" তৎপর দাঁড়াইয়া দুই রাক'আত নামায সমাপনপূর্বক বলিলেন– আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ - অর্থাৎ 'তোমরা সবর ও নামায সহকারে সাহায্য প্রার্থনা কর।' আমি এই উভয় কাজই করিলাম।" হযরত হাতেম আসেম (র) বলেন–"কিয়ামত-দিবস আল্লাহ্ চারি দল লোকের সম্মুখে চারিজন মহাপুরুষকে প্রমাণস্বরূপ আনয়ন করিবেন। যথা—ধনীদের সম্মুখে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে; হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে গোলামদের সম্মুখে; হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে দরিদ্রগণের সম্মুখে এবং যাহারা বিপদে সবর করে নাই, তাহাদের সম্মুখে হযরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালামকে।"

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট মনে করি।

তৃতীয় অধ্যায়

ভয় ও আশা

ভয় ও আশার আবশ্যকতা– ধর্মপথযাত্রীর জন্য ভয় ও আশা দুইটি ডানাস্বরূপ। এই দুই ডানার সাহায্যে মানুষ সকল প্রশংসনীয় মকামে উপনীত হয়। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পথে ভীষণ অন্তরায় এবং মারাত্মক বিপদসমাকীর্ণ স্থানসমূহ রহিয়াছে। যে-পর্যন্ত পথিকের অন্তরে অকপট আশার উদ্রেক না হয় এবং আল্লাহ্‌র অনুপত সৌন্দর্য দর্শনের জন্য চক্ষু উদ্‌গ্রীব হইয়া না উঠে, সেই পর্যন্ত সেই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। উক্ত পথে বাসনা-কামনা প্রভৃতি নানারূপ কুপ্রবৃত্তি পথিককে দোযখের দিকে টানিতে থাকে। এইগুলি বড় শক্তিশালী ও প্রতারক। ইহাদের ফাঁদ নিতান্ত জটিল এবং দুর্বল মানব ইহাতে সহজেই ধরা পড়ে। যে-পর্যন্ত মানব-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় প্রবল হইয়া না উঠে, সেই পর্যন্ত কেহই এই ফাঁদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এইজন্যই ভয় ও আশার ফযীলত এত অধিক। আশা নাকাদড়ির ন্যায়; ইহা মানুষকে সম্মুখের দিকে টানিতে থাকে। আর ভয় চাবুকের ন্যায়; ইহা তাহাকে সম্মুখে পরিচালিত করে।

এ-স্থলে প্রথমে 'আশা' সম্বন্ধে বর্ণিত হইবে; তৎপর 'ভয়' সম্বন্ধে বলা হইবে।

আশার ফযীলত– আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে ইবাদত করা অপেক্ষা তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়ার প্রত্যাশায় ইবাদত করা অতি উৎকৃষ্ট। কারণ, আশা হইতে ভালবাসা জন্মে এবং ভালবাসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মকাম আর নাই। অপর পক্ষে ভয় হইতে মনে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ -

অর্থাৎ "তোমাদের সকলেই যেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে উত্তম ধারণা পোষণ করিয়া প্রাণত্যাগ কর।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ বলেন—"বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে, আমি তেমনই (অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট যে যেরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করে, সে তাহাই পাইবে)। আপনি আমার বান্দাদিগকে জানাইয়া দেন যে, তাহাদের ইচ্ছানুরূপ তাহারা আমার প্রতি ধারণা পোষণ করুক।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যুকালে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি নিজের অবস্থা কিরূপ মনে করিতেছ?" সে ব্যক্তি বলিল—"আমি আমার পাপের কারণে ভয় পাইতেছি এবং আল্লাহ্র রহমতের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন—"এমন সময়ে যাহার অন্তরে এই দুই বিষয় (অর্থাৎ ভয় ও আশা) একত্র হয়, আল্লাহ্ তাহাকে তাহার ভয়ের ব্যাপারে নিস্কৃতি দান করেন এবং যাহা সে আশা করে তিনি তাহাকে উহা দিয়া থাকেন।"

হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালামের উপর আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন—"তুমি কি জান, ইউসুফকে (আ) কেন তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম? এইজন্য বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার অন্যান্য পুত্রকে বলিয়াছিলে—'আমার আশঙ্কা হয় যে, ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারে এবং তোমরা তাহার সম্বন্ধে অসতর্ক থাকিতে পার।' তুমি ব্যাঘ্রের জন্য কেন ভয় করিয়াছিলে এবং আমার (দয়ার) আশা কেন কর নাই? তাহার ভাইদের অসতর্কতার কথা ভাবিয়াছিলে অথচ আমি যে রক্ষা করিব ইহার খেয়াল কর নাই?" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে পাপাধিক্যের চিন্তায় হতাশ দেখিয়া বলিলেন—"নিরাশ হইও না। আল্লাহ্র রহমত তোমার গুনাহ অপেক্ষা অনেক বেশী।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন—"অপর লোককে গুনাহ্ করিতে দেখিয়া তুমি গুনাহ্ পরিত্যাগ কর নাই কেন? আল্লাহ্ তাহাকে বাকশক্তি প্রদান করিলে সে নিবেদন করিবে—'ইয়া আল্লাহ্, আমি লোকদিগকে ভয় করিয়াছি; কিন্তু তোমার রহমতের আশা রাখিতাম।' তখন আল্লাহ্ তাহার উপর দয়া করিবেন।"

একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানিলে অধিক রোদন করিবে, অল্প হাসিবে এবং নির্জন প্রান্তরে যাইয়া বুকে

কশাঘাত করিয়া চিৎকারপূর্বক ক্রন্দন করিবে।" তৎপর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন—"হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ বলিয়া পাঠলেন—"আপনি কেন আমার বান্দাগণকে হতাশ করিতেছেন?" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) গৃহের বাহিরে আসিয়া লোকগিকে আল্লাহ্র বদান্যতা ও দয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত আশা-উদ্দীপনার বাণী শুনাইলেন। হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের উপর আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন—"হে দাঊদ, তুমি নিজেও আমাকে ভালবাসিতে থাক এবং লোকদের অন্তরেও আমার ভালবাসা জন্মাইয়া দাও।" তিনি নিবেদন করিলেন—"ইয়া আল্লাহ্, অপরের হৃদয়ে কিরূপে তোমার প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিব?" আল্লাহ্ বলিলেন—"আমার দানশীলতা ও করুণা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও; কারণ দানশীলতা ও করুণা ব্যতীত তাহারা আমাতে আর কিছুই দেখে নাই।"

একব্যক্তি হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে আক্সামকে (র) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন—"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রশ্নস্থলে দণ্ডায়মান রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি অমুক কাজ করিয়াছ; অমুক কাজ করিয়াছ।' এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া আমি ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং নিবেদন করিলাম—'হে আল্লাহ্, তোমার পক্ষ হইতে আমাকে এইরূপ সংবাদ দেওয়া হয় নাই।' আল্লাহ্ বলিলেন—'কিরূপ সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে?' আমি নিবেদন করিলাম—'আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, তুমি বলিয়াছ—'আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা ও আশা পোষণ করে, আমি তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি।' এই সংবাদ আমি আবদুর রায্যাক হইতে, তিনি মু'আম্মার হইতে, তিনি যহ্রী হইতে, তিনি আনাস হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে, তিনি জিবরাঈল আলায়হিস সালাম হইতে এবং তিনি তোমা হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। (ইহা শুনিয়া) আমি আশা করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার উপর দয়া করিবে।' তৎপর আল্লাহ বলিলেন—'জিব্রাঈল সত্য বলিয়াছে, আমার রাসূল সত্য বলিয়াছে; আনাস, যহরী, আবদুর রাযযাক, সকলেই সত্য বলিয়াছে। আমি তোমার উপর দয়া করিলাম।' তৎপর আল্লাহ আমাকে গৌরবের পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন; বেহেশতের বালকগণ পরিচারকরূপে আমার সম্মুখে ঘুরাফেরা করিতেছে এবং আমি এখন এমন আনন্দে বিভোর আছি যে, ইহা কোন সময় কল্পনাও করিতে পারি নাই।"

হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, বনী ইস্‌রাঈলের এক ব্যক্তি লোকদিগকে আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ করিয়া দিত। কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তাহাকে বলিবেন-("তুমি যেমন আমার বান্দাগণকে আমার রহমত হইতে নিরাশ করিতে) তদ্রূপ আমি আজ তোমাকে আমার রহমত হইতে নিরাশ করিতেছি।" হাদীস শরীফে আছে যে. এক ব্যক্তি হাজার বৎসর দোযখের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বলিয়া উঠিবে – يَاحَنَّانُ - يَامَنَّانُ (অর্থাৎ হে দয়ালু, হে করুণাময়) তখন আল্লাহ তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য হযরত জিব্‌রাঈল আলায়হিস সালামকে আদেশ দিবেন। তাহাকে সম্মুখে আনয়ন করা হইলে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন-"দোযখে তোমার স্থান কিরূপ দেখিলে?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে-"সকল স্থান হইতে নিকৃষ্ট।" তাহাকে পুনরায় দোযখে লইয়া যাইবার আদেশ হইবে। তাহাকে দোযখে লইয়া যাইতে থাকিলে সে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকিবে। এমন সময় আল্লাহ বলিবেন-"হে বান্দা, তুমি কি দেখিতেছ?" সে বলিবে-"আমি ধারণা করিয়াছিলাম যে, তুমি যখন আমাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনাইয়াছ তখন আবার দোযখে নিক্ষেপ করিবে না।" তখন আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবার আদেশ করিবেন। আশার কারণে সে দোযখ হইতে অব্যাহতি পাইবে।

আশার হাকীকত

আশার ত্রিবিধ অবস্থা-ভবিষ্যত মঙ্গল কামনাকে রাযা বা আশা বলে। কিন্তু কোন কোন সময় এই ভবিষ্যত মঙ্গল কামনাতেই মানুষ অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা করে, ধোঁকায় পতিত হয় এবং বোকামিও করিয়া থাকে। নির্বোধ লোকেরা ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারে না এবং সবগুলিকেই আশা বলিয়া মনে করে। অথচ এই ধারণা ঠিক নহে। আশা একটি প্রশংসনীয় গুণ।

ভাল বীজ উপযুক্ত সময়ে উর্বরা ভূমিতে বপন করত কাঁটা ও আগাছা নিড়াইয়া যথাসময়ে পানি সেচনপূর্বক যদি কেহ আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করে যে, তিনি গাছগুলিকে পার্থিব ও অপার্থিব সকল আপদ হইতে রক্ষা করিয়া উত্তম ফসল উৎপাদন করিয়া দিবেন, তবে এমন কামনাকে আশা বলে। অপর পক্ষে খারাপ বীজ অকর্ষিত ভূমিতে নিক্ষেপ করত আগাছা না নিড়াইয়া বিনা-সেচনে ফসলের আশা করাকে ধোঁকায় পতিত হওয়া (غرور) ও বোকামি (حماقت)

বলে। আবার উত্তম বীজ কর্ষিত ভূমিতে বপনপূর্বক সেচন না করিয়া যদি কামনা করা হয় যে, মেঘ আসিয়া বারি বর্ষণ করিবে, অথচ সেই স্থানে বৃষ্টিপাত অসম্ভব না হইলেও সচরাচর বারি বর্ষণ হয় না এমতাবস্থায় ফসলের আশা করাকে অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা (تمنى) বলে।

তদ্রূপ যে ব্যক্তি খাঁটি ঈমানের বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করত কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাবরূপ আগাছাসমূহ হৃদয়ক্ষেত্র হইতে দূর করে এবং ইবাদত দ্বারা ঈমানরূপ বৃক্ষকে সেচনপূর্বক কামনা করিতে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক ইহাকে সকল আপদ হইতে রক্ষা করিবেন এবং সে নিজেও আমরণ সর্বযত্নে ঈমানের তত্ত্বাবধান করত মৃত্যুকালে বিশুদ্ধ ঈমান লইয়া মরিবার ইচ্ছা রাখে, এইরূপ কামনাকে আশা বলে। এমন আশার নিদর্শন এই-ভবিষ্যতে সৎকর্মে কোনরূপ শৈথিল্য না করা এবং সর্বদা ঈমানের তত্ত্বাবধান করা। কারণ, ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান পরিত্যাগ করা নৈরাশ্যের নিদর্শন, আশার নিদর্শন নহে। পক্ষান্তরে ঈমানের বীজ বিশুদ্ধ না হইলে বা বিশুদ্ধ হইলেও হৃদয়ক্ষেত্রকে মন্দ স্বভাব হইতে পবিত্র না করিলে এবং ইবাদত দ্বারা ঈমানরূপী বৃক্ষকে সেচন না করিলে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করা বোকামি। ইহা আশা নহে। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অভিলাষ অনুযায়ী যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, অথচ আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখে, সে নির্বোধ।" আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتَابَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا –

অর্থাৎ "অবশেষে তাহাদের পশ্চাতে মন্দ লোক তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, উহারা কিতাবের (তওরাতের) উত্তরাধিকারী হইল। তাহারা (নাজায়েয উপায়ে) এই দুনিয়ার জঘন্য সামগ্রী (ধনসম্পদ) গ্রহণ করে এবং বলিয়া থাকে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।" (সূরা আ'রাফ, ২১ রুকূ, ৯ পারা।) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ স্থলে নবীগণের পরবর্তী লোকদের নিন্দা করিতেছেন। তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ইহার অনুশাসন না মানিয়া পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল; অথচ তাহারা বৃথা আশা পোষণ করিতে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

যাহাই হউক, যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে আছে, তৎসমুদয় পূর্ণভাবে সংগ্রহ করত নিজের কর্তব্য সম্পাদনের পর ফলের কামনা করাকে আশা বলে। পক্ষান্তরে উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া বা বৃথা নষ্ট করিয়া ফলের কামনা করাই ধোঁকা খাওয়া ও বোকামি করা। আবার যে-স্থলে উপকরণ একেবারে নষ্টও করা হইল না এবং কাজেও লাগানো হইল না, এমন স্থলে ফলের কামনা করাকে অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা বলে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَيْسَ الدِّيْنُ بِالتَّمَنِّىْ – অর্থাৎ "অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা করিলেই ধর্ম-কর্ম নিষ্পন্ন হয় না।"

তওবা করিয়া ইহা কবূল হওয়ার আশা করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি তওবা করে নাই, কিন্তু তজ্জন্য দুঃখিত ও বিষণ্ন হইতেছে এবং কামনা করিতেছে যে, আল্লাহ্ তাহাকে তওবা করিবার সুযোগ দিবেন, তবে এমন কামনাকেই আশা বলে। কেননা দুঃখিত ও বিষণ্ন হওয়াই তওবার উপকরণ। অপরপক্ষে গুনাহ্‌র জন্য দুঃখিতও না হইয়া তওবা করিবার আশায় থাকা বোকামি ও ধোঁকা খাওয়া বৈ আর কিছুই নহে। বিনা তওবায় ক্ষমার কামনা করাও তদ্রূপ নির্বুদ্ধিতা। অথচ নির্বোধগণ ইহাকেও আশা বলে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থাৎ "বাস্তবপক্ষে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে দেশ ত্যাগ করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে, তাহারাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আশা পোষণ করেন। আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং দয়া করিবেন।" (সূরা বাকারাহ, ২৭ রুকূ, ২ পারা।)

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মু'আয (র) বলেন–"যে ব্যক্তি দোযখের বীজ বপন করত বেহেশ্‌ত লাভের আশা করে, পাপকার্য করিয়া নেক্‌কার লোকের মর্যাদা পাইবার বাসনা করে এবং সৎকার্য না করিয়া পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার ন্যায় নির্বোধ আর নাই।" যায়েদ-আল খাইল নামক এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ যে একজনের মঙ্গল চাহেন এবং অপরের চাহেন না, ইহার নিদর্শন কি?" তিনি বলিলেন–"প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের সময় তোমার অবস্থা কেমন থাকে?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "আমার এই অবস্থা থাকে যে, আমি সৎকার্য ও সৎলোক ভালবাসি। কোন সৎকার্য সম্মুখে আসিলে শীঘ্র ইহা করিয়া লই এবং ইহার সওয়াবকে ধ্রুব সত্য জ্ঞান করি। আবার কোন সৎকার্য হাতছাড়া হইলে দুঃখিত হই এবং তদ্রূপ কার্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন– "আল্লাহ্ যে তোমার মঙ্গল চাহেন, ইহাই তাহার নির্দর্শন। তিনি তোমার অমঙ্গল চাহিলে তোমাকে মন্দ কার্যে লিপ্ত রাখিতেন এবং দোযখের কোন্ গর্তে ফেলিয়া তোমাকে ধ্বংস করিতেন, ইহার পরওয়াও করিতেন না।"

আশা অর্জনের উপায়

আশা কাহার জন্য হিতকর– দুই প্রকার রোগী ব্যতীত আশারূপ ঔষধের আবশ্যকতা নাই। **প্রথম প্রকার**– যে-ব্যক্তি অত্যধিক পাপের কারণে নিরাশ হইয়া তওবা করে না এবং বলে-"আমি এত অধিক পাপ করিয়াছি যে, আল্লাহ্ আমার তওবা কবূল করিবেন না।" **দ্বিতীয় প্রকার**-যে-ব্যক্তি অত্যধিক রিয়াযত (চরিত্রোন্নতিমূলক কর্ম) এবং ইবাদত-কার্যে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করত নিজেকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দুই প্রকার রোগীর পক্ষে আশা-বৃদ্ধিকারক ঔষধের প্রয়োজন। পরকাল সম্বন্ধে উদাসীন ও অমনোযোগী লোকের জন্য ইহা ঔষধ নহে, বরং মারাত্মক বিষ।

আশা বৃদ্ধির দ্বিবিধ উপায়–দুই উপায়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আশা মানব-হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে।

প্রথম উপায়–বিশ্বজগতের সর্বত্র আল্লাহ্ তা'আলার করুণা অবারিত ধারায় অনবরত বর্ষিত হইতেছে দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করা। দুনিয়াতে যে সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিতেছে, ভূতলে যত উদ্ভিদ ও জীবজন্তু জন্মিতেছে এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত যত সম্পদ রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের সৃষ্টিকৌশলের প্রতি মনোনিবেশ করিলে প্রত্যেক ঘটনা ও প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এরূপ পূর্ণ অনুগ্রহ, অসীম দান ও অপার বদান্যতা সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, তদপেক্ষা অধিক কল্পনা করাও মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে

শুক্রের বর্ণনাকালে ইহা বলা হইয়াছে। মানবদেহের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায় যে, তাহার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তিনি সমস্তই পূর্ণমাত্রায় বিশেষ সৌন্দর্যের সহিত পরিপাটি করিয়া দিয়াছেন। যে-পদার্থ না হইলে দেহ-রাজ্যের কাজ চলিতে পারে না, যেমন মস্তক, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি, এরূপ বস্তু তিনি পূর্ণভাবে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া প্রদান করিয়াছেন। তৎপর যে-সকল অঙ্গ দ্বারা মানুষ স্বীয় কার্য সম্পন্ন করে, কিন্তু উহা না হইলেও দেহরক্ষার ব্যাঘাত ঘটিত না, যেমন হস্তপদ ইত্যাদি, এরূপ পদার্থকেও যেমন পারিপাট্যের সহিত সৃষ্টি করা উচিত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার যে সকল বস্তু মস্তকাদির ন্যায় অত্যাবশ্যকও নহে এবং হস্ত-পদাদির ন্যায় কার্য উদ্ধারেও প্রয়োজন হয় না, যাহা মানবের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে মাত্র তৎসমুদয়ও তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে পারিপাট্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছে, যথা—ওষ্ঠের লালিত্য ভ্রূযুগলের বক্রতা, চক্ষুর মণির কৃষ্ণতা, পলকের সরলতা প্রভৃতি।

কেবল মানুষের প্রতিই আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, বরং সমস্ত জীবজন্তু, কীটপতঙ্গের প্রতিও তিনি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। মধুমক্ষিকা সৃজনের মধ্যে কেমন সুন্দর শিল্পকৌশল দেখা যাইতেছে। ইহার গঠন কেমন চমৎকার এবং আকার কেমন কার্যোপযোগী। ইহাদিগকে নিজের আবাসগৃহ নির্মাণ বিষয়ে আল্লাহ্ কেমন সুন্দর কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। ইহারা কি চমৎকার গৃহ নির্মাণ করে এবং ইহাতে কেমন শৃঙ্খলার সহিত মধু সঞ্চয় করে। ইহারা স্বীয় বাদশাহ্র আদেশ কেমন সুন্দররূপে পালন করে এবং বাদশাহ্ ইহাদের উপর কেমন চমৎকারভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে, এ সমস্তই বিস্ময়কর ব্যাপার।

অতএব মানবদেহের ভিতরে ও বাহিরে এবং সমস্ত সৃষ্টজগতে যে সকল করুণাব্যঞ্জক আশ্চর্য কৌশল দেখা যাইতেছে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম দয়া হইতে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই এবং তাঁহার রাজ্যে অতিরিক্ত ভয়েরও স্থান নাই। বরং ভয় ও আশা দুইটিই সমানভাবে জাগরূক রাখা উচিত। তবে আশা বৃদ্ধি পাওয়া অসঙ্গত নহে।

আবার সর্বাবস্থায় ও সকল সময় আল্লাহ্ তা'আলা মানবের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহা অনন্ত অসীম। এক বুযুর্গ বলেন—"কুরআন শরীফে ধনের আদান-প্রদান সম্বন্ধে যে আয়াত আছে তদপেক্ষা আশা উদ্দীপক আয়াত

আর নাই। কুরআন শরীফে ইহা একটি সুবৃহৎ আয়াত। ধন হাওলাতস্বরূপ দিলে ইহা কিরূপে নিরাপদে থাকিতে পারে এবং নষ্ট না হয়, এই আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। (অর্থাৎ সব বিষয়েই আল্লাহ্র অপার রহমতের পরিচয় পাওয়া যায়।) সুতরাং এত অনন্ত অসীম দয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁহার পাপী বান্দাদের পাপ মার্জনার ব্যাপারে কি কমতি করিবেন? তবে তাহারা সকলেই দোযখে যাইবে কেন?"

আল্লাহ্র রহমতের আশা বৃদ্ধি করিবার এক বড় উপায় উপরে বর্ণিত হইল। ইহার উপকারিতা অপরিসীম। কিন্তু যে-সে লোক তদ্রূপ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় উপায়— আল্লাহ্র রহমতের আশা অন্তরে পোষণ করা সম্বন্ধে যে-সকল আয়াত ও হাদীস আছে তৎসমুদয়ের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। এইরূপ আয়াত ও হাদীস বহু আছে, এ স্থলে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে আল্লাহ্ বলেনঃ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ – অর্থাৎ "তোমরা কেউই আল্লাহ্র রহ্মত হইতে নিরাশ হইও না।" (সূরা যুমর, ৬ রুকূ, ২৪ পারা।) আল্লাহ্ অনত্র বলেন ঃ— وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ অর্থাৎ "ফিরিশতাগণ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" সূরা শূরা, ১ রুকূ, ২৫ পারা।)

তিনি আর বলেন ঃ— ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ – অর্থাৎ "দোযখ এইজন্য সৃষ্ট করা হইয়াছে যে, কাফিরগণকে ইহাতে নিক্ষেপ করা হইবে এবং মুসলমানদিগকে ইহা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা হইবে।" (সূরা যুমর, ২ রুকূ, ২৩ পারা।)

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বদা তাঁহার উম্মতের জন্য পাপমুক্তি চাহিতেন। তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আল্লাহ বলেনঃ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ – অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা) লোকে অত্যাচার (মহাপাপ) করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।" (সূরা রা'দ, ১ রুকূ, ১৩ পারা।)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى – (এবং সত্বর আল্লাহ্ আপনাকে দান করিবেন, যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।) এই আয়াত নাযিল হইলে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে (রা) বলিলেন–"আমার উম্মতের একটি লোক দোযখে থাকিলেও আমি সন্তুষ্ট থাকিব না।" পবিত্র কুরআন শরীফে এবংবিধ আরও বহু আয়াত রহিয়াছেন।

আল্লাহ্র রহমতের আশা সম্বন্ধে হাদীস–রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমার উম্মত আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত। তাহাদের (পাপের) শাস্তি দুনিয়াতেই ফিত্না ও ভূমিকম্পে হইয়া যাইবে। কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মুসলমানের হস্তে এক একজন কাফিরকে অর্পণ করিয়া বলা হইবে–"দোযখ হইতে পরিত্রাণের জন্য সে তোমার বিনিময় স্বরূপ।" তিনি বলেন–"জ্বর দোযখের আঁচ। মুসলমান দোযখের (শাস্তির) এতটুকুই পাইবে।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দু'আ করিতেন–"ইয়া আল্লাহ্, আমার উম্মতের হিসাব (বিচার) আমার সহিত একসঙ্গে করিও। তাহা হইলে অপর কোন উম্মত তাহাদের সমান দেখাইবে না।" ইহার উত্তরে আল্লাহ বলেন– "হে মুহাম্মদ (সা), ইহারা আপনার উম্মত; আর আমার বান্দা। আমি তাহাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু। আপনি কিংবা অপর কেহ তাহদিগকে অন্য কোন উম্মতের সমান দেখিতে পাইবে, ইহা আমি চাই না।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমার জীবন তোমাদের জন্য মঙ্গল এবং আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য মঙ্গল। আমি জীবিত থাকিলে তোমাদিগকে শরীয়তের শিক্ষা দান করিব। আর আমি মরিয়া গেলে তোমাদের কার্যকলাপ আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। যে কার্য সৎ হইবে তজ্জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা ও শুক্র করিব; আর মন্দ কার্য দেখিলে আল্লাহ্র নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা চাহিব।" একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ يَا كَرِيْمَ الْعَفْوِ – ইহা শুনিয়া হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম নিবেদন করিলেন– "ইহার অর্থ আপনি জানেন কি? ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পাপ ক্ষমা করিয়া ইহাকে পুণ্যে পরিবর্তিত করিয়া দেন।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

বলেন–"বান্দা পাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ বলেন– হে ফিরিশ্তাগণ, দেখ, আমার এই বান্দা একটি পাপ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহার একজন প্রভু আছেন, যিনি এই পাপের কারণে তাহাকে শাস্তি দিবেন বা তাহাকে মার্জনা করিবেন। তোমরা সাক্ষী, আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ বলেন–"আকাশ ভরিয়া যায় এত পাপ করিয়াও বান্দা যদি মুক্তির আশায় ক্ষমতা প্রার্থনা করে তবুও আমি মাফ করিয়া থাকি। পৃথিবী পরিপূর্ণ হয় এত পাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আমিও পৃথিবীপূর্ণ দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "বান্দা পাপ করার পর ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত না হইলে ফিরিশ্তা এই পাপ লিপিবদ্ধ করে না। এই সময়ের মধ্যে সেই বান্দা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সেই পাপ লেখাই হয় না। কিন্তু তওবা না করিয়া সেই ব্যক্তি কোন ইবাদত করিলে ডান পার্শ্বের ফিরিশ্তা বাম পার্শ্বের ফিরিশ্তাকে বলে–'তুমি ঐ পাপ তাহার আমলনামায় লিখিও না; আমিও ইহার পরিবর্তে একটি সওয়াব লিখিব না।' প্রত্যেক সওয়াবই দশগুণ হয়। কাজেই নয়ভাগ সওয়াব ঐ পাপীর আমলনামায় অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"মানুষ পাপ করিলে ইহা তাহার নামে লিখিত হয়।" এই কথা শুনিয়া এক পল্লীবাসী নিবেদন করিলে–"সেই ব্যক্তি যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে?" হযরত (সা) বলিলেন–"তবে সেই পাপ মুছিয়া ফেলা হয়।" সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল–"সে যদি পুনরায় পাপ করে?" তিনি বলিলেন–"তবে পুনরায় পাপ লিখিত হয়।" সেই ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল–সে যদি আবার ক্ষমা চায়?" তিনি বলেন–"আবার মুছিয়া ফেলা হয়।" পরিশেষে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল–"কতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ হইয়া থাকে?" তিনি বলিলেন–"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। মানুষ যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনায় বিরক্ত না হয়, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ ক্ষমা করিতে বিরক্ত হয় না।"

তিনি অন্যত্র বলেন–"লোক সৎকার্যের ইচ্ছা করিলে তাহার নামে একটি পুণ্য লিখিত হয়। আর কার্যটি সম্পন্ন করিলে একের পরিবর্তে দশটি পুণ্য তাহার নামে লিখিত হয়। তৎপর উহাকে সাত শত পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পক্ষান্তরে লোকে পাপকার্যের ইচ্ছা করিলে ফিরিশ্তা (পাপ) লিপিবদ্ধ করে না।

কার্যটি করিয়া ফেলিলে একটিমাত্র পাপ তাহার নামে লিখিত হয়। আবার ইহাও আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।"

এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল–"আমি রমযানের রোযা রাখি এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ি। ইহার অতিরিক্ত কোন ইবাদত করি না। আমি ধনবান নহি বলিয়া আমার উপর হজ্ব ফরয নহে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল, পরকালে আমি কোথায় থাকিব?" হযরত (সা) হাসিয়া বলিলেন–"তুমি আমার সহিত থাকিবে; তবে শর্ত এই–তুমি যদি কপটতা ও ঈর্ষা হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখ, গায়র মুহার্‌রামের প্রতি দৃষ্টিপাত না কর, অপরকে ঘৃণার চক্ষে না দেখ এবং গীবত ও মিথ্যা কখন হইতে স্বীয় রসনাকে রক্ষা কর, তবে তুমি আমার সঙ্গে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে এবং আমি তোমাকে স্নেহের সহিত আমার এই হাতের তালুতে রাখিব।"

এক পল্লীবাসী রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন–"কিয়ামত দিবস সৃষ্টের বিচার কে করিবেন?" হযরত (সা) বলিলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা।" সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ্ কি নিজেই বিচার করিবেন?" হযরত (সা) উত্তর দিলেন –"হাঁ।" ইহা শুনিয়া সেই পল্লীবাসী হাসিয়া উঠিল। হযরত (সা) বলিলেন–"তুমি হাসিতেছ?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার হাসির কারণ এই যে, দয়ালু প্রভু অধিকার পাইলে অপরাধ মাফ করিয়া দিয়া থাকেন এবং বিচার করিলে কঠোরতা করেন না?" হযরত (সা) বলিলেন–"এই পল্লীবাসী সত্য বলিয়াছে–আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় দয়ালু আর কেহই নাই।" হযরত (সা) আবার বলিলেন–"এই পল্লীবাসী ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ।" তিনি পুনরায় বলিলেন–"আল্লাহ্ কা'বাকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত করিয়াছেন। কেহ যদি ইহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, পাথরগুলি খসাইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলে তবুও আল্লাহ্‌র কোন একজন ওলীকে হেয় প্রতিপন্ন করিলে যেরূপ পাপ হয় তদ্রূপ পাপ হয় না।" তৎপর সেই পল্লীবাসী জিজ্ঞাসা করিল–"কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওলী। হযরত (সা) বলিলেন– "সকল মুসলমানই আল্লাহ্‌র ওলী। হে পল্লীবাসী, তুমি কি শুন নাই যে আল্লাহ বলেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ –

অর্থাৎ "যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদের ওলী। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনয়ন করেন।" সূরা বাকারাহ, ৩৪ রুকূ, ৩ পারা।)

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন–"লোকে আমা হইতে উপকার পাইবে বলিয়া আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের নিকট হইতে উপকার পাইবার উদ্দেশ্যে আমি তাহাদিগকে সৃজন করি নাই।" তিনি বলেন–"আল্লাহ তা'আলা মানব-সৃষ্টির পূর্বেই নিজের সম্বন্ধে লিখিয়া লইয়াছেন–"আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকিবে।" তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – (আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপসনার যোগ্য নাই) বলিয়াছে, যে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। অন্তিমকালে এই কলেমা যাহার সর্বশেষ উক্তি হইবে, দোযখের অগ্নি তাহার দিকে দৃকপাতও করিবে না। আর শির্‌ক না করিয়া যে ব্যক্তি পরলোকগমন করিবে, সে কখনও দোযখে প্রবেশ করিবে না।" তিনি বলেন–"তোমরা যদি একেবারে পাপ না কর তবে আল্লাহ্ এমন লোক সৃষ্টি করিবেন যাহারা পাপ করিবে এবং তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।" তিনি বলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি স্নেহময়ী জননী অপেক্ষা অধিক দয়ালু।" তিনি বলেন–"কিয়ামতের দিন আল্লাহ এত দয়া প্রদর্শন করিবেন যে, কেহ ইহা কল্পনাও করিতে পারে না। এমনকি ইহা দেখিয়া শয়তানও তাঁহার রহমত পাইবার আশায় মাথা উত্তোলন করিবে।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহমত একশত ভাগ করিয়া নিরান্নব্বই ভাগ কিয়ামত দিবসের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন এবং এক ভাগের অধিক এই জগতে প্রকাশ করেন নাই। এই এক ভাগ রহমতের কারণেই সকলের হৃদয় দয়াশীল। সন্তানের উপর জননীর দয়া, বাচ্চার উপর জীবজন্তুর দয়া এই এক ভাগ রহমতের দরুনই হইয়া থাকে। কিয়ামতের দিন এই এক অংশ দয়া ও সেই নিরান্নব্বই অংশের সহিত একত্র করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের উপর বর্ষণ করিবেন। রহমতের প্রতিটি অংশ পৃথিবী হইতে আকাশের মধ্যবর্তী স্থানের কয়েক গুণ হইবে। সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার ভাগ্যে ধ্বংস আছে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই সেই দিন বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যাহারা কবীরা গুনাহ্ করে তাহাদের জন্য আমি আমার শাফা'আত (পাপ মোচনের জন্য অনুরোধ) রাখিয়া দিয়াছি। ইহা পরহেযগার ও আল্লাহ্র আদেশ পালনে রত ব্যক্তিদের জন্য বলিয়া তোমরা মনে করিয়া থাক; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। বরং পাপী ও বদকারদের জন্য আমি শাফা'আত করিব।" তিনি বলেন–"কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হইবে–হে উম্মতে মুহাম্মদ (সা), তোমাদের উপর আমার হক মাফ করিয়া দিলাম। এখন তোমাদের একের হক অন্যের উপর রহিয়া গেল। তোমরা পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া দিয়া বেহেশ্‌তে চলিয়া যাও।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে আনয়ন করত পাপ লিপিবদ্ধ নিরানব্বইটি খাতা তাহার নিকট স্থাপন করা হইবে। এক একটি খাতা এত বড় হইবে যে, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে ততদূর পর্যন্ত ইহাই দেখা যাইবে। তৎপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–'ওহে, এই সকল পাপের কোনটি তুমি অস্বীকার কর কি? বা পাপ লিপিবদ্ধ করিতে ফিরিশ্‌তা কোন অন্যায় ও অতিরিক্ত করিয়াছে কি?' সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে–'ইয়া আল্লাহ্, অস্বীকার করিবার কিছুই নাই এবং ফিরিশ্‌তাও কিছু অতিরিক্ত বা অন্যায়ভাবে লিখে নাই।" আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞাসা করিবেন–"তোমার কোন আপত্তি আছে কি?" সে নিবেদন করিবে–"হে আল্লাহ্, কোন আপত্তি নাই।" তখন তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইবে যে, তাহাকে দোযখে যাইতে হইবে। কিন্তু সেই সময় আল্লাহ্ বলিবেন–"হে বান্দা, আমার নিকট তোমার একটি পুণ্য আছে; আমি তোমার প্রতি অবিচার করিব না।" তাহার পর এক টুকরা কাগজ বাহির করা হইবে। ইহাতে লিখিত থাকিবে"ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ –

(আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল।) সেই ব্যক্তি বলিবে–"এত বড় বড় নিরানব্বইটি খাতার বিরদ্ধে এই সামান্য এক টুকরা কাগজ কি কখনও যথেষ্ট হইবে?" আল্লাহ্ বলিবেন–"হে বান্দা, আমি তোমার প্রতি অবিচার করিব না।" তৎপর ঐ নিরানব্বইটি খাতা এক পাল্লায় রাখা হইবে এবং অপর পাল্লায় সেই কাগজের টুকরা স্থাপন করা হইবে। সেই কাগজের টুকরাখানা সবগুলিকে

হালকা প্রতিপন্ন করত নিজে সর্বাপেক্ষা অধিক ভারী হইয়া পড়িবে। কারণ, তাওহীদের বিরুদ্ধে কোন বস্তুই দাঁড়াইতে পারে না।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদিগকে আদেশ করিবেন–'যাহার অন্তরে রতি পরিমাণ পুণ্য আছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আন।' তদনুসারে ফিরিশ্‌তাগণ তদ্রূপ বহু লোককে বাহিরে আনয়ন করত নিবেদন করিবে–"এইরূপ লোক আর কেহই দোযখে নাই।" আবার আদেশ হইবে–'যাহার হৃদয়ে অর্ধ রতি পরিমাণ পুণ্য আছে, তাহাকেও বাহির করিয়া আন।' ফিরিশতাগণ বহু লোককে বাহিরে আনিয়া নিবেদন করিবে–"এইরূপ লোক কেহই দোযখে নাই।" তৎপর আদেশ হইবে–"যাহার মনে অণু পরিমাণ পুণ্য আছে তাহাকেও বাহিরে আন।' তদনুসারে বহু লোককে বাহিরে আনিয়া নিবেদন করিবে–'যাহার হৃদয়ে অণু পরিমাণ পুণ্য আছে, এমন কোন লোক এখন আর দোযখে নাই।" তখন আল্লাহ বলিবেন–'পয়গম্বরগণের শাফা'আত, ফিরিশতাগণের শাফা'আত, মুসলমানগণের শাফা'আত সব নিঃশেষ হইয়াছে এবং উহা কবূলও হইয়াছে। এখন আমার পূর্ণ দয়া ব্যতীত আর কিছুই বাকী নাই। ইহার পর আল্লাহ্ স্বীয় করুণার হস্ত বিস্তারপূর্বক দোযখ হইতে এক মুষ্ঠি পরিপূর্ণ এমন লোক বাহির করিয়া আনিবেন যাহারা কখনই অণু পরিমাণ পুণ্যও করে নাই। তাহারা দোযখের অগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া থাকিবে। তৎপর বেহেশ্‌তের 'হায়াত' নামক নহরে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইবে। পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া তাহারা অবশেষে এই নহর হইতে উঠিয়া আসিবে, যেমন বন্যার পানি হইতে সবুজ তৃণরাজি উদ্‌গত হইয়া থাকে। উজ্জ্বল মুক্তামালা তাহাদের গলায় ঝুলিতে থাকিবে। বেহেশ্‌তবাসিগণ তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে এবং বলিবে–'এই সকল লোককে আল্লাহ্ (দোযখ হইতে) মুক্তি দিয়াছেন। তাহারা (দুনিয়াতে) কোন পুণ্যই করে নাই।' তৎপর তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশের আদেশ প্রদানপূর্বক বলা হইবে– (যাও) 'যাহা কিছু দেখিবে সমস্তই তোমাদের জন্য।' তাহারা নিবেদন করিবেন–'ইয়া আল্লাহ্, তুমি আমাদিগকে এমন সম্পদ দান করিয়াছ যাহা অপর কাহাকেও দান কর নাই' আল্লাহ্ বলিবেন–'আমার ধনভাণ্ডারে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নি'আমতসমূহ রহিয়াছে।' তাহারা বলিবে–'উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি হইতে পারে?' আল্লাহ্ বলিবেন–ইহা আমার সন্তুষ্টি (অর্থাৎ) আমি তোমাদের প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট

থাকিব যে, পুনরায় কখনও অসন্তুষ্ট হইব না।" এই হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে।

হযরত ওমর ইব্‌নে হাযম রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিন দিন নির্জনবাসে ছিলেন। কেবল ফজর নামাযের সময় তিনি বাহিরে আসিতেন, অন্য সময় তাঁহাকে দেখা যাইত না। চতুর্থ দিনে তিনি বাহিরে আগমন করত বলিলেন–"আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোককে বিনা বিচারে বেহেশ্‌তে প্রবেশের অনুমতি দিবেন বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা আমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন। গত তিন দিন (নির্জনবাসের সময়) আমি তদপেক্ষা আরও অধিক চাহিতেছিলাম। আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যন্ত দয়ালু পাইলাম। তাঁহার সর্বব্যাপী অনুগ্রহে তিনি সেই সত্তর হাজার লোকের প্রত্যেকের সঙ্গে সত্তর হাজার করিয়া লোককে বেহেশ্‌তে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। আমি নিবেদন করিয়াছিলাম–'আমার উম্মত কি এত হইবে?' আল্লাহ্ বলিলেন–'পল্লীবাসীদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সংখ্যা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।"

বর্ণিত আছে যে, কোনও এক যুদ্ধে বন্দী হইয়া একটি বালক প্রচণ্ড রৌদ্রে ছিল। তাঁবু হইতে জনৈকা মহিলা বালকটিকে দেখিয়া বিহ্বলভাবে তাহার দিকে দৌড়িয়া গেল। তাঁবুর অন্যান্য লোকও তাহার পশ্চাতে ছুটিল। মহিলা বালকটিকে উঠাইয়া কোলে করিয়া লইল এবং তাহাকে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষাকল্পে স্বীয় দেহের ছায়া তাহার উপর ফেলিল। মহিলা লোকদিগকে জানাইল যে, বালকটি তাহার পুত্র। ঘটনা দেখিয়া সমবেত লোকগণ রোদন করিতে লাগিল এবং মহিলাটির অপার দয়া দর্শনে তাহারা বিস্মিত হইল। এমন সময় রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ ঘটনাস্থলে আগমন করিলেন। দর্শকগণ কাহিনীটি আদ্যোপান্ত হযরতকে (সা) শুনাইল। তিনি মহিলার দয়া ও লোকদের রোদনের কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমরা কি এই মহিলার দয়া ও সন্তান-বাৎসল্য দর্শনে বিস্মিত হইয়াছ?" তাহারা বলিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা বিস্মিত হইয়াছি।" হযরত (সা) বলিলেন–"এই মহিলা স্বীয় পুত্রের প্রতি যেরূপ দয়ালু, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দার প্রতি তদপেক্ষা অধিক দয়ালু।" এই কথা শ্রবণে মুসলমানগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। এইরূপ আনন্দ তাহারা কখনও অনুভব করে নাই।

হযরত ইব্‌রাহীম আদহাম (র) বলেন–"এক রজনীতে আমি কা'বাশরীফ তওয়াফের উদ্দেশ্যে একাকী রহিয়া গেলাম। এমন সময় বৃষ্টিপাতও আরম্ভ হইল। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম–'ইয়া আল্লাহ্, আমাকে পাপ হইতে এমনভাবে রক্ষা কর যে, আমি কোন পাপই না করি।' ইতিমধ্যে কা'বাশরীফ হইতে এক আওয়ায শুনিতে পাইলাম–'তুমি এমন নিষ্পাপ অবস্থা চাহিতেছ যাহাতে পাপ তোমাকে স্পর্শও করিতে না পারে। আমার সকল বান্দা আমার নিকট ইহাই চাহিয়া থাকে। আমি সকলকে পাপ হইতে রক্ষা করিলে আমরা দয়া কাহার উপর প্রকাশ করিব?"

যাহাই হউক, আল্লাহ্‌র করুণা প্রকাশক তদ্রূপ বহু হাদীস ও উক্তি আছে। প্রবল ভয় যাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে কেবল তাহাদের জন্যই উহা ফলপ্রদ। কিন্তু যাহারা আখিরাতের প্রতি উদাসীন তাহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, উপরিউক্ত হাদীসসমূহ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, কতক মুসলমান দোযখেও যাইবে এবং সাত হাজার বৎসর শাস্তি ভোগ করিবার পর সর্বশেষ মুসলমান দোযখ হইতে নিস্কৃতি পাইবে। আর যদি মানিয়াও লওয়া যায়, কেবল একজন লোকই দোযখে যাইবে, তথাপি যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে দোযখে যাওয়া সম্ভবপর মনে করিয়া প্রত্যেকেরই পরহেযগারী ও সতর্কতার পন্থা অবলম্বন করিয়া চলা আবশ্যক এবং দোযখ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় সকল সম্ভবপর সৎকার্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কেননা, সাত হাজার বৎসরকাল অত্যন্ত দীর্ঘ। মাত্র এক রাত্রির দোযখের শাস্তির ভয়ে দুনিয়ার সকল সুখ-সম্ভোগের সামগ্রী পরিত্যাগ করাও সঙ্গত।

মোটের উপর কথা এই যে, মানবের মনে ভয় ও আশা সমান সমান থাকা কর্তব্য; যেমন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"পরকালে কিয়ামতের দিন যদি ঘোষণা করা হয় যে, কেবল এক ব্যক্তি বেহেশ্‌তে যাইবে, তবে আমি মনে করিব যে, আমিই যাবই। আর যদি ঘোষণা হয় যে, দোযখে একটি মাত্র লোক যাইবে, তবে আমাকেই দোযখে যাইতে হইবে কিনা ভাবিয়া আমার ভয় হইবে।"

ভয়

ভয়ের ফযীলত– ভয় একটি শ্রেষ্ঠ মকাম। ইহার ফল ও উৎপত্তির কারণের অনুরূপই ইহার ফযীলত এবং জ্ঞান ও আল্লাহ্-পরিচয় হইতেই উহা জন্মিয়া থাকে। অতঃপর ইহা ব্যাখ্যা করা হইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আল্লাহ্

বলেন ঃ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ – অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে জ্ঞানিগণ ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাকে ভয় করেন না।" (সূরা ফাতির, ৪ রুকূ, ২২ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র ভয় সমস্ত জ্ঞানের মূল।" পবিত্রতা, তাকওয়া-পরহেযগারী ভয়ের ফল এবং এই সমস্ত সৌভাগ্যের বীজ। কারণ, প্রবৃত্তি দমন ও ধৈর্য অবলম্বন করিতে না পারিলে পরকালের পথে চলা যায় না। ভয়ের অগ্নি প্রবৃত্তিকে যেমন দগ্ধ করিতে পারে তেমন আর কিছুতেই পারে না। এইজন্যই আল্লাহ্-ভীরু লোককে হেদায়েত, রহমত, ইল্‌ম ও প্রসন্নতা দান করেন বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন। আয়াতগুলি এই ঃ

هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ –

অর্থাৎ "হেদায়েত ও রহমত ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" (সূরা আ'রাফ, ১৯ রুকূ, ৯ পারা)

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ –

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে।" (সূরা বায়্যিনাহ্, ৩০ পারা।) তৃতীয় আয়াতটি হইল পূর্বপৃষ্ঠার আয়াতটি।

আবার ভয় হইতে পরহেযগারী জন্মে এবং ইহা আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেন বলিয়া উল্লেখ করেন; যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের পরহেযগারী পৌঁছিবে।" (সূরা হজ্, ৫ রুকূ, ১৭ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"কিয়ামতের মাঠে সমস্ত মানবকুলকে একত্র করত এমন গুরুগম্ভীর স্বরে এই ঘোষণা করা হইবে যে, দূরে ও নিকটে সর্বত্র লোকে শুনিতে পাইবে–'হে মানবমণ্ডলী, সৃষ্টির দিন হইতে অদ্যাবধি আমি তোমাদের কথা শুনিয়া আসিতেছি, তোমরা আজ আমর কথা শুন। আজ আমি তোমাদের কার্যাবলী

তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব। হে লোকগণ, তোমরা স্বয়ং এক প্রকার কৌলীন্য নির্ধারিত করিয়া লইয়াছ এবং আমি অন্য প্রকার কৌলীন্য স্থিরীকৃত করিয়াছি। তোমরা তোমাদের কৌলীন্যকে উন্নত করিয়াছ এবং আমার নির্ধারিত কৌলীন্যকে তুচ্ছ করিয়াছ। আমি বলিয়াছিলাম–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ – অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি পরহেযগার সে আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কুলীন।' (সূরা হুজুরাত, ২ রুকূ, ২৬ পারা) কিন্তু তোমরা (এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ) বল নাই। বরং তোমরা অমুকের পুত্র বলিয়া অমুককে শ্রেষ্ঠ করিয়াছ। আজ আমি আমার স্থাপিত কৌলীন্যের মর্যাদা দেখাইব এবং তোমাদের নির্ধারিত কৌলীন্যকে তুচ্ছ করিব।' (তৎপর বলা হইবে) 'পরহেযগারগণ (কুলীন) কোথায়?' অনন্তর একটি পতাকা উত্তোলন করা হইবে; আর পরহেযগার ব্যক্তিগণ ইহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে থাকিবে। (এইরূপ শোভাযাত্রাসহ) সকল পরহেযগার বিনা-বিচারে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। এইজন্যই পরহেযগারদের সওয়াব দ্বিগুণ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ – অর্থাৎ 'যে ব্যক্ত আল্লাহ্‌র নিকট দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তাহার জন্য দুই বেহেশ্‌ত।' (সূরা আর-রাহমান, ২ রুকূ, ২৭ পারা)

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন–"আল্লাহ্ স্বীয় গৌরবের শপথ করিয়া বলেন–'দুই ভয় ও দুই নিরুদ্বেগ কোন বান্দার মধ্যে একত্র করিব না। দুনিয়াতে আমাকে ভয় করিলে পরকালে নির্ভয় রাখিব। আর দুনিয়াতে নির্ভর থাকিলে পরকালে ভয়ে নিপতিত রাখিব।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সমস্ত দুনিয়া তাহাকে ভয় করে। আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে করে না, সব জিনিসই তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে।" তিনি বলেন–"তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করে, সে অধিক বুদ্ধিমান।" তিনি বলেন–মক্ষিকার মস্ত কতুল্য ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু মুসলমানের চক্ষু হইতে বহির্গত হইয়া গণ্ডস্থলে গড়াইয়া পড়িলে দোযখের অগ্নি সেই মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে না।" তিনি বলেন–"আল্লাহ্‌র ভয়ে যাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তাহার পাপ বৃক্ষ হইতে পক্কপত্রের ন্যায়

ঝরিয়া পড়ে।"তিনি বলেন–"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদন করে, দোযখে তাহাকে দগ্ধ করা হইবে না।" লোকে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনার উম্মতের মধ্যে কেহ কি বিনা-বিচারে বেহেশ্‌তে যাইবে?" তিনি উত্তরে বলিলেন–"যে-ব্যক্তি স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া রোদন করিবে, সে (বিনাবিচারে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে)।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র ভয়ে যে অশ্রুবিন্দু চক্ষু হইতে বাহির হয় এবং যে রক্তবিন্দু আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধকালে নির্গত হয়, আল্লাহ্‌র নিকট এই দুই বিন্দু অপেক্ষা অধিক প্রিয় অপর কোন বিন্দু নাই।" তিনি বলেন-"সাত শ্রেণীর কোন স্বয়ং আল্লাহ্‌র ছায়াতলে আশ্রয় পাইবে। যাহারা নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু বাহির হয়, তাহারা তন্মধ্যে এক শ্রেণী।"

হযরত হান্‌যালাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন হযরত (সা) সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। (উপদেশ শ্রবণে) আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় প্রবল হইয়া উঠিল এবং চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎপর আমি গৃহে গমন করিলাম। আমার পত্নী আমার সহিত বাক্যলাপ করিতে লাগিল। আমি দুনিয়ার কথাবার্তায় লিপ্ত হইয়া গেলাম। (এমন সময়) হযরতের (সা) উপদেশ এবং আমার রোদনের কথা মনে পড়িল। আমি গৃহ হইতে বাহির হইলাম এবং চিৎকার ও বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলাম 'হায়! হান্‌যালাহ মুনাফিক (কপট) হইয়া গিয়াছে।' হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন–'মুনাফিক হয় নাই।" তৎপর আমি হযরতের (সা) দরবারে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলাম–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, হান্‌যালাহ মুনাফিক হইয়া গিয়াছে।' হযরত (সা) বলিলেন–كَلَّالَمْ مُنَافِقُ حَنْظَلَةُ (অর্থাৎ হান্‌যালাহ্‌ কখনও মুনাফিক হয় নাই।) ইহার পর আমার সকল অবস্থা তাঁহাকে জানাইলাম। হযরত (সা) বলিলেন–'হে হান্‌যালাহ্‌, আমার নিকট আসিলে তোমাদের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই অবস্থা সর্বদা থাকিলে ফিরিশতাগণ তোমাদের গৃহে যাইয়া এবং রাস্তায় পাইলে তোমাদের সহিত মুসাফাহাহ (করমর্দন) করিত। হে হান্‌যালাহ্‌, ঐরূপ অবস্থা অল্পক্ষণই থাকে।"

ভয়ের ফযীলত সম্বন্ধে বুযুর্গগণের উক্তি– হযরত শিবলী (র) বলেন– "যে দিনই আমার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় প্রবল হইয়া উঠিত, সেই দিনই আমার অন্তরে হিকমতের নতুন পথ খুলিয়া যাইত এবং আমার উপদেশ গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত।" হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মু'আয (র) বলেন–"দুইটি ব্যাঘ্রের মধ্যস্থলে একটি শৃগাল থাকিলে ইহার অবস্থা যেরূপ হয়, পরকালে শাস্তির ভয় ও আল্লাহ্‌র রহমতের আশার মধ্যস্থলে মুসলমানের পাপের অবস্থা তদ্রূপ হইয়া থাকে।" তিনি অন্যত্র বলেন– 'দরিদ্রতাকে মানুষ যেরূপ ভয় করে, দোযখকে তদ্রূপ ভয় করিলে সে অবশ্যই বেহেশ্‌তী হইত।" লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"কিয়ামতের দিন কোন্‌ ব্যক্তি অধিক নিরাপদে থাকিবে?" তিনি বলিলেন–"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহকে অধিক ভয় করে।" এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে (র) জিজ্ঞাসা করিল–"যাঁহারা আল্লাহ্‌র এত অধিক ভয় দেখাইয়া থাকেন যে, হৃদয় টুকরা টুকরা হইয়া যায়, তাঁহাদের সাহচর্য অবলম্বন সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" তিনি বলিলেন–"যাঁহারা তোমাকে তদ্রূপ ভয় প্রদর্শন করেন, দুনিয়াতে তাঁহাদের সংসর্গেই থাক;' তাহা হইলে পরকালে নির্ভয়ে থাকিবে। যাহারা তোমাকে এ দুনিয়াতে ভয়শূন্য রাখে, অথচ তজ্জন্য তোমাকে পরকালে ভয়ে পতিত হইতে হইবে, এমন লোকের সাহচর্য অপেক্ষা ভয়প্রদর্শক লোকের সংসর্গ বহুগুণে উৎকৃষ্ট।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন– "যে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় নাই, তাহা উজার হইয়া গিয়াছে।"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করেন– "কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌ যে বলেনঃ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ – (যাহারা কার্য করে, অথচ আল্লাহ্‌কে ভয় করে)-এই কথা কি চুরি ও ব্যভিচার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে?" হযরত (সা) বলিলেন–"ঐ সকল কাজ (চুরি ও ব্যভিচার নহে, বরং) নামায, রোযা ও সদ্‌কা। বান্দা এই সমস্ত কাজ করিয়া আল্লাহ গ্রহণ করিবেন কিনা ভাবিয়া ভয় করিয়া থাকে।" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মুনকাদির (র) রোদন করত অশ্রু বদনমণ্ডলে লেপিয়া রাখিতেন এবং বলিতেন– "আমি শুনিয়াছি যেস্থান অশ্রুতে ভিজে তাহা দোযখের আগুনে জ্বলিবে না।" হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"রোদন কর। রোদন করিতে না পারিলে রোদনের

ভান কর।" হযরত কা'বুল আহ্বার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সদকা করা অপেক্ষা রোদন করত বদনমণ্ডল অশ্রুসিক্ত করাকে আমি অধিক মূল্যবান মনে করি।"

ভয়ের পরিচয়–অন্তরের এক বিশেষ অবস্থাকে ভয় বলে। ইহা হৃদয়ে উদ্ভূত অগ্নিসদৃশ। উহার উৎপত্তির যেমন কারণ আছে তদ্রূপ উহার বিশেষ ফলও আছে।

ভয় উৎপত্তির কারণ-ইলম (জ্ঞান) ও মা'রিফাত (তত্ত্ব পরিচয়) হইতে ভয় জন্মে। মানুষ যখন পরকালের পথের বিপদ দেখিতে পায় এবং তাহার বিনাশের বর্তমান ও ভবিষ্যত উপকরণসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে তখন বাধ্য হইয়াই তাহার অন্তরে ভয়ের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ইহা দুই প্রকার পরিচয় জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম–স্বীয় পাপ, দোষ, ইবাদতের আপদ, স্বভাবের জঘন্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া লওয়া এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও নিজের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত দয়া ও অযাচিত দানের দিকে লক্ষ্য করা। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, মনে কর এক ব্যক্তি বাদশাহ্র নিকট হইতে বহু পুরস্কার ও উপঢৌকন লাভ করিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বাদশাহ্র অন্তঃপুরে অপব্যবহার, ধন-ভান্ডার অপহরণ ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া দিল। তৎপর সে হঠাৎ একদিন জানিতে পারিল যে, বাদশাহ তাহার অপকর্ম স্বচক্ষে দেখিতেছেন এবং তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধগ্রহণকারী ও অসীম প্রতাপশালী অথচ বাদশাহ্র নিকট তাহার জন্য অনুরোধ করিবারও কেহ নাই, বাদশাহ্র সহিত কোন সম্বন্ধও নাই বা সে তাহার নৈকট্যও লাভ করিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় সে যখন তাহার অপকর্মের বিপদ বুঝিতে পারিবে তখন তাহার হৃদয়ে ভয় ও যন্ত্রণার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

দ্বিতীয়–নিজের পাপ ও দোষত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করত ভীত না হইয়া বরং আল্লাহ্র প্রবল প্রতাপ ও অপ্রতিহত শক্তির কারণে অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হওয়া। যেমন মনে কর, এক ব্যক্তি ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ এক ভীষণ জঙ্গলে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় সে স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া ভীত হইবে না, বরং এ-কথা চিন্তা করিয়া ভীত হইবে যে, মানুষ মারিয়া ফেলাই ব্যাঘ্রের স্বভাব এবং তাহার অসহায় অবস্থার প্রতি ব্যাঘ্র মোটেই লক্ষ্য করিবে না। এই প্রকার ভয়

পূর্বোক্ত ভয় অপেক্ষা পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। এইজন্যই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তি অবগত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়াছে যে, বিশ্বজগত বিনাশ করিয়া চিরকালের জন্য দোযখে নিক্ষেপ করিলেও তাঁহার রাজ্যের বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইবে না এবং ভালরূপে জানিয়া লইয়াছে যে, তিনি মানবীয় স্নেহ-মমতাদির বহু ঊর্ধ্বে, তবে মানবের মনে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার না হইয়া পারে না। পয়গম্বরগণের হৃদয়ও এইরূপ ভয়ে পরিপূর্ণ ছিল। অথচ তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহারা নিষ্পাপ। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে অধিক চিনিতে পারিয়াছে তাহার ভয়ও তত অধিক। এই কারণেই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমি অধিক জানি বলিয়াই অধিক ভয় করি।"

আর এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ – অর্থাৎ "আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্যে আলিমগণ ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে ভয় করে না।" অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে যত অল্প জানে, সে তত নির্ভয় হইয়া থাকে। হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল–"হে দাঊদ উত্তেজিত ব্যাঘ্রকে যেমন ভয় কর, আমাকে তদ্রূপ ভয় কর।

ভয়ের ফল ও প্রকাশ– উপরে ভয়ের উৎপত্তির কারণ বর্ণিত হইল। এখন ইহার ফল সম্বন্ধে বলা হইবে। ভয়ের ফল হৃদয়, শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়। ইহা হৃদয়ে প্রকাশ পাইলে দুনিয়ার লোভ-লালসা মন্দ বলিয়া মনে হয় ও কামনা লুপ্ত হয়। যাহার মনে বিবাহের কামনা বা আহারের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সে ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ কোন বনে আটকা পড়িলে বা কোন দুর্দান্ত নরপতির কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যেমন তাহার সকল অভিলাষ লুপ্ত হইয়া যায়, যাহার অন্তরে ভয়ের ফল প্রকাশিত হয়, তাহার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া পড়ে। ভয় তখন তাহার হৃদয়ে দীনতা আনিয়া দেয় এবং সে পার্থিব সকল বিষয় ভুলিয়া সর্বান্তঃকরণে কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ ও পরিণাম চিন্তায় ব্যাপৃত হয়। সেই সময় অহংকার, ঈর্ষা, দুনিয়ার লোভ-লালসা, মোহ প্রভৃতি তাহার অন্তরে স্থান পায় না। ভয়ের ফল শরীরে প্রকাশ পাইলে অবসন্নতা ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। ভয়ের ফল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাইলে এইগুলি আর পাপকার্যে অগ্রসর হইতে পারে না এবং যথারীতি ইবাদতে প্রবৃত্তও থাকে।

অবস্থাভেদে ভয়ের নামকরণ–অবস্থাভেদে ভয় বিভিন্ন প্রকার। যে ভয় মানুষকে কামনা-প্রবৃত্তি হইতে বাঁচাইয়া রাখে, তাহাকে ইফ্ফত (পবিত্রতা) বলে এবং যাহা হারাম হইতে রক্ষা করে তাহাকে অরা' (পাপভয়) বলে। আবার যে ভয় সন্দেহযুক্ত বিষয় বা বস্তু হইতে দূরে রাখে, তাহার নাম তাকওয়া (পরহেযগারী)। যাহা মানুষকে অভাব-মোচনের পরিমিত পাথেয় ব্যতীত তদতিরিক্ত প্রত্যেক বস্তু পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে, তাহাকে সিদ্ক বলে। ইফ্ফত ও অরা' তাক্ওয়ার অন্তর্গত এবং এই সমস্তই সিদ্ক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অপরপক্ষে যে ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই মানুষ চক্ষু মুছিয়া لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ – (আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কেহই পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।) পড়িয়া মোহাচ্ছন্ন-অবস্থায় অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, এমন ভয়কে ভয় বলা চলে না। ইহা নারীসুলভ উচ্ছ্বাস। কারণ, ভয়ের বিষয় হইতে মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে এবং ইহার ত্রিসীমায়ও আর আসে না। আস্তিনে সাপ লুকাইয়া আছে দেখিয়া কেহই – لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ পড়িয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না, বরং বস্ত্র হইতে তৎক্ষণাৎ সাপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়। হযরত যুন্নুন মিসরী (র) কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "কোন্ ব্যক্তি বাস্তবিক ভীত?" তিনি বলিলেন– "পীড়িত ব্যক্তি যেমন মৃত্যুর ভয়ে ক্ষতিকর লোভনীয় বস্তু পরিত্যাগ করে তদ্রূপ যে ব্যক্তি পাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সেই-ই প্রকৃত ভয় করিয়া থাকে।"

ভয়ের শ্রেণীবিভাগ–ভয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত— দুর্বল, প্রবল ও মধ্যম। তন্মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর ভয় উত্তম। যে ভয় স্ত্রী-জনোচিত উচ্ছ্বাসের ন্যায়, পরক্ষণেই লোপ পায় এবং মানুষকে কর্তব্যকর্মে রত রাখে না, ইহাই দুর্বল ভয়। যে ভয় মানুষকে হতাশ, অজ্ঞান ও পীড়িত করিয়া ফেলে এবং মৃত্যুর ভয়ে সর্বদা অস্থির রাখে, ইহাকে প্রবল ভয় বলে। দুর্বল ও প্রবল এই উভয় প্রকার ভয়ই মন্দ। তাওহীদ, মা'রিফাত ও মহব্বতের ন্যায় ভয় স্বয়ং মানুষের কাম্য গুণ নহে, কেননা ইহা আল্লাহ্র গুণরাজির অন্তর্ভুক্ত নয়। অজ্ঞানতা ও দুর্বলতা না থাকিলে ভয় জন্মিতে পারে না। কারণ, পরিণাম অজ্ঞাত থাকিলে এবং বিপদ পরিহারে অক্ষম হইলে অন্তরে ভয় জন্মে। কিন্তু কর্তব্যকর্মে উদাসীন লোকদের পক্ষে ভয় অবশ্যই একটি গুণ। কারণ, ভয় চাবুক্সদৃশ যাহা দ্বারা দুষ্ট বালককে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত করা যায় এবং চতুষ্পদ জন্তুকে রাস্তায় পরিচালনা করা চলে।

কিন্তু চাবুক যদি এত ক্ষীণ হয় যে, প্রহার না লাগে তবে ইহা দ্বারা অমনোযোগী বালককে পাঠে রত করিতে বা হঠকারী জন্তুকে চালাইতে পারা যায় না। আবার চাবুক যদি এত শক্ত হয় যে, ইহার আঘাতে বালক বা জন্তুর শরীর যখম হইয়া পড়ে; মুখ, হস্তপদ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ইহাও কাজের উপযোগী নহে। তাই চাবুক মধ্যম রকমের হওয়া উচিত এবং ভয়ও তদ্রূপ মধ্যম প্রকারের হওয়া কর্তব্য। মধ্যম প্রকারের ভয় মানুষকে পাপ হইতে বিরত রাখে এবং ইবাদতে উৎসাহ জন্মায়। যাহার ইলম যত বেশী, তাহার ভয়ও তত মধ্যম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কারণ, মধ্যম অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখনই ভয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আলিম ব্যক্তি তখনই আল্লাহ্র রহমতের দিকে মনোনিবেশ করে এবং ভয় হ্রাস পাইলে কর্তব্যকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভীত হয়।

অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহ্-ভীরু নহে, অথচ নিজেকে আলিম বলিয়া দাবী করে, সে আলিম নহে। সে যাহা কিছু শিখিয়াছে, তাহা ইলম নহে, বরং নিরর্থক বেহুদা পদার্থ। এইরূপ লোক ভিক্ষাজীবী জ্যোতিষগণক তুল্য। গণকগণ অদৃষ্ট সম্বন্ধে জানে বলিয়া দাবী করে, কিন্তু এই সম্বন্ধে তাহারা বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে।

নিজের ও আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভ করা; নিজেকে আপাদমস্তক ত্রুটিপূর্ণ এবং আল্লাহ্কে পূর্ণ প্রতাপশালী, অসীম ক্ষমতাশালী মনে করা ও তিনি বিশ্বজগতকে নিমিষের মধ্যে বিনাশ করিয়া দিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞানে কেবল ভয় ব্যতীত অন্য কোন মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় না। এইজন্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

أَوَّلُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ وَآخِرُ الْعِلْمِ تَفْوِيْضُ الْاَمْرِ اِلَيْهِ –

অর্থাৎ "প্রচণ্ড প্রতাপশালী আল্লাহকে জানা প্রথম জ্ঞান এবং সকল কাজই তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া দেওয়া শেষ জ্ঞান।" অর্থাৎ আল্লাহ্কে অপ্রতিহত প্রতাপশালী এবং কঠিন শাস্তিদাতা বলিয়া বিশ্বাস করা, আর বান্দা নিজে কিছুই নহে ও তাহা দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয় না ভাবিয়া নিজের সমস্ত কাজ তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া দিলেই পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিলে মানব কিরূপে নির্ভর চিত্তে থাকিতে পারে?

ভয়ের প্রকারভেদ–বিপদ বুঝিতে পারিলে ভয় জন্মে এবং সকলের ভয় এক

প্রকার হয় না। কেহ দোযখের ভয়ে ভীত হয়, আবার কেহবা এমন পদার্থের জন্য ভীত হয়, যাহা তাহাকে দোযখে লইয়া যাইতে পারে। যেমন, বিনা-তওবায় মৃত্যু ঘটিতে পারে বলিয়া কেহ ভীত হয়, আবার কেহবা তওবার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত হইবার ভয়ে শঙ্কিত থাকে। কেহ স্বীয় হৃদয় মোহাচ্ছন্ন ও কঠিন হইতে পারে বলিয়া ভয় করে। নিজের কুঅভ্যাস তাহাকে পাপের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে বা পার্থিব ধনসম্পদের কারণে তাহার অন্তরে অহংকার প্রবল হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া কেহ ভয় পায়। ইহজগতের যাহাদের উপর অবিচার-অত্যাচার করা হইয়াছে, পরকালে বিচারের দিন তজ্জন্য ধরা পড়িবার শঙ্কায় কেহ সন্ত্রস্ত হয়। নিজের দোষ ও পাপ কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাইলে লোকচক্ষে হেয় হইবার ভয়ে কেহ ভীত হয়। কেহবা আবার তাহার মনে যে চিন্তা উদয় হইতেছে, ইহা আল্লাহ্র নিকট মন্দ এবং তিনি সবই জানিতেছেন ও দেখিতেছেন ভাবিয়া ভীত হয়। এইরূপ বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লোকের মনে ভয় জন্মিয়া থাকে। সুতরাং যে বিষয়ের জন্য ভয় জন্মে, তাহা পরিত্যাগ করাই সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক। যেমন, কুঅভ্যাস পুনরায় পাপের দিকে টানিয়া লইতে পারে বলিয়া ভয় হইলে এইরূপ অভ্যাস সযত্নে পরিহার করা উচিত। মনে উদিত অপ্রিয় চিন্তা আল্লাহ্ জানিতে পারেন বলিয়া ভয় জন্মিলে তদ্রূপ চিন্তা হইতে অন্তর পবিত্র রাখা আবশ্যক। এবংবিধ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিয়া লওয়া উচিত।

অধিকাংশ লোকের ভয়ের স্বরূপ–মৃত্যুকালে ঈমান লইয়া মরিতে পারিবে কিনা এবং পরিণাম কিরূপ হইবে, এই ভয় প্রবল হওয়ার কারণে অধিকাংশ লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের ভয় হইল সৃষ্টির প্রারম্ভে অদৃষ্টে কি লিপিবদ্ধ হইয়াছে–সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য লিখিত হইয়াছে, এই ভয়ে ভীত হওয়া। কেননা, সেই সময় যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে–তদনুরূপই মৃত্যু ঘটিবে। ইহার মূল এই যে, একদা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা এক কিতাব লিখিয়াছেন, ইহাতে বেহেশ্তী লোকের নাম লিপিবদ্ধ আছে।" এই কথা বলিয়া হযরত (সা) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। তৎপর তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা আর একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাতে দোযখী লোকের নাম ও ঠিকানা লিখিত আছে।" তৎপর হযরত (সা) স্বীয় বাম হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন–"ইহাতে কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে না।"

(অর্থাৎ আল্লাহ্ যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদ্রূপই ঘটিবে।) ইহা অসম্ভব নহে যে, বেহেশ্তী লোকের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি দোযখী লোকের কার্য করিতে থাকিবে, এমনকি সকলেই তাহাকে দোযখী বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুর্ভাগ্যের পথ হইতে সৌভাগ্যের পথে ফিরাইয়া লইবেন।"

বাস্তবপক্ষে সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার ভাগ্যে সৌভাগ্য দেখা হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান এবং যাহার ভাগ্যে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য। অন্তিম অবস্থার অনুরূপ পারলৌকিক অবস্থা হইবে। (অর্থাৎ ঈমানের সহিত মরিলে সৌভাগ্যবান, আর বেঈমান হইয়া মরিলে হতভাগ্য।) এইজন্যই আরিফগণ ভয় করিয়া থাকেন এবং ইহাই পূর্ণাঙ্গ ভয়। আল্লাহ্ তা'আলার অপ্রতিহত প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে ভয় জন্মে, ইহা যেমন স্বীয় পাপের কারণে উদ্ভূত ভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আরিফগণের ভয়ও তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ। কারণ, আল্লাহ্র প্রতাপ-চিন্তা-সম্ভূত ভয় কখনও লোপ পায় না। অপরপক্ষে কেবল পাপের দরুনই ভীত হইয়া থাকিলে পাপী ব্যক্তি তওবা করত গর্বিত হইয়া বলিতে পারে–"আমি ত এখন পাপকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, আর ভয় কিসের?"

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামকে বলিয়াছিলেন–"হে দাঊদ, ভয়ংকর ব্যাঘ্রকে যেরূপ ভয় কর, আমাকেও তদ্রূপ ভয় কর।" এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সংহার কার্যে ব্যাঘ্রের কোন বিঘ্ন ঘটে না।

অশুভ মৃত্যু-ভয়–সাধারণত ধর্মভীরু লোক অন্তিমকালের ভয়েই ভীত থাকে। কারণ, মানব-মন পরিবর্তনশীল, এক অবস্থায় স্থির থাকে না এবং মৃত্যু-সময় বড় কঠিন। সেই সময় মনের অবস্থা কিরূপ হইবে, কেহই বলিতে পারে না। এক আরিফ (র) বলেন– "কোন ব্যক্তিকে আমি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত তাওহীদের বিশ্বাসী বলিয়া জানিলেও সে ক্ষণকালের জন্য আমা হইতে প্রাচীরের অন্তরালে চলিয়া গেলে আমি তাহাকে তাওহীদে বিশ্বাসী বলিয়া সাক্ষ্য দিব না। কেননা মানসিক অবস্থার প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হইতে থাকে।" অপর এক আরিফ বলেন–"আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, বাড়ীর বহির্দ্বার ও বাসগৃহের দরজা, এই দুইটির কোন্ স্থানে মরিলে তুমি ঈমানের সহিত মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিতে পছন্দ কর, তবে আমি বাসগৃহের দরজার কথা বলিব। কারণ, বহির্দ্বার পর্যন্ত যাইতে ঈমান থাকিবে কিনা, বলিতে পারি না।" হযরত আবূ দরদা রাযিয়াল্লাহু আন্হু শপথ করিয়া বলিতেন–"মৃত্যুকালে ঈমান

হারাইয়া যাইতে পারে, এই ভয় হইতে কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন—"মৃত্যুর সময় ঈমান হারাইয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে সিদ্দীকগণ সর্বদা ভীত থাকেন।" হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) আন্তিমকালে অধীরভাবে রোদন করিতেছিলেন। লোকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছিল—"আপনি রোদন করিবেন না। আল্লাহ্র দয়া আপনার পাপ অপেক্ষা অধিক।" উত্তরে তিনি বলিলেন— "আমি যদি বুঝিতে পারি, যে ঈমানের সহিত আমার মৃত্যু হইবে তবে পাহাড় পরিমাণ পাপ থাকিলেও আমি মোটেই ভয় করি না।"

এক বুযুর্গ এক ব্যক্তির হস্তে তাঁহার সমস্ত ধন সমর্পণপূর্বক অন্তিম অনুরোধ জানাইলেন—"ঈমানের সহিত আমার মৃত্যু হইলে অমুক নিদর্শন দেখিতে পাইবে। এই নিদর্শন দেখিলে এই ধন দ্বারা চিনি ও বাদাম খরিদ করত শহরের বালকের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিও এবং বলিও ইহা অমুকের আনন্দোৎসব, কারণ সে ঈমান লইয়া মরিয়া গিয়াছে। আর মৃত্যুসময়ে সেই চিহ্ন দেখিতে না পাইলে লোকদিগকে আমার জানাযার নামায পড়িতে নিষেধ করিও, মৃত্যুর পরে আমা দ্বারা লোকে প্রতারিত না হয় এবং আমি রিয়াকার না হই।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন— "মুরীদের পক্ষে পাপে পতিত হইবার ভয় আছে, কিন্তু আরিফ মুরশিদের পক্ষে কাফির হইবার ভয় থাকে।" হযরত বায়েযীদ বুস্তামী (র) বলেন—"আমি মসজিদে যাইবার সময় আমার কোমরে একটি পৈতা দেখিতে পাই, অর্থাৎ আমার ভয় হয় যে, মসজিদে যাইবার পরিবর্তে মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করি কিনা। প্রত্যহ পাঁচবার আমার মনের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে।"

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম স্বীয় সহচরকে বলিলেন—"তোমরা পাপের ভয় কর, কিন্তু আমরা (পয়গম্বরগণ) কুফরের ভয় করি।" একজন পয়গম্বর (আ) কয়েক বৎসর অন্নবস্ত্রের অভাবে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। দুঃখে জর্জরিত হইয়া অবশেষে তিনি রোদন করত আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করিলেন। ওহী আসিল—"আমি তোমাদের হৃদয়কে কুফ্র (নাস্তিকতা) হইতে রক্ষা করিয়াছি। ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়া চাহিতেছ?" তিনি নিবেদন করিলেন—"ইহা আল্লাহ্, আমি তওবা করিলাম এবং সন্তুষ্ট হইলাম।" তৎপর সেই ফরিয়াদের জন্য মর্মাহত হইয়া তিনি স্বীয় মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন।

ঈমান হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার অন্যতম কারণ কপটতা। এইজন্যই সাহাবাগণ (রা) সর্বদা কপটতার জন্য ভয় করিতেন। হযরত হাসান

বস্‌রী (র) বলেন—"আমি যদি জানিতাম যে, আমার কপটতা নাই তবে সমস্ত বিশ্বজগতের ধনসম্পদ অপেক্ষা আমি ইহাকে অধিক ভালবাসিতাম।" তিনি অন্যত্র বলেন—"অন্তরে-বাহিরে এবং মনে-মুখে পার্থক্য হওয়াও কপটতার অন্তর্ভুক্ত।

অন্তিমকালে ঈমান হারাইবার কারণ—মৃত্যুকালে ঈমান লোপ পায় কি না, এই ভয়েই সকল বুযুর্গ ভীত থাকেন। ঈমান লোপ পাইবার বহু গুপ্ত রহস্য আছে। কিন্তু সচরাচর দুইটি কারণে ঈমান নষ্ট হইয়া থাকে।

প্রথম কারণ—কোন বাতিল ও বিদ'আতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করত তদনুযায়ী সমস্ত জীবন অতিবাহিত করা এবং এইরূপ আকীদাকে ভুল বলিয়া মনে না করা। তদ্রূপ ভুল বিশ্বাস অনুযায়ী যে ব্যক্তি জীবন যাপন করিতেছে, আল্লাহ তা'আলা হয়ত মৃত্যুকালে তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং তজ্জন্য তাহার মূল ধর্ম-বিশ্বাসেও সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। তদ্রূপ বিপত্তি ঘটিলে মূল ধর্ম-বিশ্বাস দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ফলে সন্দিগ্ধ ঈমান লইয়া মরিতে হয়। ঈমান বিনষ্ট হওয়ার এইরূপ আশা দুই শ্রেণীর লোকের জন্য রহিয়াছে। যথাঃ—(১) বিদ'আতী লোক। (২) ইল্‌মেকালামে অভিজ্ঞ যে ব্যক্তি সর্বদা যুক্তি-তর্কের পথই অবলম্বন করিয়া চলে। তাহারা পরহেযগার হইলেও ঈমান হারাইবার তদ্রূপ আশঙ্কা আছে। (ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাসগুলিকে যে বিদ্যার সাহায্যে যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, ইহাকে ইলমে কালাম বলে।) কিন্তু যে সকল সরল প্রকৃতির লোক কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য নির্দেশ মানিয়া চলে, তাহাদের পক্ষে ঈমান নষ্ট হওয়ার তদ্রূপ আশঙ্কা নাই। এইজন্য রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—

عَلَيْكُمْ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ -

অর্থাৎ "বৃদ্ধ মহিলাগণ যেমন দলিল-প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করিয়া লয়, তোমাদের পক্ষেও হাদীসের কথা তদ্রূপ বিনা-প্রমাণেই বিশ্বাস করিয়া লওয়া উচিত। অধিকাংশ বেহেশ্‌তবাসীই সোজা সরল প্রকৃতির লোক হইবে।" এই কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তর্কবিতর্ক দ্বারা ধর্মকর্মের হাকীকত নির্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, তাঁহারা বুঝিতেন, যে-সে লোকের মধ্যে এইরূপ তর্কবিতর্কের ক্ষমতা থাকে না, তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই বিদ'আত কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় কারণ–বাস্তবপক্ষে অধিকাংশ লোকের ঈমান দুর্বল এবং সংসারাসক্তি প্রবল থাকে। এমতাবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হইলে মানুষ দেখিতে পায় যে, সংসারের সমস্ত ভালবাসার বস্তু তাহার নিকট হইতে জোরজবরদস্তি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে এবং দুনিয়া হইতে তাহাকে বলপ্রয়োগে এমন স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে যেখানে যাইতে তাহার মন চায় না। এই কারণে তখন মনে এক প্রকার বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি যে দুর্বল ভালবাসাটুকু ছিল তাহা লোপ পায়। মনে কর, কোন ব্যক্তি স্বীয় সন্তানকে ভালবাসে। কিন্তু সন্তান যদি তাহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন বস্তু কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়, তবে সেই ব্যক্তি সন্তানকে দুশমন জ্ঞান করে এবং সন্তানের প্রতি যে সামান্য ভালবাসাটুকু ছিল তাহা আর থাকে না। এইজন্যই শহীদের এত বড় মরতবা। কেননা, সেইব্যক্তি তখন মন হইতে দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভালবাসার পূর্ণ উচ্ছ্বাস হৃদয়ে লইয়া ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং মনেপ্রাণে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। সেই সময় মৃত্যুর আগমন পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ, অন্তরের তদ্রূপ অবস্থা বেশীক্ষণ থাকে না, শীঘ্রই মনের সেই ভাব পরিবর্তিত হইয়া পরে।

আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার পরিণাম–যাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা অন্যান্য সকল পদার্থের ভালবাসা অপেক্ষা অধিক, সেই ব্যক্তি নিজকে নিজে একেবারে সংসারের দিকে ছাড়িয়া দিতে পারে না, আল্লাহ্ তাহাকে ইহা হইতে বাঁচাইয়া রাখেন। এমন ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঈমান হারাইবার ভয় হইতে নিরাপদে থাকে এবং মৃত্যুকালে স্বীয় প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার উপায় মনে করিয়া আনন্দিত হয়। তখন মৃত্যুকে অপ্রিয় বলিয়া মনে হয় না। আল্লাহ্‌র ভালবাসা তাহার হৃদয়ে অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে এবং দুনিয়ার মহব্বত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহাই খাতিমা বিল খায়র অর্থাৎ শুভ-মৃত্যুর নির্দশন।

অশুভ মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের উপায়–যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঈমান হারাইবার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়, তাহাকে বিদ'আত হইতে বহু দূরে থাকিতে হইবে এবং কুরআন-হাদীসের কথা সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লইতে হইবে। তন্মধ্যে যে কথার অর্থ বুঝিতে পারা যায়, তাহা প্রাণপণে মযবুত করিয়া ধরিতে হইবে এবং যাহা বুঝিতে পারা না যায়, তাহাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কুরআন-হাদীসের সমস্ত কথাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সর্বদা এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে যেন

আল্লাহ্‌র মহব্বত হৃদয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল হইয়া উঠে ও দুনিয়ার মহব্বত ক্রমশ দুর্বল হইয়া যায়।

শরীয়তের নির্ধারিত সীমা রক্ষা করিয়া চলিলেই দুনিয়ার মহব্বত দুর্বল হইয়া যায়। কারণ, মানবের নিকট দুনিয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং হৃদয়ে তৎপ্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির করিলে এবং সংসারাসক্ত লোকদের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া আল্লাহ্-প্রেমিকদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলে মানবহৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত বলবান হইয়া ওঠে। দুনিয়ার মহব্বত প্রবল থাকিলে মৃত্যুকালে ঈমান হারাইবার আশঙ্কা থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেন–"তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্ত্রী সকল, তোমাদের আত্মীয়গণ ধন-সম্পদ যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, বাণিজ্য যাহার বন্ধ হওয়াকে ভয় করিতেছ এবং যে গৃহসমূহ পছন্দ করিতেছ, এই সমুদয় যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তবে আল্লাহ্‌র আদেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" (সূরা তওবা, ৩ রুকূ, ১০ পারা।)

ধর্মপথে বিভিন্ন মকামের ক্রমবিকাশের ধারা–ধর্মপথে বহু মকাম আছে, তন্মধ্যে প্রথমটি ইয়াকীন (ধ্রুব বিশ্বাস) ও মারিফাত (খোদা-পরিচিতি)। মারিফাত হইতে ভয় এবং ভয় হইতে সংসার-বিরাগ, সবর ও তওবার উদ্ভব হয়। সংসার-বিরাগ ও তওবা হইতে সিদ্‌ক ইখ্‌লাস এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির ও ধ্যান করিবার বাসনা জন্মে। এই শেষোক্তটি হইতে আবার প্রেম-ভালবাসার উদ্রেক হয়। মহব্বতের মকামই সর্বোচ্চ মকাম। তাস্‌লীম (পূর্ণ আনুগত্য), রিযা (সন্তুষ্টি) এবং শওক (অনুরাগ) মকামগুলি মহব্বতের অধীন। সুতরাং ইয়াকীন ও মারিফাতের পরে ভয় সৌভাগ্যের পরশমণি। ভয়ের পরবর্তী মকামসমূহে ভয়শূন্য ব্যক্তি উপনীত হইতে পারে না।

হৃদয়ে ভয় জাগ্রত করিবার উপায়–তিনটি উপায়ে হৃদয়ে ভয় জন্মে।

প্রথম উপায়– মানুষ নিজের ও আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় পাইলে অবশ্যই তাহার মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। কারণ, যে ব্যক্তি সিংহের কবলে পতিত হইয়াছে এবং সে সিংহ সম্বন্ধে ভালরূপে অবগত আছে, তাহার হৃদয়ে সিংহের ভয় জাগাইয়া তোলার জন্য এবং অন্য কোন উপায় অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। বরং স্বভাবতই তাহার সর্বশরীর সিংহ-ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে অপ্রতিহত প্রতাপশালী, অসীম ক্ষমতাবান ও সম্পূর্ণ

বেপরওয়া বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে এবং তৎসঙ্গে স্বীয় অসহায়তা, দুর্বলতা ভালরূপে অবগত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি উক্ত সিংহের কবলে পতিত ব্যক্তির ন্যায় ভয়ে প্রকম্পিত না হইয়া পারে না। এইজন্য রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, একবার হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্তাপন করিলেন এবং হযরত আদম আলায়হিস্ সালামও ইহার জওয়াবে প্রমাণ পেশ করিলেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বলিলেন–"হে আদম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বেহেশ্‌তে স্থান দিয়াছিলেন এবং অমুক অমুক নি'আমত দান করিয়াছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও কেন আপনি পাপ করিয়া নিজকে ও আমাদিগকে বিপদে নিপতিত করিলেন?" হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম জওয়াব দিলেন–"হে মূসা, আদিকালে এই পাপ আমার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ ছিল কিনা?" "হযরত মূসা (আ) বলিলেন–"হাঁ, লিপিবদ্ধ ছিল।" হযরত আদম (আ) বলিলেন –"তৎপর সেই আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করিবার ক্ষমতা কি আমার ছিল?" হযরত মুসা (আ) বলিলেন–"না।" এইরূপে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ) অভিযোগ খণ্ডিত করিলেন এবং হযরত মূসা (আ) নিরুত্তর হইয়া গেলেন।

যে মা'রিফাত হইতে ভয় জন্মে, ইহার বহু ধাপ আছে। যে ব্যক্তি যতটুকু মা'রিফাত হাসিল করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ততটুকুই আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম উভয়েই রোদন করিতেছিলেন। এমন সময় ওহী অবতীর্ণ হইল– "আমি তোমাদিগকে অভয় দান করিয়াছি, তথাপি তোমরা রোদন করিতেছ কেন?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন– "ইয়া আল্লাহ্ তোমার বাহানা হইতে আমরা নির্ভর নহি।" উত্তর আসিল–"তদ্রূপই মনে করিতে থাক।" মারিফাতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌কে ভয় না করিয়া থাকা উচিত নহে। নির্ভয়ে থাকিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি যে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, তাহা হয়ত কোন পরীক্ষা ছিল বা ইহাতে কোন রহস্য নিহিত ছিল, যাহা আমরা অবগত নহি।

বদর-যুদ্ধে প্রথমে মুসলমান সৈন্যদল দুর্বল হইয়া পড়িল। ইহাতে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভীত হইয়া বলিলেন–"ইহা আল্লাহ্, মুসলমানের এই দল বিনষ্ট হইলে ভূপৃষ্ঠ তোমার ইবাদত করিবার আর কেহই থাকিবে না।" ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলিলেন– "হে

আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি আল্লাহ্‌কে শপথ দিতেছেন? তিনি ত আপনাকে বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দিয়াছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন।" সেই সময় হযরত আবূ বকর (রা) ইয়াকীনের মকামে উপনীত ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন সিদ্দীক। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বস হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ অবশ্যই বিজয় দানের অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া দেখাইবেন। অপরপক্ষে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই অবস্থা ছিল যে, তিনি মহাকৌশলী আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন রাসূল। আর রিসালতের মকাম সিদ্দীকের মকাম হইতে উন্নতর। এইজন্য রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অবগত ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কার্যাবলী ও সমস্ত বিশ্বজগত পরিচালনায় তাঁহার যে মঙ্গলময় বিধান অহরহ কাজ করিয়া যাইতেছে, ইহার গুপ্ত রহস্য এবং তাঁহার নির্ধারিত বিষয়সমূহ কেহই অবগত নহে।

দ্বিতীয় উপায়–খোদা-পরিচিতি লাভে অক্ষম হইলে আল্লাহ্-ভীরু লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহা হইলে আল্লাহ্-ভীরু লোকদের ভয় তাহাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করিবে। গাফিল অসতর্ক লোকদের হইতে দূরে সরিয়া থাকা উচিত। অন্ধ অনুকরণ হইলেও এই পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিলে মানবহৃদয়ে ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ এইরূপ, যেমন বালক পিতাকে সর্প দর্শনে পলায়ন করিতে দেখিয়া পিতার দেখাদেখি সে-ও সর্প ভয়ে পলায়ন করে, অথচ সর্প যে অনিষ্টকর জন্তু ইহা বালক অবগত নহে। কিন্তু যাহারা সর্পের অনিষ্টকারিতার পরিচয় পাইয়া ভয় করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের ভয় অপেক্ষা শিশুদের এইরূপ দেখাদেখি ভয় নিতান্ত দুর্বল। কারণ, তাহারা পিতামাতাকে সর্প হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া যেরূপ ভয় করিতে শিখিয়াছে, আবার কোন সাপুড়িয়াকে কয়েকবার সর্প ধরিতে ও সর্পের গাত্রে হস্ত রাখিতে দেখিলে তদ্রূপ সেই ভয় লোপ পাইবে এবং তাহারাও সর্পের গাত্রে হাত দিবে। যে ব্যক্তি সর্পের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে অবগত আছে, সে কখনও সাপুড়িয়ার দেখাদেখি সর্পের গাত্রে হাত দিবে না। সুতরাং পরকাল সম্বন্ধে চিন্তাশূন্য ও মোহমুগ্ধ অজ্ঞান লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য। বিশেষত যে সকল মোহমুগ্ধ অজ্ঞান লোক আলিমের বেশে বিচরণ করেন, তাহাদের সংসর্গ সযত্নে বর্জন করা উচিত।

তৃতীয় উপায়–বর্তমান সময়ে আল্লাহ্-ভীরু লোক নিতান্ত বিরল। তাই এরূপ লোকের সংসর্গ পাওয়া না গেলে তাঁহাদের উপাখ্যান শ্রবণ করা ও

তাঁহাদের কিতাব পাঠ করা আবশ্যক। তাহা হইলেও হৃদয়ে পরকালের ভয় জাগ্রত হইবে। এই উদ্দেশ্যেই কয়েকজন পয়গম্বর ও ওলী-আল্লাহ্র ভয়ের কাহিনী এ-স্থলে বর্ণিত হইতেছে। যাহাদের বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি আছে, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, এই মহামনীষিগণ জগতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, আরিফ (চক্ষুষ্মান) ও পরহেযগার ছিলেন। তাঁহারাই যখন তদ্রূপ ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন তখন সাধারণ লোকের পক্ষে কত অধিক ভয় করিয়া চলা আবশ্যক।

ফিরিশ্তা ও পয়গম্বরগণের ভয়ের কাহিনী– বর্ণিত আছে যে, ইবলীস অভিশপ্ত হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম এবং হযরত মীকাঈল আলায়হিস সালাম সর্বদা রোদন করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের উপর ওহী অবতীর্ণ করিলেন–"তোমরা রোদন কর কেন?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন–"আমরা আপনার অভিসন্ধি হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।" উত্তর আসিল–"হাঁ, ইহাই উচিত, নিশ্চিন্ত থাকিও না।" হযরত মুহাম্মদ ইব্নে মুন্কাদির (র) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখ সৃজন করিলে সমস্ত ফিরিশ্তা রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপর আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করিলে তাঁহারা ক্রন্দন ক্ষান্ত করিলেন। কারণ, তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, দোযখ তাঁহাদের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "জিবরাঈল যখনই আমার নিকট আসিতেন তখনই তাঁহাকে আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত ও ভীত সন্ত্রস্ত দেখা যাইত।" হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহ আন্হু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আমি মীকাঈলকে কখনো হাসিতে দেখি নাই, (ইহা কারণ কি?)" হযরত জিবরাঈল (আ) উত্তর দিলেন–"যে সময় হইতে আল্লাহ্ দোযখের অগ্নি সৃষ্টি করিলেন, সেই সময় হইতে তিনি হাসেন না।"

নামায পড়িবার সময় হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের হৃদয়ে এমন ভয়ের উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিত যে, এক মাইল দূর হইতে লোকে সেই শব্দ শুনিতে পাইত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন–"হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম চল্লিশ দিন পর্যন্ত সিজদায় প্রণত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, এমনকি তাঁহার অশ্রু দ্বারা ঘাস অঙ্কুরিত হইয়াছে। তৎপর আকাশবাণী শুনা গেল–'হে দাঊদ, কেন কাঁদিতেছ? যদি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বা অনাবৃত থাক তবে বল, আহার, পানি ও বস্ত্র প্রেরণ করি।' ইহা শুনিয়া তিনি এমন জ্বলন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন যে, ইহার উত্তাপে কাষ্ঠে অগ্নি ধরিয়া গেল। যাহা হউক, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার

তওবা কবূল করিলেন। তৎপর তিনি নিবেদন করিলেন–'ইয়া আল্লাহ্, আমার পাপ আমার হাতের তালুতে অঙ্কিত করিয়া দাও যেন আমি ইহা ভুলিতে না পারি।' আল্লাহ্ তাঁহার প্রার্থনা কবূল করিলেন। ইহার পর যখনই তিনি পানাহারের দিকে হস্ত প্রসারিত করিতেন তখনই স্বীয় তালুতে অঙ্কিত পাপ দেখিয়া লইতেন এবং রোদন করিতে থাকিতেন। কোন কোন সময় তিনি এত অধিক রোদন করিতেন যে, অপূর্ণ পানপাত্র তাঁহাকে দিলে ইহা তাঁহার অশ্রুতে ভরিয়া যাইত।"

বর্ণিত আছে যে, রোদন করিতে করিতে হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল। সেই সময় তিনি নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, আমার রোদনে তোমার দয়া হয় না?" ওহী আসিল–"হে দাঊদ, রোদনের কথা ত বলিতেছ, কিন্তু পাপের কথা ভুলিয়া গেলে?" তিনি নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, পাপ কিরূপে ভুলিতে পারি? পাপ করিবার পূর্বে আমি যখন যবুর পড়িতাম তখন ইহা শুনিতে পানির স্রোত ও বায়ু-প্রবাহ বন্ধ হইত, পক্ষী আমার মাথার উপর সমবেত হইত এবং মানুষ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে এবং বন্য পশু আমার মিহ্রাবে আসিয়া জমা হইত। এখন সেই সমস্ত কিছুই হয় না। ইয়া আল্লাহ্, এখন ইহারা আমাকে ভয় ও ঘৃণা করে কেন?" আল্লাহ্ বলিলেন–"ইবাদতের প্রতি ভালবাসার জন্য পূর্বে ঐরূপ ঘটিত এবং এখন পাপের ভয়ে এইরূপ হইতেছে। হে দাঊদ, আদম (আ) আমার বান্দা। আমি তাহাকে স্বীয় করুণার হস্তে সৃজন করিয়াছিলাম, আমার রূহ তাহার মধ্যে ফুৎকার করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাকে সিজদা করিতে ফিরিশ্তাদিগকে আদশ করিয়াছিলাম, সম্মানের পরিচ্ছদ তাহার পরিধানে দিয়াছিলাম, সম্ভ্রমের মুকুট তাহার মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলাম এবং সে স্বীয় নির্জনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে হাওয়াকে সৃজন করিয়া উভয়কে একত্রে বেহেশ্তে থাকিবার অনুমতি প্রদান করিলাম। তৎপর সে একটি পাপ করিলে বিবস্ত্র ও অপমান করত আমি তাহাকে আমার দরবার হইতে বাহির করিয়া দিলাম। হে দাঊদ, শুন এবং বিশ্বাস কর যে, তুমি যখন আমার ইবাদত করিতে তখন আমি তোমার কথা শুনিতাম এবং যাহা প্রার্থনা করিতে, তাহা তোমাকে দান করিতাম। তুমি পাপ করিলে, আমিও (তওবা করিবার জন্য) তোমাকে অবকাশ দিলাম। এতদ্সত্ত্বেও তুমি তওবা করত আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলে আমি কবূল করিব।"

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে কাসীর (র) বলেন যে, হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম স্বীয় পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিতে চাহিলে সাত দিন পর্যন্ত কিছুই আহার করিতেন না, স্ত্রীপরিজনের মুখ দেখিতেন না। তৎপর বিজন প্রান্তরে গমন করত তদীয় পুত্র হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে তাঁহার অনুতাপ-গাথা শ্রবণের জন্য সাধারণ্যে ঘোষণা করিতে আদেশ দিতেন। তদনুযায়ী হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম ঘোষণা করিতেন–"হে খোদার বান্দাগণ, দাঊদের বিলাপ শুনিতে চাহিলে আস।" ইহা শুনিয়া দলে দলে নর-নারী জনপদ হইতে প্রান্তরে যাইত, বন্য পশু ও পক্ষী পাহাড় ও অরণ্য ছাড়িয়া চলিয়া আসিত। হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা দ্বারা তাঁহার বিলাপ আরম্ভ করিতেন। মানুষ ও সকল জীবজন্তু ইহা শুনিয়া 'হায়, আহা' বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিত। ইহার পর বেহেশ্ত-দোযখের বর্ণনা করিয়া তিনি নিজের বিলাপ আরম্ভ করিতেন। ইহা শ্রবণ করিয়া বহু শ্রোতা দুঃখ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। তখন হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম তাঁহার নিকট আগমন করত নিবেদন করিতেন–"আব্বাজান, বহু লোক মারা পড়িয়াছে, এখন বিলাপ বন্ধ করুন।" আর তিনি ঘোষণা করিতেন–"সকলেই তোমাদের আপন আপন মৃতদেহ লইয়া যাও।" তদনুযায়ী সকলেই মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া যাইত। একদিন দেখা গেল যে, চল্লিশ হাজার শ্রোতার মধ্যে ত্রিশ হাজার প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের দুই পরিচারিকা ছিল। ভয়ের সময় কাঁপিতে কাঁপিতে শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেন উৎপাটিত হইয়া না যায় তজ্জন্য তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিত।

হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালামের পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস্ সালাম শৈশবকালেই ইবাদত করিবার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন করিতেন। সমবয়স্ক বালকেরা তাঁহাকে খেলা করিতে আহবান করিলে তিনি বলিতেন–"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে খেলার জন্য সৃজন করেন নাই।" পনর বৎসর বয়সে তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করত অরণ্যবাস অবলম্বন করিলেন। একদা হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তিনি পানিতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন; অথচ পিপাসায় তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে এবং তিনি নিবেদন করিতেছেন–"ইহা আল্লাহ্, তোমার গৌরবের শপথ, তোমার নিকট আমার পদমর্যাদা কি, ইহা

অবগত না হওয়া পর্যন্ত আমি পানি পান করিব না।" তিনি এত অধিক রোদন করিতেন যে, মুখমণ্ডলের উপর দিয়া অশ্রুধারা বহিয়া যাইতে যাইতে মুখমণ্ডলের মাংসপেশী গলিয়া পড়িয়াছিল; ইহাতে দন্তপংক্তি বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং লোক যেন এই আকৃতি দেখিতে না পায় এইজন্য দুই টুকরা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা তিনি মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিতেন।

সাহাবা ও প্রাচীন বুযুর্গগণের ভয়ের কাহিনী–হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু কোন পক্ষী দর্শনেও বলিতেন–"হায়, আমি যদি তোমার ন্যায় (পক্ষী) হইতাম।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিতেন–"হায়, আমি যদি বৃক্ষ হইতাম।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলিতেন–"হায়, আমার অস্তিত্বই যদি না হইত।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু কুরআন শরীফের কোন আয়াত শ্রবণ করিলে বেহুশ হইয়া পড়িতেন এবং কখন কখন অবস্থা এমন গুরুতর হইয়া উঠিত যে, কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে শয্যাগত থাকিতে হইত। তিনি অত্যধিক রোদন করিতেন। এই কারণে বদনমণ্ডলে দুইটি দাগ পড়িয়াছিল। তিনি বলিতেন–"হায়, ওমর যদি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠই না হইত।" একদিন তিনি উষ্ট্রারোহণে কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন। পথপ্রান্তে এক গৃহে কোন এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ পাঠ করিতেছিল। তিনি সেই গৃহদ্বার অতিক্রম করিবার কালে পাঠক উচ্চারণ করে – اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ "অবশ্যই আপনার প্রভুর শাস্তি হইবেই হইবে।" (সূরা তূর, ১ রুকূ, ২৭ পারা।) এই আয়াত শুনিয়া তিনি উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পার্শ্বস্থ এক গৃহ প্রাচীরে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। লোকে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। এক মাস পর্যন্ত তিনি তদ্রূপ অবস্থায় রহিলেন; অথচ তাঁহার পীড়ার কারণ কেহই বুঝিতে পারে নাই।

হযরত হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্হুর পিতা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর বদনমণ্ডল ওযু করিবার সময় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিত। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন–"তোমরা কি জান না, আমি কাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে যাইতেছি?" হযরত মুসাওয়ার ইব্নে মখরমা (র) এত ভয়াতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কুরআন শরীফ শ্রবণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। একদা এক অপরিচিত ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে তাঁহার সম্মুখে এই আয়ত পাঠ করিল–

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ـ وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ـ

অর্থাৎ "যে-দিন পরহেযগারদিগকে পরম দয়ালু আল্লাহ্র সমীপে মেহমানদের ন্যায় সাদরে একত্রিত করা হইবে এবং পাপীদিগকে পিপাসার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। (সূরা মারইয়াম, ৬ রুকূ, ১৬ পারা।) ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন–"আমি কি পাপীদের দলভুক্ত, না পরহেযগারদের অন্তর্গত?" তিনি পাঠককে আবার ঐ আয়াত পড়িতে বলিলেন। সেই ব্যক্তি পুনরায় পাঠ করিল। এইবার শুনামাত্র এক বিকট চিৎকার করত তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

হযরত হাতেম আসেম (র) বলেন–"উত্তম স্থান পাইয়া গর্ব করিও না। বেহেশ্ত অপেক্ষা মনোরম স্থান আর নাই। হযরত আদম আলায়হিস সালামকে তথায় বাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখ, তৎপর তাঁহার কি দশা ঘটিল। অধিক ইবাদত করিয়াছ বলিয়াও অহংকার করিও না। কারণ, শয়তানও কয়েক সহস্র বৎসর ইবাদত করিয়াছিল। অধিক ইলম শিক্ষা করিয়াছ বলিয়াও গর্বে স্ফীত হইও না। কেননা, 'বল্আম, বাউ'র এত বিদ্যা শিখিয়াছিল যে, ইসমে আযম পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছিল। অথচ তাহার নিন্দা করিয়া এই আয়াত অবতীর্ণ হয়–

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ـ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ـ

অর্থাৎ 'তাহার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়। কুকুরের উপর বোঝা চাপাইলে হাঁপাইতে থাকে; আর না চাপাইলেও হাঁপাইতে থাকে।' (সূরা আরাফ, ২২ রুকূ, ৯ পারা।) বুযুর্গ লোকের দর্শন লাভ করিয়াও গর্বিত হইও না। কারণ, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সংসর্গ ও দর্শন লাভ করিয়াও ঈমানদার হইতে পারে নাই।"

হযরত আতা সাল্মীও আল্লাহ্-ভীরু লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি হাসেন নাই এবং আকাশের দিকেও দৃষ্টিপাত করেন নাই। একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র তিনি বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। দিবারাত্রের মধ্যে কয়েকবার তিনি নিজের শরীরে হাত

বুলাইয়া দেখিতেন যে, তাঁহার আকৃতি পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কিনা। আল্লাহ্র সৃষ্টির উপর কোন বিপদ বা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি আসিলে তিনি বলিতেন–"আমার পাপের কারণেই এই সমস্ত বিপদাপদ অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি মরিয়া গেলে লোকে এই সকল বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবে।" হযরত সররী সক্তী (র) বলেন–"প্রত্যহ আমার নাকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বলি– হয়ত আমার বদনমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন।"

হযরত ইমাম হাম্বল (র) বলেন–"ভয়ের একটি দরজা উন্মুক্ত পাইতে আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলাম। আমার প্রার্থনা কবূল হইল। তৎপর ভয়ে আমার বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। ইহা বুঝিতে পারিয়া আবার প্রার্থনা করিলাম। –'ইয়া আল্লাহ্, আমি যতটুকু ভয় সহ্য করিতে পারি ততটুকু ভয় আমাকে দান কর।' তখন আমার মন স্থির হইয়া গেল।" একজন আবিদ রোদন করিতেন দেখিয়া লোকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন–"কিয়ামত-দিবস যে সময়ে ঘোষণা করা হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ নিজ কার্যের প্রতিদান দেওয়া হইবে, সেই সময়ের ভয়ে আমি রোদন করিতেছি।" এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি কেমন আছেন?" তিনি বলিলেন–"সমুদ্রে নৌকা ভাঙ্গিয়া গেলে আরোহীদের প্রত্যেকেই যদি এক একটি তক্তা অবলম্বনে ভাসিতে থাকে তবে অবস্থা কিরূপ হয়?" সেই ব্যক্তি উত্তর দিল–"নিতান্ত কঠিন।" তিনি বলিলেন–"আমার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।" তিনি অন্যত্র বলেন–"হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, এক ব্যক্তিকে সহস্র বৎসর পরে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি আবার বলিলেন–"হায়, এই ব্যক্তি হয়ত আমিই হইব।" ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবে কিনা এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু না হইলে চিরকাল দোযখে থাকিতে হইবে, এই ভয়ে তিনি সর্বদা ভীত থাকিতেন বলিয়াই ঐ প্রকার উক্তি করিয়াছিলেন।

হযরত ওমর ইব্নে আবদুল আযীয (র)-এর এক পরিচারিকা একদা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বলিতে লাগিল–"হে আমীরুল মুমিনীন, আমি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখিয়াছি।" তিনি অতিশীঘ্র স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। সে নিবেদন করিল–"আমি দেখিলাম, দোযখের অগ্নি প্রজ্বলিত করত তদুপরি 'পুলসিরাত' স্থাপন করা হইয়াছে এবং ফিরিশ্তাগণ খলীফাদিগকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। সর্বপ্রথমে খলীফা আবদুল মালিক ইব্নে মারওয়ানকে আনিয়া পুলসিরাত

পার হইয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। তিনি কিছু দূর যাইতে না যাইতেই ধপ্ করিয়া দোযখে পড়িয়া গেলেন। তিনি বলিলেন–"তাড়াতাড়ি বল, তৎপর কি হইল?" পরিচারিকা বলিতে লাগিল–"ইহার পর আবদুল মালিকের পুত্র ওলীদকে আনা হইল। তিনিও পিতার ন্যায় দোযখে পড়িয়া গেলেন।" তিনি বলিলেন–"তারপর কি দেখিলে, শীঘ্র বল।" পরিচারিকা বলিতে লাগিল–"তারপর আবদুল মালিকের পুত্র সুলায়মানকে আনয়ন করা হইল। তিনিও পূর্ববর্তীদের ন্যায় দোযখে পড়িলেন।" ইহার পর কি হইল বর্ণনা করিবার জন্য পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন। সে বলিতে লাগিল–"হে আমীরুল মুমিনীন, তৎপর আপনাকে আনা হইল।" এতটুকু বলা মাত্রই হযরত ওমর ইব্নে আবদুল আযীয (র) বিকট চিৎকার করত অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। পরিচারিকা আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিল–"আপনাকে নিরাপদে পুলসিরাত পার হইয়া যাইতে দেখিয়াছি।" পরিচারিকা বৃথাই চিৎকার করিতেছিল; কোন মতেই তাঁহার সংজ্ঞা হইল না। তিনি পূর্বের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতে এবং হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন।

হযরত হাসান বসরী (র) কয়েক বৎসর পর্যন্ত হাসেন নাই। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তাঁহাকে বন্দী করিয়া শিরচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি এত কঠোর রিয়াযত (সাধনা) ও ইবাদত করা সত্ত্বেও রোদন করেন কেন?" তিনি বলিলেন–"আমার ভয় হয় যে, হয়ত আমার দ্বারা এমন কোন কার্য সম্পন্ন হইয়াছে যাহার কারণে আল্লাহ আমাকে শত্রু জ্ঞান করিয়া লইয়াছেন এবং তিনি বলিতেছেন "তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; কিন্তু আমি কখনও তোমার প্রতি দয়া প্রর্দশন করিব না।"

যাহা হউক, এবংবিধ বহু উপাখ্যান আছে। এখন ভাবিয়া দেখ, এই সকল মহামনীষী ভয়ে কত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, আর তুমি একেবারে নির্ভয় হইয়া রহিলে। তাঁহাদের ভয় এবং তোমার ভয়শূন্যতার কারণ হয়ত এই যে, তাঁহারা ছিলেন অধিক পাপী এবং তুমি একবারে নিষ্পাপ; অথবা তাঁহাদের মারিফাত ছিল–তাঁহারা সব বুঝিতেন: অপর পক্ষে তুমি মারিফাত হইতে বঞ্চিত–কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। সত্য কথা ত এই যে, তুমি অধিক পাপী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় অসতর্কতা ও মূর্খতার দরুন তুমি নির্ভয় এবং ঐ সকল মহামনীষী এত অধিক ইবাদত, রিয়াযত-মুজাহাদা করা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম পরিচয়-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঐরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

অবস্থাভেদে ভয় ও আশার প্রয়োগ ব্যবস্থা–এ-স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বহু হাদীসে ভয় ও আশা, এই দুইটির ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে; এমতাবস্থায় এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই অবলম্বন করা উচিত। ভয় ও আশা দুইটিই মানসিক রোগের ঔষধ; অবস্থাভেদে উভয়টিই উপকারী। সুতরাং ঔষধের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বরং উপকারিতা আছে। কারণ, ভয় ও আশা মানুষের পূর্ণ গুণ নহে। মানুষ যদি আল্লাহর ভালবাসায় সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকে এবং আল্লাহ্‌র ধ্যান তাহাকে একেবারে বেষ্টন করিয়া লয়, আর সে যদি আদি-অন্ত সমস্ত ভুলিয়া গিয়া কেবল বর্তমানে কি হইতেছে তাহাই লক্ষ্য করে, এমন কি সময়টি পর্যন্ত ভুলিয়া সময়ের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে লইয়া একান্তভাবে ব্যাপৃত থাকে, তবেই সে চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং ইহাই তাহার পূর্ণ গুণ। ভয় ও আশার দিকে মনোনিবেশ করিলে ইহাই আল্লাহ্-প্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ্-প্রেমে বিভোর তদ্রূপ ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। এইজন্য যাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে, তাহার মনে আল্লাহত্ম রহ্মতের আশা প্রবল রাখা আবশ্যক। কারণ, আশা ভালবাসা বৃদ্ধি করে। ইহজগত পরিত্যাগ করত পরপারে যাইবার সময় আল্লাহ্‌র মহব্বতে পরিপূর্ণ অন্তর লইয়া যাওয়া উচিত। তাহা হইলেই আল্লাহ্‌র সহিত মিলন সুখের হইবে; কেননা প্রেমাস্পদের মিলনেই পরম আনন্দ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় ভিন্ন অন্য সময়ে মানুষ যদি ধর্মকর্মে উদাসীন ও শিথিল থাকে তবে ভয়কে তাহারা মনে প্রবল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ, এমন ব্যক্তির জন্য আশা মারাত্মক বিষতুল্য। আবার পরহেযগার নীতিবান ব্যক্তির মনে ভয় ও আশা সমান থাকা উচিত। মানুষ ইবাদত ও সৎকার্যে প্রবৃত্ত থাকিলে রহমতের আশা রাখা উচিত। কেননা প্রার্থনার সময় ভালবাসায় মন নির্মল হয় এবং আশা হইতেই ভালবাসার উৎপত্তি হয়। অপরপক্ষে পাপের সময় হৃদয়ে ভয় প্রবল করা কর্তব্য। যাহারা অভ্যাসের দাস, মুবাহ কার্যের সময়েও তাহাদের মনে ভয় প্রবল করিয়া রাখা আবশ্যক। অন্যথায় তাহারা পাপে নিপতিত হইয়া পড়িবে।

অতএব এ-পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভয় ও আশা এমন দুইটি ঔষধ যাহার উপকারিতা এবং ক্রিয়া মানব-হৃদয়ের অবস্থার তারতম্যানুসারে পরিবর্তিত হয়। এইজন্যই ভয় ও আশার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, এ-প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া চলে না।

চতুর্থ অধ্যায়

অভাবগ্রস্ততা ও সংসার-বিরাগ (যুহ্দ)

চারটি মূল পদার্থের উপর ধর্মপথের ভিত্তি স্থাপিত আছে। দর্শন খণ্ডে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। চারটি মূল পদার্থ এই ঃ (১) মানবাত্মা, (২) আল্লাহ্, (৩) ইহকাল ও (৪) পরকাল। তন্মধ্যে দুইটি গ্রহণযোগ্য এবং অপর দুইটি বর্জনোপযোগী। আল্লাহ্কে পাইবার জন্য নিজেকে ভুলিয়া যাইতে হইবে এবং পরকাল পাইবার আশায় ইহকালকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং আমিত্ব হইতে মুখ ফিরাইয়া আল্লাহ্র দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করা আবশ্যক এবং দুনিয়াকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া আখিরাতের দিকে দৌড়িয়া চলা কর্তব্য। ভয়, সবর এবং তওবা ইহার সূচনা; কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত ইহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। দুনিয়ার মহব্বত দূরীকরণের উপায় ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও ইহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করা পরিত্রাণের উপায়। এ-স্থলে ইহার ব্যাখ্যা করা হইবে। ইহার সারমর্মই হইল দরিদ্র্যতা ও সংসার-বিরাগ। প্রথমে এই দুইটির হাকীকত ও ফযীলত বর্ণিত হইবে।

অভাবগ্রস্ততা ও সংসার-বিরাগের হাকীকত–যাহার অভাব মোচনের পরিমিত বস্তু নাই এবং ইহা উপার্জন করিবার শক্তিও নাই, তাহাকে অভাবগ্রস্ত বলে। মানুষের প্রথম অভাব অস্তিত্বের এবং তৎপর হইল তাহার জীবিত থাকিবার আবশ্যকতা। জীবনের সঙ্গে আহার ও ধনের অভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু দ্রব্যের অভাব ও আবশ্যকতা আসিয়া জুটিয়াছে। যে-সকল পদার্থে মানুষের অভাব মোচন হইতেছে, ইহার কোনটাই তাহার ক্ষমতা ও আয়ত্তে নহে; অথচ উহা না হইলে মানুষ জীবনধারণ করিতে পারে না। অপরপক্ষে যাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁহাকে ধনী বলে। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত এরূপ ধনী অপর কেহই হইতে পারে না। মানব, জিন, ফিরিশতা, শয়তান ইত্যাদি যাহা কিছু বর্তমান আছে, তৎসমুদয়ের অস্তিত্ব এবং জীবন তাহাদের দ্বারা হয় নাই। সুতরাং বাস্তবপক্ষে তাহাদের সকলেই ফকীর। এইজন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ -

অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহ্ই ধনী এবং তোমরা সকলেই ফকীর।" (সূরা মুহাম্মদ, ৩৪ রুকূ, ২৬ পারা।) হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম ফকীরের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন–

اَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِيْ وَالْاَمْرُ بِيَدِ غَيْرِيْ فَلَا فَقِيْرَ اَفْقَرُ مِنِّيْ

অর্থাৎ "আমি আমার কাজে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; অথচ ইহার কুঞ্জি অন্যের হাতে। এমতাবস্থায় আমা অপেক্ষা ফকীর আর কে হইতে পারে?" আল্লাহ্ তা'আলাও এই অর্থেই বলেন ঃ

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ - اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ -

অর্থাৎ "আপনার প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা ধনী ও করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে দূর করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের পরে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন।" (সূরা আন'আম, ১৬ রুকূ, ৮ পারা।) ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সৃষ্টিমাত্রই দরিদ্র।

সূফীগণের ভাষায় ফকীরের অর্থ– উপরে যেরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যে-ব্যক্তি নিজেকে তদ্রূপ অক্ষম ও দরিদ্র জ্ঞান করে ও ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া লয় এবং ইহাও বুঝে যে, ইহকাল ও পরকালে কোন বস্তুর উপরই তাহার কোন ক্ষমতা নাই—সৃষ্টির প্রারম্ভে যেমন কোন ক্ষমতা ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না, সেই ব্যক্তিকে সূফীগণের পরিভাষায় ফকীর বলে।

শয়তানের প্রবঞ্চনা ও ইহার প্রতিকার –সূফীগণের বর্ণিত অভাবগ্রস্ততার অর্থ শ্রবণ করত নির্বোধগণ বলে, ইবাদত একেবারে ছাড়িয়া না দেওয়া পর্যন্ত ফকীর হওয়া যায় না। কারণ, ইবাদত করিলে পুণ্য হয় এবং ইহা ইবাদতকারীর জন্য সঞ্চিত থাকে। সুতরাং তাহাকে ফকীর বলা যাইতে পারে না। এইরূপ উক্তি বেঈমানি ও কুফ্রির বীজ। শয়তান এই বীজ নির্বোধ লোকদের হৃদয়ে বপন করিয়া থাকে। যে-সকল মূর্খ নিজকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে, শয়তান এইরূপেই তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করে। শয়তান ভাল কথার মন্দ অর্থ বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে নির্বোধ লোকেরা প্রতারিত হয়; কারণ তদ্রূপ অর্থ বাহির করাকেই তাহারা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করে। এই নির্বোধদের উক্তি

এইরূপ। মনে কর, কোন ব্যক্তি বলে–"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে পাইয়াছে, সে সবই পাইয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই অভাবী হইতে পারিবে।" যাহাই হউক, যে-ব্যক্তি পূর্ণভাবে ইবাদত করিতে থাকে, সে-ই ফকীর। যেমন ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন–"ইবাদত আমার নিজস্ব নহে, ইহার উপর আমার কোন ক্ষমতাও নাই, তথাপি আমি ইহাতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি।" যাহাই হোক, সূফীগণ যাহাকে ফকীর বলিয়া অভিহিত করেন, তাহার ব্যাখ্যা করা এখানে উদ্দেশ্য নহে। পক্ষান্তরে সর্ববিষয়ে অভাবগ্রস্ত; সুতরাং সর্বতোভাবে অভাবী; এ-কথার ব্যাখ্যা করাও উদ্দেশ্য নহে। বরং কেবল ধনের দিকে মানুষ যে অভাবী হয়, শুধু ইহাই এ-স্থলে বর্ণিত হইবে।

ফকীরের শ্রেণীভেদ–লক্ষ লক্ষ অভাবের মধ্যে মানব জীবন যাপন করে। ধন ইহাদের অন্যতম। ধনের অভাব হওয়ার কারণ হইল, ধন হস্তগত না হওয়া বা ইচ্ছাপূর্বক ধন পরিত্যাগ করা। যে-ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক ধন পরিত্যাগ করে, তাহাকে যাহিদ বা সংসার-বিরাগী বলে। যে-ব্যক্তি আদৌ ধন পায় নাই, তাহাকে ফকীর বলে। ফকীর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) যাহার ধন নাই; কিন্তু উপার্জন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এমন ব্যক্তিকে লোভী ফকীর বলে। (২) যে-ব্যক্তি ধন উপার্জনের চেষ্টা করে না; আবার বিনা-চেষ্টায় হাতে আসিলে ফেলিয়াও দেয় না; কেহ দিলে গ্রহণ করে, না দিলেও সন্তুষ্ট থাকে, এরূপ ব্যক্তিকে 'ফকীরে কানে' (তুষ্ট ফকীর) বলে। (৩) যে-ব্যক্তি ধনার্জনে চেষ্টা করে না, কেহ দিলেও গ্রহণ করে না, এমন কি ধনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, তাহাকে যাহিদ (সংসার-বিরাগী) বলে।

প্রথমে দরিদ্রতার ফযীলত বর্ণনা করা হইবে এবং তৎপর সংসার-বিরাগের ফযীলত প্রদর্শিত হইবে। কারণ, ধনে লোভ সত্ত্বেও ধন হইতে বঞ্চিত থাকা একটি ফযীলতের কাজ।

অভাবগ্রস্ততার ফযীলত–অভাবগ্রস্ততার এত ফযীলত যে, আল্লাহ্ তা'আলা لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ– আয়াতে 'মুহাজির' শব্দের পূর্বে 'ফকীর' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"বৃহৎ পরিবারবিশিষ্ট পরহেযগার দরিদ্র ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।" তিনি বলেন–"হে বিলাল, সংসার হইতে যাইবার সময় ধনী না হইয়া যেন দরিদ্র হইয়া যাইতে পার, ইহার চেষ্টা কর।" তিনি বলেন–"আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র লোক, ধনী লোকের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।"

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে–"ধনী লোকের চল্লিশ বৎসর পূর্বে দরিদ্রগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" এই হাদীসে লোভী দরিদ্রদের কথা বলা হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত হাদীসে দরিদ্রতা সত্ত্বেও যাহারা সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল থাকে, তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র লোক উত্তম এবং দুর্বল লোক সর্বাগ্রে বেহেশ্‌তে বিচরণ করিতে থাকিবে।" তিনি বলেন–"আমার দুইটি পেশা আছে। যে-ব্যক্তি এই দুইটিকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে। (ইহাদের) একটি দরিদ্রতা ও অপরটি জিহাদ।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন–'আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ভূপৃষ্ঠের সকল পাহাড়-পর্বত স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিবেন, যেন আপনি উহাদিগকে যে-স্থানে ইচ্ছা ব্যবহার করিতেন পারেন।" হযরত (সা) বলিলেন–হে জিবরাঈল, আমি ইহা চাহি না। এই সংসার গৃহশূন্য লোকের গৃহ এবং নির্ধন লোকের ধন ও দুনিয়াতে ধন সঞ্চয় করা নির্বোধ লোকের কাজ।" ইহা শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন–"হে মুহাম্মদ (সা), সুদৃঢ় কথার উপর আল্লাহ্ আপনাকে অটল রাখুন।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম একদা এক নিদ্রিত লোকের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন–"জাগ্রত হও এবং আল্লাহ্‌র যিকির করিতে থাক।" সেই ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া বলিল– "হে ঈসা (আ), আমাকে কি করিতে হইবে? আমি ত দুনিয়াদারদের জন্য দুনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।" তৎপর ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"হে ভ্রাতঃ, তবে শয়ন কর, খুব আরামে নিদ্রা যাও।" হযরত মূসা আলায়হিস সালাম একদিন কোন স্থানে যাইবার কালে দেখিলেন, এক ব্যক্তি একটি ইটের উপর মাথা রাখিয়া ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে। একটি কম্বল ব্যতীত তাহার আর কিছুই ছিল না। ইহা দেখিয়া হযরত মূসা আলাহিস সালাম নিবেদন করিলেন–"ইহা আল্লাহ্, তোমার এই বান্দার জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার নিকট কিছুই নাই।" তৎক্ষণাৎ ওহী আসিল–"হে মূসা, তুমি কি জান না যে, যাহাকে আমি অধিক ভালবাসি, তাহাকে দুনিয়া হইতে সম্যকরূপে বিমুখ রাখি?"

হযরত আবূ রাফে' রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহে একদা একজন মেহমান আসিল। সেই সময় তাঁহার গৃহে খাদ্য কিছুই ছিল না। হযরত (সা) আমাকে বলিলেন–'অমুক ইয়াহূদীর নিকট যাইয়া কিছু আটা ধারে আন।' আমি ঐ ইয়াহূদীর নিকট গেলাম। কিন্তু সে দিবে না বলিয়া শপথ করিল। ফিরিয়া আমি হযরত (সা)-কে ইহা জানাইলাম। তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্র শপথ, আকাশ ও পৃথিবীতে আমি আমীন (বিশ্বস্ত)। ইয়াহূদী ধার দিলে আমি অবশ্যই ইহা পরিশোধ করিতাম। এখন আমার এই বর্মটি লইয়া গিয়া তাহার নিকট বন্ধক রাখিয়া কিছু আটা আন।" আমি হযরত (সা)-এর বর্মটি বন্ধক রাখিলাম। এই সময় হযরত (সা)-এর মন প্রফুল্ল করিবার উদ্দেশ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ –

لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا الاية –

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা) বহু সম্প্রদায়কে ধনৈশ্বর্য দান করত তাহাদের পার্থিব জীবনের শোভা আমি বৃদ্ধি করিয়াছি। আপনি সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। উহা তাহাদের বিপদের কারণ হইয়াছে। আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকট যে-বস্তু আছে, তাহা অতীব শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।" (সূরা তাহা, ৮ রুকূ, ১৬ পারা।)

হযরত কা'বুল আহ্বার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, হযরত মূসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল– "তুমি দরিদ্রতায় নিপতিত হইলে বলিও مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِيْنَ – অর্থাৎ "ধন্য দরিদ্রতা! তুমি পুণ্যাত্মা-লোকদের নিদর্শন।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমাকে যখন দোযখ দেখানো হয়, তখন অধিকাংশ দোযখবাসীকে ধনী দেখিতে পাইলাম এবং আমাকে যখন বেহেশ্ত দেখানো হয় তখন অধিকাংশ বেহেশ্তবাসীকে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র দেখিতে পাইলাম।" তিনি আরও বলেন–"আমি বেহেশ্তে অতি অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'তাহারা কোথায়?' উত্তর হইল–

شَغَلُهُنَّ الْاَحْمَرَانِ الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانِ – অর্থাৎ "অলঙ্কার ও রঞ্জিত বেশভূষা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" বর্ণিত আছে যে, একজন পয়গম্বর নদী তীর দিয়া গমনকালে দেখিতে পাইলেন, এক ধীবর আল্লাহ্র নাম লইয়া জাল ফেলিয়াছে, অথচ জালে মাছ বাধিতেছে না। কিন্তু অপর এক ধীবর শয়তানের নাম লইয়া জাল ফেলিতেছে, অথচ তাহার জালে প্রচুর মাছ বাধিতেছে। ইহা দেখিয়া পয়গম্বর (আ) নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, এ-সমস্তই তোমার আদেশে হইতেছে। কিন্তু ইহাতে কি রহস্য আছে, বুঝিতে পারিতেছি না।" বেহেশ্ত ও দোযখে ঐ ধীবরদ্বয়ের স্থান উক্ত পয়গম্বর (আ)কে দেখাইবার জন্য আল্লাহ্ ফিরিশতাকে আদেশ করিলেন। তৎপর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, প্রথম ধীবরের স্থান বেহেশতে এবং দ্বিতীয় ধীবরের স্থান দোযখে। ইহা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"ধনৈশ্বর্যের কারণে নবীগণের মধ্যে হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের পুত্র হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম ও আমার সাহাবাগণের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সর্বশেষে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"ধনী লোক বহু কষ্টে বেহেশতে যাইবে।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ যাহাদিগকে ভালবাসেন, তাহাদিগকে বিপদাপদে নিপতি করেন এবং যাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাদিগকে তিনি 'ইফতিনা' বলেন।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, ইফতিনা কাহাকে বলে?" তিনি বলিলেন–"যে ব্যক্তি একেবারে নির্ধন এবং পরিবার-পরিজনহীন।" হযরত মূসা আলায়হিস সালাম নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমার বন্ধু? আমিও তাহদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিব।" আল্লাহ্ বলিলেন–"যে-ব্যক্তি একেবারে নির্ধন।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, একে অপরের নিকট যেন কৃতকর্মের কৈফিয়ত প্রদর্শন করে, দরিদ্রগণের নিকট তদ্রূপ কৈফিয়ত প্রদর্শন করিয়া কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ বলিবেন–"হে আমার বান্দাগণ, দুনিয়াতে তোমাদিগকে ধন না দেওয়ার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, তোমাদিগকে হেয় ও তুচ্ছ করিয়া রাখিব, বরং তোমরা যেন আমার নকিট হইতে মহাপুরস্কার ও সম্মান লাভ কর, এইজন্যই তোমাদিগকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলাম। অদ্য

এই জনতার সারিতে সারিতে তোমরা প্রবেশ কর এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাদিগকে অন্ন-বস্ত্র দান করিয়াছে, তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া আইস। কেননা, তাহাদিগকে আমি তোমাদের সহায়ক করিয়াছিলাম।" সেই দিন সকল লোক ঘর্মে নিমজ্জিত থাকিবে। কিন্তু দরিদ্রগণ জনতার মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং দুনিয়াতে যাহারা তাহাদের প্রতি উপকার করিয়াছিল তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিবে।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"দরিদ্রদের উপকার কর এবং তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখ। কারণ, তাহাদের সম্বল পথে রহিয়াছে।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন—"হে আল্লাহ্‌র রাসূল ইহা কি?" তিনি বলিলেন—"কিয়ামতের দিন দরিদ্রের প্রতি আদেশ হইবে যে, যাহারা দুনিয়াতে তোমাদিগকে এক লুক্‌মা অন্ন, এক ঢোক পানি, একখণ্ড বস্ত্র দিয়াছে, তাহাদিগকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেহেশতে চলিয়া যাও।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে সময় লোকে ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় ও অট্টালিকাদি নির্মাণে লিপ্ত হইবে এবং দরিদ্রগণকে শত্রু জ্ঞান করিবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে চার প্রকার বিপদে নিপতিত করিবেন— (১) দুর্ভিক্ষ, (২) রাজার অত্যাচার, (৩) বিচারকের অবিচার ও (৪) শত্রু ও কাফিরদের পরাক্রম।" হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন—"যে-ব্যক্তি কাহাকেও দরিদ্রতার জন্য তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং ধনের জন্য সম্মানের পাত্র বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র) অভিশপ্ত।" বুযুর্গগণ বলেন যে, হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) দরবারে ধনীগণ যেরূপ লাঞ্ছিত হইত তদ্রূপ কোথাও হইত না। কারণ, তিনি তাহাদিগকে সম্মুখে সারিতে স্থান দিতেন না; দরিদ্রদিগকে তাঁহার নিকটে বসাইয়া ধনীদিগকে সকলের পশ্চাতের সারিতে রাখিতেন। লুকমান স্বীয় পুত্রকে বলেন—"ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্র ব্যক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। কারণ, তাহার আল্লাহ এবং তোমার আল্লাহ এক ও অভিন্ন।"

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মু'আয (রা) বলেন—"দরিদ্রতাকে লোকে যেমন ভয় করে, দোযখকে তদ্রূপ ভয় করিলে দরিদ্রতা ও দোযখ উভয় হইতে সে নির্ভয় হইত; দুনিয়া যেরূপ অন্বেষণ করে বেহেশ্‌ত তদ্রূপ অন্বেষণ করিলে উভয়টিই সে পাইত এবং বাহিরে অপরকে যেরূপ ভয় করে, অন্তরে আল্লাহ্‌কে সেরূপ ভয় করিলে সে উভয় জগতে সৌভাগ্যবান হইত।" এক ব্যক্তি দশ সহস্র

স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকনস্বরূপ হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হামের (র) নিকট উপস্থিত করিল। কিন্তু তিনি ইহা গ্রহণ করিলেন না। সেই ব্যক্তি অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিলে তিনি বলিলেন—"তুমি কি মনে কর, এই অর্থের বিনিময়ে দরিদ্রের তালিকা হইতে আমি আমার নাম কাটাইয়া ফেলিব? আমি কখনই ইহা করিব না।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে বলেন—"কিয়ামত-দিবস আমার সহিত থাকিতে চাহিলে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন কর, ধনীদের ভালবাসা অর্জন কর এবং তালি লাগাইবার পূর্বে বস্ত্র পরিত্যাগ করিও না।'

অল্পে পরিতুষ্ট ফকীরের ফযীলত— রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আল্লাহ্ যাহাকে ইসলাম ধর্মের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অভাব মোচনের উপযোগী ধন দিয়াছেন, আর ইহাতে যে সন্তুষ্ট থাকে, তবে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান।" তিনি বলেন—"হে দরিদ্রগণ, অকপট মনে দরিদ্রতায় সন্তুষ্ট থাক। তাহা হইলে দরিদ্রতার সওয়াব পাইবে; অন্যথায় সেই সওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। এই হাদীসে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, দরিদ্রতার সওয়াব হইতে লোভী দরিদ্র বঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু অন্যান্য বহু হাদীসে প্রকাশ্যভাবে বলা হইয়াছে যে, তদ্রূপ সওয়াব পাইবে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন— "প্রত্যেকটি বস্তুর এক একটি কুঞ্জি আছে এবং সবরকারী দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা বেহেশতের কুঞ্জি। কেননা তাহারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে উপবেশ করিবে।" তিনি বলেন—"নিজের নিকট যাহা আছে, তাহাতেই যে-দরিদ্র পরিতুষ্ট থাকে এবং আল্লাহ্ যে-জীবিকা দান করেন, ইহাতেই যে দরিদ্র সন্তুষ্ট হয়, তাহাকে আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।" তিনি বলেন যে, কিয়ামতের দিন ধনী-দরিদ্র সকলেই বলিবে—"হায়, দুনিয়াতে যদি নিজের জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যের অতিরিক্ত না পাইতাম।"

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিলেন—"ভগ্নহৃদয় লোকের নিকটে আমাকে অনুসন্ধান কর।" তিনি নিবেদন করিলেন—"তদ্রূপ ব্যক্তি কে?" আল্লাহ বলিলেন—"সবরকারী দরিদ্রগণ।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, কিয়ামত-দিবস আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন—"আমার খাস ও প্রিয় বান্দাগণ কোথায়?" ফিরিশ্‌তাগণ নিবেদন করিবে—"তাহারা কে?" আল্লাহ্ বলিবেন—"তাহারা মুসলমান দরিদ্র, যাহারা আমার দানে সন্তুষ্ট ছিল। তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে লইয়া

যাও।" যে-সময় লোক হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকিবে, সে সময় তাহারা বেহেশতে চলিয়া যাইবে। হযরত আবূ দরদা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"ধনের বৃদ্ধি দেখিয়া যে-ব্যক্তি আনন্দিত হয়, কিন্তু পরমায়ু প্রতিক্ষণ কমিতেছে বলিয়া দুঃখিত হয় না, তাহার বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত হইয়াছ। সুব্হানাল্লাহ্, পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে, এমতাবস্থায় ধন বৃদ্ধি পাইলে কি লাভ?" হযরত আমের ইব্নে কাইস (র) শাক-রুটি খাইতেছেন দেখিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন–"হে আমের দুনিয়ার এ-সামান্য দ্রব্যে তুমি পরিতুষ্ট হইয়াছ? তিনি বলিলেন– আমি এমন লোক দেখিয়াছি যাহারা ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও সামান্য পদার্থে পরিতুষ্ট আছে।" সেই ব্যক্তি বলিল–"তেমন লোক আবার কাহারা?" তিনি বলিলেন–"যাহারা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়া লইয়াছে, তাহারাই ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতম বস্তুতে পরিতুষ্ট হইয়া থাকে।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হু একদা কতক লোকের সহিত উপবেশন করত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার পত্নী আসিয়া বলিলেন–"আপনি ত এ-স্থানে বসিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আল্লাহ্র শপথ, গৃহে আজ কিছুই নাই।" তিনি বলিলেন–"ওহে মহিলা, আমার সম্মুখে বিপদে পরিপূর্ণ অতি দুর্গম পথ রহিয়াছে এবং দুনিয়ার বোঝা যাহার কম হইবে, সেই-ই এই পথ অতিক্রম করিয়া যাইবে।" ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার স্ত্রী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কৃতজ্ঞ ধনী অপেক্ষা ধৈর্যশীল দরিদ্র উৎকৃষ্ট–ধৈর্যশীল দরিদ্র ও কৃতজ্ঞ ধনীর মধ্যে কে উৎকৃষ্ট, এ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু ধৈর্যশীল দরিদ্রই যে উৎকৃষ্ট, ইহাতে কোন ভুল নাই। উপরে যে-সকল হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই এই কথার প্রমাণ। উহার রহস্য এই–যে বস্তু আল্লাহ্র যিকির ও তাঁহার মহব্বতের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা মন্দ। কাহারও পক্ষে দরিদ্রতা এই পথে বাধা সৃষ্টি করে, আবার কাহারও পক্ষে ধন অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ফলকথা এই যে, অভাব মোচনের পরিমিত ধন একেবারে ধনশূন্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই পরিমাণ ধন দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং পরকালের পাথেয়রূপে পরিগণিত। এইজন্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করিতেন–"ইয়া আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবার-পরিজনকে অভাব মোচনের উপযোগী জীবিকা দান কর।" অভাব মোচনে যে পরিমাণ ধনের আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক ধন না পাইয়াই মঙ্গল। লোভ ও পরিতুষ্টি বিষয়ে যখন ধনী ও দরিদ্র উভয়ের অবস্থা একরূপ হয় তখন ধন সম্বন্ধে উপরিউক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য।

লোভী ধনী অপেক্ষা লোভী দরিদ্র উৎকৃষ্ট– লোভী দরিদ্র এবং লোভী ধনী উভয়ই ধনাসক্তিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে ও ধন উপার্জনের জন্যই তাহারা ব্যাপৃত রহিয়াছে। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ধন উপার্জনে অক্ষম হইলে তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিফল পরিশ্রম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে বলিয়া সংসারের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মে। মুসলমানের অন্তরে যে পরিমাণে সংসারাসক্তি হ্রাস পায়, আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তখন দুনিয়া তাহার নিকট কারাগারে পরিণত হয়। এই কথা সে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও মৃত্যুকালে দুনিয়ার প্রতি তাহার মনের আকর্ষণ অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে ধনী ব্যক্তি দুনিয়ায় উন্নতি করিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে তাহার মনে সংসারাসক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে সংসার ছাড়িয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং মৃত্যুকালে লোভী দরিদ্র ও লোভী ধনীর অবস্থার মধ্যে বিরাট প্রভেদ দেখা যায়। এমন কি ইবাদত ও মুনাজাতের সময়ও এইরূপ পার্থক্য ঘটে। কারণ, দরিদ্র ব্যক্তি ইবাদত এবং মুনাজাতে যে আনন্দ পায়, ধনীর ভাগ্যে তাহা কখনও ঘটে না। ধনীর যিকির কেবল রসনার অগ্রভাগ ও মনের বাহির হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মানব-হৃদয় ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ না হইলে এবং দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ না হইলে আল্লাহ্র যিকিরের মাধুর্য ইহাতে উদ্ভব হয় না।

তুষ্ট ধনী অপেক্ষা তুষ্ট দরিদ্র উৎকৃষ্ট–ধনী এবং দরিদ্র উভয়েই নিজ নিজ অবস্থায় পরিতুষ্ট থাকিলেও ধনী অপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট। কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি স্বীয় ধনে কৃতজ্ঞ ও পরিতুষ্ট থাকে, ধন অপহৃত হইলে দুঃখিত না হয়, বরং পূর্বের ন্যায় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্তির প্রভাবে তাহার মন পবিত্র হইয়া উঠে, তৎসঙ্গে সংসারাসক্তি ও পার্থিব সুখসম্ভোগে তাহার হৃদয় কলুষিত না হয়; অপরপক্ষে দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধন-লোভী হয়, লোভে তাহার মন দুষিত হয় বটে, কিন্তু দুঃখকষ্টে জর্জরিত হইয়া হৃদয় পরিষ্কার ও সংশোধিত হইয়া উঠে। এমতাবস্থায় পরিতুষ্ট ধনী ও লোভী দরিদ্রের অবস্থা প্রায় সমান সমান হইয়া পড়ে। আর এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট কতটুকু প্রিয় বা অপ্রিয়, ইহা দুনিয়ার প্রতি তাহাদের অনাসক্তি বা আসক্তি দ্বারা নির্ণীত হয়।

লোভী দরিদ্র অপেক্ষা অনাসক্ত ধনী উৎকৃষ্ট–ধন থাকা বা না থাকা যদি ধনী ব্যক্তির নিকট সমান বলিয়া গণ্য হয়, ধনের প্রতি তাহার মন সম্পূর্ণরূপে

অনাসক্ত থাকে এবং হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার ন্যায় কেবল পরের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যেই সে ধন রাখিয়া থাকে। তবে এমন ধনীর অবস্থা লোভী দরিদ্রের অবস্থা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার অবস্থা এই ছিল যে, একদা তিনি লক্ষ মুদ্রা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। সেই দিন তিনি রোযা রাখিয়াছেন, গৃহে ইফ্তারের জন্য ব্যঞ্জনাদি ছিল না; অথচ তিনি একটি মুদ্রা মূল্যের গোশ্ত খরিদ করেন নাই। কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি এইরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত না হয় এবং লোভী দরিদ্র ও পরিতুষ্ট ধনীর মানসিক অবস্থা সমান সমান থাকে তবে দরিদ্র ব্যক্তিই উত্তম। কেননা, এমন ধনী ব্যক্তি সদ্কা ও খয়রাত অপেক্ষা অপর কোন উৎকৃষ্ট কার্য সম্পন্ন করে না।

দরিদ্রের ত্রিবিধ সৌভাগ্য ও মর্তবা–হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, দরিদ্রগণ এক প্রতিনিধি দ্বারা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে এই নিবেদন জানাইল–"ইহকাল ও পরকালের সমস্ত পুণ্য ত ধনী লোকেরা লুটিয়া লইল; তাহারা দান-খয়রাত করে, যাকাত দেয় এবং হজ্ব ও জিহাদ করে। আমরা এই সকল করিতে পারি না।" হযরত (সা) দরিদ্রগণের দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করত বলিলেন–

مَرْحَبًا بِكَ وَبِمَنْ جِئْتَ عِنْدَهُمْ –

অর্থাৎ "তুমি এবং তুমি যাহাদের পক্ষ হইতে আসিয়াছ, তাহারা ধন্য। আমি তাহাদিগকে ভালবাসি। তুমি তাহাদিগকে যাইয়া বলিবে–যাহারা আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের আশায় দরিদ্রতায় ধৈর্য অবলম্বন করে, তাহাদের মর্যাদার তিনটি স্তর আছে, যাহা ধনীগণ পাইবে না। প্রথম বেহেশ্তে এমন উচ্চ প্রাসাদ আছে যাহাকে দুনিয়াবাসিগণ যেরূপ নক্ষত্ররাজি দেখিয়া থাকে, বেহেশ্তবাসিগণ তদ্রূপ দেখিবে। আর এই স্তরে দরিদ্র পয়গম্বর, দরিদ্র মুসলমান, দরিদ্র শহিদগণ ব্যতীত আর কেহই যাইতে পারিবে না। দ্বিতীয়, দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশত বৎসর পূর্বে বেহেশতে যাইবে। তৃতীয়, দরিদ্র ব্যক্তি যদি একবার এই কলেমা পড়ে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –

এবং ধনী লোকও ইহা একবার পড়িয়া দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে

বিতরণ করিয়া দেয় তথাপি ধনী ব্যক্তি দরিদ্রের সমান মরতবা পাইবে না।" হযরত (সা)-এর পক্ষ হইতে এই সুসংবাদ পাইয়া দরিদ্রগণ বলেন–رَضِيْنَا رَضِيْنَا – অর্থাৎ "আমরা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইলাম।"

উপরিউক্ত হাদীসের শেষাংশে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কলেমা সম্বন্ধে এই উদ্দশ্যে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্র যিকির এমন এক বীজ যাহা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, দুঃখকষ্টক্লিষ্ট হৃদয়ে বপন করিলে অতি সহজে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া থাকে। পার্থিব আনন্দে বিভোর ধনীর হৃদয়ে এই বীজ স্থান পায় না। কঠিন প্রস্তরের উপর পানি পড়িলে যেমন অতি দ্রুতবেগে গড়াইয়া যায় তদ্রূপ ধনীর হৃদয় হইতেও আল্লাহ্র যিকির-স্বরূপ বীজ তেমনিভাবেই গড়াইয়া পড়ে।

মোটের উপর কথা এই যে, যে-ব্যক্তি যত অধিক আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত রহিয়াছে এবং তাঁহার নৈকট্য ও ভালবাসা লাভ করিয়াছে, সে তত অধিক উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। দুনিয়ার প্রতি মানব-হৃদয়ের আসক্তি যত হ্রাস পায়, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ও তাঁহার স্মরণ-ব্যাপৃতিও তত বৃদ্ধি পায়। ধনী ব্যক্তির হৃদয় ধনজনের চিন্তা হইতে কখনই একেবারে শূন্য হইতে পারে না। এমতাবস্থায় ধনী ও দরিদ্র কিরূপে সমান হইবে? ধনী ব্যক্তি হয়ত মনে করিতে পারে–ধনের চলাচলের পথে আমি একটি মাধ্যমমাত্র, একদিক দিয়া ইহা আসে, অন্যদিক দিয়া চলিয়া যায়। এইজন্যই ধনাসক্তি হইতে আমার মন একেবারে নির্মুক্ত। ধনীর পক্ষে এইরূপ কল্পনা এক বিষম ধোঁকা। কিন্তু সে যদি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার ন্যায় মানসিক অবস্থায় উন্নত হইতে পারে তবে বরং তাহাকে ধনে অনাসক্ত বিবেচনা করা সত্য হইতে পারে। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একদা লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ জ্ঞানে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন অথচ , নিজের আবশ্যকতার কথা মনে উদয়ও হয় নাই। সংসারে অনাসক্ত থাকিয়া যদি ধন সঞ্চয় সম্ভবপর হইত তবে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কেন এত সংযমের সহিত দূরে থাকিতেন এবং অপরকেও তদ্রূপ দূরে থাকিতে আদেশ দিতেন? এমন কি দুনিয়াকে মূর্তি ধারণপূর্বক সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তিনি 'দূর! দূর! করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন–"তোমরা দুনিয়াদারদের ঐশ্বর্যের

দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। কারণ, ইহার ছায়া তোমাদের ঈমানের মাধুর্য কাড়িয়া লয়।" এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার মাধুর্য হৃদয়ে জাগিয়া ওঠে এবং আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধুর্য বিনষ্ট হয়। কেননা, দুই আসক্তি এক মনে স্থান পায় না। বিশ্বজগতেও দুই প্রকার পদার্থই মৌজুদ আছে—একটি সত্য, অপরটি অসত্য। অসত্যের সহিত যে-পরিমাণে মন লাগাইবে, আল্লাহ্ হইতে সেই পরিমাণে দূরবর্তী হইবে; আবার অসত্যের প্রতি মন যত অনাসক্ত হইবে, আল্লাহ্‌র সহিত মন তত বিজড়িত হইবে। হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন—"দরিদ্র ব্যক্তি কোন বস্তুর জন্য চেষ্টা করিয়া না পাইলে হতাশ মনে যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ইহা ধনী লোকের সহস্র বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" এক ব্যক্তি হযরত বিশ্‌রে হাফীর (র) নিকট নিবেদন করিল—"আমার বিরাট পরিবার, অথচ আমি একেবারে কপর্দকশূন্য। আমার জন্য দু'আ করুন।" তিনি বলিলেন—"যখন তোমার পরিবারের জন্য কোনই খাদ্যদ্রব্য থাকিবে না এবং ইহা সংগ্রহে তুমি অক্ষম হইয়া পড়, আর এই ব্যথায় তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন তুমি আমার জন্য দু'আ করিও। কারণ তোমার তৎকালীন দু'আ, আমার দু'আ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে।"

অভাবের সময় দরিদ্রের কর্তব্য—অভাবের সময় দরিদ্রের পক্ষে মানসিক সন্তোষ অক্ষুণ্ন রাখা এবং প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ না করা কর্তব্য। আন্তরিক অবস্থা অনুসারে দরিদ্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। **প্রথম শ্রেণী**—যে-দরিদ্র দরিদ্রতাকে আল্লাহ্-প্রদত্ত একটি প্রকৃত দান মনে করিয়া ইহাতে প্রফুল্ল, আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় পাত্রগণকে দরিদ্রতা দিয়া থাকেন বলিয়া বিশ্বাস করে। **দ্বিতীয় শ্রেণী**—যাহারা দরিদ্রতার উপর সন্তুষ্ট হয় না বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি অসন্তুষ্টও নহে। যেমন, কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রোপচার করা হইলে তাহার নিকট ইহা ভাল না লাগিলেও অস্ত্র প্রয়োগকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর দরিদ্রগণ প্রথম শ্রেণীর সমকক্ষ নহে; তথাপি দরিদ্রতার জন্য দুঃখিত হইয়াও আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট থাকা কম কথা নহে। **তৃতীয় শ্রেণী**—যাহারা দরিদ্রতার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম। ইহাতে দরিদ্রতার সওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। বরং দরিদ্রদিগকে এই বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, যাহা করা উচিত, আল্লাহ্ তাহাই করিতেছেন। তাঁহার কার্যে অসন্তুষ্ট হওয়া ও প্রতিবাদ করিবার অধিকার কাহারও নাই। দরিদ্রতার জন্য লোকসমক্ষে দুঃখ

প্রকাশ করাও উচিত নহে; বরং ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকা আবশ্যক।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন—"দরিদ্রতা কখন কখন শাস্তির কারণও হইয়া থাকে; মন্দ স্বভাব, অদৃষ্টের নিন্দা এবং আল্লাহত্ম বিধানের প্রতি বিরক্ত প্রকাশ, ইহার নিদর্শন। আবার দরিদ্রতা কখন কখন সৌভাগ্যের কারণ হয়; সৎস্বভাব, অদৃষ্টের নিন্দা না করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ইহা নির্দশন।" হাদীস শরীফে আছে—"স্বীয় দরিদ্রতা ও অভাব গোপন রাখা একটি পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার।" ধনী লোকের সঙ্গে মেলামেশা না করা, তাহাদের নিকট নিজকে খাট না করা এব! তাহাদিগকে খোশামোদ না করা দরিদ্র ব্যক্তির কর্তব্য। হযরত সুফিয়ান (র) বলেন—"দরিদ্র লোক ধনী লোকের আশেপাশে ঘুরাফেরা করিলে তাহাকে রিয়াকার জ্ঞান করিবে এবং বাদশাহ্‌র আশেপাশে থাকিলে তাহাকে চোর বলিয়া জানিবে।"

দরিদ্র লোকের অপর এক কর্তব্য এই যে, নিজের খরচ যথাসাধ্য কমাইয়া অতি সামান্য হইলেও কোন কোন সময় দান করিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"একটি মুদ্রার সওয়াব কোন সময় লক্ষ মুদ্রার সওয়াব অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন—"কোন্ স্থলে এরূপ হয়?" তিনি বলিলেন—"যে স্থলে কোন ব্যক্তির নিকট দুইটি মুদ্রার অধিক থাকে না, অথচ সে আল্লাহর রাস্তায় একটি মুদ্রা দান করে, ইহা ক্রোড়পতির লক্ষ মুদ্রা দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দান গ্রহণের নিয়ম—অন্যের দান গ্রহণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। সন্দেহযুক্ত ও স্বীয় অভাব মোচনের অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করা উচিত নহে। যে-দরিদ্র অপর দরিদ্রের অভাব মোচনে নিযুক্ত আছে, সেই ব্যক্তি যদি স্বীয় অভাব মোচনের অতিরিক্ত ধন প্রকাশ্যে গ্রহণ করিয়া গোপনে অপর দরিদ্রের অভাব মোচনে ব্যয় করে, তবে ইহা অতীব উৎকৃষ্ট কাজ। সিদ্দীকগণ ব্যতীত অপর কেহ এইরূপ কাজ করিতে পারে না। যাহার এবংবিধ গোপন দানের ক্ষমতা নাই, তাহার পক্ষে নিজের অভাব মোচনের অতিরিক্ত বস্তু গ্রহণ করা উচিত নহে; ধনস্বামী নিজেই তখন উপযুক্ত অভাবগ্রস্ত লোক অনুসন্ধান করত দান করিবে।

দান গ্রহণ করিবার পূর্বে দাতার সংকল্প জানিয়া লওয়াও অবশ্য কর্তব্য। কারণ, দাতা হয়ত ভালবাসার নির্দশনস্বরূপ হাদিয়া দিতেছে অথবা সদ্‌কা

দিতেছে কিংবা সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে রিয়ার বশীভূত হইয়া ধন বিতরণ করিতেছে। দাতার মনে যদি গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের ভাব না থাকে তবে হাদিয়াস্বরূপ যাহা প্রদান করা হয়, তাহা গ্রহণ করা সুন্নত। যদি জানা যায় যে, উপস্থিত পদার্থের মধ্যে কিয়দংশে অনুগ্রহ প্রদর্শনের ভাব আছে আর কিয়দংশে এরূপ ভাব নাই তবে যতটুকুতে অনুগ্রহমূলক ভাব নাই তাহা গ্রহণ করিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি ঘৃত, পনির ও একটি ছাগল লইয়া আসিল। হযরত (সা) ঘৃত ও পনির গ্রহণপূর্বক ছাগলটি ফেরত দিলেন। হযরত ফত্‌হে মুসেলীর (র) সম্মুখে এক ব্যক্তি পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা উপস্থিত করিল। তিনি একটি মুদ্রা তুলিয়া লইলেন এবং অবশিষ্ট সমস্ত মুদ্রা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"হাদীস শরীফে আছে যে, বিনা প্রার্থনায় কেহ কাহাকেও কিছু প্রদান করিলে সে যদি ইহা প্রত্যাখ্যান করে তবে সে যেন আল্লাহ্‌র দান প্রত্যাখ্যান করিল। হযরত হাসান বসরীও (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এক ব্যক্তি একদা স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রায় পরিপূর্ণ থলিয়া এবং বহু উৎকৃষ্ট রঙিন বস্ত্র তাঁহার জন্য আনয়ন করিল; তিনি ইহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না এবং বলিলেন—"যে-ব্যক্তির নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণার্থ লোক সমাগম হয়, সে যদি আগন্তুকদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করিবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই পাইবে না।" আখিরাতের সওয়াবই তাঁহার মজলিস অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; এই কারণেই হয়ত তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। আর তিনি হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, মজলিসের কারণেই সেই ব্যক্তি উপঢৌকনাদি লইয়া আগমন করিয়াছিল এবং তজ্জন্যই তিনি বিশুদ্ধ সংকল্প নষ্ট হইতে দেন নাই। এক ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে কিছু দিতে চাহিল। সেই বন্ধু বলিল— "এই উপঢৌকন গ্রহণ করিলে তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখ। যদি বৃদ্ধি পায় তবে গ্রহণ করিব।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতেন না এবং বলিতেন—"যদি বুঝিতাম যে, দাতা ইহা মুখে প্রকাশ করিবে না, তবে আমি গ্রহণ করিতাম।" অর্থাৎ দাতা আমাকে কিছু দিয়া আমার উপকার করিয়াছে বলিয়া যদি গাহিয়া না বেড়াইত তবে আমি গ্রহণ করিতাম। এক বুযুর্গ তাঁহার বিশেষ বন্ধুগণ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন

না। বুযুর্গ মাত্রই অপরের অনুগ্রহ-বোঝা বহন করিতে রাযী নহেন। হযরত বিশ্‌রে হাফী (র) বলেন—"আমি হযরত সররী সক্‌তী (র) ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে কখনও কোন কিছু চাহি নাই। কারণ, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ সংসার-বিরাগী ইহা আমার জানা ছিল। তাঁহার হস্ত হইতে কোন বস্তু চলিয়া গেলে তিনি আনন্দিত হইতেন।"

যাহারা রিয়ার উদ্দেশ্যে দান করে, তাহাদের দান গ্রহণ করা উচিত নহে। একজন বুযুর্গ দান গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া দাতাগণ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"দাতাদের উপর দয়া করিয়াই আমি ফেরত দিয়াছি। কারণ, আমি গ্রহণ করিলে তাহারা লোকসমক্ষে ইহা বলিয়া বেড়াইত। এইরূপে তাহাদের ধনও যাইত এবং সওয়াবও নষ্ট হইত।"

সদ্‌কাস্বরূপ কেহ কিছু দিলে গ্রহীতা যদি সদ্‌কা লওয়ার উপযুক্ত হয় তবে লইবে; নতুবা ফেরত দিবে। হাদীস শরীফে আছে যে, বিনা-প্রার্থনায় লোকে যদি কাহাকেও কিছু দেয় তবে ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত উপজীবিকা। বুযুর্গগণ বলেন যে, কোন কিছু দিতে গেলে যে-ব্যক্তি না লয় সে এমন বিপদে নিপতিত হইবে যে, প্রকৃত অভাবে পড়িয়া চাহিলেও কেহ তখন তাহাকে কিছু দিবে না। হযরত সররী সক্‌তী (র) সর্বদা হযরত ইমাম আহ্‌মদ হাম্বলের (র) নিকট কিছু না কিছু পাঠাইতে থাকিতেন। কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে হযরত সররী(র) একদা বলিলেন—"হে আহ্‌মদ, প্রত্যাখ্যানের আপদকে ভয় কর।" হযরত ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল (র) বলিলেন—"আচ্ছা ভাই, এখন আমার হাতে এক মাসের উপযোগী দ্রব্যাদি মৌজুদ আছে। তুমি ইহা রাখিয়া যাও। মৌজুদ দ্রব্যাদি শেষ হইলেই তোমার হাদিয়া গ্রহণ করিব।"

বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা হারাম— রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, ভিক্ষা করা কুৎসিত কার্যের অন্তর্ভুক্ত এবং বিনা প্রয়োজনে কুৎসিত কার্য বৈধ হয় না। তিনটি কারণে ভিক্ষা করা ঘৃণিত কার্যের অন্তর্গত। **প্রথম কারণ—**নিজের অভাব প্রকাশ করিলে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি নিন্দা করা হয়। কেননা, ভৃত্য অন্যের নিকট কিছু চাহিলে সে যেন স্বীয় প্রভুর নিন্দা করিল। কিন্তু নিতান্ত অভাবের তাড়নায় নিন্দা প্রকাশ না পায়, এমনভাবে চাহিলে এই কুৎসিত কার্যের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা) হইয়া যাইবে। **দ্বিতীয় কারণ—**অপরের নিকট চাহিলে নিজেকে হেয় করা হয় এবং এক আল্লাহ্‌

ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট নিজকে হেয় করা মুসলমানের উচিত নহে। অভাবে পড়িয়াও নিজকে লোকচক্ষে হেয় না করিবার উপায় এই যে, যাহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে না এবং যাহাদের নিকট তুচ্ছও হইতে হইবে না যতদূর সম্ভব এমন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন বা উদারচিত্ত দয়ালু লোকদের নিকট চাহিবে। আত্মীয়, বন্ধু এবং উদারচিত্ত দয়ালু লোক না থাকিলেও নিতান্ত কঠিন অভাবে পতিত না হইলে অপরের নিকট কিছু চাওয়া উচিত নহে। **তৃতীয় কারণ**–যাহার নিকট চাওয়া হয় তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়া থাকে। কেননা, দাতা হয়ত লোকনিন্দার ভয়ে, চক্ষু-লজ্জায় বা অপরের আশায় দান করে। এই সকল কারণে দাতা দান করিয়া দুঃখিত হয় এবং আন্তরিক অনুরাগে দেয় না বলিয়া দানের পর অনুতাপ করিয়া কষ্ট পায়। দাতাকে এইরূপ কষ্ট দেওয়ার আপদ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় এই যে, প্রকাশ্যভাবে সোজাসুজি না চাহিয়া বরং ইশারা-ইঙ্গিতে চাহিবে যেন যাহার নিকট চাওয়া হইতেছে, সে যদি বুঝিয়াও বুঝিতে পারে নাই বলিয়া ভান করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে ইহার সুযোগ পায়। আবার যদি প্রকাশ্যভাবেই চাহিতে হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট না চাহিয়া বরং সমবেতভাবে সকলের নিকট চাওয়া উচিত। কিন্তু সে-স্থলে যদি একজন-মাত্র ধনী লোক উপস্থিত থাকে এবং সকলেই তাহার নিকট হইতে পাইবার আশা রাখে; কিন্তু সেই ব্যক্তি না দিলে যদি তিরস্কৃত হয় তবে ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে নির্দিষ্ট করিয়া প্রার্থনা করার সমতুল। যে ধনীর উপর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব, তাহার নিকট যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য চাওয়া জায়েয আছে এবং নিজে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হইলে নিজের জন্য অনুরোধ করাও জায়েয। সেই ধনী ব্যক্তি এই জন্য বিরক্ত হইলেও কোন দোষ নাই।

ধনী ব্যক্তি অপবাদের ভয়ে, লজ্জায় পড়িয়া বা এবংবিধ অন্য কোন কারণে কিছু দিতে চাহিলে ইহা গ্রহণ করা হারাম। কেননা, এইরূপ দান গ্রহণ করা বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়ার তুল্য। কিন্তু প্রকাশ্য ফত্ওয়া প্রদানকালে কেবল লোকের উক্তিই বিবেচনা করা হয়; (আন্তরিক ভাবের দিকে লক্ষ্য করা হয় না)। এইরূপ ফত্ওয়া দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের আইনে সঙ্গত বলিয়া দুনিয়ার কাজেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মনের ভাব লইয়া পরকারের বিচার সম্পন্ন হইবে। সুতরাং মনে যখন বুঝা যায়, দাতা অসন্তুষ্ট হইয়া দান করিতেছে তখন সেই দান গ্রহণ করা হারাম। এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার হইতে জানা গেল যে, যাচ্ঞা করা হারাম। তবে দায়ে পড়িয়া নিতান্ত কঠিন অভাবের চাপে

অন্যের নিকট যাচ্ঞা করা জায়েয আছে। কিন্তু আড়ম্বর, সৌষ্ঠব বৃদ্ধি, উত্তম পানাহার ও সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য অপরের নিকট যাচ্ঞা করা মোটেই উচিত নহে।

কাহার পক্ষে যাচ্ঞা করা যায়েয– যে-সকল ব্যক্তি শ্রমসাধ্য কাজ করিতে অক্ষম, অথচ একেবারে কপর্দকশূন্য, উপার্জনের কোন পন্থা বা শিল্প-ব্যবসাও জানে না, এমন লোক যাচ্ঞা করিতে পারে। এইরূপ যাহারা ইলমে দীন শিক্ষায় ব্যাপৃত আছে, কোন শিল্পব্যবসা করিবার অবসর পায় না, এমন নিঃস্ব শিক্ষার্থীও অপরের নিকট যাচ্ঞা করিতে পারে। কিন্তু ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে কাহারও নিকট যাচ্ঞা করা উচিত নহে; বরং স্বীয় অভাব মোচনের জন্য কোন না কোন উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে ওয়াজিব। কাহারও গৃহে অনাবশ্যক পুস্তক, অতিরিক্ত জায়নামায, বস্ত্র, কোমরবন্ধী ইত্যাদি থাকিলে আহারের অভাব হওয়া মাত্রই এমন ব্যক্তির পক্ষে অপরের নিকট যাচ্ঞা করা হারাম।

কি পরিমাণ বস্তু থাকিলে ভিক্ষা অনুচিত– রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি নিজের অধিকারে কিছু দ্রব্য রাখিয়া ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন সে এমন আকৃতি ধারণ করিবে যে, তাহার বদনমণ্ডলে কেবর অস্থিমাত্র থাকিবে, মাংসপেশী একেবারেই থাকিবে না।" তিনি বলেন–"যে-ব্যক্তি নিজের অধিকারে কোন বস্তু থাকিতে ভিক্ষা করে, ভিক্ষালব্ধ বস্তু অধিকই হউক বা অল্পই হউক তৎসমুদয়ই দোযখের অগ্নি।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"হে আল্লাহ্র রাসূল, কি পরিমাণ ধন অধিকারে থাকিলে ভিক্ষা করা জায়েয?" এক হাদীসে বর্ণিত আছে, দুই বেলার আহার হাতে থাকিতে ভিক্ষা করা হারাম। অপর এক হাদীসে আছে যে, পঞ্চাশ রৌপ্যমুদ্রা হাতে থাকিলে ভিক্ষা করা হারাম। এই হাদীসের অর্থ হইল পঞ্চাশ রৌপ্যমুদ্রা অধিকারে থাকিলে এক ব্যক্তির সারা বৎসরের ব্যয় চলিতে পারে। যে-দেশে বৎসরের মধ্যে এক নির্দিষ্ট মৌসুমে দান-খয়রাত বিতরণের প্রথা প্রচলিত আছে, সেই দেশে অক্ষম অথচ নির্ধন লোকের অধিকারে পঞ্চাশ রৌপ্যমুদ্রা পরিমিত ধন না থাকিলে এবং তখন অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করত সেই পরিমাণ পূরণ করিয়া না লইলে যদি তাহাকে সম্পূর্ণ বৎসর অভাবগ্রস্ত থাকিতে হয়, তবে সেই পরিমাণ অর্থ অপরের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লওয়া জায়েয আছে।

আর যে-দেশে দরিদ্রগণের পক্ষে প্রত্যহ পাইবার উপায় আছে, সেই দেশে প্রাতঃসন্ধ্যা দুই বেলা পরিমিত আহারের সংস্থান না থাকিলে অপরের নিকট যাচ্ঞা করিবার বিধান আছে। এই-স্থলে যে-দেশে বৎসরে এক নির্দিষ্ট মৌসুমে দান বিতরণ করা হয়, সেই দেশের এক বৎসর এবং যে দেশে প্রত্যহ বিতরণ হয়, সেই দেশের এক দিন সমস্থানীয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

মানুষের প্রধানত তিন প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন হয়; যথা-(১) অন্ন, (২) বস্ত্র ও (৩) গৃহ। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"তিন বস্তু ব্যতীত দুনিয়াতে মানুষের অপর কোন দ্রব্য পাওয়ার অধিকার নাই;' (যথা)- মেরুদণ্ড সোজা থাকে, এই পরিমাণ খাদ্য; সতর ঢাকিয়া রাখে ও শীতগ্রীষ্ম হইতে দেহকে রক্ষা করে, এই উপযোগী বস্ত্র এবং দেহের স্থান সংকুলান হওয়ার উপযুক্ত গৃহ।" গৃহসামগ্রী ও তৈজসপত্র ঐ তিন প্রকার দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। মোটা বস্ত্র ও লেপ থাকিলে কম্বল ও শতরঞ্জির জন্য অপরের নিকট প্রার্থনা করা সঙ্গত নহে। মাটির বদনা থাকিলে ধাতুনির্মিত ঘটির জন্য সওয়াল করা অনুচিত। আবশ্যকতা বিভিন্ন প্রকার; ইহার সীমা নির্ধারণ করা যায় না। মোটকথা, নিতান্ত কঠিন অভাব উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অপরের নিকট যাচ্ঞা করা অনুচিত। কারণ, যাচ্ঞা করা বড় মন্দ কাজ।

মানসিক অবস্থাভেদে দরিদ্রের শ্রেণীবিভাগ- মানসিক অবস্থাভেদে দরিদ্রের নানাশ্রেণী হইয়া থাকে। হযরত বিশরে হাফীর (র) মতে দরিদ্রগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। **প্রথম শ্রেণী**-যাহারা স্বয়ং কাহারও নিকট যাচ্ঞা করে না এবং অযাচিতভাবে কেহ কিছু দিলেও গ্রহণ করে না। এই শ্রেণীর দরিদ্র পবিত্র আত্মাদের সহিত 'ইল্লীনের' সর্ব্বোচ্চ স্থানে থাকিবে। **দ্বিতীয় শ্রেণী**-যাহারা স্বয়ং কাহারও নিকট কিছু চাহে না, কিন্তু অযাচিতভাবে কেহ দান করিলে গ্রহণ করে। এই প্রকার দরিদ্রগণ ফেরদাউসে আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত বাস করিবে। **তৃতীয় শ্রেণী**- যাহারা অন্যের নিকট যাচ্ঞা করে বটে, কিন্তু নিতান্ত কঠিন অভাবের তাড়নায়ই যাচ্ঞা করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর দরিদ্রগণ আস্‌হাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) হযরত শকীককে (র) জিজ্ঞাসা করিলেন- "তুমি গৃহত্যাগের সময় নিজ দেশের দরিদ্রদিগকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ।" হযরত শকীক (র) বলিলেন-"উত্তম অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহারা কিছু পাইলে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেয়; কিন্তু না পাইলে ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকে।" হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (র) বলিলেন-"বলখ দেশ পরিত্যাগের সময় তথাকার কুকুরগুলিকেও আমি ঠিক এই অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি।" হযরত শকীক (র) জিজ্ঞাসা করিলেন-"আপনার মতে দরিদ্র কিরূপ হওয়া আবশ্যক?" হযরত ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম (র) বলিলেন-"দরিদ্র ব্যক্তি কিছু না পাইলে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিবে, আর কিছু পাইলে কিয়দংশ নিজের অভাব মোচনের ব্যয় করিবে এবং অবশিষ্টাংশ অপর দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে।" হযরত শকীক (র) বলিলেন- "ইহাই যথার্থ কথা।"

কোন এক ব্যক্তি বলেন-"আমি হযরত আবূ হাসান নূরী (র)-কে দুই হস্ত বিস্তারপূর্বক যাচ্ঞা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমি ইহা হযরত জুনায়দ বাগ্‌দাদী (র)-কে জানাইলাম। তিনি বলিলেন-"তুমি কখনও মনে করিও না যে, তিনি মানুষের নিকট হইতে কিছু চাহিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন; এবং হস্ত বিস্তারপূর্বক হয়ত মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, যেন তাহাদের কল্যাণ হয় এবং তাহাদের দ্বারা তাঁহার নিজের কোন অনিষ্ট না ঘটে।" এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে দাঁড়িপাল্লা আনিতে আদেশ করিলেন। আমি আনয়ন করিলাম তিনি একশত রৌপ্যমুদ্রা ওযন করিয়া এক পাত্রে রাখিলেন। তৎপর বিনা ওযনে ইহার সহিত আরও কিছু সংযোগ করিয়া আমাকে এই সমস্ত হযরত নূরী (র)-কে দিতে বলিলেন। পরিমাণ জানিবার জন্য লোকে ওযন করে; কিন্তু তিনি ওযন করিবার পর বিনা ওযনে ইহার সহিত কতকগুলি মিশাইয়া দিয়া পরিমাণ কেন অনিশ্চিত করিয়া ফেলিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। যাহাই হউক, আমি মুদ্রাপূর্ণ পাত্রটি লইয়া গিয়া হযরত নূরী (র)-এর সম্মুখে স্থাপন করিলাম। তিনিও দাঁড়িপাল্লা আনিয়া একশত মুদ্রা ওযন করত বলিলেন-"এই একশত মুদ্রা হযরত জুনায়দ (র) কে ফেরত দাও।" আর অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া তিনি বলিলেন-"হাঁ, বাস্তবিকই জুনায়দ (র) একজন মহাজ্ঞানী লোক। তিনি দুই দিকেই রজ্জু বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া আমি আরও অবাক হইয়া রহিলাম। অপর ঐ একশত মুদ্রা ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য হযরত জুনায়দ (র)-এর নিকট গেলাম এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন-"আল্লাহ্‌ই সহায়ক। যে-পরিমাণ মুদ্রা

তাঁহার জন্য ছিল, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। আর যাহা আমার জন্য ছিল, তাহা ফেরত দিয়াছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–"হে মহাত্মন, ইহার অর্থ কি?" তিনি বলিলেন–"পরকালে পুণ্য পাইবার আশায় একশত মুদ্রা দিয়াছিলাম এবং অবশিষ্টগুলি নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলাম। যাহা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ছিল, তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন এবং যাহা আমার জন্য ছিল, তাহা ফেরত দিলেন।"

যাহা হউক, তৎকালে দরিদ্র লোক এইরূপ কামিল হইতেন। তাঁহাদের হৃদয় এত পরিষ্কার ছিল যে, অপরের অন্তর্নিহিত গুপ্তভাবও তাঁহারা জানিতে পারিতেন। বর্তমান কালের দরিদ্রগণ তদ্রূপ গুণে গুণান্বিত হইতে না পারিলেও অন্তত উহার আশায় থাকা উচিত। ইহা সম্ভব না হইলে ঐগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য।

সংসার-বিরাগ

সংসার-বিরাগের হাকীকত–এক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে পিপাসার সময় বরফ সংযোগে পানি ঠাণ্ডা করিয়া পান করিবার জন্য কিছু বরফ সংগ্রহ করিল। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি আসিয়া স্বর্ণ দিয়া বরফ খরিদ করিতে চাহিলে বরফ-স্বামী চিন্তা করিবে–"বরফ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বস্তু; রজনী আসিতে আসিতে সমস্ত গলিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে এই স্বর্ণ আমার সহিত চিরজীবন থাকিবে।" এমতাবস্থায় চিরহিতকর স্বর্ণের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী বরফ পরিত্যাগ করা এবং ইহার লোভ সংবরণ করাকে সংসার-বিরাগ বলে। বরফ সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তির সংসার-বিরাগ যে-কারণে ও যে-প্রকারে জন্মিয়াছিল, দুনিয়া সম্বন্ধে আরিফের সংসারে অনাসক্তি সেই কারণে এবং সেইরূপেই জন্মিয়া থাকে। আরিফ (চক্ষুষ্মান, জ্ঞানী ব্যক্তি) দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, দুনিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং প্রতি পলেই হ্রাস পাইতেছে ও মৃত্যুর সময়ে সব শেষ হইয়া যাইবে। তাঁহারা পরকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, ইহা অতি মনোরম চিরস্থায়ী ও অশেষ। ফলে দুনিয়া তাঁহাদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয় হইয়া পড়ে। তখন তাঁহারা সংসার-বিরাগী হইয়া দুনিয়া বর্জনপূর্বক ইহার পরিবর্তে পরকাল অবলম্বন করেন। কারণ, পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শতসহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। আরিফের এই অবস্থাকেই যুহ্‌দ বা বৈরাগ্য বলে।

যুহ্‌দের শর্ত–যুহ্‌দের কতকগুলি অপরিহার্য শর্ত আছে; উহা ব্যতীত যুহ্‌দ হইতে পারে না। **প্রথম শর্ত**–শরীয়তমতে যাহা নির্দোষ দুনিয়ার এমন বস্তু পরিত্যাগ করা। কারণ, শরীয়তে যাহা নিষিদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করা ত সকলের উপরই ফরয। **দ্বিতীয় শর্ত**–দুনিয়ার সম্পদ ও ভোগ্যবস্তুর অধিকারী হইয়া উহা উপভোগের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত পরিত্যাগ করা; কেননা, যাহার দুনিয়া উপভোগের ক্ষমতাই নাই, সে সংসার-বিরাগী হইতেই পারে না। অথবা, যাহার কিছুই নাই তাহাকে অযাচিতভাবে কেহ দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের বস্তু দান করিলে তাহা গ্রহণ না করা এবং গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া দেওয়া। কিন্তু বিনা-পরীক্ষায় কেহ এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা, বুঝা যায় না। সংসার লাভের ক্ষমতা হস্তগত হইলেই মানবের স্বভাব পরিবর্তিত হয়। অনেকে মনে করে, সংসার বর্জনের ক্ষমতা তাহার আছে। কিন্তু হাতে পাইলেই সেই কুহেলিকা ঘুচিয়া যায়। **তৃতীয় শর্ত**–যে-ধন অধিকারে আছে তাহা খরচ করিয়া ফেলা ও ধনের রক্ষণাবেক্ষণ না করা এবং মান-সম্মানেরও কোন পরওয়া না করা। কারণ, পরকালের আনন্দ লাভের আশায় যে-ব্যক্তি ইহকালের সকল আনন্দ ও সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সংসার-বিরাগী।

যুহ্‌দ ক্রয়-বিক্রয়ের এক ব্যবসা এবং এই বিক্রয়ে লাভ অপরিসীম; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুসলমানদের নিকট হইতে তাহাদের প্রাণ এবং ধন বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছেন।" (সূরা তওবা, ১৪ রুকূ, ১১ পারা।) আল্লাহ্ আবার বলেন ঃ

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ –

অর্থাৎ "অতএব তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয় যাহা (আল্লাহ্‌র সহিত)করিয়াছ তাহাতে আনন্দিত হও।" (সূরা তওবা, ১৪ রুকূ।) ফলকথা এই যে, মুসলমানদের দেহ ও ধন, যাহা অতি নগণ্য এবং প্রতি পলে নষ্ট হইতেছে, তাহা লইয়া আল্লাহ্ ইহার বিনিময়ে মূল্যস্বরূপ অতি মনোরম চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত প্রদান করিতেছেন। সুতরাং এই ব্যবসায়ে মুসলমানদের যে-লাভ হইল তাহা বর্ণনাতীত।

উন্নত শ্রেণীর সংসার-বিরাগী–স্বীয় বদান্যতা মানব-সমাজে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বা পরকাল ব্যতীত অন্য কিছু পাইবার জন্য দুনিয়া পরিত্যাগ করাকে

'যুহ্দ' বলে না। আবার পরকাল লাভের আশায় ইহকাল পরিত্যাগ করা আরিফের নিকট অতি নিম্ন শ্রেণীর যুহ্দ। বরং তাঁহাদের মতে প্রকৃত সংসার-বিরাগী দুনিয়ার প্রতি যেরূপ উদাসীন থাকেন, আখিরাতের (সুখ-সম্ভোগের) প্রতিও তদ্রূপ উদাসীন থাকেন। কারণ, বেহেশ্‌তেও চক্ষু, উদর, কাম ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু আছে, কিন্তু সংসার-বিরাগী এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ বস্তুকে অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন করেন এবং নিজকে এই সকলের বহু উর্ধ্বে রাখেন। যে-সকল পদার্থে ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট হয় তাহা পশুগণও ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং সংসার-বিরাগী ব্যক্তি এরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাঁহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ইহকাল ও পরকালের সুখ-সম্পদের কিছু চাহেন না এবং তাঁহারা মারিফাত ও দর্শন লাভ ভিন্ন অপর কোন পদার্থেই পরিতুষ্ট হন না। স্বয়ং আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বস্তু তাঁহাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে। একমাত্র আরিফে রব্বানীগণ (অর্থাৎ যাঁহারা আল্লাহ্‌র সম্যক পরিচয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা) এই শ্রেণীর যাহিদ (সংসার-বিরাগী) হইয়া থাকেন। এইরূপ যাহিদের পক্ষে সাংসারিক ধনৈশ্বর্য হইতে পলায়ন না করারও বিধান আছে। বরং ধন গ্রহণপূর্বক উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করা এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া তাঁহাদের উচিত। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু ইহাই করিতেন। ইসলাম জগতের সমস্ত ধনভাণ্ডার তাঁহার করতলগত ছিল। কিন্তু তিনি তৎপতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও উদাসীন ছিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার অবস্থাও এইরূপই ছিল। তিনি এক দিন এক লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকাবৎ বিতরণ করিয়া দিলেন; কিন্তু নিজের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় একটি মুদ্রা মূল্যের গোশ্‌তও খরিদ করিলেন না।

অতএব বুঝা গেল, আরিফের হস্তে লক্ষ মুদ্রা থাকিলেও তিনি প্রকৃত সংসার-বিরাগী থাকিতে পারেন। অপরপক্ষে, যাহার হাতে এক কপর্দকও নাই, তাহাকে সংসার-বিরাগী বলা হয় না। বরং দুনিয়ার প্রতি একেবারে মনক্ষুণ্ন এবং অনাসক্ত থাকাই যুহ্দের চরম বিকাশ। যে-ব্যক্তি যুহ্দের এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ত দুনিয়া অন্বেষণে ব্যাপৃত হন না বা ইহা হইতে পলায়নও করেন না; দুনিয়ার প্রতিকূল আচরণও করেন না, কিংবা ইহার সহিত মিশিয়াও যান না; আবার সংসারকে তিনি ভালও বাসেন না, কিংবা ইহাকে শত্রু বলিয়াও জ্ঞান করেন না। কেননা, কোন পদার্থকে ভালবাসিলে মন যেমন তৎপ্রতি ব্যাপৃত হয়, শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতে গেলেও মন তদ্রূপ ব্যাপৃত হইয়া থাকে।

সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থের অনুরাগ বা বিরাগ হইতে উদাসীন থাকাই প্রকৃত সংসার-বিরাগ। এই প্রকার সংসার-বিরাগীর নিকট পার্থিব ধনৈশ্বর্য সমুদ্রের পানির ন্যায় এবং স্বীয় হস্ত আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারের ন্যায় বিবেচিত হয়। আর তাঁহার অধিকারে কত ধন আসিল, কত গেল; বৃদ্ধি পাইল বা কমিয়া গেল; এই সকল চিন্তা হইতে তিনি একেবারে মুক্ত থাকেন। ইহাই যুহ্দের পরাকাষ্ঠা।

এ-স্থলে নির্বোধ লোকেরা বিষম ধোঁকায় পতিত হয়। কারণ, তাহারা পার্থিব ধনৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিতে পারে না, অথচ নিজকে উহাতে অনাসক্ত এবং সংসার-বিরাগী বলিয়া মনে করে। কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাদের ধন, অপর কোন ব্যক্তির ধন বা নদীর পানি অপহরণ করিলে এই ত্রিবিধ হরণ-কার্য দর্শনে যদি তাহাদের মনে একই প্রকার অবস্থা না ঘটিয়া পার্থক্য অনুভূত হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, তাহারা নিজদিগকে ধন সম্বন্ধে উদাসীন ভাবিয়া ভুল করিয়াছে এবং তাহাদের মনে ধনাসক্তি গুপ্তভাবে রহিয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, ধন হস্তগত হওয়ার পর ইচ্ছানুরূপ ভোগ করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও নির্বিকার চিত্তে ইহা দূরে ঠেলিয়া দিয়া সংসারের প্রলোভন হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে যুহ্দের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মুবারক (র)-কে যাহিদ (সংসার-বিরাগী) বলিয়া সম্বোধন করিল। তিনি উত্তর দিলেন—"যাহিদ ত হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (র)। সসাগরা ধরার ধনৈশ্বর্য তাঁহার করতলগত। তৎসমুদয় ভোগ করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সংসার-বিরাগী। পক্ষান্তরে আমার হাতে কিছুই নাই। এমতাবস্থায় আমাকে 'যাহিদ' বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?" ইব্‌নে আবূ লায়লা একদা ইব্‌নে শব্‌রমাকে বলিলেন—"দেখ ভাই, আবূ হানীফা (র) জোলার ছেলে হইয়া আমার ফতওয়া অগ্রাহ্য করেন।" ইব্‌নে শব্‌রমা বলিলেন—"জোলার ছেলে বা শরীফ-সন্তান বলিয়া আমি তাঁহার মর্যাদার কোন তারতম্য বুঝি না। কিন্তু আমি এইটুকু জানি যে, দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, আর তিনি ইহা হইতে পলায়ন করিতেছেন। অপর পক্ষে দুনিয়া বদন ফিরাইয়া আমাদের নিকট হইতে পলাইতেছে; অথচ আমরা ইহাকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া মরিতেছি।" হযরত ইব্‌নে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন—"নিম্ন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমি বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের মধ্যে কেহ দুনিয়াকে ভালবাসে—

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ –

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কতক লোক দুনিয়া চায় এবং কতক লোক আখিরাত চাহিয়া থাকে।" (সূরা আলে ইমরান, রুকূ ১৬ পারা ৪।) এক সময় যখন কতিপয় মুসলমান বলিল, কোন্ কার্য আল্লাহ্ ভালবাসেন জানিতে পারিলে আমরা তাহাই করিতাম, তখন আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَافَعَلُوْهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ –

"আর আমি যদি তাহাদের (মানুষের) প্রতি ফরয করিয়া দিতাম যে, তোমরা আত্মহত্যা কর কিংবা স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া যাও, তবে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত এই আদেশ কেহই পালন করিত না।" (সূরা নিসা, ৯ রুকূ, ৫ পারা।)

যুহ্‌দ অবলম্বন না করার কারণ–বরফের বিনিময়ে স্বর্ণ গ্রহণ করা কোন কঠিন কাজ নহে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহা করিতে পারে। স্বর্ণের সহিত তুলনায় বরফ যত নিকৃষ্ট, আখিরাতের সহিত তুলনায় দুনিয়া তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু তিনটি কারণে মানুষ ইহা বুঝিতে পারে না যথা (১) ঈমানের দুর্বলতা, (২) প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং (৩) শিথিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা; অর্থাৎ কাজটি অদ্য না করিয়া কল্য করিব বলিয়া রাখিয়া দেওয়া। লোভ-লালসাদি প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিলেই এই শিথিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার উদ্ভব হয়। কারণ, লোভনীয় বস্তু সম্মুখে পাইলেই মানুষ ইহা উপভোগের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠে। এইজন্য সে নগদ পার্থিব তুচ্ছ সুখে এমন মুগ্ধ হয় যে, বাকী পারলৌকিক চিরস্থায়ী সুখের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়।

যুহ্‌দের ফযীলত– দুনিয়ার মহব্বতের অপকারিতা ও নিন্দা বর্ণনাকালে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই যুহ্‌দের ফযীলতের প্রমাণ। দুনিয়ার মহব্বত মারাত্মক দোষসমূহের অন্যতম এবং যে-সকল গুণের অধিকারী হইলে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, দুনিয়ার প্রতি বিরক্তি উহাদের অন্যতম। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সম্বন্ধে কতিপয় আয়াত ও হাদীস-বাণী এ-স্থলে উল্লেখ করা হইবে।

সংসার-বিরাগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা ইহাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে আলিমদের কাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ যখন মহাড়ম্বরে শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়াছিল, তখন আলিম ব্যতীত অন্যান্য দর্শকগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল–"হায়! আমরা যদি এইরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনৈশ্বর্য পাইতাম!" কিন্তু সেই সময় আলিমগণ বলিয়াছিলেন–"ঈমানদারদের জন্য পরকালে যে-পুরস্কার অবধারিত আছে তাহা পার্থিব ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট।" যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا –

অর্থাৎ "আর যাহাদিগকে ইলম দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা বলিল, তোমাদের প্রতি আক্ষেপ; যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য করিয়াছে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কার উত্তম।" (সুরা কাসাস, ৯ রুকূ, ২০ পারা।) এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন–"যে-ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্তও সংসার-বিরাগী হইয়া থাকিতে পারে, তাঁহার হৃদয়ে হিকমতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাইতে চাহিলে সংসার-বিরাগী হও।" হযরত হারিসা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিলেন–"আমি সত্যই ঈমানদার।" হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন–"(তুমি যে ঈমানদার) ইহার প্রমাণ কি?" তিনি বলিলেন–"দুনিয়ার প্রতি আমার মন এমন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বর্ণ ও প্রস্তর আমার নিকট সমান বোধ হয় এবং বেহেশ্‌ত ও দোযখ যেন আমি দেখিতে পাইতেছি।" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) বলিলেন–"যাহা তোমার পাইবার ছিল, তাহা পাইয়াছ। এখন ইহা সযত্নে রক্ষা কর।" তৎপর হযরত (সা) বলিলেন–

عَبْدٌ نَوَّرَ اللّٰهُ قَلْبَهُ অর্থ "উপযুক্ত বান্দা বটে। আল্লাহ তাহার হৃদয়কে আলোকিত করিয়া দিয়াছেন।" যখন এই আয়াত নাযিল হয়–

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ –

(অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়েত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেয়।) তখন সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন—"হে আল্লাহর রাসূল, এই প্রশস্ততা কি?" হযরত (সা) বলিলেন—"ইহা এক প্রকার নূর, হৃদয়ে জন্মে এবং ইহার প্রভাবে হৃদয় প্রশস্ত হইয়া পড়ে।" সাহাবাগণ (রা) আবার নিবেদন করিলেন—"ইহার নিদর্শন কি?" হযরত (সা) বলিলেন—"ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি বিরক্ত হইয়া চিরস্থায়ী আখিরাতের দিকে মন নিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্বেই মরণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আল্লাহ্র জন্য যেরূপ লজ্জা রাখা উচিত তদ্রূপ লজ্জা রাখ।" সাহাবাগণ (রা) বলিলেন —"হে আল্লাহর রাসূল, আমরা ত লজ্জা করিয়া থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন—"তাহা হইলে যে-ধন ভোগ করিতে পারিবে না, তাহা কেন সঞ্চয় কর এবং যেখানে বাস করিতে পারিবে না, সেখানে কেন গৃহ তৈয়ার কর?" একদা খুত্বা প্রদানকালে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন—"যে-ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর সহিত কোন কিছু মিশ্রিত না করিয়া খাঁটিভাবে ইহা লইয়া পরলোকগমন করে, সে বেহেশ্তী।" ইহা শুনিয়া হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু নিবেদন করিলেন—"হে আল্লাহ্র রাসূল, কোন্ জিনিস ইহার সহিত মিশ্রিত করা উচিত নহে, বুঝাইয়া বলুন।" হযরত (সা) বলিলেন—"দুনিয়া-প্রীতি ও দুনিয়া-অন্বেষণ। কারণ, কোন কোন লোক পয়গম্বরগণের ন্যায় কথা বলে; কিন্তু তাহাদের কার্য ধন-গর্বিত অত্যাচারী লোকের কার্যের ন্যায়। যে-ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সংসারপ্রীতি ও সংসার-অন্বেষণ হইতে নিষ্কলঙ্ক লইয়া যাইবে, তাহার স্থান বেহেশ্তে হইবে।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি সংসার-বিরাগী, আল্লাহ্ তাহার হৃদয়ে হিক্মতের দ্বার খুলিয়া দেন এবং তাহার রসনা হইতে হিক্মতের কথা বাহির করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুনিয়ার ক্ষতি এবং রোগ ও রোগের ঔষধ সম্বন্ধে জানাইয়া দেন এবং পরিশেষে তাহাকে নিরাপদে পৃথিবী হইতে বেহেশতে লইয়া যান।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা কোন স্থানে যাইতেছিলেন; পথের পার্শ্বে উষ্ট্রের একটি বৃহৎ পাল ছিল। সমস্ত উষ্ট্রই সুন্দর ও গর্ভবতী ছিল। উষ্ট্র আরবাসীর খুব উৎকৃষ্ট সম্পদ। কারণ, ইহা হইতে প্রচুর

অর্থ, দুগ্ধ, গোশ্ত এবং পশম পাওয়া যায়। হযরত (সা) এই উষ্ট্রের পালের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন—"হে আল্লাহ্র রাসূল, এইগুলি ত উত্তম সম্পদ। আপনি ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না কেন?" হযরত (সা) বলিলেন—"ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে আল্লাহ্ আমাকে নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি বলেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ الاية –

অর্থাৎ "তাহাদিগকে পার্থিব ধনৈশ্বর্যের যে-শোভা দান করিয়াছি, ইহার দিকে আপনি দৃষ্টপাত করিবেন না।" (সূরা তাহা, ৮ রুকূ, ১৬ পারা) লোকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের নিকট বলিল—"আপনি অনুমতি দিলে আপনার জন্য ইবাদত-গৃহ নির্মাণ করিয়া দেই।" তিনি বলিলেন, "যাও—নদীর পানির উপর গৃহ বানাও।" তাহারা নিবেদন করিল—"পানির উপর কিরূপে গৃহ বানাইব?" তিনি বলিলেন—"দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে রাখিয়া ইবাদত করা কিরূপে সম্ভবপর?" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আল্লাহ্র ভালবাসা পাইতে চাহিলে দুনিয়া পরিত্যাগ কর এবং মানুষের ভালবাসা পাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহা হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লও।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্যতম পত্নী হযরত হাফ্সা রাযিয়াল্লাহু আন্হা তদীয় পিতা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট নিবেদন করিলেন—"বিভিন্ন দেশ হইতে যখন যুদ্ধ-লব্ধ ধনসম্পদ আসে, আপনি উহা হইতে উত্তম বস্ত্র গ্রহণ করত পরিধান করুন এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য পাক করাইয়া বন্ধুবান্ধবসহ আহার করুন।" ইহা শুনিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিলেন—"হে হাফ্সা (রা), স্বামীর অবস্থা স্ত্রী যেমন জানিতে পারে অপর কেহই তেমন জানিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবস্থা তুমি অতি ভালরূপেই অবগত আছ। আল্লাহ্র শপথ, সত্য কিনা বল দেখি, তিনি যে-কয়েক বৎসর পয়গম্বররূপে জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকালে তৃপ্তির সহিত আহার করিলে রজনীতে অনাহারে থাকিতেন এবং রজনীতে তৃপ্তির সহিত আহার করিলে দিবসে উপবাস থাকতেন। আল্লাহর শপথ, খয়বার বিজয়ের দিন পর্যন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি কেবল খোরমাও ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া আহার করেন নাই। আল্লাহ্র শপথ

তুমি জান, একদা খাদ্যদ্রব্য একটি খাঞ্চার উপর স্থাপনপূর্বক তাঁহার সম্মুখে রাখিলে তাঁহার বদনমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল; অবশেষে তাঁহার আদেশক্রমে খাদ্যদ্রব্য ভূতলে রাখা হইল। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি অবগত আছ, হযরত (সা) রজনীতে শয্যাগ্রহণকালে একটি কম্বল দুই ভাঁজ করিয়া শয়ন করিতেন। একদা কম্বলটি চারিটি ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে বিছানা অধিক কোমল হইয়া পড়িল। পরদিন হযরত (সা) বলিলেন– 'এই কোমল বিছানা আমাকে রজনীর নামায হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে।" তৎপর হযরত (সা) যেরূপে বিছাইতেন তদ্রূপ বিছাইয়া লইলেন এবং দুই ভাঁজের অধিক দিতে তিনি নিষেধ করিলেন। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি জান, হযরত (সা) কাপড় ধৌত করিবার পর বিলাল (রা) আযান দিলে কাপড় শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাহিরে আসিতে পারিতেন না। কারণ, তাহার দ্বিতীয় কাপড় থাকিত না। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি জান, বনী-যাফর বংশের এক মহিলা হযরতের (সা) লুঙ্গি ও চাদর তৈয়ার করিত। দুইটি একসঙ্গে তৈয়ার হইবার পূর্বে মহিলা একটি বস্ত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। হযরত (সা) ইহার এক প্রান্ত কোমরে পেচ দিয়া পরিধানপূর্বক সম্মুখে বন্ধন করত অপর প্রান্ত দ্বারা পৃষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া বাহিরে আসিলেন। কারণ, ইহা ব্যতীত তাঁহার নিকট অপর কোন বস্ত্র ছিল না। হযরত হাফ্‌সা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলিলেন–"এই সমস্তই আমি জানি।" তৎপর হযরত হাফ্‌সা (রা) ও হযরত ওমর (রা) রোদন করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা লাভের পর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু আবার বলিলেন–"আমার দুই বন্ধু অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু আমার পূর্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের পথে চলিলে তাঁহাদের নিকট যাইতে পারিব। অন্যথায় আমি ভিন্ন পথে পরিচালিত হইব। আমারও তাঁহাদের ন্যায় দুঃখকষ্টের সহিত জীবন যাপন করা উচিত। তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করিতে পারিব।"

একজন সাহাবী (রা) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একজন তাবেয়ী'কে বলিলেন– "তোমাদের ইবাদত সাহাবাগণের ইবাদত অপেক্ষা পরিমাণে অধিক। কিন্তু তাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, পার্থিব বিষয়ে তাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা অধিক সংসার বিরাগী ছিলেন।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"সংসার-বিরাগই দুনিয়াতে মনের শান্তি এবং দেহের সুখ।" হযরত

ইবনে মাস্‌উদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"সংসার-বিরাগীর দুই রাকাত নামায সমস্ত মুজতাহিদের সমগ্র জীবনের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" হযরত সহল তস্তরী (রা) বলেন–"তুমি খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, দরিদ্রতা এবং অপমান এই চারিটি পদার্থের ভয় হইতে নির্মুক্ত হইতে পারিলে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ সংকল্পে কাজ করিতে পারিবে।"

যুহ্‌দের শ্রেণীবিভাগ– সংসার-বিরাগীর প্রকারভেদে যুহ্‌দ (বৈরাগ্য) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) যাহারা দুনিয়া হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছে, কিন্তু হৃদয়কে সংসারের প্রতি অনাসক্ত করিতে পারে নাই অথচ পূর্ণভাবে সংসার-বিরাগী হওয়ার জন্য ধৈর্যের সহিত কঠোর সাধনা করিয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে মুতাযাহ্‌হিদ (বৈরাগ্য-শিক্ষার্থী) বলে, যাহিদ (সংসারবিরাগী) বলে না। তবে এই স্থান হইতেই যাহেদির যাত্রা শুরু হয়। (২) যাহারা হস্ত ও হৃদয় উভয়ই সংসার হইতে তুলিয়া লইতে পারিতেছে, কিন্তু নিজের সংসার-বিরাগের ভাব তাহাদের অন্তরে জাগরূক থাকে এবং সংসার-বিরোগী হইয়া তাহারা অতি বড় কাজ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করে। এই শ্রেণীর লোক যাহিদ বটে, কিন্তু দোষমুক্ত নহে। (৩) যাহারা নিজের যুহ্‌দের বিষয়ও ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ তাহারা যে যাহিদ এ কথা তাহাদের কল্পনায়ও আসে না এবং সংসার-বিরাগী হইয়া তাহারা অতি বড় কাজ করিয়াছে বলিয়াও মনে করে না। এই শ্রেণীর যাহিদের উদাহরণ এইরূপ–মনে কর, এক ব্যক্তি বাদশাহ্‌র মন্ত্রিত্ব পদ লাভের আশায় রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু তথায় অবস্থিত এক কুকুর তাহাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে বাধা দিল। তখন সেই ব্যক্তি হস্তস্থিত রুটি কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। কুকুর খাদ্য পাইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল এবং সেই ব্যক্তি বাদশাহ্‌র দরবারে যাইয়া মন্ত্রিত্বের পদে অধিষ্ঠিত হইল।

সংসারের সমস্ত ভোগ্যবস্তু এক টুকরা রুটিতুল্য এবং শয়তান কুকুরের ন্যায় আল্লাহ্‌র দরবারে গমনোন্মুখ ব্যক্তিগণকে বাধা প্রদান করিতেছে। রুটির ন্যায় সংসারের ভোগ্যবস্তু শয়তানরূপ কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিলে সে তোমার পথ ছাড়িয়া দিবে। মন্ত্রিত্ব পদের তুলনায় এক টুকরা রুটি যেমন তুচ্ছ আখিরাতের তুলনায় সমস্ত জগৎ ততোধিক তুচ্ছ। কারণ, দুনিয়া সসীম এবং আখিরাত অসীম। অসীমের সহিত সসীমের কোন তুলনাই হইতে পারে না। এইজন্যই হযরত আবূ ইয়াযীদ বুস্তামীর (র) নিকট যখন লোকে বলিল যে, অমুক ব্যক্তি বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেছেন, তখন তিনি বলিলেন–"কোন্ বিষয় হইতে

বৈরাগ্য?” তাহারা বলিল–“সংসার হইতে বৈরাগ্য।” তিনি বলিলেন–“সংসার ত কোন পদার্থই নহে। ইহার প্রতি আবার অনাসক্ত হওয়ার অর্থ কি? একমাত্র উপযুক্ত বস্তুর প্রতিই অনাসক্তি হইতে পারে।

অভিলষিত বস্তুর প্রকারভেদে বৈরাগ্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা–(১) পরকালের আযাব হইতে মুক্তি পাইবার আশায় সংসার-বিরাগী হওয়া এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা। ইহা আল্লাহ-ভীরু লোকদের বৈরাগ্য। একদা হযরত মালিক দীনার (র) বলেন–“গত রজনীতে আমি বড় ধৃষ্টতা করিয়াছি যে, আমি আল্লাহ্র নিকট বেহেশ্ত চাহিয়াছি।” (২) পরকালের পুরস্কারের আশায় সংসার-বিরাগী হওয়া। ইহা সংসারের প্রতি পূর্ণ অনাসক্তি। কেননা আখিরাতের আশা ও আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা হইতেই সংসারের প্রতি অনাসক্তির উদ্ভব হয়। তবে ইহা হইল আশাধারী লোকদের যুহ্দ। (৩) এই শ্রেণীর সংসার-বিরাগীর অন্তরে দোযখের ভয় বা বেহেশ্তের আশা, কোন কিছুই থাকে না। কেবল আল্লাহ্র মহব্বত তাঁহাদের অন্তরকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি একেবারে উদাসীন করিয়া রাখে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকেও তাঁহারা অন্যায় ও অপমানজনক বলিয়া মনে করেন। ইহাই সর্বোচ্চ শ্রেণীর যুহ্দ। যেমন হযরত রাবেয়ার (র) নিকট লোকে বেহেশ্তের উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন– اَلْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ – অর্থাৎ “গৃহ অপেক্ষা গৃহস্বামী উৎকৃষ্ট।” বাদশাহীর আনন্দের তুলনায় শিশুদের পক্ষী-ক্রীড়াজনিত আনন্দ যেমন অকিঞ্চিৎকর, আল্লাহ্র মহব্বতের আনন্দের তুলনায় বেহেশ্তের আনন্দও আল্লাহ্-প্রেমিকের নিকট তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু শিশু বাদশাহী অপেক্ষা পক্ষী-ক্রীড়াকেই অধিক ভালবাসে। ইহার কারণ এই যে, শিশুর বুদ্ধি বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া সে বাদ্শাহীর আনন্দ বুঝিতে পারে না। তদ্রূপ আল্লাহ্র দর্শন ব্যতীত যাহারা অপর কিছু পাওয়ার কামনা করে বুঝিতে হইবে, তাহারাও এমন শিশুর ন্যায় অপরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন, যে তাহার বুদ্ধি বিকশিত না হওয়ার দরুন বাদ্শাহীর আনন্দ বুঝিতে অক্ষম।

পরিত্যক্ত বস্তুর প্রকারভেদেও যুহ্দের বহু শ্রেণী আছে। কারণ, কেহ হয়ত দুনিয়া একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া ইহার কিয়দংশ পরিত্যাগ করে। কিন্তু যে পদার্থে প্রবৃত্তি আনন্দ পায়, অথচ ধর্মপথে ইহার কোন আবশ্যকতা নাই, এই প্রকার সকল পদার্থ পরিত্যাগ করাকেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর যুহ্দ বলে। কেননা ধন,

মান, পানাহার, পরিচ্ছদ, বাক্যালাপ নিদ্রা, সংসর্গ, শিক্ষাদান, উপদেশ প্রদান, হাদীস-বর্ণনা ইত্যাদিতে প্রবৃত্তি যে-আনন্দ পায় ইহার নামই দুনিয়া এবং প্রবৃত্তি যে সম্মান বোধ করে, ইহাও দুনিয়ারই অন্তর্গত। কিন্তু একমাত্র মানুষের হেদায়েতের জন্য যদি শিক্ষাদান, হাদীস বর্ণনা ও উপদেশ প্রদান করা হয় এবং মানবজাতিকে পাপ হইতে বিরত রাখিয়া আল্লাহ্র দিকে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তবে এই সমস্ত কাজ দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে।

হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন–“যুহ্দ সম্বন্ধে আমি অনেকের উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমার অভিমত এই যে, যে-বস্তু মানুষকে আল্লাহ্ হইতে দূরে রাখে, তাহা পরিত্যাগ করাই প্রকৃত যুহ্দ। তিনি অন্যত্র বলেন–“যে ব্যক্তি বিবাহ, ভ্রমণ এবং হাদীস শরীফ লেখার কার্যে লিপ্ত আছে, সেই ব্যক্তিও দুনিয়ার প্রতি নিবিষ্ট।” লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–

اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ – (তবে হাঁ, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট কল্বে সালীম' অর্থাৎ নির্মল হৃদয় উপস্থিত করিবে।) এই আয়াতে 'কল্মে সালীম' এর অর্থ কি?” তিনি বলিলেন–“যে হৃদয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর চিন্তা স্থান পায় না তাহাই কল্বে সালীম।”

হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালামের পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস্ সালাম চট পরিধান করিতেন। কোমল বস্ত্র পরিধান করিলে তাঁহার দেহ আরাম পাইবে, প্রবৃত্তি আনন্দ লাভ করিবে, এই ভয়ে তিনি চট পরিধান করিতেন। পরিহিত চটের ঘর্ষণে তাঁহার শরীরে ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মাতা স্নেহ-পরবশ হইয়া তাঁহাকে পশমী বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য করিলেন। তিনি পশমী বস্ত্র পরিধান করিলে ওহী অবতীর্ণ হইল–“হে ইয়াহ্ইয়া, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দুনিয়া গ্রহণ করিলে।” ইহা শুনিয়া তিনি খুব রোদন করিলেন এবং পুনরায় চট পরিধান করিলেন। ইহা অতিউচ্চ শ্রেণীর যুহ্দ এবং যে-সে ব্যক্তি এই উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারে না। বরং পরিত্যক্ত বস্তুর আনন্দের তারতম্যানুসারে যুহ্দের শ্রেণী নির্ধারিত হয় অর্থাৎ যে-পরিমাণ আনন্দপ্রদ বস্তু পরিত্যাগ করা হয়, যুহ্দও সেই পরিমাণে উন্নত শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হয়।

একসঙ্গে সকল পাপ হইতে তওবা করা অসম্ভব হইলে যেমন কোন কোন পাপ হইতে তওবা করা জায়েয, তদ্রূপ প্রবৃত্তির আনন্দপ্রদ কোন কোন বস্তু হইতেও যুহ্দ অবলম্বন করা জায়েয আছে। ইহার অর্থ এই যে, আংশিক যুহ্দ

নিষ্ফল এবং নিরর্থক নহে; ইহার সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সংসার-বিরাগী ও তওবাকারীর জন্য পরকালে উচ্চ মর্যাদা দানের যে অঙ্গীকার আছে, তাহা কেবল সকল লোভনীয় পদার্থ পরিত্যাগকারী সংসার-বিরাগী ও সমস্ত পাপ হইতে তওবাকারী ব্যক্তির জন্য অবধারিত।

সংসার-বিরাগীর পরিতুষ্টির জন্য অবশ্যক বস্তু–মানবজাতি সংসাররূপ কারাগারে বন্দী হইয়া রহিয়াছে এবং ইহার বিপদাপদের অন্ত নাই। দুনিয়াতে ছয় প্রকার বস্তু মানবের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। যথা–(১) অন্ন, (২), বস্ত্র, (৩) গৃহ, (৪) গৃহ-সামগ্রী, (৫) পত্নী এবং (৬) ধন ও মান।

আহার্যদ্রব্যের পরিমাণ ও শ্রেণীভেদ–মানবের জন্য প্রথম আবশ্যক আহার্যদ্রব্য; উহা নানাবিধ। যাহা আহার করিলে কেবল শরীর রক্ষা পায়, তাহাই নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য; যেমন খুদকুড়া, ভূষি ইত্যাদি ভক্ষণ করিলেও শরীর রক্ষা পাইতে পারে। যব, বাজরা মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং চালা-আটার রুটি প্রথম শেণীর খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। যে-ব্যক্তি চালা-আটার রুটি ভক্ষণ করে, সে যুহদের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায় এবং তখন সে শরীর-সেবক হইয়া পড়ে। পরিমাণ হিসাবেও আহারের শ্রেণীভেদ আছে। আহারের নিম্ন পরিমাণ দৈনিক প্রায় তিন ছটাক, মধ্যম পরিমাণ দৈহিক প্রায় চারি ছটাক এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ দৈহিক প্রায় অর্ধসের। ধর্মপথ-যাত্রীর জন্য শরীয়তে খাদ্যের পরিমাণও নির্ধারিত আছে। ইহার অতিরিক্ত ভক্ষণ করিলে আহার বিষয়ে যুহ্দ রক্ষা পায় না।

ভবিষ্যতের জন্য আহার্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখারও পরিমাণ নির্ধারিত রহিয়াছে। ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া কেবল এক বেলার আহার চলিবার উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত রাখা সর্বোচ্চ শ্রেণী যুহ্দের নিদর্শন। কারণ লঘু আশা যুহ্দের মূল এবং দীর্ঘ আশা লোভের আকর। এক মাস বা চল্লিশ দিনের আহার্য সামগ্রী হাতে রাখা মধ্যম শেণীর যুহ্দ। এক বৎসরের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য রাখা নিকৃষ্ট শ্রেণীর যুহ্দের কার্য। এক বৎসরের অধিক কাল চলার উপযোগী খাদ্যদ্রব্য হাতে রাখিলে যুহ্দ হইতে বঞ্চিত হয়। কারণ সেই ব্যক্তি যুহদের সীমা ছাড়াইয়া যায়। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য রাখিতেন; কেননা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ক্ষুধা জ্বালা সহ্য করিতে পরিতেন না। কিন্তু তিনি নিজের জন্য রাত্রির খাদ্যও দিবসে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না।

শাক ও শির্কা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যঞ্জন। যায়তুন-তৈল ও যায়তুন-তৈল নির্মিত দ্রব্যাদি মধ্যম শ্রেণীর ব্যঞ্জনের অন্তর্গত এবং গোশ্‌ত সর্বোচ্চ শ্রেণীর ব্যঞ্জনের মধ্যে গণ্য। সর্বদা গোশ্‌ত ভক্ষণ করিলে যুহ্দ সমূলে বিনষ্ট হয়; কিন্তু সপ্তাহে দুই একবার ভক্ষণ করিলে একেবারে নষ্ট হয় না। পরিশেষে আহারের সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। দিবারাত্রের মধ্যে একবারের অধিক আহার করা উচিত নহে। দুই দিনে একবার আহার করা পূর্ণ যুহ্দের পরিচয়। প্রত্যহ দুইবার ভক্ষণ করিলে যুহ্দ থাকে না।

যুহ্দ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের (রা) জীবন-চরিত্র পাঠ করা উচিত। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন–"কখন কখন এমন হইত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের গৃহে চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রদীপ জ্বলিত না এবং খোরমা ও পানি ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য থাকিত না।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন–"যে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত পাইতে চায়, সে যেন যবের রুটি আহার করিয়া কুকুরের সহিত আবর্জনার স্তূপে শয়ন করে।" তিনি তাঁহার সহচরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন–"যবের রুচি ও শাক ভক্ষণ কর। গমের অনুসন্ধান করিও না; কেননা, ইহার কৃতজ্ঞতা তোমরা প্রকাশ করিতে পারিবে না।"

বস্ত্রের পরিমাণ ও প্রকারভেদ–দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থ হইল বস্ত্র। সংসার-বিরাগী লোকের পক্ষে একাধিক বস্ত্র রাখা উচিত নহে; এমন কি বিবস্ত্র হইয়া পরিহিত বস্ত্র ধৌত করিতে হইবে। যাহার নিকট দুইটি বস্ত্র থাকে, সে সংসার-বিরাগী নহে। পরিচ্ছদের নিম্নতম পরিমাণ হইল একটি লম্বা জামা, একটি টুপী এবং এক জোড়া জুতা। তদুপরি পাগড়ী ও একটি লুঙ্গি হইলে পরিচ্ছদের সর্বাধিক পরিমাণ হইয়া পড়ে। চট নিকৃষ্ট শ্রেণীর পরিচ্ছেদ; মোটা পশমী বস্ত্র মধ্যম শ্রেণীর এবং তুলার মোটা বস্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরিচ্ছদের মধ্যে গণ্য। যে-ব্যক্তি সূক্ষ্ম ও কোমল বস্ত্র পরিধান করে সে সংসার-বিরাগী নহে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা একখানা কম্বল ও একখানা মোটা লুঙ্গি বাহির করিয়া আনিয়া বলিলেন–"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামের এই পর্যন্তই পরিচ্ছদ ছিল।" হাদীস শরীফে আছে, যে-পোশাক পরিধান করিলে

খ্যাতি বৃদ্ধি পায়, তাহা আল্লাহ্‌র কোন প্রিয়পাত্র পরিধান করিলেও উহা যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার পরিধানে থাকিবে ততক্ষণ আল্লাহ্ তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ থাকিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুইখানা বস্ত্র অর্থাৎ কম্বল ও লুঙ্গির মূল্য দশ দেরহামের (১) অধিক হইত না। একবার তাহার নিকট উপঢৌকনস্বরূপ একখানা বস্ত্র আসিল। ইহাতে কয়েকটি বুটা ছিল। হযরত (সা) বস্ত্রখানা পরিধান করিয়াই উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন–"ইহা আবূ জহীসের নিকট লইয়া যাও এবং তাহার কম্বল লইয়া আস; কেননা উহার বুটাসমূহ আমার দৃষ্টিকে নিজের দিকে নিবদ্ধ করিয়াছে।" একবার হযরতের (সা) পবিত্র পাদুকায় নূতন ফিতা লাগানো হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন–"ঐ পুরাতন ফিতা লাগাইয়া দাও। কারণ, ইহা আমি পছন্দ করি না; নামাযের সময় ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল।" একবার মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ প্রদানকালে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় অঙ্গুলি হইতে আংটি খুলিয়া লইলেন। কারণ, তাঁহার দৃষ্টি আংটির দিকে পতিত হইয়াছিল। তৎপর তিনি বলিলেন–"এক দৃষ্টি ইহার উপর পড়িবে, আর এক দৃষ্টি তোমাদের উপর পড়িবে, ইহা সম্ভব নহে।" একবার হযরতের (সা) জন্য এক জোড়া নূতন পাদুকা আনয়ন করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সিজদায় প্রণত হইলেন। কিছুক্ষণ পর সিজদা হইতে উঠিয়া তিনি বাহিরে তশরীফ নিলেন। সর্বপ্রথমে তাঁহার সহিত যে-দরিদ্র ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটিল, তিনি তাহাকে পাদুকা জোড়াখানা দান করিলেন এবং বলিলেন–"আমার চক্ষে ইহা সুন্দর লাগিয়াছিল। আল্লাহ্ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন কিনা, আমার এই আশঙ্কা হইয়াছিল। এইজন্য আমি সিজদা করিলাম।" তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে সম্বোধন করিয়া বলেন–"কিয়ামতের দিন আমার সহিত মিলিত হইতে চাহিলে দুনিয়াতে জীবনধারণ-উপযোগী বস্তুতে পরিতুষ্ট থাক এবং তালি দেওয়ার পূর্বে পরিধেয় জামা দেহ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দিও না।

একদা গণনা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর পরিহিত বস্ত্রে চৌদ্দটি তালি লাগানো হইয়াছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিন দেরহাম মূল্যে একটি জামা খরিদ করিলেন। ইহার আস্তিন লম্বা হওয়াতে অতিরিক্ত অংশ ছিঁড়িয়া ফিলিয়া দিয়া

(১) প্রতি দেরহামের মূল্য ঐ সময়ে ছিল প্রায় ৮ টাকার সমান

তিনি বলিলেন–" আল্লাহ্ তা'আলাকে ধন্যবাদ, যিনি আমাকে অনুগ্রহপূর্বক এই পোশাক পরিধান করিতে দিয়াছেন।" এক বুযুর্গ বলেন "আমি হযরত সুফিয়ান সাওরীর (র) পাদুকাসহ পরিচ্ছদের মূল্য যাচাই করিয়া দেখিলাম যে, ইহা এক দেরহাম চারি দাঙ্গের অধিক হয় নাই।" হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, যাহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিবার অর্থবল আছে, সেই ব্যক্তি যদি বিনয় অবলম্বনপূর্বক তদ্রূপ পরিচ্ছদ পরিধান না করে, তবে সে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পদ্মরাগ মণি নির্মিত বৃহৎ থালাসমূহ পরিপূর্ণ বেহেশতী পোশাক পাওয়ার অধিকার লাভ করে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, যে-সকল মহামানবকে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পোশাক যেন সাধারণ লোকের পোশাকের ন্যায় হয়। তাহা হইলে ধনবান লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিবে এবং দরিদ্রগণ মনঃক্ষুণ্ন হইবে না।

হযরত ফাযালা ইব্‌নে ওবায়দুল্লাহ্ (র) মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। লোকে তাঁকে সামান্য পোশাক পরিধানপূর্বক নগ্নপদে চলিতে দেখিয়া বলিল–"আপনি এইরূপ সাধারণ বেশে চলাফেরা করিবেন না। কারণ, আপনি এই দেশের শাসনকর্তা।" তিনি উত্তর দিলেন–" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে আড়ম্বর প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কখন কখন নগ্নপদে চলিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন।" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে ওয়াসে (র) একদা মোটা পশমের সামান্য বস্ত্র পরিধানপূর্বক কুতায়বা ইব্‌নে মুস্‌লিমের নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি এমন পশমী বস্ত্র পরিধান করিয়াছ কেন?" হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে ওয়াসে' (র) উত্তর না দিয়া নীরব থাকিলে তিনি নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন–"আমি কি উত্তর দিব? যদি বলি যে, যুহ্‌দ অবলম্বন করিয়াছি তবে আত্মপ্রশংসা হয়; আর যদি বলি যে, দরিদ্রতার কারণে এইরূপ নিকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, তবে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।" লোকে হযরত সালমানকে (রা) জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করেন না কেন?" তিনি বলিলেন– "দাস হইয়া কিরূপে উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করা যায়? আগামী কল্য (অর্থাৎ আখিরাতে) স্বাধীন হইতে পারিলে উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধানে বঞ্চিত থাকিব না।" হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল

আযীযের (রা) একখানা চট ছিল। ইহা পরিধান করিয়া তিনি রাত্রে নামায পড়িতেন। লোকে দেখিবে বলিয়া দিবসে তিনি ইহা পরিধান করিতেন না। হযরত হাসান বস্‌রী (র) ফরকদ সঞ্জীকে বলিলেন—"এই কম্বল পরিধানপূর্বক তুমি হয়ত নিজকে অপর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করিতেছ। আমি ত শুনিয়াছি যে, অধিকাংশ কম্বল পরিধানকারী দোযখে যাইবে।"

গৃহের প্রকার ও ব্যবহার —তৃতীয় প্রকার দরকারী বস্তু বাসগৃহ। ইহার নিম্নতম শ্রেণী হইল বাসের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট না করিয়া কোন মসজিদে বা কোন পান্থশালার এক কোণে আশ্রয় পাইলেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকা। আবাস-স্থানের সর্বোচ্চ শ্রেণী হইল নিজ-নির্মিত বা ভাড়ায় কোন গৃহ আপন অধিকারে রাখা। এইরূপ বাসগৃহের আয়তন আবশ্যকতা অনুযায়ী হওয়া উচিত; অনাবশ্যক প্রশস্ত বা উচ্চ হওয়া উচিত নহে এবং ইহাতে নানারূপ চিত্রবিচিত্র কারুকার্যও থাকিতে পারিবে না। এইরূপ আড়ম্বরশূন্য গৃহও আবার ছয় হাতের অধিক উচ্চ হইলে অধিবাসী যুহ্‌দের সীমা হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবে। শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহের আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ইহাতে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে।

বুযুর্গগণ বলেন, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মানবসমাজে দীর্ঘ আশার বিস্তার সর্বপ্রথমে এইরূপে হইল যে, লোকে চুনকাম-করা গৃহ ও অধিক সেলাইযুক্ত সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের সময়ে কেবল এক সেলাই দিয়া পরিধেয় বস্ত্র তৈয়ার করা হইত, একের অধিক সেলাই দেওয়া হইত না। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এক উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপর হযরতের (সা) আদেশে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা কোন স্থানে যাওয়ার কালে একটি উচ্চ গুম্বজওয়ালা গৃহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৃহটি কাহার?" লোকে তাঁহাকে গৃহস্বামীর নাম জানাইল। তৎপর সেই ব্যক্তি হযরতের (সা) নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। লোকের নিকট হইতে হযরতের (সা) অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসাপূর্বক অবগত হইয়া সেই ব্যক্তি গৃহের গুম্বজটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইহার পর হযরত (সা) তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মঙ্গলের জন্য দু'আ করিলেন। হযরত হাসান (রা) বলেন— "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম সারা জীবনে কখনও ইটের উপর

ইট রাখেন নাই এবং কাঠের সহিত কাঠ জোড়া দেন নাই।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আল্লাহ্ যাহার অমঙ্গল চাহেন তাহার ধন পানি এবং মাটিতে নষ্ট করিয়া দেন।" (অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি পাকা বাড়ী বানাইয়া টাকা-পয়সা অযথা নষ্ট করে।)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন—"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমনপূর্বক আমরা কি করি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি নিবেদন করিলাম—'নলের ঘরখানি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহা মেরামত করিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন—'অবসর কোথায়, ব্যাপার ত সন্নিকট।" অর্থাৎ মৃত্যু অতি নিকটবর্তী।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে-ব্যক্তি অনাবশ্যক গৃহ নির্মাণ করিবে, কিয়ামতের দিন তাহাকে এই গৃহ মাথায় উঠাইয়া লইবার আদেশ করা হইবে।" তিনি বলেন—(অভাব মোচনের জন্য) "মানুষ যাহা ব্যয় করে, তাহার পুণ্য সে পাইবে। কিন্তু মাটি ও পানিতে সে যাহা ব্যয় করে তাহার পুণ্য সে পাইবে না।" হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম নলের গৃহ বানাইলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ইটের ঘর বানাইলে কি দোষ হইত।? তিনি বলিলেন—"যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার জন্য ইহাও অতিরিক্ত।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) বড় বড় গৃহ তৈয়ার করে, কিয়ামতের দিন ইহা তাহার জন্য বিপদ হইবে। কিন্তু শীতাতপ হইতে রক্ষা পাওয়া জন্য যে-গৃহ আবশ্যক, ইহা তাহার জন্য বিপদ হইবে না।"

সিরিয়া দেশে যাইবার পথে মযবুত ইষ্টক নির্মিত একটি উচ্চ প্রাসাদ দেখিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলিলেন—"আমি জানিতাম না যে, এই উম্মতের মধ্যে কেহ এমন প্রাসাদ নির্মাণ করিবে। এই প্রকার প্রাসাদ হামান ফেরআউনের জন্য বানাইয়াছিল। কারণ, ফেরআউন পাকা ইট তৈয়ার করিতে আদেশ দিয়া বলিয়াছিল – أَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ "হে হামান, আমার জন্য মাটির উপর আগুন জ্বালাও।" (অর্থাৎ পাকা ইট তৈয়ার কর) সূরা কাসাস, ৪ রুকূ, ২০ পারা।) হাদীস শরীফে আছে যে, বান্দা যখন ছয় হাত অপেক্ষা উচ্চ গৃহ তৈয়ার করে তখন ফিরিশতা আকাশ হইতে ঘোষণা করে—"রে ফাসিক শ্রেষ্ঠ! তুই কোথায় আসিতেছিস্?" অর্থাৎ তোকে ভূগর্ভে যাওয়া উচিত ছিল। তুই আকাশে উঠিতেছিস কেন? হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু

আন্হু বলেন–"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সকল গৃহ এরূপ উচ্চ ছিল যে, একজন লোক দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইলে গৃহের ছাদে হাত লাগিল। হযরত ফুযায়েল (র) বলিতেন–"লোকে গৃহ নির্মাণপূর্বক ইহা পরিত্যাগ করিয়া মরিয়া যায় দেখিয়া আমি আশ্চর্য বোধ করি না। কিন্তু আশ্চর্য বোধ করি ইহা দেখিয়া যে লোকে উপদেশ গ্রহণ করে না।"

গৃহসামগ্রীর পরিমাণ– চতুর্থ প্রকার আবশ্যক দ্রব্য হইল গৃহসামগ্রী। এ-সম্বন্ধে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের আদর্শ সর্বোৎকৃষ্ট। প্রথমে তাঁহার একটি চিরুনি ও একটি পেয়ালা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। একদা এক ব্যক্তিকে অঙ্গুলি দ্বারা দাড়ি আঁচড়াইতে দেখিয়া তিনি চিরুনি পরিত্যাগ করিলেন। আবার এক ব্যক্তিকে অঞ্জলি করিয়া পানি পান করিতে দেখিয়া তিনি পেয়ালাটিও বর্জন করিলেন। গৃহসামগ্রীর মধ্যম শ্রেণী হইল প্রত্যেক দরকারী বস্তুর এক একটি করিয়া রাখা। উহা মাটি বা কাঠের নির্মিত হওয়া আবশ্যক। তামা বা পিতলের তৈজসপত্র ব্যবহার করিলে যুহ্দ বিনষ্ট হয়। পূর্বকালের বুযুর্গগণ একই দ্রব্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেন।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লামের গাছের ছালে ভর্তি করা একখানা বালিশ ছিল এবং একটি কম্বল দুই ভাঁজ করিয়া পাতিয়া তাঁহার শয্যা তৈয়ার করা হইত। একদা হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাঁহার পবিত্র পাঁজরে খেজুর পাতার চাটাইর দাগ দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হযরত (সা) রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, দুনিয়ার বাদ্শাহগণ আল্লাহ্র দুশমন হইয়াও সুখভোগ করিতেছে এবং আল্লাহর রাসূল ও প্রিয় বন্ধু এত দুঃখকষ্ট সহ্য করিতেছেন দেখিয়া আমি রোদন করিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন–"হে ওমর, আল্লাহ্ যে তাহাদিগকে পার্থিব ধন দান করিয়াছেন এবং আমাদের জন্য পরকালের অনন্ত সম্পদ অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হইবে না?" হযরত ওমর (রা) বলিলেন–"আমি সন্তুষ্ট হইলাম।" তৎপর হযরত (সা) বলিলেন–"হে ওমর, অবগত হও আমি যাহা বলিলাম, তাহাই প্রকৃত ব্যাপার।" এক ব্যক্তি হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর গৃহে যাইয়া দেখিল সমস্ত গৃহে কিছুই নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–"হে আবূ যর, তোমার গৃহে তো কিছুই নাই!" হযরত আবূ যর (রা) বলিলেন–"আমার হাতে যাহা কিছু আছে, আমি তাহা আমার অন্যগৃহে পাঠাইয়া দেই।" (অন্যগৃহ' অর্থে তিনি পরকালকে বুঝাইয়াছেন।) সেই ব্যক্তি বলিলেন–"এ-গৃহে যতক্ষণ পর্যন্ত আছ ততক্ষণ ত কিছু গৃহসামগ্রী আবশ্যক।" হযরত আবূ যর (রা) বলিলেন–"গৃহস্বামী (অর্থাৎ আল্লাহ্) আমাকে এখানে থাকিতে দিবেন না।"

হাম্সের শাসনকর্তা হযরত আমীর ইব্নে সা'আদ হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"পার্থিব আসবাবপত্রের মধ্যে তোমার নিকট কি কি আছে?" তিনি বলিলেন– "একটি লাঠি; ইহাতে ভর করিয়া পথ চলি এবং ইহা দ্বারা সাপ মারিয়া থাকি। একটি থলি, ইহাতে খাদ্যদ্রব্য রাখি একটি পেয়ালা ইহাতে আহার করি এবং ইহাতে পানি রাখিয়া মস্তক ও বস্ত্রাদি ধৌত করি। একটি লোটা, ইহাতে পানি পান করি এবং ওযু করি। এইগুলি মূলবস্তু তৎসমুদয় ব্যতীত যাহা আছে তাহা উহার আনুষঙ্গিক।" এক সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্হার গৃহে গমন করিলেন। গৃহের দ্বারে একখানা পর্দা ঝুলিতেছিল এবং কন্যার হস্তে তিনি রূপার বালা দেখিতে পাইলেন। ইহা দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ফিলিয়া গেলেন। হযরত ফাতিমা (রা) বুঝিতে পারিলেন যে, গৃহদ্বারে পর্দা ও হস্তের বালা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। হযরত ফাতিমা (রা) কালবিলম্ব না করিয়া পর্দা ও বালা বিক্রয় করত উহা মূল্য গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত (সা) হযরত ফাতিমার (রা) প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন–"তুমি অতি উত্তম কাজ করিয়াছ।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার গৃহে একটি পর্দা ছিল। হযরত (সা) হযরত আয়েশাকে (রা) লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–"এই পর্দা দেখিলে দুনিয়া আমার স্মরণে আসে। ইহা লইয়া যাইয়া অমুককে দিয়া আস।"

পরিধানের কম্বল দুই ভাঁজ করিয়া ইহার উপর রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রাত্রে শয়ন করিতেন। এক রজনীতে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা একখানা নূতন বিছানা পাতিয়া দিলেন। হযরত (সা) ইহাতে শয়ন করিয়া সমস্ত রজনী অনিদ্রায় ও অশান্তিতে কাটাইলেন এবং পর দিবস বলিলেন–"এই বিছানা আমার নিদ্রা নষ্ট করিয়াছে।" তদবধি হযরত আয়েশা (রা) তাঁহাকে ঐ কম্বলটি বিছাইয়া দিতেন। একবার রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু ধন আসিল। তিনি সব ধন দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন; তন্মধ্য হইতে মাত্র ছয়টি দীনার অবশিষ্ট রহিল। এই

অর্থ জমা থাকার দরুন সমস্ত রজনী তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। শেষ রাত্রে তিনি ঐ ছয়টি দীনারও বিতরণ করিয়া দিয়া আরামে নিদ্রা গেলেন। তৎপর তিনি বলিলেন–"ঐ ছয়টি দীনার রাখিয়া যদি আমি মরিয়া যাইতাম তবে আমার অবস্থা কেমন হইত?"

হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেন–"আমি এমন সত্তর জন সাহাবার (রা) দর্শন লাভ করিয়াছি, যাঁহাদের পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বস্ত্র ছিল না। তাঁহারা পরিহিত বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করত ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিতেন এবং শরীরে মাটি লাগিবে বলিয়া মোটেই পরওয়া করিতেন।"

বিবাহ– পঞ্চম আবশ্যক বিবাহ। হযরত সহল তস্তরী (র) হযরত সুফিয়ান উইয়াইনা এবং কতিপয় আলিম বলেন যে, বিবাহে বৈরাগ্য নাই। ইহার কারণ এই যে, রাসূলে মক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমস্ত জগতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংসার-বিরাগী হওয়া সত্ত্বেও পত্নীদিগকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার নয় জন পত্নী ছিলেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু সংসার বিরাগীদের আদর্শস্থানীয়; কিন্তু তাঁহারও চারিজন স্ত্রী ছিলেন। এইরূপ বিবাহ-কার্য দ্বারা তাঁহারা হয়ত বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বৈরাগ্যের কারণে বিবাহ পরিত্যাগ করা দুরস্ত নহে। বিবাহ সন্তান উৎপত্তির উপায় এবং ইহা দ্বারা বংশ রক্ষা পায়। এতদ্ব্যতীত বিবাহে আরও বহু উপকারিতা আছে। বৈরাগ্য ভ্রমে যে-ব্যক্তি বিবাহ হইতে বিরত থাকে, তাহাকে এমন লোকে সহিত তুলনা করা যায়, যে পানাহারের আনন্দ পরিহারের উদ্দেশ্যে পানাহার একেবারে পরিত্যাগ করে। পানাহার বর্জন করিলে যেমন শরীর বিনাশ পায়, স্ত্রী গ্রহণে বিমুখ হইলেও তদ্রূপ মনুষ্যবংশ লুপ্ত হয়। তবে বিবাহ করিলে আল্লাহকে ভুলিয়া কেবল স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবার ভয় থাকিলে এমন লোকের পক্ষে বিবাহ না করাই শ্রেয়। কিন্তু কাম-রিপু প্রবল হইলে রূপবতী সুন্দরী কামিনী পরিত্যাগ করত যে কাম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত না করিয়া বরং নির্বাপিত করে, এমন নারী বিবাহ করা যুহ্‌দের কার্য।

হযরত ইমাম আহমদ হাম্বলের (র) সহিত বিবাহের জন্য লোকে এক পরমা সুন্দরী মহিলা ঠিক করিল এবং তাহারা বলিল– "এই মহিলার এক ভগিনীও আছেন। তিনি সুন্দরী নহেন এবং এক চক্ষুহীনা; কিন্তু তিনি খুব বুদ্ধিমতী।" হযরত ইমাম সাহেব (র) রূপবতী মহিলাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং সেই বুদ্ধিমতী কানা মহিলাকে বিবাহ করিলেন। হযরত জুনায়েদ (র)

বলেন–"ব্যবসা, বিবাহ ও হাদীস লেখা হইতে বিরত থাকাকে আমি প্রাথমিক মুরীদগণের জন্য অত্যন্ত পছন্দ করি।" তিনি আরও বলেন–"সূফীদের জন্য আমি লেখাপড়ার কাজ পছন্দ করি না। কারণ, লেখাপড়া করিলে একাগ্রতা থাকে না এবং মন প্রশান্ত হয় না।"

ধন ও মান –ষষ্ঠ প্রয়োজনীয় বিষয় ধন ও মান। বিনাশন খন্ডে বলা হইয়াছে যে, ধন ও মান মরাত্মক বিষতুল্য হইলেও উহার আবশ্যক পরিমাণ বিশেষ উপকারী। আবশ্যক পরিমাণ ধন ও মান দুনিয়ার অন্তর্গত নহে; বরং ধর্মপথের অত্যাবশ্যক বস্তুর মধ্যে পরিগণিত।

একদা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম এক ব্যক্তির নিকট কিছু ধার চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ ওহী অবতীর্ণ হইল–"হে ইবরাহীম, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধু; এমতাবস্থায় তুমি আমার নিকট চাহিলে না কেন?" তিনি নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, আমি জানি যে, দুনিয়াকে তুমি ভালবাস না। এই জন্য তোমার নিকট চাহিতে আমার ভয় হইয়াছিল।" আল্লাহ্ বলিলেন–"হে ইবরাহীম, যে-জিনিস নিতান্ত আবশ্যক, তাহা দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে"

উপসংহার–মানুষ যখন অনাবশ্যক দ্রব্য পরকালের আশায় পরিত্যাগ করে এবং ধন ও মান আবশ্যক পরিমাণ পাইয়া সন্তুষ্ট থাকে তখন তাঁহার মন ধন ও মানে লিপ্ত থাকে। এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে না। ফলকথা এই যে, এইরূপ ব্যক্তি পরলোকগমন করিলে তাহার মস্তক নিম্ন দিকে এবং মুখমণ্ডল পশ্চাৎ দিকে থাকিবে না; অর্থাৎ সে দুনিয়ার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইবে না। যে-ব্যক্তি দুনিয়াকে শান্তি ও আরামের স্থান বলিয়া মনে করে, সে পরকালে যাইবার সময়ে ইহার দিকে বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকে। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি দুনিয়াকে পায়খানা তুল্য মনে করে অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যকতা দেখা না দিলে ইহার দিকে দৃষ্টিপাতও করে না, এমন ব্যক্তি মরিয়া গিয়া যখন দুনিয়ারূপ পায়খানা হইতে অব্যাহতি পায়, তখন সে ইহার প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করিবে? সংসারাসক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এইরূপ—মনে কর, তোমাকে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতে দেওয়া হইবে না; কিন্তু তথায় তুমি স্বীয় গ্রীবা দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলে অথবা মস্তকের কেশপাশ সেই স্থানে মযবুত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে। এমতাবস্থায় তোমাকে সেই স্থান হইতে বলপূর্বক টানিয়া বাহির করিবার সময় কেশে বন্ধন থাকার দরুন তুমি ঝুলিতে থাকিবে এবং সমস্ত

চুল সমূলে উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে তথা হইতে বাহির করা যাইবে না। টানাটানি করিয়া তোমাকে সেই স্থান হইতে বাহির করিলে চুল উপড়িয়া যাওয়ার ফলে মস্তকে যে-যখম হইবে, ইহা তোমার শরীরে থাকিয়াই যাইবে।

হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলিতেন-"আমি এমন কতিপয় লোকের দর্শন লাভ করিয়াছি যাঁহারা বিপদাপদে পতিত হইলে এতদূর আনন্দিত হইতেন, যে তোমরা মহা সম্পদ লাভেও তত আনন্দিত হও না। তাঁহারা তোমাদিগকে দেখিলে তোমাদিগকে শয়তান বলিয়া মনে করিতেন এবং তোমরা তাঁহাদিগকে পাগল জ্ঞান করিতে।" সংসারের প্রতি মন বিরক্ত ও বিমর্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই বিপদাপদে নিপতিত হওয়াকে তাঁহারা এত পছন্দ করিতেন, যেমন মৃত্যুকালে তাঁহাদের হৃদয় দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট না থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়ত (সংকল্প), সিদ্‌ক ও ইখলাস (আন্তরিকতা)

বিশুদ্ধ নিয়তের চরম আবশ্যকতা-চক্ষুষ্মান জ্ঞানিগণের নিকট ইহা দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত যে, মানবজাতির মধ্যে আবিদগণ ব্যতীত অপর সকলেই অধঃপতিত; আবার আবিদের মধ্যে আলিম ব্যতীত অপর সকলেই উৎসন্ন; আবার আলিমগণের মধ্যে যাহাদের আন্তরিকতা নাই তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত। এইরূপ আন্তরিকতাসম্পন্ন আলিমগণও মহাসংকটের সম্মুখীন। কারণ, আন্তরিকতা ব্যতীত তাহাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট ও পরিশ্রমই নিষ্ফল। আবার আন্তরিকতা (ইখ্‌লাস) ও সিদ্‌ক নিয়তের মধ্যেই থাকে। সুতরাং যে-ব্যক্তি নিয়তের অর্থ না বুঝে, সে তাহার সংকল্পে ইখ্‌লাস রক্ষার জন্য কিরূপ তৎপর হইবে? এইজন্যই এই অধ্যায়টি তিন অনুচ্ছেদে ভাগ করিয়া প্রথম অনুচ্ছেদে নিয়তের অর্থ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ইখলাসের পরিচয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে সিদ্‌কের হাকীকত বর্ণনা করা হইবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ—নিয়ত

নিয়তের ফযীলত-সকলের পক্ষেই নিয়তের ফযীলত বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, নিয়ত যাবতীয় পুণ্যকর্মের প্রাণ। নিয়ত লইয়াই বিচার হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা কার্যের নিয়তই দেখিয়া থাকেন। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি ও ধনের প্রতি দৃষ্টপাত করিবেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর (অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে কাজ কর তাহা) ও আমল দেখিবেন।" অন্তরই নিয়তের স্থান বলিয়া তিনি ইহা দেখিবেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"নিয়ত অনুযায়ী আমল হইয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়ত অনুরূপ ফল পায়। যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে (অর্থাৎ জিহাদ বা হজ্বের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাহির হয়), তাহার হিজ্‌রত

আল্লাহ্‌র জন্যই হয়। আর যে-ব্যক্তি ধন লাভ বা কোন মহিলাকে হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তাহার হিজ্‌রত আল্লাহ্‌র জন্য হইবে না; বরং ইহা তাহার নিয়ত অনুযায়ী হয়।" তিনি বলেন-"আমার উম্মতের মধ্যে বহু লোক শয্যার উপর বালিশে মাথা রাখিয়া শহীদ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। আবার বহু লোক যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই সৈন্যদলের মধ্যে নিহত হয়; আল্লাহ্ তাহাদের নিয়ত উত্তমরূপে অবগত আছেন।" (অর্থাৎ নিয়ত বিশুদ্ধ না হইলে যুদ্ধে নিহত হইয়াও শহীদের মরতবা পায় না। আবার নিয়ত বিশুদ্ধ থাকিলে বিছানায় পড়িয়া মরিলেও শহীদের মরতবা পায়।) তিনি বলেন-"বান্দা এমন বহু সৎকার্য করে যাহা ফিরিশ্‌তাগণ ঊর্ধ্বে লইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই সমস্ত কার্য তাহাদের আমলনামা হইতে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করেন এবং বলেন-'সে এই কাজ আমার জন্য করে নাই। অমুক কার্য তাহার আমলনামায় লিখিয়া লও।' ফিরিশ্‌তাগণ নিবেদন করেন -"ইয়া আল্লাহ্, এই কার্যত সে করে নাই।' আল্লাহ্ বলেন-'সেই এ সকল কার্যের নিয়ত করিয়াছিল।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"চারি প্রকার লোক আছে। এক প্রকার লোক ধনবান এবং শরীয়তের বিধানমতে ধন ব্যয় করে। দ্বিতীয় প্রকার লোক (নির্ধন, তাহারা) বলে-আমাদের ধন থাকিলে আমরাও তদ্রূপ (প্রথম প্রকার লোকের ন্যায়) ব্যয় করিতাম। এই উভয় প্রকার লোক সমান সওয়াব পাইবে। তৃতীয় প্রকার লোক অন্যায়ভাবে ধন ব্যয় করে। চতুর্থ প্রকার লোক বলে-ধন থাকিলে আমরাও ঐরূপ অপব্যয় করিতাম। এই দুই শ্রেণীর লোক সমান পাপী হইবে।" এই হাদীসের অর্থ এই যে, সৎকার্য করিলে যে-সওয়াব পাওয়া যায়, শুধু ইহার নিয়ত থকিলেও তদ্রূপ সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে- "তাবুক-যুদ্ধের দিন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বাহিরে আসিয়া বলিলেন-'সফর ও ক্ষুধাজনিত যে-কষ্ট আমরা ভোগ করিতেছি, মদীনাতে এমন বহু লোক আছে, যাহারা উহাতে আমাদের সমান অংশী হইতেছে।' (অর্থাৎ তাহারা আমাদের সমান সওয়াব পাইতেছে।) আমরা নিবেদন করিলাম-হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তাহারা ত সফরের কষ্ট ভোগ করে নাই; কিরূপে তাহারা আমাদের সমান অংশী হইবে? হযরত (সা) বলিলেন-'যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকায় তাহারা আমাদের সঙ্গে আসিতে পারে নাই। অন্যথায় তাহাদের নিয়ত আমাদের নিয়তের অনুরূপ।"

বানী ইসরাঈল বংশের এক ব্যক্তি বালুকাময় পাহাড়ের উপর দিয়া পথ চলিতেছিল। তখন সেই দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছিল। সেই ব্যক্তি মনে মনে বলিল-"আমি এই পাহাড় পরিমাণ গম পাইলে তৎসমুদয়ই দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতাম।" তৎকালীন পয়গম্বরের (আ) নিকট ওহী অবতীর্ণ হইল-"অমুক ব্যক্তিকে জানাইয়া দাও-"আল্লাহ্ তোমার দান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমার নিকট যদি সেই পরিমাণ গম থাকিত এবং উহা সমস্তই দান কারিয়া দিতে তবে তুমি এতটুকু সওয়াবই পাইতে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যাহার সংকল্প ও শক্তি দুনিয়া অর্জনে নিয়োজিত থাকে, তাহার চক্ষুর সম্মুখে সর্বদা দরিদ্রতা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং দুনিয়ার মায়াতে আবদ্ধ হইয়া সে পরলোকগমন করেন। আর যাহার সংকল্প ও শক্তি পরকালের কার্যে নিবদ্ধ থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মনকে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত রাখেন এবং সে সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া পরলোকগমন করে।" তিনি বলেন-"মুসলমান যখন কাফিরের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হয়, তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের নাম লিখিতে আরম্ভ করে যে- 'অমুক ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার বশীভূত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। অমুক ব্যক্তি জেদের বশীভূত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে; পরিশেষে লিখে, অমুক অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হইয়াছে।' যে ব্যক্তি কালেমা তাওহীদ সমুন্নত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে আল্লাহ্‌র পথে আছে।" তিনি বলেন-"যে-ব্যক্তি স্ত্রীর মোহরানা দিবে না বলিয়া ইচ্ছা রাখে সে যিনাকার। আর যে-ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের অনিচ্ছা পোষণ করিয়া ঋণগ্রহণ করে, সে চোর।"

জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন-"অগ্রে সৎকার্যের সংকল্প সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর, তৎপর কার্য কর।" এক ব্যক্তি এমন কোন সৎকর্ম সম্বন্ধে জানিতে চাহিল যাহা সে দিবারাত্র করিতে পারে এবং অনবরত সওয়াব পাইতে থাকে। জ্ঞানিগণ তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন-"সৎকর্ম যদি করিতেও না পার তবুও সৎকর্ম করিবার ইচ্ছা সর্বদা মনে জাগরুক রাখ। তাহা হইলে সৎকর্ম করিয়া যে সওয়াব পাইতে তাহাই পাইবে।" হযরত আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন-"কিয়ামতের দিন লোকের পুনরুত্থান তাহাদের সংকল্প অনুরূপ হইবে।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেন- "জীবনের সামান্য কয়েক দিনের সৎকার্যের ফলে চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত পাওয়া যাইবে না; এবং নিয়তের কারণে পাওয়া যাইবে, কেননা নিয়তের কোন পরিসীমা নাই।"

নিয়তের হাকীকত–তিনটি জরুরী পদার্থের সমাবেশ না হওয়া পর্যন্ত মানব দ্বারা কোন কার্য সংঘটিত হইতে পারে না। তিনটি পদার্থ এই–(১) জ্ঞান, (২) ইচ্ছা ও (৩) শক্তি। উদাহরণস্বরূপ দেখ, খাদ্যদ্রব্য না দেখিলে কেহই আহার করে না; আবার দেখিলেও ইচ্ছা না থাকিলে কেহ খায় না। ইহার পর আহারের ইচ্ছা থাকিলেও তাহার হাত শক্তিহীন অবশ হইলে সে খাইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার অগ্রে জ্ঞান, ইচ্ছা, শক্তি এই তিনটি বস্তুর সমাবেশ নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কার্যটি শক্তির অধীন; শক্তি আবার ইচ্ছার অধীন। কারণ, ইচ্ছা শক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে এবং ইচ্ছা জ্ঞানের আজ্ঞাধীন। কেননা মানুষ বহু কিছু দেখে, অথচ তৎসমুদয়ের ইচ্ছা ও লোভ তাহার মনে জাগ্রত হয় না। কিন্তু বিনা জ্ঞানে ইচ্ছা ও কামনা উদ্রেক হয় না। কেননা যে-সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান নাই, উহার ইচ্ছা সে কিরূপে করিবে?

উপরিউক্ত তিনটি বস্তুর মধ্যে 'ইচ্ছা'র নামই নিয়ত। নিয়ত জ্ঞান ও শক্তি হইতে উদ্ভূত নহে। যে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা মানুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে এবং ইহাতে লাগাইয়া রাখে তাহাকেই ইচ্ছা (ইরাদা) বলে। এই ইচ্ছাকেই উদ্দেশ্য, নিয়ত এবং কস্‌দও বলে। এই তিনটি শব্দই সম-অর্থবোধক। যে উদ্দেশ্য মানুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে, ইহার সংখ্যা কখনও একটি, আবার কখনও একাধিক হইয়া থাকে। কার্যের উদ্দেশ্য যখন একটিমাত্র থাকে তখন ইহাকে বিশুদ্ধ (খালিস) বলে। ইহার উদাহরণ এইরূপ—মনে কর, এক ব্যক্তি উপবিষ্ট আছে। এক ব্যাঘ্র তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিল। এমন সময় সেই ব্যক্তি সেই স্থান হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করে। এ-স্থলে সেই ব্যক্তির একটিমাত্র উদ্দেশ্য, একটিমাত্র বাসনা অর্থাৎ পলাইয়া যাওয়া। এইরূপ কোন ভক্তিভাজন সম্ভ্রান্ত লোক নিকটে আসিলে মানুষ দণ্ডায়মান হয়। এ-স্থলেও সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত দণ্ডায়মান হওয়ার কার্যের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং এই উদ্দেশ্যও খালিস অর্থাৎ একক ও অমিশ্র।

আবার এই কার্যের একাধিক উদ্দেশ্য তিন প্রকার হইয়া থাকে। **প্রথম প্রকার**–একাধিক উদ্দেশ্যের প্রত্যেকটিই এরূপ যে, ইহাতের একটিও মানুষকে কার্যে রত করিয়া রাখিতে পারে। যেমন, মনে কর, কোন দরিদ্র আত্মীয় আসিয়া তোমার নিকট একটি টাকা চাহিল। তুমি আত্মীয় ও দরিদ্র জ্ঞানে তাহাকে একটি টাকা দান করিলে এবং মনে মনে বলিলে–"এই ব্যক্তি দরিদ্র না হইলেও

তাহাকে একটি টাকা দিতাম; অথবা সে আত্মীয় না হইয়া শুধু দরিদ্র হইলেও দিতাম। এমন স্থলে তোমার ঐ একটি টাকা দানের মধ্যে দুইটি উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। সুতরাং তোমার নিয়ত ভাগাভাগি হইয়া পড়িল। ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে মনে কর, একটি প্রস্তর স্থানান্তরিত করিতে হইবে। দুইজন সমান শক্তিশালী লোক আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়েই এত বলবান যে, প্রত্যেকেই একা প্রস্তরটি সরাইতে পারে; তথাপি দুইজন একত্রে ধরাধরি করিয়া ইহা অতি সহজে সরাইয়া দিল। **দ্বিতীয় প্রকার**–ঐ দানের সময়ে তুমি যদি বিবেচনা করিতে যে, সেই প্রার্থী দরিদ্র না হইয়া যদি শুধু আত্মীয় হইত অথবা দরিদ্রই হইত কিন্তু আত্মীয় না হইয়া অপর লোক হইত, তবে তুমি টাকা দিতে না; একসঙ্গে দরিদ্র ও আত্মীয় হওয়ার জন্যই তুমি দান করিয়াছ; সেই স্থলে দুইটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া দান-কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত এই—মনে কর, দুই জন দুর্বল ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া ধরাধরি করিয়া ঐ প্রস্তরটি সরাইল। কিন্তু তাহাদের কেহই একাকী ইহা সরাইতে পারিত না। **তৃতীয় প্রকার**–দুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি এমন দুর্বল যে, ইহা কখনই মানুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে না; কিন্তু অপরটি এমন বলবান যে, ইহা একাকীই তাহাকে কার্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে। তবে দুর্বল উদ্দেশ্যটিও মিলিত হইয়া কার্যটি নিতান্ত সহজ করিয়া দিল। যেমন, মনে কর, এক ব্যক্তি একাকী থাকিলেও তাহাজ্জুদের নামায পড়ে; কিন্তু লোক সমাবেশে তাহাজ্জুদ-নামায পড়া তাহার পক্ষে অতি সহজ হইয়া উঠে এবং সে তখন নামাযে আনন্দও অধিক পাইয়া থাকে। এইরূপ নামাযী ব্যক্তির মনে পুণ্য-প্রাপ্তির আশা থাকিলে লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে যে তাহাজ্জুদ পড়িল না। ইহার উদাহরণ এইরূপ–মনে কর, একজন বলবান ব্যক্তি উক্ত প্রস্তরটি একাকীই সরাইতে পারে; কিন্তু একটি দুর্বল লোকও যদি তাহাকে সাহায্য করে তবে কাজটি নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে।

কার্যের উদ্দেশ্যের উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটির জন্যই আবার পৃথক পৃথক বিধান আছে। ইখ্‌লাসের বর্ণনাকালে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। সেই আলোচনা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, যে-উদ্দেশ্যে মানুষ কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কোন স্থলে একটিমাত্র থাকে, আবার কোন একাধিক উদ্দেশ্য একত্র মিলিয়া কাজ করে।

শারীরিক কার্য অপেক্ষা নিয়ত উৎকৃষ্ট– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন – نِيَّتُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ অর্থাৎ "মুমিনের নিয়ত, (সংকল্প) তাহার কার্য অপক্ষো উৎকৃষ্ট।" এই হাদীসের অর্থ ইহা নহে যে, কর্মহীন নিয়ত, নিয়তহীন কর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ ইহা নিতান্ত সুস্পষ্ট যে, নিয়তহীন কর্ম ইবাদহ নহে এবং কর্মহীন নিয়ত ইবাদতের মধ্যে গণ্য। ইহার কারণ এই যে, শরীর দ্বারা ইবাদত সম্পন্ন হয় এবং মন দ্বারা নিয়ত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই দুইটির মধ্যে যাহা অন্তরের সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহা উৎকৃষ্ট। আবার অন্তরের কার্য উৎকৃষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, অন্তরের স্বভাবের পরিবর্তন শারীরিক ইবাদতের উদ্দেশ্য এবং শরীরের স্বভাবের পরিবর্তন নিয়ত অর্থাৎ আন্তরিক ইবাদতের উদ্দেশ্য নহে। লোকে মনে করে, ইবাদতের জন্য নিয়ত আবশ্যক; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, নিয়ত বিশুদ্ধ করিবার জন্যই ইবাদত আবশ্যক। কেননা মনকে এ-সংসার হইতে ফিরাইয়া লওয়াই যাবতীয় ইবাদতের উদ্দেশ্য। কারণ আত্মাকেই পরকালে যাইতে হইবে এবং উহাকেই তথায় সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। শরীর যদিও মাধ্যমরূপে থাকিবে তথাপি ইহা আত্মারই অধীন; যেমন হজ্বে যাওয়ার জন্য উষ্ট্র আবশ্যক। কিন্তু হজ্বযাত্রীকে বহন করিয়া মক্কা শরীফে লইয়া যায় বলিয়া উষ্ট্র কখনই হাজী হয় না। হৃদয়কে ফিরাইয়া লওয়ার অর্থ ইহা ছাড়া আর কিছু নহে যে, ইহাকে সংসারের দিক হইতে ফিরাইয়া পরকালের দিকে নিবদ্ধ করিতে হইবে; বরং সংসার ও পরকাল উভয় হইতে ফিরাইয়া কেবল আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। হৃদয়ের অভিলাষ ও ইচ্ছাই উহার মুখমণ্ডল। সংসারের অভিলাষ হৃদয়ে প্রবল হইলে বুঝিতে হইবে, ইহার লক্ষ্য সংসারের দিকে নিবিষ্ট আছে। হৃদয় সংসারের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের এই অবস্থাই থাকে। আল্লাহ্ ও পরকারের অভিলাষ হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিলে বুঝিবে ইহার পূর্ব অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াছে। অতএব হৃদয়ের এইরূপ বিবর্তনই যাবতীয় ইবাদতের উদ্দেশ্য।

তদ্রূপ মস্তককে উচ্চ হইতে নামাইয়া ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করা সিজ্‌দার উদ্দেশ্য নহে; বরং মনের অহংকার ভাব পরিবর্তন করত ইহাকে বিনীত, নম্র ও অধীন করিয়া তোলাই সিজদার উদ্দেশ্য। 'আল্লাহু আক্‌বার' বলার উদ্দেশ্য রসনা সঞ্চালন নহে; বরং আত্মাভিমান হইতে মনকে ফিরাইয়া আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও

শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই 'আল্লাহু আক্‌বার' বলার উদ্দেশ্য। হজ্বের সময়ে প্রস্তর নিক্ষেপ-কার্যে হস্ত-সঞ্চালন বা বহু প্রস্তর একত্র করা উদ্দেশ্য নহে; বরং হৃদয়কে আল্লাহ্‌র দাসত্বে অকপট ও দৃঢ়পদ করিয়া তোলা—প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির অধীনতা ছিন্ন করত কেবল আল্লাহ্‌র আদেশের অধীন হওয়া এবং স্বয়ং আপনাকে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা বিসর্জনপূর্বক নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করিয়া দেওয়াই উহার উদ্দেশ্য। এইজন্য হজ্ব সম্পাদনকালে বলা হয় – لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًّا تَعَبُّدًا وَّرِقًّا অর্থাৎ "প্রকৃত ইবাদতকার্যে দাসের ন্যায় হজ্বের জন্য তোমার সমীপে দাঁড়াইলাম।" ছাগ্-গবাদির জীবন বিসর্জন কুরবানীর উদ্দেশ্য নহে, বরং অন্তরের কৃপণতা বাহির করিয়া ফেলা এবং গৃহপালিত প্রাণীদের প্রতি মানব-প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে মমতাশীল না হইয়া আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে ইহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। যবেহ্ করিবার আদেশ হইলে যেন এরূপ তর্ক মনে উদিত না হয় যে, এই নিরীহ পশুগুলি কী পাপ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে এত কষ্ট দিয়া হত্যা করিব? বরং সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে হইবে। বাস্তবপক্ষে তুমি আমি কিছুই নহি–বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু হয় তৎসমুদয় কিছু নহে–কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই অস্তিত্ব আছে। সকল ইবাদতেই এইরূপ একই উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানবহৃদয়কে এমন স্বভাব-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যখন কোন ইচ্ছা ও অভিলাষ তন্মধ্যে জাগ্রত হয় তখন যদি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই ইচ্ছার ইঙ্গিত অনুসারে সঞ্চালিত হয়, তবে সেই ভাবটি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বসিয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, ইয়াতীম সন্তান-সন্ততির প্রতি কাহারও মনে দয়ার ভাব উদ্রেক হইলে সেই ব্যক্তি যদি উক্ত সন্তানের শরীরে হাত বুলায় তবে অনাথ সন্তান-সন্ততির প্রতি তাহার দয়ার ভাব সুদৃঢ় হইয়া উঠে এবং তাহার হৃদয়ে মমতাবোধ বৃদ্ধি পায়। এইরূপ হৃদয়ে বিনয়-ভাব উদিত হইলে মানব যদি স্বীয় ললাট ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করে তবে সেই বিনয় ভাব অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়। মঙ্গলপ্রাপ্তি সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মানব এইজন্য ইবাদত করিবে যেন তাহার মন দুনিয়া হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়া একমাত্র আখিরাতের দিকে নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে ইবাদত করিলে আখিরাতের দিকে হৃদয়ের টান ঘনীভূত হইতে থাকে। অতএব বুঝা গেল যে,

অভিলাষ ও নিয়তকে বলবান করিয়া তোলার জন্যই ইবাদতের আবশ্যক। একথা অবশ্য সত্য যে, প্রথমে নিয়তের কারণেই ইবাদতকার্য সম্পন্ন হয়।

এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল যে, নিয়ত ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, নিয়তের স্থান হৃদয় এবং ইবাদতের প্রভাব ভিন্ন স্থান হইতে হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে। এই প্রভাব যদি অন্তরে প্রবেশ করে তবে ইবাদত ফলপ্রদ; আর যদি এই প্রভাব অন্তরে প্রবিষ্ট না হয় এবং অমনোযোগিতার সহিত ইবাদত করা হয়, তবে ইহা বিনষ্ট ও নিষ্ফল হইয়া যায়। কিন্তু এই কারণে কর্মহীন নিয়ত বিনষ্ট হয় না; কেননা অন্তরের মধ্যেই নিয়তের স্থান। কাজেই এ-স্থলে অমনোযোগিতার কোন অধিকার নাই। একটি উপমা দ্বারা কথাটি ভালরূপে বুঝানো যাইতে পারে। মনে কর, কাহারও উদরে বেদনা হইলে সে যদি ঔষধ সেবন করে তবে ইহা সোজাসুজি উদরে প্রবেশ করে। আবার বক্ষঃস্থলে ঔষধের প্রলেপ দিলে ইহার ক্রিয়া যদি ক্রমে ক্রমে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তবে ইহাতেও উপকার হয়। কিন্তু প্রলেপের ঔষধের তুলনায় যে-ঔষধ সোজাসুজি উদরে প্রবেশ করে ইহা অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে। প্রলেপের ঔষধের লক্ষ্য বক্ষস্থল নহে; বরং বহির্দেশে প্রযুক্ত ঔষধ অভ্যন্তরে প্রবেশ করত উদরে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়াই প্রলেপের উদ্দেশ্য। সুতরাং বক্ষঃস্থলে প্রযুক্ত ঔষধের ক্রিয়া উদরে প্রবেশ না করিলে ইহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া গেল। পক্ষান্তরে যে-ঔষধ উদরে প্রবেশ করে ইহা বক্ষঃস্থলে না পৌঁছিলেও ব্যর্থ হয় না।

মার্জনীয় ও অমার্জনীয় প্রবৃত্তির কুপরামর্শ–রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "প্রবৃত্তি মনে যে কুপরামর্শ প্রদান করে, আল্লাহ্ তজ্জন্য আমার উম্মতের দোষ ধরিবেন না।" সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ পাপ-কার্যের ইচ্ছা করে, অথচ সেই পাপ কার্য না করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে উহা তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ইচ্ছানুরূপ পাপ-কার্য করে তবে তিনি ফিরিশতাগণকে একটি মাত্র পাপ লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করেন। আর যদি কেহ কোন সৎকার্যের ইচ্ছা করে, অথচ সেই কার্য না করে, তবে তাহার আমলনামায় একটি পুণ্য লিখিতে আদেশ করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ইচ্ছানুরূপ সৎকার্য করে তবে তাহার আমলনামায় দশটি পুণ্য লিখিতে আদেশ করেন। অন্যান্য হাদীসে দেখা যায় যে, ফিরিশতাগণ সেই পুণ্য

সাত শত পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই হাদীস হইতে কেহ কেহ বুঝিয়া লইয়াছে যে, স্বীয় ইচ্ছায় ও বুঝিয়া-শুনিয়া লোকে পাপাভিলাষ মনে জাগাইলে সে তজ্জন্য দায়ী হইবে না। কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল। কারণ, ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, আত্মাই মূল পদার্থ এবং শরীর তাহার অধীন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ –

অর্থাৎ "তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি প্রকাশ কর বা গোপনে রাখ, আল্লাহ্ ইহার হিসাব লইবেন।" (সূরা বাকারাহ্, শেষ রুকূ, ৩ পারা।) তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً –

অর্থাৎ "নিশ্চয় কর্ণ এবং অন্তঃকরণসমূহের প্রত্যেকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।" (সূরা বানী ইস্‌রাঈল, ৪ রুকূ, ১ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ

لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِى اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ –

অর্থাৎ "তোমাদের বেহুদা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে ধরিবেন না। কিন্তু তোমরা যে-সমস্ত পাকা শপথ করিয়াছ তজ্জন্য তিনি তোমাদিগকে ধরিবেন।" (সূরা মাইদা, ১২ রুকূ ৭ পারা।)

যাহা হউক, অহংকার, কপটতা, আত্মগর্ব, রিয়া , ঈর্ষার জন্য মানুষ দায়ী হইবে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। এ সমস্তই অন্তরের কাজ।

প্রবৃত্তির চতুর্বিধ কুপরামর্শ–যাহা হউক, প্রবৃত্তির পরামর্শ কোন্ স্থলে মার্জনীয় এবং কোন্ অবস্থায় মার্জনীয় নহে, ইহার মীমাংসা এই যে, যে-সমস্ত কথা মনে উদিত হয়, ইহার চারিটি অবস্থা আছে। তন্মধ্যে দুইট অবস্থাতে মানুষের ক্ষমতা চলে না, সুতরাং তজ্জন্য মানব দায়ী নহে। আর দুইটি অবস্থাতে মানবের ক্ষমতা চলে এবং তজ্জন্য সে দায়ী হইবে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতেছে। মনে কর, তুমি আপন মনে পথ চলিতেছ। এমন সময় এক মহিলা তোমার অনুগমন করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় প্রথমত, তোমার মনে এরূপ ভাব জাগিল যে, তুমি পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইলে সেই মহিলা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। মনের এইরূপ ভাবকে হাদীসে নফ্‌স (প্রবৃত্তির প্ররোচনা) বলে। দ্বিতীয়ত, সেই মহিলার দিকে ফিরিয়া তাকাইবার

আগ্রহ তোমার মনে জন্মিল। ইহাকে প্রবৃত্তির ঝোঁক বলে। কাম-বাসনার দরুন মনে এইরূপ আগ্রহের উদ্রেক হয়। তৃতীয়ত, প্রবৃত্তি তোমাকে আদেশ করিল যে, মহিলাটির দিকে ফিরিয়া দেখা আবশ্যক। যে-স্থলে কোন ভয় ও বিপদের আশঙ্কা না থাকে, এমন স্থানেই প্রবৃত্তির এইরূপ আদেশ হইয়া থাকে। কাম-বাসনা যাহা ইচ্ছা করে, অন্তরও তাহা আদশে করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী নহে। বরং কখন কখন অন্তর প্রবৃত্তির ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে নিষেধ করে। ইহাকে অন্তরের আদেশ বলে। চতুর্থত, তুমি মহিলাটিকে ফিরিয়া দেখিবার ইচ্ছা করিলে। এখন যদি আল্লাহ্ বা মানুষের ভয়ে অন্তরের তদ্রূপ আদেশ অগ্রাহ্য অথবা রহিত না কর, তবে শীঘ্রই তোমার সেই ইচ্ছা অটল হইয়া পড়িবে। উল্লিখিত প্রথম দুই অবস্থায় অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির ঝোঁকের কারণে মানুষ দায়ী হইবে না। কারণ এই দুই অবস্থা মানুষের ক্ষমতাধীন নহে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا – অর্থাৎ "আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত ক্লেশ দেন না।" (সূরা বাকারাহ, শেষ রুকূ, ৩ পারা।)

হযরত ওসমান ইব্‌নে মজউ'ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের যে-সকল ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন উহা হাদীসে নফ্‌স অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি হযরতের (সা) নিকট নিবেদন করিলেন –"বিবাহের বাসনা হইতে অব্যাহতি পাওয়া জন্য আমার মন আমাকে অণ্ডকোষ ছিন্ন করিয়া ফেলিতে বলে।" হযরত (সা) বলিলেন–"ইহা করিও না। কারণ, রোযা রাখা আমার উম্মতের পক্ষে অণ্ডকোষ ছিন্ন করার তুল্য।" তিনি নিবেদন করিলেন–"আমার মন আমাকে পত্নী ত্যাগ করিতে বলে।" হযরত (সা) বলিলেন–"উগ্রতা প্রদর্শন করিও না। কেননা, বিবাহ আমার সুন্নত।" তিনি নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় পাহাড়ে যাইয়া উপবেশ করিয়া থাকিতে আমার মন চায়।" হযরত (সা) বলিলেন–"ইহা করিও না। কারণ, হজ্ব ও জিহাদ করা আমার উম্মতের জন্য সন্ন্যাস।" তিনি নিবেদন করিলেন–"আমার মন আমাকে গোশ্‌ত খাইতে নিষেধ করে।" হযরত (সা) বলিলেন–"ইহা করিও না। কারণ, আমি গোশ্‌ত পছন্দ করি। কেননা গোশ্‌ত পাইলে আমি খাইতাম এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট চাহিলে তিনি দিতেন।"

যাহা হউক, যে-সমস্ত ভাব হযরত ওসমান ইব্‌নে মজউ'ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল তৎসমুদয়ই অন্তরের প্ররোচনা এবং এই সকল মার্জনীয়। কারণ, তদনুসারে কাজ করিবার তিনি সংকল্প করেন নাই, উহা কেবল মনের পরামর্শ ছিল। অপর দুইটি অবস্থা মানবের স্বাধীন ইচ্ছায় অন্তরে দেখা দেয়। তন্মধ্যে একটি অন্তরের আদেশ; অপরটি প্রবৃত্তির এমন ঝোঁক যে, এই কাজটি করার যোগ্য এবং উহা করার আন্তরিক সংকল্প। এই দ্বিবিধ অবস্থার জন্য মানব দায়ী। যদিও লোকলজ্জা ও ভয় অথবা অন্য কোন বাধার কারণে অন্তরের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে অক্ষম হয় তথাপি মানুষ দায়ী হইবে। 'মানব দায়ী হইবে' ইহার অর্থ এই নহে যে, কেহ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে এবং তজ্জন্য তাহাকে শস্তি দিবে। কারণ, ক্রোধ-প্রবৃত্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণের ভাব হইতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পাকপবিত্র। ইহার অর্থ এই, মানব নিজস্ব স্বাধীন ক্ষমতায় অন্যায় করিবার ইচ্ছা করিলে তাহার হৃদয়ে এইরূপ অবস্থান্তর ঘটে যে, তজ্জন্য সে আল্লাহ্ হইতে দূরবর্তী হইয়া পড়ে। ইহাই মানবের চরম দুর্ভাগ্য। এইজন্যই ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, নিজের এবং সমস্ত দুনিয়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া রাখাই মানবের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। হৃদয়ের অভিলাষ ও সম্বন্ধই ইহার মুখ। সংসারের সহিত সম্বন্ধ আছে এমন বস্তুর অভিলাষ করিলে সংসারের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ মযবুত হইয়া পড়ে এবং যাহা লাভ করা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা হতে বহু দূরে সরিয়া পড়িতে হয়।

'মানুষ দায়ী ও অভিশপ্ত হইয়াছে' ইহার অর্থ এই যে, সে দুনিয়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং আল্লাহ্ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। এই দায়ী ও অভিশপ্ত হওয়ার কার্য হৃদয় দ্বারা, হৃদয় হইতে এবং হৃদয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। মানুষের ইবাদতে আনন্দিত হইয়া বা তাহার পাপে ক্রুদ্ধ হইয়া কেহই তাহাকে প্রতিফল দিতে আসে না। তবে লোকে যেন বুঝিতে পারে এইজন্যই তাহাদের বুদ্ধি অনুসারে পাপ করিলে শাস্তি ও পুণ্য করিলে পুরস্কার পাওয়া যায়, এইরূপ বলা হইয়াছে। যাহারা এই গুপ্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহারা নিঃসন্দেহে জানে যে, হৃদয়ের অবস্থার কারণেই মানুষ দায়ী হয়। ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"দুই ব্যক্তি যদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং একজন নিহত হয় তবে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই দোযখে যাইবে।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন

করিলেন –"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, নিহত ব্যক্তি কেন দোযখে যাইবে। হযরত (সা) বলিলেন–"কারণ, সে অপর ব্যক্তিকে বধ করিতে চাহিয়াছিল। তাহার বধ করিবার ক্ষমতা থাকিলে সে তাহাকে বধ করিয়া ফেলিত।" অপর এক প্রমাণ এই যে, কোন ধনী লোক শরীয়তের বিধান লংঘনপূর্বক অন্যায়ভাবে অপব্যয় করিতেছ দেখিয়া যদি কোন দরিদ্র লোক ধন পাইলে তদ্রূপ অন্যায়ভাবে অপব্যয় করিবার ইচ্ছা করে তবে উভয়েই সমান পাপী হইবে। পূর্বোক্ত নিহত ব্যক্তি এবং এই দরিদ্র লোকটির পাপ কেবল আন্তরিক ইচ্ছার জন্যই হইবে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কোন ব্যক্তি নিজ বিছানায় এক মহিলা পাইয়া পরনারী জ্ঞানে সম্ভোগ করিবার পর জানিতে পারিল যে, সে পরনারী নহে–নিজেরই বিবাহিত স্ত্রী; তথাপি সেই ব্যক্তি পাপী হইবে। তদ্রূপ যে-ব্যক্তির ওযু নাই, অথচ সে জানে যে তাহার ওযু আছে, এমতাবস্থায় নামায পড়িলে সে নামাযের সওয়াব পাইবে। পক্ষান্তরে যাহার ওযু আছে, অথচ সেই মনে করিতেছে যে, তাহার ওযু নাই, এমতাবস্থায় যদি সে নামায পড়ে এবং নামাযান্তে ওযু আছে বলিয়া স্মরণও হয় তথাপি সে পাপী হইবে। হৃদয়ের অবস্থার কারণেই এইরূপ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি পাপের ইচ্ছা করিবার পর আল্লাহ্‌র ভয়ে ইহা হইতে ক্ষান্ত থাকিলে তাহার আমলনামায় পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। কারণ, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, মানুষের ইচ্ছা তাহার স্বভাবের অনুরূপ হয় এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করাকে মুজাহাদা বলে। হৃদয়কে মলিন করিতে অন্যায় অভিলাষের যে পরিমাণ ক্ষমতা আছে, ইহাকে উজ্জ্বল করিতে মুজাহাদার তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা আছে। ইহাই অভিলষিত পাপ হইতে বিরত থাকিলে মানুষের আমলনামায় পুণ্য লেখার অর্থ এবং উহাই উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তি পাপ কার্যের অভিলাষ করিয়া অক্ষমতা বশত ইহা করিতে না পারিলে অভিলাষে যে-পাপ হয়, অক্ষমতাজনিত পাপ হইতে বিরতির দরুন উক্ত পাপ মোচন হয় না এবং যে-মলিনতা তাহার আত্মার উপর পড়ে তাহা বিদূরিত হয় না ও তদ্রূপ অভিলাষের জন্য সে দায়ী হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি। সে অক্ষমতা বশত প্রতিপক্ষকে হত্যা করিতে না পারিয়া নিজে নিহত হইলেও পাপী হইবে।

নিয়তের কারণে কার্য-ফলের পরিবর্তন–মানুষের কার্য তিন প্রকার; যথা ঃ- (১) পাপ, (২) ইবাদত ও (৩) মুবাহ অর্থাৎ যাহা ক্ষতিকর নহে এবং হিতকরও নহে।

পাপ– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে বলিয়াছেন–
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ –
(নিয়ত অনুরূপই কার্যফল পাওয়া যায়) ইহাতে যদি কেহ মনে করে যে, পাপ কার্যও সদুদ্দেশ্যের ফলে পুণ্য-কার্যে পরিববর্তিত হয় তবে মস্ত বড় ভুল করা হইবে। পাপ-কার্য এমন জঘন্য যে, উৎকৃষ্ট নিয়ত ইহার কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। আর মন্দ অভিপ্রায়ে পাপ কার্য করিলে ইহা আরও জঘন্যতম হইয়া উঠে। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ–যেমন, একজনের মনস্তুষ্টির জন্য অপরের নিন্দা করিয়া অথবা হারাম ধন দ্বারা মসজিদ, পুল, মাদরাসা নির্মাণ করত ধারণা করা যে, আমার উদ্দেশ্য মহৎ। যে-ব্যক্তি এবংবিধ কাজ করে সে জানে না যে, মন্দ কার্যে ভাল নিয়ত করাও অপর একটি মন্দ কার্য। এই মন্দকে মন্দ জানিয়া করিলেও সে ফাসিক এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানে করিলেও ফাসিক। কেননা ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেকের জন্যই ফরয। অধিকাংশ স্থলে অজ্ঞানতাই মানবের ধ্বংসের কারণ। এইজন্য হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন–"অজ্ঞানতা অপেক্ষা বড় পাপ আর নাই; আবার নিজের অজ্ঞানতা বুঝিতে না পারা তদপেক্ষা গুরুতর পাপ।" ইহার কারণ এই যে, নিজের অজ্ঞানতা বুঝিতে না পারিলে কেহই শিক্ষা করে না। অতএব অজ্ঞানতা তাহার সৌভাগ্যের পথে বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।

তদ্রূপ বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সম্পাদক হইয়া ইয়াতীমদের ধনরক্ষকের দায়িত্ব লইয়া সরকারের নিকট হইতে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন ও তর্কবিতর্কে জয়ী হওয়ার জন্য যে-সমস্ত ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করে, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হারাম। এরূপ স্থলে শিক্ষক যদি বলেন–"আমি শরীয়তের ইলম সর্বত্র বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দান করিতেছি। শিক্ষার্থী যদি অর্জিত ইলম মন্দ কার্যে প্রয়োগ করত উহার অপব্যবহার করে, তবে করিবে, ইহাতে আমার কি? আমি ত সদুদ্দেশ্যের কল্যাণে পুণ্য পাইব।" শিক্ষকের এইরূপ উক্তি অজ্ঞানতা বৈ আর কিছুই নহে। যে-ব্যক্তি ডাকাতকে তলওয়ার ও মদ্য প্রস্তুতকারীকে আংগুর দিয়া বলে যে, দানের উদ্দেশ্যে আমি উহা বিতরণ করিয়াছি এবং যে-শিক্ষক তদ্রূপ অপাত্রে শিক্ষাদান করে, এই উভয় ক্ষেত্রেই দান নিতান্ত মূর্খতার কার্য। তলওয়ারধারী ব্যক্তিকে ডাকাত বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার নিজস্ব তলওয়ার কাড়িয়া লওয়া কর্তব্য। এমতাবস্থায় তাহাকে অপর একটি তলওয়ার দান করা কিরূপে সঙ্গত হইবে? পর্ববর্তী বুযুর্গগণ দুনিয়াশীল আলিমের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার

জন্য আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাপের চিহ্ন দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে শিক্ষা না দিয়া তাড়াইয়া দিতেন। হযরত ইমাম হাম্বল (র) তাঁহার এক পুরাতন ছাত্রকে সামান্য কারণে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ছাত্র নিজে গৃহের দেওয়ালের বাহির পৃষ্ঠে পলস্তারা করিয়াছিল। ইমাম সাহেব (র) বলিলেন–"দেওয়ালে লেপ দিয়া তুমি মুসলমানদের সদর রাস্তার পরিসর অন্যায়ভাবে নখ-পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছ। অতএব চলিয়া যাও, তোমাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে।"

মোটের উপর কথা এই যে, সৎ উদ্দেশ্যে পাপ কার্য করিলে উহা কখনও পুণ্য কার্যে পরিণত হয় না। বরং যাহা শরীয়তে আদেশ করা হইয়াছে, তাহাই পুণ্য কার্য।

ইবাদত– ইবাদতের উপর নিয়ত (সদুদ্দেশ্য) দুই প্রকার ক্রিয়া করে। প্রথমত, নিয়তের কারণেই মূল ইবাদত শুদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, কোন ইবাদতের সদুদ্দেশ্য যত অধিক প্রবিষ্ট থাকে, সওয়াবও তত বৃদ্ধি পায়। নিয়ত কিভাবে করিলে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়, ইহা যে-ব্যক্তি শিক্ষা করিয়াছে, সে এক কার্যে দশ প্রকার সদুদ্দেশ্য সৃজনপূর্বক উহাকে দশ প্রকার ইবাদতের সমান করিয়া লইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, কোন ব্যক্তি মসজিদে ই'তিকাফে বসিলে ইহাতে বহু প্রকার নিয়ত থাকিতে পারে। প্রথম, আল্লাহ্র দর্শন লাভের আশা। কেননা, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর; অতএব যে-ব্যক্তি মসজিদে যায়, সে আল্লাহ্র দর্শন লাভের জন্যই যাইয়া থাকে; যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–" যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করে, সে আল্লাহ্কে দর্শন করিতে যায় এবং যে-ব্যক্তি কাহারও দর্শন লাভে যায়, দর্শকের আতিথ্য করা তাহার (গৃহস্বামীর) পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।" দ্বিতীয়, পরবর্তী নামাযের প্রতীক্ষা। হাদীস শরীফে আছে, যে-ব্যক্তি নামাযের প্রতীক্ষায় থাকে, সে যেন নামাযেই লিপ্ত থাকে। (অর্থাৎ সেই ব্যক্তি নামাযে লিপ্ত থাকার তুল্য সওয়াব পায়।) তৃতীয়, মসজিদে অবস্থান দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অন্যায় ও নিরর্থক সঞ্চালন হইতে বিরত রাখা। ইহা এক প্রকার রোযা। কারণ, হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"মসজিদে উপবেশন আমার উম্মতের পক্ষে রাহ্‌বানিয়াত (সংসার-বিরাগ।)" চতুর্থ, সাংসারিক সকল কাজকারবার পরিত্যাগ করত

নিজকে আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করিয়া দেওয়া এবং একমাত্র যিকির, ধ্যান-ধারণা ও মুনাজাতে নিমগ্ন থাকা। পঞ্চম, লোকের সহিত মেলামেশা ও তাহাদের অনিষ্টকারিতা হইতে আত্মরক্ষা করা। যষ্ঠ, মসজিদের মধ্যে মন্দ কাজ দেখিলে নিষেধ করা, উৎকৃষ্ট কার্য দেখিলে আদেশ করা এবং কেহ ভালরূপে নামায পড়িতে না জানিলে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া। সপ্তম, মসজিদ ধর্মপরায়ণ লোকের শান্তির স্থান বলিয়া আল্লাহ্র কোন প্রিয় বান্দা আগমন করিলে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ লাভ করা। অষ্টম, আল্লাহ্র ঘরে পাপকার্য বা পাপকার্যের চিন্তা করিতে লজ্জা আসিবে, এই নিয়তে ই'তিকাফ করা। এই একটি উদাহরণ হইতে অন্যান্য সকল ইবাদতের সম্বন্ধে অনুধাবন করিয়া দেখ। প্রত্যেক ইবাদত কার্যেই উক্ত প্রকার বহু নিয়ত করা যাইতে পারে এবং যে-ব্যক্তি এক কার্যে যত অধিক সদুদ্দেশ্য সংযোগ করিতে পারে, সে তাহা হইতে তত অধিক সওয়াব লাভ করে।

মুবাহ্‌–যে-কার্যে পাপও নাই, পুণ্যও নাই তাহাই মুবাহ্‌। পশুর ন্যায় উদাসীনভাবে এই শ্রেণীর কার্য করা কাহারও উচিত নহে। ভাল নিয়ত সংযোগ করত এই শ্রেণীর কার্য করিতে পারিলে ইহা হইতেও বহু সওয়াব পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় পশুর ন্যায় অন্যমনস্কভাবে এই সকল কার্য করিয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে বিষম ক্ষতির কথা। কেননা, মানুষের প্রত্যেক গতি ও স্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং মুবাহ্‌ কার্যেরও হিসাব লওয়া হইবে; যদি মন্দ উদ্দেশ্যে করা হয় তবে তজ্জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে এবং সদুদ্দেশ্যে করিয়া থাকিলে সওয়াব দেওয়া হইবে। কিন্তু কোনই উদ্দেশ্য না রাখিয়া পশুর ন্যায় অন্যমনস্কভাবে করিলে অমূল্য পরমায়ুর যে-অংশ সেই কার্যে ব্যয় হয়, তাহা বৃথা অপচয় হয় বলিয়া ইহা মানবের পক্ষে কেবল ক্ষতিই ক্ষতি।

আল্লাহ্‌ বলেন ঃ – وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ "ইহলোক হইতে তোমাদের নিজের অংশ (লইতে) ভুলিও না।" (সূরা-কাসাস, ৮ রুকূ ২০ পারা।) সদুদ্দেশ্য ব্যতীত মুবাহ্‌ কার্য করিলে আল্লাহ্‌ তা'আলার এই নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। দুনিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। অতএব, যতদূর সম্ভব পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লওয়া উচিত। ইহা চিরকাল সঙ্গে থাকিবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"বান্দা পৃথিবীতে যে-সমস্ত কার্য করে, ইহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই

তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। এমন কি যে-সুরমা সে চক্ষে ব্যবহার করিয়াছে, মাটির ছোট ঢেলা যাহা সে হাতে ঘসিয়া ফেলিয়াছে বা যে-হস্ত কোন ভ্রাতার বস্ত্র স্পর্শ করিয়াছে, তৎসমুদয় সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হইবে।"

সদুদ্দেশ্যে কিরূপে মুবাহ্ কার্য করা যাইতে পারে, এই জ্ঞানও একটি শ্রেষ্ঠ ইলম এবং প্রত্যেকেরই ইহা শিক্ষা করা আবশ্যক। মুবাহ্ কার্য নিয়তের দোষে কিরূপে পাপে পরিণত হয় আবার নিয়তের গুণে ইহাই কেমন সওয়াবের কার্যে পরিগণিত হয়, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। যে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে এবং তাহার উদ্দেশ্য থাকে, স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করত আত্মগর্ব করা বা শারীরিক পরিষ্কার-পচ্ছিন্নতা ও সৌখিনতার পরিচয় দেওয়া অথবা মন্দ অভিপ্রায়ে পর-নারীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা। পক্ষান্তরে সুগন্ধি দ্রব্য এইরূপ সদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে–আল্লাহ্‌র ঘর অর্থাৎ মসজিদের সম্মান প্রদর্শনার্থ আমি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতেছি; নিজ শরীরে সুগন্ধ লাগাইলে পার্শ্ববর্তী লোকেও শান্তি পাইবে এবং তাহাদের মন প্রফুল্ল হইবে, সুগন্ধি ব্যবহার করত নিজ দেহের দুর্গন্ধ দূর করিতেছি যেন ইহাতে অপরের কষ্ট না হয় এবং লোকে আমার গীবত করিয়া পাপী না হয়। সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছি যেন ইহা নির্মল হইয়া আল্লাহ্‌র যিকির ও ধ্যান-ধারণায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়া ওঠে। যাহাদের মনে পুণ্যলাভের ইচ্ছা প্রবল থাকে কেবল তাহারাই প্রত্যেক মুবাহ্ কার্যে তদ্রূপ সদুদ্দেশ্য মনে জাগাইয়া লইতে পারে এবং তাহাদের প্রতিটি নিয়তই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের এই অবস্থাই ছিল। এমনকি, তাঁহারা আহার করা, পায়খানায় যাওয়া এবং স্ত্রীসম্ভোগ করাও সদুদ্দেশ্যে সম্পন্ন করত সর্বদা পুণ্য অর্জন করিয়া গিয়াছেন। মানুষ সৎকার্যের নিয়ত করিলেই সওয়াব পাইয়া থাকে। স্ত্রীসহবাসকালে এইরূপ নিয়ত করিলেও সওয়াব পাওয়া যায়; যথা–সন্তান জন্মিলে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে; স্বীয় পত্নী আনন্দানুভব করিবে এবং তাহাকে ও নিজকে পাপ হইতে রক্ষার উপায় হইবে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) একদা উলটা জামা পরিধান করিলেন। লোকে উহা দেখিয়া নিবেদন করিল–"আপনি বাহু প্রসারিত করুন; তাহা হইলে আমরা জামাটি সোজা করিয়া দিব।" তিনি ইহা শুনিয়া স্বীয় বাহু আরও সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন এবং বলিলেন–"আমি এই উলটা বস্ত্র আল্লাহ্‌র জন্য পরিধান করিয়াছি

এবং তাঁহার জন্যই সোজা করিয়া লইব।" হযরত যাকারিয়া আলায়হিস সালাম কোন স্থানে মজুরি করিতে গিয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইলে কয়েকজন লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে আহার করিতে আহবান না করিয়া নিজে আহার সমাধা করিলেন এবং বলিলেন–"সমস্ত খাদ্য না খাইলে আমা দ্বারা পূর্ণ পরিশ্রম হইত না, কাজ করিতে যাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম এবং যে কাজ করা আমার উপর ফরয ছিল, বাহাদুরি ও দানের কারণে তাহা সমাধা করিতে পারিতাম না।" হযরত সুফিয়ান (র) আহার করিতেছিলেন; এমন সময় এক ব্যক্তি যাইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে আহার করিতে আহ্বান না করিয়া নিজের আহার শেষ করত বলিলেন–"এই খাদ্য ধারে সংগ্রহ হইয়া না থাকিলে তোমাকে নিশ্চয়ই খাইতে বলিতাম।" অবশেষে তিনি বলিলেন–" আহারের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করিয়া আহার দানকালে যদি মনে ভার বোধ হয় এবং অনুরুদ্ধ ব্যক্তি আহার না করে তবে অনুরোধকারী কপটতার দোষে পাপী হইবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি আহার করিলে অনুরোধকারী কপটতা ও খেয়ানতজনিত পাপে পাপী হইবে। কারণ, তাহার যে খাওয়াইবার ইচ্ছা নাই, এই কথা জানিলে সে কখনও খাইত না।"

প্রকৃত ও মৌখিক নিয়ত–সোজা সরল লোকে যখন শুনে যে, মুবাহ্ কার্য উৎকৃষ্ট নিয়তে করা যায় তখন তাহারা হয়ত অন্তরে বা মুখে বলে–"আল্লাহ্‌র জন্য আমি বিবাহ করিতেছি; আল্লাহ্‌র জন্য আহার করিতেছি বা আল্লাহ্‌র জন্য শিক্ষা দান করিয়া থাকি।" এই প্রকার কথা বলিয়া তাহারা বিবেচনা করে যে, মনে বা মুখে এইরূপ বলাকেই নিয়ত বলে। কিন্তু মন বা মুখের এইরূপ কথাকে নিয়ত বলে না। প্রকৃত নিয়ত এমন এক আকর্ষণ ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে, তাহা হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া মানুষকে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত কার্যে লাগাইয়া রাখে। উহা যেন যাচঞাকারীর করুণ আর্তনাদ ; শরীর এই আর্তনাদে অস্থির হইয়া তদনুসারে কাজে প্রবৃত্ত হয়। মনের এই অবস্থা সর্বদা থাকে না। কর্মের উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্ট ও বলবান হইয়া উঠে কেবল তখনই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে। যে নিয়ত মনকে তদ্রূপ আকৃষ্ট ও উদ্দীপ্ত করিতে পারে না, তাহাকে মৌখিক নিয়ত বলে।

মৌখিক নিয়তের দৃষ্টান্ত এইরূপ–মনে কর, এক ব্যক্তির উদর পূর্ণ আছে অথচ সে বলে–'আমি ক্ষুধার্ত থাকিবার নিয়ত করিলাম।" অথবা কোন উদাসীন

ব্যক্তি বলে–'আমি অমুকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের আশা রাখি।' অথচ ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব কথা। এইরূপ যে-ব্যক্তি কামবাসনায় উত্তেজিত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিতেছে, সে যদি বলে–"আমি সন্তান কামনায় ইহা করিতেছি।' তবে ইহা বেহুদা কথা হইবে। এইরূপ যে-ব্যক্তি কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে পাণি গ্রহণ করে, সে যদি বলে–'আমি সুন্নত পালনার্থে বিবাহ করিতেছি।' তবে তাহার কথাও বেহুদা হইবে। শুধু মৌখিক উক্তি বা প্রবৃত্তির অভিলাষে প্রকৃত নিয়ত হৃদয়ে উদ্ভব হয় না। প্রথমে শরীয়তের বিধানের প্রতি ঈমান খুব মযবুত হওয়া আবশ্যক। সন্তান-কামনায় বিবাহ করিলে যেরূপ পুণ্য পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যে-সকল হাদীস বর্ণিত আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লওয়া উচিত। এইরূপে বিবাহজনিত পুণ্য ও কল্যাণ লাভের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া বিবাহ করিলে মুখে না বলিলেও এমন বিবাহ সুন্নত পালনের জন্য হইবে। এইরূপ আল্লাহ্র আদেশ পালনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাহাকে নামাযে প্রবৃত্ত করে তাহার পক্ষে 'আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে নামায পড়িতেছি', এমন উক্তি করা নিরর্থক। এরূপ নিরর্থক উক্তিকারী এমন ব্যক্তিতুল্য যে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং মুখে বলিতেছে–'ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমি আহার করিতেছি।' তাহার পক্ষে এই উক্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। কেননা, সে যখন ক্ষুধার্ত তখন তাহার আহার কেবল ক্ষুধা নিবারণের জন্যই হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি যেখানে আনন্দ লাভের আশায় উদ্দীপ্ত সেখানে পারলৌকিক মঙ্গল প্রাপ্তির নিয়ত করা বড় দুঃসাধ্য। তবে পরকালের পুণ্যপ্রাপ্তির আশা অত্যন্ত প্রবল থাকিলে ইহা সহজ হইয়া পড়ে।

নিয়তের উপর মানবের অক্ষমতা–এই পর্যন্ত বলার উদ্দেশ্য এই যে, নিয়ত মানবের আয়ত্তে নহে। কারণ, যে-প্রবল ইচ্ছা মানুষকে কার্যে রত রাখে তাহাকেই নিয়ত বলে। কার্য অবশ্যই তাহার ক্ষমতাক্রমে সম্পন্ন হয়। সে মনে করিলে হস্তপদাদি সঞ্চালনে কাজ করিতে পারে; আবার নাও করিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাটি তাহার ক্ষমতার মধ্যে নহে। সে মনে করিলেই ইচ্ছা হৃদয়ে উৎপন্ন করিতে পারে না, আবার ইচ্ছা উদয় হইলে ইহাকে বাধাও দিতে পারে না। কোন কোন সময় এমন হয় যে, প্রবৃত্তি কিছু চাহিতে থাকিলেও তখন ইচ্ছা হয় না, আবার অন্য সময়ে প্রবৃত্তি না চাহিলেও সেই বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে।

ইচ্ছার উৎপত্তি–ধ্রুব বিশ্বাস হইতে ইচ্ছার উদ্ভব হয়। যে-ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে যে, ইহকালে বা পরকালে তাহার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য

রহিয়াছে, সে সেই উদ্দেশ্য সাধনে চিরকাল আশাধারী হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি এই বিষয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, সে বিশুদ্ধ নিয়তের অভাবে বহু সৎকার্য হইতে বিরত থাকে। হযরত ইব্‌নে সিরীন (র) হযরত হাসান বসরীর (র) জানাযার নামায পড়ে নাই এবং বলেন–"আমার অন্তরে জানাযার নামাযে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা খুঁজিয়া পাই নাই।" কুফার প্রখ্যাত আলিম হযরত জামাদ ইব্‌নে সুলায়মানের (র) জানাযার নামাযে হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) যোগদান করেন নাই। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞসা করিলে তিনি বলিলেন–"ইচ্ছা হইলে অবশ্যই জানাযার নামায পড়িতাম।" এক ব্যক্তি দু'আ করিবার জন্য হযরত তাউসকে (র) অনুরোধ করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন–" যে-পর্যন্ত আমার হৃদয়ে দু'আ করিবার ইচ্ছা আবির্ভূত না হয় সেই পর্যন্ত প্রতীক্ষা কর।" লোকে তাঁহাকে হাদীস বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলে কখন কখন তিনি বর্ণনা করিতেন না; আবার কোন কোন বিনা অনুরোধে বর্ণনা করিতেন এবং ইহার কারণস্বরূপ বলিতেন– "আমি নিয়তের প্রতীক্ষায় থাকি।" এক বুযুর্গ বলেন–"কোন একজন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবার নিয়ত বিশুদ্ধ করিতে আমি এক মাস যাবত চেষ্টা করিতেছি, অদ্যাবধি নিয়ত বিশুদ্ধ হয় নাই।"

মোটের উপর কথা এই যে, যে-পর্যন্ত সংসারের লোভ হৃদয়ে প্রবল থাকে, সেই পর্যন্ত কোন ইবাদতে নিয়ত ঠিক হয় না; এমনকি তখন ফরয কার্যের নিয়তও বহু কষ্টে ঠিক করিতে হয়। কখন কখন এমন হয় যে, দোযখের শাস্তির ভয় না আনিলে নিয়ত ঠিক হয় না। এই বিষয়ে যে-ব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি কোন কোন সময় সওয়াবের কার্য পরিত্যাগ করত মুবাহ্ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কেননা, মুবাহ্ কার্যে তিনি বিশুদ্ধ নিয়ত দেখিতে পান। যেমন, কোন ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যাপারে সদুদ্দেশ্য দেখিতে পান; কিন্তু ক্ষমা করিতে তদ্রূপ নিয়ত দেখিতে পান না। এমন স্থলে ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিশোধ গ্রহণই উৎকৃষ্ট। কেহ কেহ হয়ত তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সুষ্ঠু নিয়ত স্বীয় অন্তরে খুঁজিয়া পান না; কিন্তু নিদ্রা যাওয়ার উৎকৃষ্ট সংকল্প দেখিতে পান যে, তাহা হইলে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ফজরের নামায পড়া যাইবে। এমন ব্যক্তির পক্ষে তাহাজ্জুদ না পড়িয়া নিদ্রা যাওয়াই উত্তম। যে-ব্যক্তি ইবাদত করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে, পত্নীর সহিত কিছুক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিলে বা অন্যের সহিত আলাপ করিলে মনের বিমর্ষতা ও

শরীরের ক্লান্তি দূর হইতে এবং অবশেষে পুনরায় ইবাদতে আনন্দ, উৎসাহ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইবে, তবে এই নিয়তে তাঁহার পক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও বাক্যালাপ করা একাগ্রতাহীন ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

হযরত আবূ দরদা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন—"আল্লাহ্‌র ইবাদতে প্রফুল্লতা ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে আমি কোন কোন সময় নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করি।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন—"এক কার্যে যদি সর্বদা তোমার মনকে বলপূর্বক নিযুক্ত রাখ তবে তোমার আত্মা অন্ধ হইয়া পড়িবে।" এই ব্যবহারকে জ্বরের রোগীর জন্য গোশ্‌ত পথ্য দেওয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর বল ফিরাইয়া আনিয়া ঔষধ গ্রহণের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাকে গোশ্‌ত খাওয়াইয়া থাকে। কেহ হয়ত শত্রুগণকে পশ্চাৎ দিক হইতে অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। সুচতুর সেনাপতিগণ এইরূপ বহু কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। মানবকে প্রবৃত্তি ও শয়তানের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ও তর্কবিতর্ক করিয়া ধর্মপথে চলিতে হয়। এই পথেও চালাকি এবং কৌশল নিতান্ত আবশ্যক। বুযুর্গগণ উহা পছন্দ করেন। অবশ্য অপরিপক্ক আলিমগণ এই পথের সন্ধান জানে না।

ইবাদতের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য—ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে, যে-মানসিক উদ্দীপনার প্রভাবে মানব কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে নিয়ত বলে। ইবাদতের নিয়ত তিন প্রকার হইয়া থাকে। কেহ কেহ দোযখের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া ইবাদত করে। আবার কোন কোন লোক বেহেশ্‌ত পাইবার লোভে ইবাদতে রত হয়। যে-ব্যক্তি বেহেশ্‌ত লাভের আশায় ইবাদত করে, সে ভোজন-লালসা ও কামপ্রবৃত্তির দাস। কারণ, সেই ব্যক্তি এমন স্থানে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, যথায় ভোজন-লালসা ও কামনাবাসনা চরিতার্থ হইবে। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি দোযখের ভয়ে ইবাদত করে, সে দুষ্ট ভৃত্যতুল্য; লাঠি হাতে লইয়া না ধমকাইলে সে কাজ করে না। এই দুই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কোন আবশ্যকতা অনুভব করে না। আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন—বেহেশ্‌তের লোভ বা দোযখের ভয়ে কোন কাজ করেন না। তাঁহার অবস্থা প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তিসদৃশ। প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন প্রেমাস্পদের মুখের দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকে—তাহার নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য চায় না, আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাও তদ্রূপ তাঁহার অপার সৌন্দর্যের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য করিয়া চলেন। যে-প্রেমিক স্বর্ণ-রৌপ্য

পাইবার আশায় প্রেমাস্পদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, বস্তুত স্বর্ণ-রৌপ্যই তাহার যথার্থ প্রেমাস্পদ। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য যাহার নিকট প্রিয়তম পদার্থ নহে, তাহার মনে প্রকৃত নিয়ত জন্মিতে পারে না। সৌভাগ্য ক্রমে যাহার মনে এই প্রকরে নিয়ত জন্মিয়াছে তাহার সমস্ত ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র স্মরণে, তাঁহার ধ্যান-ধারণায় ও তাঁহার নিকট মুনাজাতে প্রযুক্ত হয়। প্রেমাস্পদের আদেশ পালনও প্রিয় কার্য বলিয়াই এমন ব্যক্তি শারীরিক ইবাদত করিয়া থাকনে। তিনি স্বীয় দেহকেও কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত রাখিতে চাহেন এবং সর্বশক্তি প্রয়োগে ইহাকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। স্বীয় মনকে আল্লাহ্‌র অতুলনীয় সৌন্দর্যে বিভোর করিয়া রাখাই তাঁহার এইরূপ ইবাদতের উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য দর্শনে এবং তাঁহার নিকট নিভৃত নিবেদনের আনন্দে বিঘ্ন ঘটে ও হৃদয়ের সম্মুখে বিষম পর্দা পড়িয়া যায়। এইজন্য তদ্রূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বদা পাপ হইতে বিরত থাকেন। বাস্তবপক্ষে এইরূপ ব্যক্তিই আরিফ (চক্ষুষ্মান)।

হযরত আহ্‌মদ ইব্‌নে খেযরুভিয়্যা (র) আল্লাহ্‌কে স্বপ্নে দেখিলেন যে তিনি বলিতেছেন—"সকলেই আমার নিকট হইতে কিছু চাহিয়া থাকে; কিন্তু আবূ ইয়াযীদ আমাকেই চাহে।" হযরত শিব্‌লীকে (র) লোকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন—"আল্লাহ্ আমাকে ভর্ৎসনা করিলেন। ইহার কারণ এই যে, একবার আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—"বেহেশ্‌ত হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা ক্ষতি আর কি হইতে পারে?" আল্লাহ্ বলিলেন —'ইহা ঠিক নহে; বরং আমার দর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি আর কি হইবে।"

যাহা হউক, আল্লাহ্‌র দর্শনজনিত আনন্দের পরিচয়, ইনশাআল্লাহ্, পরিত্রাণ পুস্তকের 'মহব্বত' অধ্যায়ে দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ—ইখ্‌লাস (আন্তরিকতা)

ইখলাসের ফযীলত—ইখ্‌লাসের ফযীলত বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ বলেন—

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র জন্য ধর্মকে বিশুদ্ধ করিয়া একমাত্র তাঁহার ইবাদত করিবার জন্য মানুষকে আদেশ করা হইয়াছে।" (সূরা বাইয়্যেনাহ্, ১ রুকূ, ৩০ পারা।) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ – اَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ অর্থাৎ "সাবধান হও! আল্লাহ্‌রই জন্য বিশুদ্ধ ধর্ম" (সূরা যুমর, ১ রুকূ, ৩০ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ বলেন–"আমার গুপ্ত তত্ত্বসমূহের মধ্যে ইখলাস একটি গুপ্ত তত্ত্ব। যাহাকে আমি ভালবাসি তাহার হৃদয়ে উহা জন্মাইয়া দিয়া থাকি। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"হে মু'আয, ইখ্‌লাসের সহিত কাজ কর, তাহাতে অল্প কাজই তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে।" বিনাশন খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে রিয়ার নিন্দা ও অপকারিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ইখ্‌লাসের প্রশংসা। কেননা, রিয়া ইখ্‌লাস বিনষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ।

হযরত মা'রূপ কারখী (র) স্বীয় দেহে চাবুক মারিতেন এবং বলিতেন – يَا نَفْسُ اَخْلِصِيْ تَخَلَّصِيْ অর্থাৎ "হে নফ্‌স, ইখ্‌লাস অবলম্বন কর, তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে।" হযরত আবূ সুলায়মান (র) বলেন–"যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনে একবারও ইখ্‌লাসের সহিত একমাত্র আল্লাহ্‌কে চাহিয়াছে সে সৌভাগ্যবান।" হযরত আবূ আইয়্যূব সেজেস্তানী (র) বলেন–নিয়তের মধ্যে ইখ্‌লাস রক্ষা করা মূল নিয়ত অপেক্ষা দুষ্কর।" এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" তিনি উত্তর করিলেন–"আমি যাহা কিছু আল্লাহর জন্য করিয়াছিলাম তৎসমুদয় আমার পুণ্যের পাল্লায় দেখিয়াছি। এমন কি একটি ডালিমের দানা যাহা রাস্তায় পতিত দেখিয়া কুড়াইয়া লইয়াছিলাম এবং একটি বিড়াল ঘরে মরিয়াছিল, এই দুইটিও পুণ্যের পাল্লায় দেখিয়াছি; আমার টুপীতে একটি রেশমের সূতা ছিল, ইহা পাপের পাল্লায় দেখিয়াছি। কিন্তু এক শত দীনার মূল্যে খরিদ-করা একট গর্দভ পুণ্যের পাল্লায় দেখিতে না পাইয়া আমি বলিলাম–"সুব্‌হানাল্লাহ্, বিড়ালটি ত পুণ্যের পাল্লায় দেখিতেছি কিন্তু গর্দভটি দেখিতেছি না!" উত্তর আসিল–'যেখানে তুমি পাঠাইয়াছ, তথায় পৌছিয়াছে। কারণ, গর্দভটি মরিয়াছে শুনিয়া তুমি বলিয়াছিলে – اِلٰى لَعْنَتِ اللّٰهِ (অর্থাৎ অধঃপাত হইল।) কিন্তু যদি বলিতে – فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে গিয়াছে) তবে গর্দভটিকে পুণ্যের পাল্লায় দেখিতে পাইতে।' একবার আমি আল্লাহ্‌র জন্য দান করিলাম। সেই সময় কতিপয় লোক আমার দান দর্শন করিতেছিল। তাহারা দেখিতেছিল বলিয়া আমি আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। এই দানে আমার মঙ্গল বা অমঙ্গল কিছুই হয় নাই" হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন–"তাহার সৌভাগ্য যে, সেই দান তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই।"

এক ব্যক্তি বলেন–"আমি জাহাজে আরোহণপূর্বক জিহাদে যাইতে ছিলাম। আমাদের এক সাথী একটি মেষশাবক বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে আমি ভাবিলাম–'ইহা কিনিয়া কাজে লাগাই। অমুক শহরে যখন উপস্থিত হইব তখন বিক্রয় করিয়া ফেলিলে কিছু লাভও পাইব।" সেই রজনীতে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, দুই ব্যক্তি আকাশ হইতে অবতরণ করিল। তাহাদের একজন অপর জনকে বলিল– "ধর্মযোদ্ধাদের নাম লিপিবদ্ধ কর। আর ইহাও লিখিয়া লও যে, অমুক ব্যক্তি তামাশা দেখিতে, অমুকে বাণিজ্য উপলক্ষে এবং অমুকে গাযী বলিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিতে আসিয়াছে।' তৎপর সেই ব্যক্তি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল–'এই ব্যক্তি বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে।" আমি বলিলাম–'আল্লাহ্‌র শপথ, আমার অবস্থা অবলোকন কর; আমার সহিত কোন পণ্যদ্রব্য নাই। আমি কিরূপে বাণিজ্য করিতে আসিলাম? আমি ত আল্লাহর জন্য আসিয়াছি।' সেই ব্যক্তি বলিল–"ওহে তুমি কি লাভ করিবার জন্য ঐ মেষশাবকটি খরিদ কর নাই?" ইহা শুনিয়া আমি রোদন করিতে করিতে বলিলাম–"আল্লাহ্‌র শপথ, আমি সওদাগর নহি।' তখন অপর ব্যক্তি বলিল–'ইহা লিখিয়া লও যে, অমুক ব্যক্তি জিহাদে আসিয়াছিল, কিন্তু পথে আসিয়া লাভের উদ্দেশ্যে একটি মেষশাবক কিনিয়া লইয়াছে। আল্লাহ্‌র যেরূপ ইচ্ছা তদ্রূপ তিনি আদেশ করিবেন।" এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন–"এক মুহূর্তের ইখ্‌লাসে মানব নাজাত পাইতে পারে; কিন্তু ইখ্‌লাস নিতান্ত দুর্লভ।" তাঁহারা আরও বলেন–"ইলম বীজ, আমল শস্যভূমি এবং ইখ্‌লাস পানিস্বরূপ।"

বানী ইসরাঈলে এক আবিদ ছিলেন। তিনি একদা শুনিতে পাইলেন, অমুক স্থানে একটি বৃক্ষ আছে, লোকে ইহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছে। আবিদ

ক্রুদ্ধ হইয়া একটি কুঠার স্বীয় স্কন্ধে স্থাপনপূর্বক সেইবৃক্ষ কর্তনে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে শয়তান এক বৃদ্ধের মূর্তি ধারণপূর্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কোথায় যাইতেছে?" আবিদ বলিলেন— "অমুক বৃক্ষ কর্তন করিতে যাইতেছি।" শয়তান বলিল—"যাও, আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাক। ইহা তোমার জন্য বৃক্ষ কর্তন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" আবিদ বলিলেন—"আমি কখনও ফিরিয়া যাইব না। ইহাই আমার ইবাদত।" শয়তান বলিল—"আমি কখনও তোমাকে অগ্রসর হইতে দিব না।" ইহা বলিয়া সে আবিদের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আবিদ জয়ী হইয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করত বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন। তখন শয়তান বলিল—"আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে একটি কথা বলিতেছি।" আবিদ ছাড়িয়া দিলে শয়তান বলিল—হে আবিদ, আল্লাহ্ দুনিয়াতে সহস্র সহস্র পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন; এই বৃক্ষ কর্তন করা যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত তবে তিনি কোন পয়গম্বরকে আদেশ করিতেন। আর আল্লাহ্ তোমাকেও ইহা ছেদন করিতে আদেশ দেন নাই। সুতরাং বৃক্ষটি কর্তনে ক্ষান্ত হও।" আবিদ বলিলেন—"আমি বৃক্ষটি কাটিবই কাটিব।" শয়তান আবার বলিল— "আমি তোমাকে যাইতে দিব না।" তাহাদের মধ্যে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবিদ শয়তানকে পূর্বের ন্যায় পরাস্ত করিয়া তাহার বক্ষের উপর চড়িয়া বসিলেন। তখন শয়তান বলিল "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে একটি কথা বলিতেছি। ইহা পছন্দ না হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও।" আবিদ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শয়তান বলিল—"হে আবিদ তুমি দরিদ্র, অন্যের সাহায্যে সংসার চালাইয়া থাক। বৃক্ষটি ছেদনে ক্ষান্ত হইলে যদি তোমার নিজের ব্যয় চালাইয়া অপর আবিদগণকেও দান করিবার পরিমাণ অর্থ পাও তবে ইহা তোমার পক্ষে বৃক্ষ কর্তন অপেক্ষা উত্তম। কারণ তুমি বৃক্ষটি কর্তন করিয়া ফেলিলে বৃক্ষ-পূজকগণের কোন ক্ষতি হইবে না; তাহারা অন্য একটি বৃক্ষ রোপন করিয়া লইবে। তোমার খামখেয়ালি পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে প্রত্যহ সকালে তোমার বালিশের নিচে দুইটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া যাইব।" আবিদ ইহা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন—"এই বৃদ্ধ ত সত্য কথাই বলিতেছে। প্রত্যহ দুইটি স্বর্ণ মুদ্রা পাইলে একটি দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব এবং অপরটি নিজের সাংসারিক কাজে ব্যয় করিব। বৃক্ষ ছেদক অপেক্ষা ইহা উত্তম। তদুপরি এই বৃক্ষ কর্তনের জন্য আল্লাহ্ আমাকে আদেশও করেন নাই এবং আমি কোন পয়গম্বর নহি যে, আমার উপর বৃক্ষটি ছেদন করা

ওয়াজিব হইবে।" ফলকথা এই যে, এইরূপ চিন্তা করিয়া আবিদ আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন। প্রত্যুষে বালিশের নিচে দুইটি স্বর্ণ মুদ্রা দেখিয়া তিনি তুলিয়া লইলেন। দ্বিতীয় দিনও তদ্রূপ দুইট স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া তিনি মনে মনে বলিলেন—'বৃক্ষটি কর্তন না করিয়া আমি উত্তম কাজ করিয়াছি।" কিন্তু তৃতীয় দিবস কিছুই না পাইয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আবার কুঠার হস্তে বৃক্ষ কর্তনে ধাবিত হইলেন। শয়তান পুনরায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইতে চাহিতেছ?" আবিদ বলিলেন—"ঐ বৃক্ষটি ছেদন করিতে যাইতেছি।" শয়তান উত্তর দিল—"তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি কখনও ঐ বৃক্ষ কাটিতে পারিবে না।" এমন সময় উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার শয়তান আবিদকে পরাস্ত করিল। বাজের থাবা হইতে যেমন অন্য পাখির প্রাণরক্ষার কোন উপায় থাকে না শয়তানের হস্তেও নিরীহ আবিদের তদ্রূপ অবস্থা হইল। তখন শয়তান বলিল—"এখনও ফিরিয়া যাও; অন্যথায় ছাগলের ন্যায় তোমাকে যবেহ করিয়া ফেলিব।" আবিদ বলিলেন—"আচ্ছা, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি ফিরিয়া যাইব। তবে বল দেখি দুইবার আমি কিরূপে তোমাকে পরাস্ত করিলাম এবং এবার কিরূপেই বা তুমি আমাকে পরাস্ত করিলে?" শয়তান বলিল "প্রথম দুইবার তুমি আল্লাহ্‌র জন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে এবং তিনি আমাকে তোমার নিকট পরাজিত করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, যে-ব্যক্তি ইখ্‌লাসের সহিত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য কার্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি তাহার উপর জয়ী হইতে পারি না। আর এবার তোমার নিজের স্বার্থে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছ। যে-ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে আমার সহিত পারে না।"

ইখ্‌লাসের হাকীকত—ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, নিয়তের কারণেই ইবাদত হইয়া থাকে এবং নিয়তই মানুষকে ইবাদতে প্রবৃত্ত করে। একটিমাত্র উদ্দেশ্য যখন ইবাদতে প্রবৃত্ত করে তখন এইরূপ নিয়তকে বিশুদ্ধ নিয়ত বলে। একাধিক উদ্দেশ্যে কার্য সম্পন্ন হইলে নিয়ত ভাগাভাগি হইয়া পড়ে এবং তখন ইহাকে বিশুদ্ধ নিয়ত বলা যায় না। একাধিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যের দৃষ্টান্ত এই– (১) এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য রোযা রাখে, তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যলাভের জন্য আহারে বিরত থাকাও তাহার উদ্দেশ্য থাকে। এই একই রোযার আরও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; যেমন—পরিবারিক ব্যয় কমানো, রন্ধনের পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ; অপর কোন জরুরী কার্যে লিপ্ত থাকা অথবা অনাহারে নিদ্রা কম হইলে অধিক কাজ করিয়া লওয়া। (২) তদ্রূপ পুণ্য লাভের জন্য গোলাম আযাদ

করার সঙ্গে সঙ্গে গোলাম পোষণের ব্যয় ও তাহার মন্দ স্বভাব হইতে বাঁচিবার আশা করা। (৩) এইরূপ আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থ হজ্বে গমন করা এবং তৎসঙ্গে আবহাওয়া পরিবর্তনে সুস্থ হইবার অভিলাষ, নানা দেশে-পর্যটনের অভিপ্রায় ও তামাশা দর্শনের বাসনা অথবা পরিবারিক কোন অশান্তি পরিহার পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের চিন্তা হইতে মুক্তি বা কোন শত্রুর যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের ইচ্ছা রাখা। (৪) সওয়াবের আশায় তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত থাকিয়া চোর হইতে ধনসম্পত্তি পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য রাখা। (৫) আল্লাহ্‌র জন্য বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত অর্জিত বিদ্যার প্রভাবে অর্থোপার্জনের ইচ্ছা এবং সেই অর্থে ভূসম্পত্তি ক্রয়ের বাসনা ও সেই ভূমিতে সুন্দর উদ্যান নির্মাণের অভিলাষ অথবা লোকসমাজে বড় মানুষ বলিয়া সম্মানিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করা। (৬) শিক্ষাদান কার্যে নির্বাক থাকার কষ্ট দূরীকরণ ও মনের প্রফুল্লতা অর্জনেরও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। (৭) তদ্রূপ কুরআন শরীফ লেখার মধ্যে হস্তাক্ষর সুন্দর ও পাকা করিবার উদ্দেশ্য রাখা। (৮) পদব্রজে হজ্বে গমনের উদ্দেশ্যের মধ্যে যানবাহনের ব্যয় বাঁচাইবার ইচ্ছা করা। (৯) ওযু করিবার উদ্দেশ্যের মধ্যে শরীর শীতল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার বাসনা থাকা। (১০) গোসলের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে শরীরে দুর্গন্ধ দূরীকরণের ইচ্ছা থাকা। (১১) মসজিদে ই'তিকাফের উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘরভাড়া হইতে অব্যাহতির আশা রাখা। (১২) কোন ভিক্ষুককে দানের উদ্দেশ্যের সহিত তাহার খোশামোদ ও কাকুতি-মিনতি হইতে অব্যাহতি এবং দানে বিরত থাকিলে লোকলজ্জা হইতে নিস্কৃতি-লাভের অভিলাষ করা। (১৩) লোক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই ইচ্ছাও বিজড়িত করা যে, আমি পীড়িত হইলে লোকে আমাকে দেখিতে আসিবে অথবা লোকের নিন্দা ও তিরস্কার হইতে বাঁচিয়া থাকিবার আশা করা। (১৪) কোন সৎকার্য করিবার সময়ে এই আশা পোষণ করা যে, লোকে সৎ ও পুণ্যবান বলিয়া প্রসংশা করিবে। এবংবিধ উদ্দেশ্যে সৎকার্য করার নামই রিয়া। এই সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে। (বিনাশনঃ শেষার্ধ, অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) ঐ প্রকার উদ্দেশ্য ধারণা অল্পই হউক বা অধিকই হউক, ইখ্‌লাস একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলে।

নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহত্ব উদ্দেশ্যে যে-কাজ সম্পন্ন হয় ইহাকেই বিশুদ্ধ সৎকার্য বলে। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ইখ্‌লাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন–

أَنْ تَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ – অর্থাৎ মনেপ্রাণে বলা যে, "আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং তৎপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে আদেশ হইয়াছে তাহাতে দৃঢ়পদ থাকা।" মানব যে-পর্যন্ত স্বীয় প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্ত না হইবে, সেই পর্যন্ত এই অবস্থা লাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন–"ইখ্‌লাসের ন্যায় কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ আর নাই। সমস্ত জীবনের মধ্যে একটি কাজও যদি ইখ্‌লাসের সহিত ঠিকভাবে করা যাইতে পারে তবেও মুক্তির আশা করা যায়।" বাস্তবিক কথা এই, গোবর এবং রক্তের মধ্য হইতে দুগ্ধ অবিকৃতভাবে নিঃসৃত করিয়া লওয়া যেমন দুষ্কর, প্রবৃত্তির স্পর্শে কলঙ্কিত হইতে না দিয়া কোন কার্য বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র জন্য সম্পাদন করিয়া লওয়াও তদ্রূপ দুঃসাধ্য। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ –

অর্থাৎ "তাহাদের (পশুগণের) উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে এমন দুগ্ধ বাহির করত তোমাদিগকে পান করাই যাহা বিশুদ্ধ ও পানকারীদের জন্য সহজে গলনালী মধ্যে প্রবেশ করে।" (সূরা নহল, ৯ রুকূ ১৪ পারা।)

ইখ্‌লাসের সহিত কার্য সম্পাদনের উপায়–সংসারের সকল আসক্তি ছিন্ন করত আল্লাহ্‌র মহব্বতে তন্ময় হইয়া প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া পড়াই ইখ্‌লাসের সহিত কার্য সম্পদনের একমাত্র উপায়। কারণ প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি যাহা কিছু ইচ্ছা করে তৎসমুদয় তাহার প্রেমাস্পদের জন্যই করিয়া থাকে। যাহার অন্তরে আল্লাহ্-প্রেম প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এমন ব্যক্তি আহার করিলে বা পায়খানায় গেলে তাহাও আল্লাহর জন্য ইখ্‌লাসের সহিত করিতে পারে। পক্ষান্তরে যাহার সংসারাসক্তি প্রবল, তাহার পক্ষে নামায-রোযাও ইখলাসের সহিত সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ, মানবের বাহ্য আচরণ তাহার অভ্যন্তরীণ স্বভাবের রূপ ধারণ করে। যে-দিকে তাহার মনের আকর্ষণ থাকে, সেই দিকেই সে ঝুঁকিয়া পড়ে। যাহার হৃদয়ে সম্মানের ভালবাসা প্রবল, তাহার সকল কার্য কেবল লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়। এমন কি প্রত্যুষে তাহার হস্তমুখ প্রক্ষালন এবং বস্ত্র পরিধানও লোক-দেখানোর জন্য ঘটিয়া

থাকে। এমতাবস্থায় সর্বসাধারণের সহিত সম্পর্কিত কার্য, যথা-সভাসমিতি সংগঠন ও ইহাতে যোগদান, শিক্ষাদান, হাদীস-বর্ণনা প্রভৃতি কার্য ইখ্‌লাসের সহিত বিশুদ্ধভাবে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য নির্বাহ করা যেমন দুঃসাধ্য এমন দুঃসাধ্য কাজ আর নাই। ইহার কারণ এই যে, জনসাধারণের সহিত সম্পর্কিত কাজ অধিকাংশ স্থলে লোকের নিকট ভক্তিভাজন হওয়ার জন্যই নির্বাহ করা হয় অথবা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশাও ইহার সঙ্গে জড়িত থাকে। শেষোক্ত স্থলে লোকের ভক্তিভাজন হওয়ার ইচ্ছা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশা সমান সমান হইয়া পড়ে; বা সমান সমান না হইয়া কমবেশী হইলেও দুইটি উদ্দেশ্যের মিশ্রণ অবশ্যই ইহাতে থাকিয়া যায়।

লোকের প্রশংসা ও ভক্তি অর্জনের ইচ্ছা হইতে নিয়তকে নিষ্কলঙ্ক রাখা অধিকাংশ আলিমের পক্ষেও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কিন্তু কোন কোন নির্বোধ লোক নিজকে মুখলেস অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কার্য নির্বাহকারী মনে করিয়া ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা নিজেদের রোগ চিনিতে পারে না। মূর্খদের কথাই বা কেন বলি? বহু সুনিপুণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এই বিষয়ে নিতান্ত হতবুদ্ধি ও অক্ষম হইয়া পড়ে। এক বুযুর্গ বলেন ঃ "আমি ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত জামা'আতের প্রথম সারিতে দাঁড়াইয়া যে-নামায পড়িয়াছিলাম উহা পুনরায় পড়িয়া লইলাম। ইহার কারণ এই যে, একদিন নামাযে আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল বলিয়া শেষের সারিতে স্থান পাইলাম। তখন আমি এই ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম যে, লোকে বলিবে আমি বিলম্বে আসিয়াছি। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, ইতঃপূর্বে আমার মনে নামাযের জন্য যে-আনন্দ ছিল তাহা কেবল এইজন্য জন্মিয়াছিল যে, লোকে আমাকে প্রথম সারিতে দেখিতে পাইবে।"

মোটের উপর কথা এই যে, ইখ্‌লাস এমন এক মানসিক সুক্ষ্ম ভাব যাহা বুঝিতে পারাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদনুসারে কার্য করা যে কেমন কঠিনতম ব্যাপার, তাহা বর্ণনাতীত। ইবাদত ইখ্‌লাস ব্যতীত একাধিক উদ্দেশ্যে ঘটিলে কখনই কবূল হয় না। বুযুর্গগণ বলেন–"আলিমের দুই রাকাত নামায মূর্খের সমস্ত বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।" কারণ, কি দোষে ইবাদত নষ্ট হয়, মুর্খগণ তাহা জানে না এবং সদুদ্দেশ্যের সহিত প্রবৃত্তি অভিলাষ কিরূপে মিলিত হয় তাহাও বুঝিতে পারে না। স্বর্ণের মধ্যে যেমন মেকি থাকে, ইবাদতের

মধ্যেও তদ্রূপ ভুয়া ইবাদত থাকে। মূর্খেরা হরিদ্রাবর্ণের সমস্ত ধাতুকেই যেমন স্বর্ণ বলিয়া মনে করে তদ্রূপ তাহারা সমস্ত ইবাদতকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান করিয়া থাকে। পরিপক্ক স্বর্ণপরীক্ষক ব্যতীত অন্যে যেমন মেকি স্বর্ণকে বিশুদ্ধ বলিয়া ভ্রম করিতে পারে তদ্রূপ সুদক্ষ জ্ঞানী ব্যতীত অপর লোক বিশুদ্ধ ইবাদত নির্বাচন করতে পারে না।

ইবাদতে ইখ্‌লাস বিনষ্টকারী দোষের শ্রেণীবিভাগ– যে-সকল দোষ ইবাদতের ইখ্‌লাস বিনষ্ট করে তাহার চারিটি শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে কোন কোনটি নিতান্ত গোপনীয় ও দুর্বোধ্য। এই কারণে বুঝিবার সুবিধার জন্য রিয়ার উদাহরণ অবলম্বনে উহার বর্ণনা করা হইবে। **প্রথম শ্রেণী**–এই শ্রেণীর দোষ অতি প্রকাশ্য। যেমন, মনে কর, এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছে; এমন সময় অন্য লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শয়তান সেই ব্যক্তিকে বলিতে লাগিল– "সুন্দরভাবে নামায পড়। অন্যথায় তাহারা তোমাকে তিরস্কার করিবে।" **দ্বিতীয় শ্রেণী–** শয়তানের উপরিউক্ত প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া সেই ব্যক্তি যদি অপরের নিন্দা পরিহারের চেষ্টায় স্বীয় নামায সুন্দর করিয়া না দেখায়, তবে শয়তান অন্য প্রকারে তাহাকে বুঝাইতে থাকে–"তুমি সুন্দরভাবে নামায সম্পন্ন কর। তাহা হইলে এই সকল লোক তোমার অনুসরণ করিবে এবং তুমি ইহার সওয়াব পাইবে।" শয়তানের এইরূপ কুপরামর্শে হয়ত সেই নামাযী ধোঁকায় পতিত হইবে। সে বুঝিতে পারিবে না যে, যখন অন্তর-রাজ্যে দীনতাভাব পূর্ণমাত্রায় আবির্ভূত হয় এবং ইহার আলোক অপরের অন্তরেও বিকীর্ণ হইয়া যায় তখন যদি লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার অনুকরণ করে তবে, দৃষ্টান্ত-স্থাপক হিসাবে সে সওয়াব পাইবে। সেই ব্যক্তির অন্তরে দীনতা-হীনতার ভাব আবির্ভূত না হইয়া থাকিলে লোকে যদি তাহাকে তদ্রূপ মনে করিয়া তাহার অনুকরণ করে তবে তাহারাও সওয়াব পাইবে; কিন্তু সেই ব্যক্তি কপটতার দোষে দায়ী হইবে। **তৃতীয় শ্রেণী–** সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে যে, নির্জনে একাকী যে-নামায সম্পন্ন হয় তাহা লোক-সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে সম্পাদিত নামায হইতে কিছু পার্থক্য ঘটিলে কপটতা হয়। এই ভয়ে সে নির্জনে একাকী উত্তমরূপে নামায পড়িতে যত্নবান হয় যেন সে লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ্যভাবেও তদ্রূপ নামায পড়িতে পারে। ইহাতে নিহিত দোষ অত্যন্ত গোপনীয় এবং তন্মধ্যে সামান্য রিয়ার ভাবও রহিয়াছে। কিন্তু এই রিয়া কেবল তাহার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কেননা জামা'আতে যেমন সুন্দররূপে সে নামায পড়ে, নির্জনে একাকী

সেইভাবে নামায না পড়িতে সে নিজে নিজেই লজ্জাবোধ করে। এইজন্য লোকসম্মুখে উত্তমরূপে নামায পড়িবার উদ্দেশ্যে সে নির্জনেও উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং মনে করে যে, সে প্রকাশ্য রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্য লজ্জা না করিয়া নিজের জন্য নির্জন ও প্রকাশ্য নামাযে পার্থক্য করিতে লজ্জা করায় বাস্তবপক্ষে সে নির্জনে রিয়াকার হইয়াছে। **চতুর্থ শ্রেণী**–এই শ্রেণীর দোষ নিতান্ত গুপ্ত ও দুর্বোধ্য। সেই নামাযী ব্যক্তি বুঝে যে, নির্জনে হউক, কি প্রকাশ্য হউক লোকের মনোরঞ্জনের জন্য দীনতা-হীনতা অবলম্বন করা বৃথা। তখন শয়তান ফাঁকি দিয়া বলিতে থাকে–"প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন কর। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না কাহার সম্মুখে তুমি দণ্ডায়মান হইয়াছ।" শয়তানের এই কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে এবং লোকের দৃষ্টিতে দোষমুক্ত দেখায়। কিন্তু এই ভাবটি যদি নির্জনে একাকী নামাযের সময় তাহার মনে না আসিয়া কেবল প্রকাশ্য নামাযের সময় উদিত হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, রিয়ার কারণেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

কিয়ামতের দিন মহাবিচার কালে কেহই কাহারও উপকারে আসিবে না। সেই সংকটময় মুহূর্তের কথা স্মরণ হইলে মানব রিয়ার আপদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। মানুষের দৃষ্টি ও চতুষ্পদ জন্তুর দৃষ্টি তোমার নিকট সমান বোধ হওয়া আবশ্যক। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বোধ হইলেও তুমি রিয়াশূন্য হইতে পারিবে না। এই স্থলে উল্লিখিত রিয়ার দৃষ্টান্ত সমূহের ন্যায় উক্ত উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যেও শয়তানের নানাপ্রকার ধোঁকা রহিয়াছে। এই সকল সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তি ইবাদতের পুণ্য হইতে বঞ্চিত থাকে। সে পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করে; তাহার যাবতীয় কাজ বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন ব্যক্তি সম্বন্ধেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ –

অর্থাৎ "তাহারা যাহা কল্পনাও করে নাই, তাহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়েবে।" (সূরা যুমর, ৫ রুকূ, ২৪ পারা)

নিয়তে আবিলতার তারতম্যানুসারে প্রতিদান-ব্যবস্থা–নিয়তে যদি মিশ্রণ থাকে এবং তন্মধ্যে রিয়া বা অপর কোন উদ্দেশ্য ইবাদতের সংকল্প অপেক্ষা প্রবল হয়, তবে ইবাদতকারী শাস্তির উপযুক্ত হইবে। কিন্তু উভয় উদ্দেশ্য সমান সমান হইলে সেই ব্যক্তি শাস্তি বা পুরস্কার কিছুই পাইবে না। পক্ষান্তরে রিয়ার

ভাব দুর্বল থাকিলে আশা করা যায় ইবাদত একেবারে নিষ্ফলে যাইবে না, যদিও হাদীসের মর্মে বুঝা যায়, ইবাদতের নিয়তের মধ্যে প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থপরতা মিশ্রিত হইয়া উহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিলে আল্লাহ্‌র আদশ হইবে–"যাহার উদ্দেশ্যে এই ইবাদত করিয়াছ, তাহার নিকট ইহার পুরস্কর চাহিয়া লও।" আমাদের মতে এই আদেশ এমন ইবাদত সম্বন্ধে প্রদত্ত হইবে যাহার মধ্যে উক্ত উভয় প্রকার উদ্দেশ্য সমান সমান থাকে। অবশ্য এমন ইবাদতে পুণ্য পাওয়া যাইবে না। এরূপ স্থলেই বান্দা ইবাদতের পুরস্কার চাহিলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে উক্ত প্রকার আদেশ হইবে। যে-সমস্ত কার্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পূর্ণই রিয়া বা রিয়ার ভাব অধিক থাকে সেই সকল কার্যের জন্যই হাদীসে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ইচ্ছা যদি ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হয় এবং তৎসঙ্গে রিয়া ও অন্য কোন প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থপরতার সংকল্প দুর্বল থাকে তবে আশা করা যায় যে, তাহাতে বিশুদ্ধ সংকল্পকৃত ইবাদতের ন্যায় তত পুণ্য না পাওয়া গেলেও সংকল্পের বিশুদ্ধতার অনুপাতে সওয়াব পাওয়া যাইবে। দুইটি দলীলে নির্ভর করিয়া এই কথা বলা হইল। **প্রথম দলীল**–বহু দলীল দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা গিয়াছে যে, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপযোগী গুণ হইতে বঞ্চিত হইলে এক বিষম পর্দানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে এবং ইহার নামই শাস্তি। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পাইবার আশা সৌভাগ্যের বীজ এবং দুনিয়া অর্জনের লালসা দুর্ভাগ্যের হেতু। এই দুইটি আকাঙ্ক্ষাকে মনে স্থান দিলে একটি আকাঙ্ক্ষা মনকে আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ করে এবং অপরটি তাহা হইতে দূরে লইয়া যায়। এমতাবস্থায় দুইটি আকাঙ্ক্ষার শক্তি সমান সমান হইলে একটি যদি হৃদয়কে এক হস্ত নিকটে টানিয়া আনে, অপরটি ইহাকে ততখানি দূরে লইয়া যায়। সুতরাং উভয়ের টানাটানিতে মন পূর্বে যে-স্থানে ছিল সেই স্থানেই থাকে। কিন্তু অর্ধহস্ত পরিমাণ নিকটে আসিলে এবং এক হস্ত দূরে বিতাড়িত হইলে অর্ধহস্ত দূরবর্তী রহিয়া যায়। আবার যদি এক হস্ত পরিমাণ নিকটে আসে এবং অর্ধহস্ত দূরবর্তী হয় তবে অর্ধহস্ত পরিমাণ নিকটবর্তী হইয়া তাকে, যেমন কোন পীড়িত ব্যক্তি উষ্ণ ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ শীতল ঔষধ সেবন করিলে পরস্পর-বিরোধী শক্তি সমান সমান হওয়ায় কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। কিন্তু ঠাণ্ডা ঔষধ অল্পমাত্রায় সেবন করিলে উষ্ণতার প্রভাব কিছু অবশিষ্ট থাকে। আবার ঠাণ্ডা ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করিলে উষ্ণতা লুপ্ত

হইয়া কিছু শীতলতা বৃদ্ধি করে। শরীরের পীড়া ও স্বাস্থ্যের উপর ঔষধের প্রভাব যেরূপ, আত্মার উজ্জ্বলতা ও মলিনতার সম্বন্ধে পাপ ও পুণ্যের প্রভাব ঠিক তদ্রূপ। পাপ এবং পুণ্য রেণু পরিমাণও বিনষ্ট হইবে না। মহাবিচারের দিনে ন্যায়ের নিক্তিতে ইহাদের কমবেশী প্রকাশ পাইবে। এই মর্মেই আল্লাহ্ বলেন ঃ "অনন্তর যে-ব্যক্তি রেণু পমিাণ সৎকার্য করিবে সে তাহা দেখিতে পাইবে এবং যে-ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কার্য করিবে সে তাহা দেখিতে পাইবে।" (সূরা যিল্‌যাল, ৩০ পারা।) মোটেই উপর কথা এই যে, আল্লাহ্‌র জন্য যে-কার্য করা হয় ইহাতে রিয়া বা অপর প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থ যেন মিশ্রিত হইতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কার্য। অসম্ভব নহে যে, সদুদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশ্রিত প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থ প্রবল হওয়া সত্ত্বেও লোকে ইহাকে দুর্বল মনে করে। সুতরাং সৎকার্যকে নির্দোষ রাখিতে হইলে, ইহার উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থ মিশিতে দেওয়াই উচিত নহে। **দ্বিতীয় দলীল**—সর্ববাদিসম্মত মত এই যে, কেহ যদি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্বে যাইবার পথে ব্যবসায়ের ইচ্ছা করে তবে আদিম ও মূল উদ্দেশ্যটি হজ্বের জন্য থাকায় এবং ব্যবসায়ের ইচ্ছা পরে ইহার অনুগতভাবে উদ্ভব হওয়ায় হজ্বের পুণ্য একেবারে নষ্ট হইবে না। তবে বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে হজ্ব করিলে যত পুণ্য হইত তত পুণ্য অবশ্যই সেই ব্যক্তি পাইবে না। আবার মনে কর, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং দুই দিকে জিহাদ আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে বিরোধী দলের কাফিরগণ ধনবান। সেই দিকে গেলে জয়লব্ধ ধন অধিক পাওয়া যাইতে পারে। অপর দিকের কাফিরগণ দরিদ্র। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি যদি ধনী কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে যায় তবে তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইবে না। কারণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জিহাদ করা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য; কেবল জয়লব্ধ ধন পাওয়া ও না পাওয়ার মধ্যে সে পার্থক্য করিতেছে। মানব অন্তরে এইরূপ পার্থক্য-জ্ঞান থাকাই সম্ভব। দুর্ভাগ্যক্রমে জয়লব্ধ ধন জিহাদের শর্ত হইলে সওয়াব পাওয়ার সন্দেহ থাকে। কেননা, এইরূপ শর্তের উপর কোন সৎকার্যই দুরস্ত নহে; বিশেষত শিক্ষার মজলিস, গ্রন্থ-প্রণয়ন প্রভৃতি যে-সকল সৎকার্য সাধারণের সহিত সম্পর্ক রাখে, উহা তদ্রূপ শর্তের সহিত দুরস্ত হয় না। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ অযাচিতভাবে করুণা প্রদর্শনপূর্বক এমন ব্যক্তিকে অকস্মাৎ প্রবৃত্তির শৃঙ্খল হইতে ছিন্ন করিয়া না লইলে সে উহা হইতে অব্যাহতি পায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তির প্রণীত গ্রন্থ বা তাহার উক্তি অন্যের

নামে প্রকাশিত ও আদৃত হইতেছে জানিতে পারিলে সেই ব্যক্তির নিকট ইহা মন্দ বোধ হইতে পারে। কিন্তু আত্মগর্ব ও প্রবৃত্তিমূলক স্বার্থপরতা তাহার মধ্যে না থাকিলে সে তৎপ্রতি কোনই লক্ষ্য করিবে না এবং তজ্জন্য মনক্ষুণ্ণও হইবে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সিদ্‌ক

পূর্ণ সিদ্‌ক—সিদ্‌ক (সত্যপরায়ণতা) ইখ্‌লাসের মরতবা প্রায় সমান সমান। কিন্তু সিদ্‌কের মরতবা অতি বড়। সিদ্দীকের প্রশংসায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُو اللّٰهَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ "মুমিনগণের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে অঙ্গীকার করিয়া তাহা পূর্ণভাবে পালন করিয়াছে।" (সূরা আহযাব, ৩ রুকূ, ২১ পারা।)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন — لِيَسْئَلَ الصَّادِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ অর্থাৎ "এইজন্য যে আল্লাহ্ সত্যপরায়ণদিগকে তাহাদের সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন।" (সূরা আহ্‌যাব, ১ রুকূ, ২১ পারা।) লোকে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল—"মানব কোন বিষয় অবলম্বনে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে?" তিনি বলেন— "সত্য কথন ও সত্যানুষ্ঠানে।" প্রত্যেকেরই সিদ্‌কের অর্থ জানা আবশ্যক। সত্যপরায়ণতাকে "সিদ্‌ক" বলে। ছয়টি বিষয়ে সত্যপরায়ণতা রক্ষা করিতে হয়। যে-ব্যক্তি নিম্নের ছয় বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সত্যপরায়ণতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাঁহাকে 'সিদ্দীক' বলে।

প্রথম বিষয়—বচন। অতীত ঘটনা বর্ণনাকালে বা বর্তমান নূতন বিষয়ের সংবাদ প্রদানে কিংবা ভবিষ্যত বিষয়ের অঙ্গীকার করণে কিছুমাত্র মিথ্যা না বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন সত্য বলা। কারণ ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, হৃদয় অতি সহজে বাক্যের দোষগুণ গ্রহণ করে—কুটিল কথা বলিলে হৃদয় বক্র হইয়া পড়ে এবং সত্য কথা বলিলে হৃদয় সরল হয়। (বিনাশন ঃ প্রথমার্ধ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। দুইটি উপায়ে বাচনিক সত্যপরায়ণতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। (১) ব্যাজবাক্যও না বলা। অর্থাৎ কথা বাস্তবিক সত্য হইলেও শ্রোতা যদি অন্য অর্থ বুঝে তবে রূপকভাবে সংকুচিত বাক্য ব্যবহার না করা। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

ঝগড়া বাধিলে কিংবা মুসলমান মুসলমানে মনোমালিন্য ঘটিলে বা এইরূপ যে-স্থলে খোলাখুলি সত্য বলিতে গেলে বিবাদ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে সেই স্থলে বিবাদ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলার বিধান থাকিলেও সত্যের পূর্ণতা লাভেচ্ছুক সিদ্দীকগণের পক্ষে যথাসম্ভব ব্যাজবাক্য বলাই উচিত; পরিষ্কার মিথ্যা বলা কখনই সঙ্গত নহে। অর্থাৎ সত্য কথা সংকুচিত করিয়া রূপকভাবে বলা উচিত যেন শ্রোতা ইহার অর্থ তাহার অনুকূলে ভুল বুঝিয়া লয়। তবে সর্বদা সত্য বলা যাহার প্রকৃতির অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে, তেমন সত্যবাদী ব্যক্তি যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানবজাতির হিতকামনার সদুদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া মিথ্যা বলেন তবে তিনি সিদ্দীকের শ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবেন না। (২) আল্লাহর নিকট প্রার্থনাকালে মনে পূর্ণ সত্যবাদী থাকা। যখন বলিবে وَجَّهْتُ وَجْهِيَ (স্বীয় মুখ ফিরাইলাম) তখন যেন তোমার হৃদয়ের মুখ সংসারের সর্ববিধ বস্তু ও অবস্থ হইতে ফিরিয়া একমাত্র আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অন্যথায় তোমার উক্তি মিথ্যা হইবে। আবার যখন বলিলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ (অর্থাৎ আমি তোমারই দাস এবং তোমারই দাসত্ব করিতেছি), তখন যদি তুমি দুনিয়া বা দুনিয়ার লোভ-লালসাদির শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাক এবং প্রবৃত্তিকে তোমার অধীন করিতে না পারিয়া বরং তুমি নিজেই প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়, তবে তোমার এইরূপ বলা মিথ্যা হইবে। কারণ, যে ব্যক্তি যাহার অধীনে থাকে, সে তাহারই দাস বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"দিরহাম ও দীনারের দাস নিতান্ত হীন ও তুচ্ছ।" কেবল স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধনৈশ্বর্যের কথাই বা কেন, মানব যে পর্যন্ত সংসারের সর্ববিধ আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে না পারিবে, সেই পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র দাসরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে না। সংসারের সর্ববিধ আসক্তি হইতে মুক্তি তখনই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় যখন মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তি হইতেও একেবারে মুক্ত হয় এবং অহংভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়; এমন কি তাহার কোন ইচ্ছাই না থাকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া যায় ও আল্লাহ্ যেভাবেই রাখেন, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ্‌র বন্দেগিতে ইহাই সত্যপরায়ণতার চরম বিকাশ। যে ব্যক্তি এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকে সিদ্দীক বলা দূরের কথা, তাহাকে সত্যবাদীও বলা চলে না।

দ্বিতীয় বিষয়– নিয়ত (সংকল্প) যে-কার্য দ্বারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের আশা থাকে তন্মধ্যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছু পাইবার ইচ্ছা না রাখা। কার্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্য কিছু শরীক করিয়া না লওয়াকে ইখ্‌লাস বলে। আবার ইখ্‌লাসকে সিদ্‌কও বলা হয়। কেননা ইবাদতের উদ্দেশ্যের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের বাসনার সহিত অন্য আশা মনে থাকিলে সেই ব্যক্তি নিয়ত সম্বন্ধে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয় বিষয়– সংকল্পের দৃঢ়তা। যে-ভাবে অমূলক আগ্রহকে মিথ্যা আগ্রহ এবং বলবান আগ্রহকে সত্য আগ্রহ বলা হয় তদ্রূপ অটল সংকল্পকে সত্য সংকল্প এবং দুর্বল সংকল্পকে মিথ্যা সংকল্প বলা হইয়া থাকে। কোন কোন লোক ইচ্ছা করে–'রাজত্ব পাইলে সুবিচার করিব; ধন পাইলে সমস্তই দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব; শাসনকার্য পরিচালনায় বা শিক্ষা-দানে আমার অপেক্ষা উপযুক্ত কাহাকেও পাইলে তাহার হস্তে উহার দায়িত্ব অর্পণ করিব।' এইরূপ ইচ্ছা কখন কখন যথোচিত দৃঢ় থাকে; আবার কখন কখন দুর্বল ও অনিশ্চিত থাকে। যে-ইচ্ছাটি দৃঢ় ও অবিচলিত, ইহাকেই সংকল্পের সত্যপরায়ণতা বলে। যে-ব্যক্তির হৃদয়ে সৎকর্মের সংকল্প সর্বদা নিতান্ত বলবান থাকে তাহাকে সিদ্‌ক বলে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বলিয়াছিলেন–"যে-সম্প্রদায়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিদ্যমান আছেন, সেই সম্প্রদায়ে আমি নেতা হওয়া অপেক্ষা আমার মুণ্ডপাত করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।" তাঁহার অন্তরে স্বীয় জীবন বিসর্জনে ধৈর্যাবলম্বনের সংকল্প অত্যন্ত বলবান ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। কাহারও প্রতি যদি রাজাজ্ঞা হয় যে, তুমি নিজকে অথবা হযরত আবূল বকর সিদ্দীককে (রা) হত্যা কর, তখন সেই ব্যক্তি যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চায় তবে তাহার ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর মধ্যে কত বড় পার্থক্য তাহা সহজেই অনুমেয়।

চতুর্থ বিষয়–অঙ্গীকার পালন। কেহ কেহ পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখে যে, জিহাদ আরম্ভ হইলে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন দিব বা উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হইলে তাহার হস্তে নেতৃত্ব অর্পণ করিব। কিন্তু ঠিক সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রবৃত্তি সেই অঙ্গীকার পালনে তৎপর হয় না। তাই আল্লাহ্ বলেনঃ – رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ অর্থাৎ "কতক লোক স্বীয় অঙ্গীকার পালন করিয়াছে এবং জীবন বিসর্জন দিয়াছে।" (সূরা আহ্‌যাব, ৩

রুকূ, ২১ পারা।) যাহারা দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া উহা পালন করে নাই তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ (الٰى قَوْلِه) وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ –

অর্থাৎ "মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোক আছে যে, আল্লাহ্র সহিত এই বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল–যদি তিনি নিজ কৃপায় আমাদিগকে (ঐশ্বর্য) দান করেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা সদকা করিব এবং অবশ্যই আমরা পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হইব। অনন্তর তিনি যখন তাহাদিগকে নিজ কৃপায় দান করিলেন তখন তাহারা ইহাতে কৃপণতা করিল এবং পরান্মুখ হইয়া (স্বীয় প্রতিজ্ঞা হইতে) ফিরিয়া গেল। অনন্তর তাহাদের হৃদয়ে কপটতা সংযোগ করানো হইল, ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাত করিবে। কারণ, তাহারা আল্লাহ্র সতিত যে-অঙ্গীকার করিয়াছিল, উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং (তৎসম্বন্ধে) তাহারা মিথ্যা বলিয়াছিল।" (সূরা তওবা, ১০ রুকূ, ১০ পারা।)

পঞ্চম বিষয়–অন্তরের ভাবের সহিত বাহিরের আচরণ সমান ও অনুরূপ রাখা। হৃদয়ে গাম্ভীর্য না থাকিলে যদি কেহ ধীরগম্ভীরভাবে চলে, সে সত্যবাদী নহে। ভিতর-বাহির সমান একই প্রকার রাখিতে পারিলে সত্যপরায়ণতা লাভ করা যায়। যাহার অন্তরের ভাব বাহিরের আচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সমান সমান তাহার মধ্যেই সত্যপরায়ণতা আছে। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দু'আ করিতেন–"ইয়া আল্লাহ, আমার বাহিরের আচরণ উৎকৃষ্ট কর এবং আমার অন্তরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া দাও।" যাহার অন্তর বাহির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে, অথচ বলে ভিতর-বাহির সমান, ইহাতে রিয়ার উদ্দেশ্য না থাকিলেও তাহার এই উক্তি মিথ্যা এবং সেই ব্যক্তি সিদ্দীক শ্রেণীর বহির্ভূত।

ষষ্ঠ বিষয়–যুহ্দ, তাওয়াক্কুল, খওফ, রযা (আল্লাহ্র রহমতের আশা), রেযা (আল্লাহ্র বিধানে সন্তুষ্টি), শওক (আগ্রহ(প্রভৃতি দীনের মকামসমূহের গূঢ় তত্ত্ব অন্তরে অনুসন্ধান করা এবং ইহাদের সূচনা ও বহির্ভাগ লইয়াই পরিতুষ্ট না থাকা। এই সদগুণরাজির কিছু না কিছু অবশ্যই প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে;' তবে সকলের মনে বলবান হইয়া উঠে নাই। যাহাদের মনে ঐরূপ ভাব বা গুণ পূর্ণ বিকাশ পাইয়া দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহারাই

সত্যপরায়ণ; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (الى قوله) الصّٰدِقُوْنَ *

অর্থাৎ "মুমিন তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, তৎপর ইতস্তত করে নাই এবং আল্লাহর পথে স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করিয়াছে; তাহারা সত্যপরায়ণ।" (সূরা হুজুরাত, ২ রুকূ।)

ফলকথা, যাঁহাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগকেই আল্লাহ্ সত্যপরায়ণ বলিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, যে-ব্যক্তি ভয়ংকর কিছু দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে, তাহার শরীর কম্পিত হয়, বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে; পানাহার পরিত্যাগ করত সে অস্থির হইয়া পড়ে। আল্লাহ্কে কেহ এইরূপ ভয় করিলে ইহাতে সত্য ভয় বলে। যদি কেহ বলে 'আমি পাপকে ভয় করি', অথচ সে পাপ পরিত্যাগ করে না, তবে সে মিথ্যাবাদী। অন্যান্য মকাম সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচ্য।

উপসংহার–যাহা হউক, যে-ব্যক্তি ছয়টি বিষয়ের প্রত্যেকটি অবলম্বনে পূর্ণ সত্যপরায়ণ হইতে পারিয়াছেন তাঁহাকেই সিদ্দীক বলে। যে-ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অপর বিষয়ে পারেন নাই, তাঁহাকে সিদ্দীক বলা চলে না। তথাপি যে-ব্যক্তি যত বিষয়ে যে-পরিমাণে অধিক সত্যপরায়ণতা রক্ষা করিয়া চলেন তাঁহার মর্যাদাও তত অধিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহাসাবা (কৃতকর্ম-পর্যালোচনা) ও মুরাকাবা

কিয়ামত দিবসে মানবের বিচার—আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا –

অর্থাৎ "ন্যায়বিচারের দাঁড়ীপাল্লা আমি কিয়ামতের দিন স্থাপন করিব; তখন কাহারও প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হইবে না।" (সূরা আম্বিয়া ৪ রুকূ, ১৭ পারা।) কিয়ামত-দিবস স্বয়ং আল্লাহ্ পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন; কেহ রেণু পরিমাণ পাপ-পুণ্য করিলে তাহারও সূক্ষ্ম বিচার হইবে।

স্বীয় কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য মানবের প্রতি আদেশ—পাপ-পুণ্য বিচারের উপরিউক্ত অঙ্গীকারের পর মানবকে আদেশ দিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ –

অর্থাৎ "আর উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আগামী কল্যের (আখিরাতের) জন্য কি অগ্রে পাঠাইয়াছে, তাহা পর্যাবেক্ষণ করিয়া দেখ।" (সূরা হাশর, শেষ রুকূ, ২৮ পারা।) হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, বুদ্ধিমান লোক সময়কে চারি অংশে ভাগ করত এক অংশে স্বীয় কার্যের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করে, অপর অংশে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, অন্য এক অংশে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে আর অবশিষ্ট অংশে দুনিয়ার হালাল দ্রব্য উপভোগে নির্দোষ আরাম লাভ করে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন ঃ

حَاسِبُوْا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا –

অর্থাৎ "কিয়ামত-দিবসে তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করিবার পূর্বে তোমরা নিজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ কর।" আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا –

অর্থাৎ হে মুমিনগণ, স্বয়ং ধৈর্য অবলম্বন কর, একে অন্যকে ধৈর্যধারণে প্রবুদ্ধ কর এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক।" (সূরা আলে ইমরান, শেষ রুকূ, ৪ পারা।)

পারলৌকিক বাণিজ্যে প্রবৃত্তির হিসাব-নিকাশের উপায়—আরিফ বুযুর্গগণ ভালরূপে বুঝিয়াছেন যে, মানব এ-জগতে বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করিয়াছে এবং নফ্সের (প্রবৃত্তির) সহিত তাহার কাজ-কারবার। এই বাণিজ্যের লাভ বেহেশ্ত এবং লোকসান দোযখ; অর্থাৎ ইহাতে লাভ হইলে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য পাওয়া যাইবে ও লোকসান হইলে চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। বুযুর্গগণ স্বীয় নফ্সকে পারলৌকিক বাণিজ্যে অংশী করিয়া লইয়াছেন। পার্থিব ব্যবসায়ে যাহাকে অংশী করা হয়, তাহার সহিত যেমন সর্বাগ্রে কতকগুলি শর্ত করিয়া লওয়া হয় এবং তাহার আচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়, লাভ-লোকসানের হিসাব লওয়া হয় এবং ক্ষতি করিলে শাস্তি ও তিরস্কার করা হয়, তাঁহারাও নফ্সের সহিত তদ্রূপ ব্যবহারের জন্য ছয়টি উপায় নির্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। যথা ঃ— (১) মুশারাতা অর্থাৎ নফ্সের সহিত চুক্তি সম্পাদন; (২) মুরাকাবা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যান সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা এবং মনে করা যে, তিনি মানবের কার্যকলাপ দেখিতেছেন ও মনোভাব জানিতেছেন; (৩) মুহাসাবা অর্থাৎ কৃতকার্য পর্যালোচনা; (৪) মু'আকাবা অর্থাৎ নফ্সকে শাস্তি দান; (৫) মুজাহাদা অর্থাৎ নফ্সের বিরুদ্ধাচরণ; (৬) মু'আতাবা অর্থাৎ নফ্সকে তিরস্কার করা।

মুশারাতা (নফ্সের সহিত চুক্তি সম্পাদন)— কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই প্রবৃত্তির সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া লওয়া আবশ্যক। দুনিয়ার ব্যবসায়ে অপরকে শরীক করিয়া তাহার হস্তে মূলধন অর্পণ করিলে এবং সেই ব্যবসায়ে লাভ পাওয়া গেলে শরীককে হিতৈষী বন্ধু বলা চলে। কিন্তু মূলধনই নষ্ট করিয়া ফেলিলে সে দুশমন বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্যই শরীকের সঙ্গে কারবার আরম্ভ করিবার পূর্বেই চুক্তি করিয়া লইতে হয়, চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী সে কাজ-কারবার পরিচালনা করে কিনা, তৎপ্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ অতি কড়াকড়িভাবে গ্রহণ করিতে হয়। পারলৌকিক বাণিজ্যে নফ্সকে শরীক করিয়া লইয়াও তদ্রূপ নীতি অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, পরকারের বাণিজ্যের লাভ চিরস্থায়ী। কিন্তু সাংসারিক ব্যবসারের লাভ ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ক্ষণস্থায়ী বস্তু

নিতান্ত তুচ্ছ। এমন কি জ্ঞানীগণ বলেন–"যে-বস্তু তত ভাল নহে অথচ চিরস্থায়ী, ইহা ক্ষণস্থায়ী উৎকৃষ্ট বস্তু হইতে উত্তম।"

পরমায়ু পারলৌকিক বাণিজ্যের একমাত্র মূলধন–জীবনের প্রতি নিশ্বাস এক একটি অমূল্য রত্নসদৃশ। এক একটি নিশ্বাসের বিনিময়ে পরকালের এক একটি অবিনশ্বর সম্পদ-ভাণ্ডার অর্জন করা চলে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, এইরূপ অমূল্য রত্নের সদ্ব্যবহারে কতদূর যত্ন-সাধনা এবং হিসাব-নিকাশ আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি ফজরের নামাযান্তে কিছু সময়ের জন্য মনোনিবেশ করত পরমায়ুর সদ্ব্যবহারে স্বীয় প্রবৃত্তিকে চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া লয়, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রত্যুষে কার্য আরম্ভের পূর্বেই স্বীয় নফসকে লক্ষ্য করিয়া বলে–"দেখ মন, পরমায়ু ব্যতিত তোমার কোন মূলধন নাই। যে-মুহূর্ত অতিবাহিত হইল তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। কেননা মৃত্যু পর্যন্ত তুমি যতগুলি নিশ্বাস ফেলিবে, তাহা আল্লাহ্‌র নিকট গণনা করা ও নির্দিষ্ট আছে; তদপেক্ষা অধিক একটি নিশ্বাসও ফেলিবার অবসর তোমাকে দেওয়া হইবে না। পরমায়ু শেষ হইয়া গেলে বাণিজ্য করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাহা করিবার এখনই করিয়া লও। পরমায়ু অতিসংকীর্ণ; পরকালে অনন্ত দীর্ঘ সময় পাইবে বটে, কিন্তু সেখানে কিছুই করিবার নাই। গত রজনীতে যখন ঘুমাইয়াছিলে তখন ত এক প্রকার মরিয়া ছিলে। আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তোমাকে যেন নূতন জীবন দান করিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় মরিয়া গেলে আশা থাকিয়া যাইত–'হায়! যদি একদিনের অবকাশ পাইতাম, তবে নিজের কাজ কিছুটা সংশোধন করিয়া লইতাম।' এখন আল্লাহ্ দয়া করিয়া তোমাকে এ-দিনটি দিলেন। হে নফ্‌স, কথা শুন--অদ্যকার প্রতিটি নিশ্বাসকে এক একটি অমূল্য রত্ন জ্ঞানে সদ্ব্যবহার কর এবং একটি মুহূর্তও বৃথা অপচয় করিও না। আগামীকল্য বাঁচিয়া থাকিবার অবকাশ হয়ত তুমি পাইবে না; তাহা হইলে তোমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। আজ বুঝিয়া লও যে, তুমি মরিয়া গিয়া এক দিনের জীবন-ভিক্ষা চাহিয়াছিলে এবং আল্লাহ্ তোমাকে ইহা দান করিলেন। এমতাবস্থায় এই দিনটি হেলায় নষ্ট করত পরম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকা অপেক্ষা অধিক ক্ষতির আর কি হইতে পারে?"

হাদীস শরীফে আছে–ইহকালের দিবারাত্রের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেক ঘণ্টার বিনিময়ে কিয়ামত-দিবস মানবের সম্মুখে এক একটি ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে। প্রতিটি ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া মানবকে দেখানো হইবে। যে-সময়ে

সৎকার্য করা হইয়াছিল, সেই ঘণ্টার বিনিময়ে যে-ভাণ্ডার পাওয়া যাইবে, তাহা পুণ্যের কারণে নূরে ভরপুর দেখা যাইবে। ইহা দর্শনে মানব মনে এত আনন্দ ও সুখ উথলিয়া উঠিবে যে, ইহার কিয়দংশ দোযখবাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে তাহারা দোযখের অগ্নির কথা ভুলিয়া যাইবে। সেই আনন্দের কারণ এই, সেই ব্যক্তি জানিবে যে, ঐ নূর তাহার পক্ষে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার উপায় হইবে। তৎপর অপর একটি ভাণ্ডারের দ্বার খোলা হইবে। ইহা ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ থাকিবে। ইহা হইতে এমন দুর্গন্ধ বাহির হইবে যে, সকলেই নাক বন্ধ করিয়া ফেলিবে। যে-ঘন্টায় পাপ করা হইয়াছিল সেই ঘন্টার পরিবর্তে ইহা পাওয়া যাইবে। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তির মনে এমন ভয় ও লজ্জার উদ্ভব হইবে যে ইহা বেহেশ্‌তীগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে বেহেশ্‌ত তাহার নিকট দুঃখপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। অতঃপর অন্য একটি ভাণ্ডারের দ্বার খোলা হইবে; ইহা একেবারে শূন্য থাকিবে। ইহাতে আলো বা অন্ধকার কিছুই থাকিবে না। যে-সময়ে বান্দা পাপ বা পুণ্য কিছুই করে নাই, সেই সময়ের পরিবর্তে এই শূন্য ভাণ্ডার পাওয়া যাইবে। বিরাট রাজত্ব ও অপরিসীম ধনসম্পদ হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও তাহার মূল্য বুঝিতে না পারিয়া উহা নষ্ট হইতে দিলে মানব-মনে যেরূপ দুঃখ ও পরিতাপের সঞ্চার লইয়া থাকে, এই শূন্য ভাণ্ডার দেখিয়া বান্দার মনে তদ্রূপ দুঃখ ও পরিতাপের উদ্রেক হইবে।

ফলকথা এই যে, পরমায়ুর প্রতিটি ঘণ্টা পরকালে তদ্রূপ মানবের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সুতরাং মনকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলা মানবের পক্ষে উচিত–"হে নফস, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য চব্বিশটি ভাণ্ডার তোমার সম্মুখে স্থাপন করিবেন। খবরদার! ইহার কোনটিই যেন শূন্য না থাকে; কারণ শূন্য থাকিলে যে অসীম মর্মবেদনা হইবে, ইহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না।" বুযুর্গগণ বলেন–"মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহা হইলেও পুণ্যবানগণ যে-পুরস্কার ও মরতবা লাভ করিবেন, তাহা হইতে তুমি বঞ্চিত থাকিবে এবং তজ্জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।" এতএব স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ নফ্‌সের নিকট অর্পণপূর্বক বলিয়া দেওয়া আবশ্যক–"হে মন, খরবদার! রসনা সংযত রাখিবে এবং চক্ষুকে নিষিদ্ধ দর্শন হইতে রক্ষা করিবে।" এইরূপে সপ্ত অঙ্গকে কুকর্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাকীদ করিবে। কেননা দোযখের যে সাতটি দ্বার আছে বলিয়া উক্ত আছে, তাহা তোমার সপ্ত কর্মেন্দ্রিয়। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পাপের জন্যই তোমাকে

দোযখে যাইতে হইবে। অতএব তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কি প্রকার পাপ হইতে পারে বুঝিয়া লইয়া তৎসমুদয় হইতে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখিবে। তৎসঙ্গে সেই দিন যে-পরিমাণ যিকির-শোগল হইতে পারে ইহার প্রতি স্বীয় প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে এবং যে-সমস্ত কাজ করা যাইতে পারে তাহা করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করত প্রবৃত্তিকে ধমক দিয়া বলিবে–"হে নফ্স, আমার কথার বিরুদ্ধাচারণ করিলে তোমাকে শাস্তি দিব এবং দুঃখকষ্টে নিপতিত করিব।" এইরূপ ধমক দেওয়ার কারণ এই যে, নফ্স অবাধ্য হইলেও উপদেশ এবং সাধনার প্রভাব গ্রহণ করিয়া থাকে।

কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে নফ্সের সহিত তদ্রূপ চুক্তি গ্রহণ করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِى اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ –

অর্থাৎ "আর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ তোমাদের মনের কথা জানেন; সুতরাং তাঁহাকে ভয় করিতে থাক।" (সূরা বাকারাহ্ ৩০ রুকূ, ২ পারা।) রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি নিজের হিসাব-নিকাশ করে এবং মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কার্য করে, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান।" তিনি অন্যত্র বলেন–"যে-কার্য সম্মুখে আসে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ; হিতকর হইলে কর, অনিষ্টকর হইলে দূরে সরিয়া থাক।"

যাহাই হউক, প্রত্যহ সকালে মনকে সৎকর্মের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা আবশ্যক। এমন কি যে-সকল পরহেযগার লোক ধর্মপথে অটল হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্মুখেও প্রতিদিন এইরূপ কার্য আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাঁহাদের পক্ষেও নফ্সের নিকট হইতে সেই কার্যের অঙ্গীকার লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মুরাকাবা– 'মুরাকাবা' শব্দের অর্থ হইল রক্ষণাবেক্ষণ করা ও পাহারা দেওয়া। সাংসারিক বাণিজ্যের শরীক হইতে লাভের অঙ্গীকার লইয়া তাহার নিকট মূলধন অর্পণ করিলেও যেমন তাহার কার্যকলাপ পরীক্ষা করা এবং তাহার আচরণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক তদ্রূপ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষা করা ও যাহাতে অপকর্ম করিতে না পারে তজ্জন্য পাহারা দেওয়া মানবের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এ-ব্যাপারে শৈথিল্য করিলে অলসতা অথবা বিলাসিতার কারণে প্রবৃত্তি স্বীয় স্বাভাবিক প্রকৃতি গ্রহণ করে এবং অবাধ্য হইতে আরম্ভ করে।

প্রকৃত মুরাকাবা–'আল্লাহ্ আমার সমস্ত কার্যকলাপ দেখিতেছেন এবং মনোভাব জানিতেছেন। মানুষে শুধু লোকের বাহ্য আচরণ দেখিতে পায়, আল্লাহ্ ভিতর-বাহিরের সমস্ত বিষয় সমভাবে দেখিতেছেন। –এই বিশ্বাসটি দৃঢ় করিয়া লওয়ার নামই প্রকৃত মুরাকাবা। 'আল্লাহ্ সব দেখিতেছেন, জানিতেছেন' কথাটি যে-ব্যক্তি ভালরূপে বুঝিয়াছেন এবং এই উপলব্ধি যাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার দেহ ও মন সর্বদা ভীত ও বিনীত থাকে। এ বিশ্বাসটি যাহার নাই সে কাফির। আবার সেই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধাচরণে পাপে লিপ্ত হয়, সে নিতান্ত দুঃসাহসিক ও অবাধ্য। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى – অর্থাৎ "সে কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দেখিতেছেন?" (সূরা আ'লাক, ৩০ পারা।) এক হাব্শী রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি বহু পাপ করিয়াছি; আমার তওবা কবূল হইবে কি না?" হযরত (সা) বলিলেন "কবূল হইবে।" সেই ব্যক্তি আবার নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি যখন পাপ করিতেছিলাম তখন কি আল্লাহ্ দেখিতেছিলেন?" হযরত (সা) বলিলেন– "হাঁ, দেখিতেছিলেন।" ইহা শ্রবণমাত্র সেই ব্যক্তি এক দীর্ঘবিশ্বাস ফেলিলেন এবং বিকট চিৎকার করত ভূতলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"তুমি যেন আল্লাহকে দেখিতে পাইতেছ, এইভাবে তাঁহার ইবাদত কর। যদি তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।"

মোটের উপর কথা এই যে–আল্লাহ্ সর্বদা তোমার সহিত আছেন, সব জানিতেছেন দেখিতেছেন–এই কথাটি যে-পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, সেই পর্যন্ত তোমার কোন কাজই ঠিক হইবে না; যেমন আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا – অর্থাৎ "আল্লাহ্ সব সময় তোমাদের সবকিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন।" (সূরা নিসা,) ১ রুকূ, ৪ পারা।) আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন' বিশ্বাসটি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকিলে ইহার চরম উন্নত অবস্থা এই হইবে যে তখন আল্লাহ্র তাজাল্লী সর্বদা মানবের নয়নগোচর হইতে থাকিবে।

কাহিনী– এক পীর সাহেবের বহু মুরীদ ছিল। তন্মধ্যে একজনকে তিনি

সর্বাধিক ভালবাসিতেন। ইহাতে অন্যান্য মুরীদ দুঃখিত ও লজ্জিত ছিল। পীর সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া প্রত্যেক মুরীদকে এক একটি পাখি দিয়া বলিলেন—"যেখানে কেহই দেখিতে না পায় এমন স্থান হইতে পাখি যবেহ করিয়া আনয়ন কর।" সকলেই নির্জন স্থানে যাইয়া পাখি যবেহ করিয়া আনিল। কিন্তু তাঁহার ঐ প্রিয় মুরীদ পাখি যবেহ না করিয়া জীবিত অবস্থায় পীরের সম্মুখে উপস্থিত করত বলিল—"কেহই দেখিতে না পায় এমন স্থান আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। কারণ, আল্লাহ্ সর্বত্র দেখিতেছেন।" তখন পীর সাহেব অন্যান্য মুরীদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এই উক্তি হইতে তাহার মরতবা তোমরা বুঝিয়া লও। এই ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্র দর্শনে নিমগ্ন আছে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করে না।" যখন বিবি যুলায়খা হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে নির্জনে আহ্বান করিয়াছিলেন তখন সর্বাগ্রে তিনি তাঁহার উপাস্য দেবমূর্তির চক্ষু বস্ত্রাবরণে আবৃত করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম বলিলেন—"হে যুলায়খা, তুমি প্রস্তর দেখিয়া লজ্জা করিতেছ; আকাশ-পাতালের সৃষ্টিকর্তা সর্বদর্শী আল্লাহ্কে কিরূপে আমি লজ্জা না করিয়া থাকিতে পারি?"

এক ব্যক্তি হযরত জুনায়দের (র) নিকট নিবেদন করিলেন—"আমি নিষিদ্ধ দর্শন হইতে স্বীয় চক্ষুকে রক্ষা করিয়া রাখিতে পারি না। কিরূপে রক্ষা করিব?" হযরত জুনায়দ (র) বলিলেন—"তুমি যেমন অপরকে দেখ, তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তোমাকে দেখিতেছেন, এই কথাটি অটলভাবে বিশ্বাস করিয়া লও।" হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, আল্লাহ্ বলেন—"যাহারা পাপ কার্যের অভিলাষ করিয়া আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্মরণে লজ্জিত হয় ও সেই পাপ হইতে বিরত থাকে, তাহাদের জন্য 'আদন' নামক বেহেশ্ত অবধারিত আছে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন—"আমি হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সহিত মক্কা শরীফে যাইতেছিলাম। আমরা উভয়ে এক স্থানে অবতরণ করিলাম। এমন সময় জনৈক রাখালের গোলাম পাহাড়ের উপর হইতে কতকগুলি ছাগল নামাইয়া লইয়া আসিল। হযরত ওমর (রা) বলিলেন—'একটি ছাগল আমার নিকট বিক্রয় কর। গোলাম নিবেদন করিল—'আমি গোলাম; এই ছাগলগুলির মালিক আমি নহি।' হযরত ওমর (রা) তাহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—'মালিককে বলিও যে, একটি ছাগল বাঘে লইয়া গিয়াছে। সে কিরূপে জানিতে পারিবে (যে, তুমি বিক্রয় করিয়াছ)?' গোলাম নিবেদন করিল—তিনি জানিতে না পারিলেও আল্লাহ্ ত জানিতেছেন।" ইহা শুনিয়া

হযরত ওমর (রা) অপ্রকৃতিস্থ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপর তিনি গোলামের প্রভুকে আহ্বান করিয়া আনিয়া উক্ত গোলামকে খরিদ করত আযাদ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন—'হে গোলাম, ঐ কথা বলিয়া তুমি পৃথিবীতে দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইলে এবং পরকালেও মুক্তি পাইবে।'

মুরাকাবার শ্রেণী-বিভাগ—মুরাকাবা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী—ইহা একমাত্র সিদ্দীকগণের পক্ষেই সম্ভবপর। সিদ্দীকগণের হৃদয় সর্বদা আল্লাহ্র অপ্রতিহত প্রতাপে নিমজ্জিত এবং তাঁহার ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ থাকে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য দিকে লক্ষ্য করিবার কোন অবকাশই তাঁহারা পান না। এই মুরাকাবা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। কারণ, তাঁহাদের মন প্রশান্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছে; বিধিসঙ্গত নির্দোষ বিষয় হইতেও তাঁহারা বিরত থাকেন। এমতাবস্থায় পাপকর্মে কিরূপে তাঁহারা লিপ্ত হইবেন? এই শ্রেণীর মুরাকাবাকারিগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রকার উপায় ও কৌশল অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধেই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"প্রত্যুষে যে-ব্যক্তি (আল্লাহ্র দিকে) একাগ্র মন রাখিয়া জাগ্রত হয়, আল্লাহ্ উভয় জগতে তাহার সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া দেন।" এই শ্রেণীর কোন কোন লোক আল্লাহ্র ধ্যানে এত অধিক নিমগ্ন থাকেন যে, তাঁহাদের নিকট কথা বলিলে তাঁহারা শুনেন না এবং তাঁহাদের উন্মিলিত চক্ষের সম্মুখ দিয়া কেহ গমনাগমন করিলেও তাঁহারা দেখিতে পান না।

হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌নে যায়িদকে (র) কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি এমন কোন ব্যক্তিকে চিনেন যিনি লোকের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া কেবল নিজের ভাবে তন্ময় রহিয়াছেন?" তিনি বলিলেন—"হাঁ এক ব্যক্তিকে চিনি। তিনি এখনই আসিতেছেন। ইতোমধ্যে হযরত ওতবাতুল গোলাম (র) তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"আপনি পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন— "কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।" অথচ তিনি লোকে লোকারণ্য রাজপথ দিয়া আগমন করিয়াছেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস সালাম একদা একজন স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে প্রাচীর ভ্রমে তদুপরি হস্ত রাখিয়া ভর করিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এমন কাজ করিলেন কেন?" তিনি বলিলেন—"আমি ইহাকে দেওয়াল মনে করিয়া ছিলাম।" এক বুযুর্গ

বলেন–"আমি একদল লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম; তাহারা তীরধনুক লইয়া খেলা করিতেছিল। বহু দূরে একজন লোককে একাকী উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার বাসনায় নিকটে গিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন–'লোকের সহিত আলাপ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র যিকির উৎকৃষ্ট।' আমি বলিলাম–'আপনি তো নিঃসঙ্গ বসিয়া রহিয়াছেন।' তিনি বলিলেন–'না, আল্লাহ্ ও দুই ফিরিশ্‌তা আমার সঙ্গে আছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–'এই কওমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?' তিনি বলিলেন–'যাহাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম–'পথ কোন্ দিকে?' তিনি আকাশের দিকে মুখ করত উঠিয়া প্রস্থান করিলেন এবং বলিয়া গেলেন–'হে আল্লাহ, তোমা হইতে দূরে রাখিবার বহু লোক আছে।" হযরত শিবলী (র) একদা হযরত সাওরীর (র) নিকট গিয়া দেখিলেন তিনি মুরাকাবায় এমন তন্ময় ও নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন যে, তাঁহার শরীরের একটি লোম পর্যন্ত নড়িতেছে না। হযরত শিবলী (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"কাহার নিকট হইতে এমন নিস্পন্দভাবে মুরাকাবা করিতে শিখিলেন?" তিনি বলিলেন–"বিড়াল হইতে শিখিয়াছি। কারণ, ইঁদুরের প্রতীক্ষায় বিড়ালকে ইঁদুরের গর্তের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে খফীফ (র) বলেন "আমি লোকমুখে শুনিলাম, সূর নামক স্থানে এক বৃদ্ধ ও এক যুবক সর্বদা মুরাকাবায় বসিয়া থাকেন। আমি তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে কেবলামুখী হইয়া উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমি একাদিক্রমে তিনবার সালাম দিলাম; কিন্তু তাঁহারা জওয়াব দিলেন না। আমি তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া সালামের জওয়াব দিতে অনুরোধ করিলাম। তখন যুবক মাথা তুলিয়া বলিলেন–'হে খফীফের পুত্র, পরমায়ু নিতান্ত সংক্ষিপ্ত; আর ইহার সামান্য অংশই বাকী আছে। বাকী অংশটুকুর বিরাট অংশ আবার তুমি অনর্থক কাড়িয়া লইলে! হে খফীফ তনয়, তুমি অত্যন্ত গাফিল; তুমি আমাদিগকে কর্তব্যকার্যে বাধা দিয়া সালামের উত্তর দিতে বাধ্য করিলে।' এই কথা বলিয়া পুনরায় তিনি মস্তক অবনত করত নিস্তব্ধ হইলেন। আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ছিলাম। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা ভুলিয়া গেলাম এবং আমার বুদ্ধিসুদ্ধিও লোপ পাইল, আমি তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহাদের সহিত যুহর আসরের নামায পড়িলাম এবং তৎপর নিবেদন করিলাম–'আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।' যুবক বলিলেন–"হে খফীকের

পুত্র, আমরা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত, উপদেশ দিবার ভাষা আমাদের নাই।' আমি তিন দিবারাত্র তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহারাও কোন কথা বলেন নাই, এবং আমিও কোন কথা বলি নাই; আর কেহই নিদ্রাও যাই নাই। অনন্তর আমি মনে মনে বলিলাম, –'তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া উপদেশ দিতে অনুরোধ করিব।' তখন সেই যুবক আবার মাথা তুলিয়া বলিলেন–'এমন লোকের অনুসন্ধান কর যাহাকে দেখিলেই তোমার মনে আপনিআপনি আল্লাহর স্মরণ জাগিয়া উঠে এবং আল্লাহ্‌র ভয় তোমার অন্তরে প্রবেশ করে। তদ্রূপ ব্যক্তি তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি নিঃসৃত প্রভাবেই (যবানে হালে) তোমাকে উপদেশ দিবেন; কথা বলিয়া উপদেশ দিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।"

ফলকথা, সিদ্দীকগণের মুরাকাবা এইরূপই হইয়া থাকে। তাঁহারা আল্লাহ্‌তে একেবারে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী– এই শ্রেণীর মুরাকাবা পরহেযগার ও পুণ্যবান লোকদের কার্য। এই প্রকার লোক ভালরূপে অবগত আছেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাদের বাহিরের ও ভিতরের সমস্ত অবস্থা সুস্পষ্টরূপে দেখিতেছেন এবং এই বিশ্বাসে তাঁহারা আল্লাহকে শরমাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকেন না; বরং নিজের ও জগতের অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ থাকেন। এই শ্রেণীর লোককে এমন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা চলে, যে নির্জনে একাকী কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে অথবা উলঙ্গ আছে, এমতাবস্থায় একটি ক্ষুদ্র বালক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বালককে দেখিয়া লজ্জায় সেই ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতায় নিজে নিজকে আবৃত্ত করিয়া লইল। অপর পক্ষে পূর্বোক্ত সিদ্দীক লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, মনে কর, কাহারও সম্মুখে অকস্মাৎ মহাপ্রতাপশালী বাদ্‌শাহ্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই ব্যক্তি তাঁহার ভয়ে আত্মহারা ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

মুরাকাবার দ্বিবিধ ধারা–যাহাই হউক, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুরাকাবাকারিগণের পক্ষে স্বীয় অবস্থা, কল্পনা এবং গতি-স্থিতি গভীরভাবে মনোনিবেশপূর্বক পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা উচিত। তাঁহারা কোন কার্য করিতে ইচ্ছা করিলে দ্বিবিধ ধারা অবলম্বনে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

মুরাকাবার প্রথম ধারা–কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে ইহা করা আবশ্যক। কার্যের ইচ্ছা জন্মিবামাত্র ইহা ভাল কি মন্দ, পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্তব্য।

এমন কি যে-কোন খেয়ালই হৃদয়ে উদিত হউক না কেন, তৎপ্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়া দেখা উচিত। পরীক্ষায় যদি বুঝা যায় যে,ইহা আল্লাহ্‌র জন্য হইতেছে তবে কার্য আরম্ভ করিবে। কিন্তু প্রবৃত্তির বাসনা-কামনা চরিতার্থের জন্য হইলে উহা করিবে না এবং আল্লাহকে লজ্জা করিবে। বরং এইরূপ ইচ্ছা মনে উদয় হইয়াছে বলিয়া নিজকে তিরস্কার করিবে এবং কোন প্রবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করিতে কর্মের ইচ্ছা জন্মিলে পরিণামে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, এই ধারণটি অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া লইবে। কর্মের ইচ্ছা জন্মিবামাত্র এই শ্রেণীর মুরাকাবা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, মানুষের নিজ ক্ষমতায় সম্পন্ন প্রতিটি গতি-স্থিতি সম্পর্কে তাহাকে তিনটি প্রশ্ন করা হইবে; যথা-(১) কেন করিলে? (২) কিরূপে করিলে? (৩) কাহার জন্য করিলে?

প্রথম প্রশ্নের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে করা উচিত ছিল, সেই উদ্দেশ্যে না করিয়া কেন শয়তানের অনুসরণে ও প্রবৃত্তিবিশেষকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য করিলে? ইহার উত্তর সন্তোষজনকরূপে দিতে পারিলে এবং কার্যটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকিলে তৎপর প্রশ্ন করা হইবে, তুমি কাজটি কিরূপে করিলে? অর্থাৎ প্রতিটি সৎকার্য করিবার জন্য ইহার শর্ত, নিয়মপদ্ধতি ও তৎসম্পর্কীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই কার্যটি কি তুমি জ্ঞান অনুসারে ও যথোচিত নিয়ম অনুযায়ী করিয়াছ? না, জ্ঞানান্ধভাবে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া করিয়াছ? এই প্রশ্নের উত্তরও সন্তোষজনকভাবে দিতে পারিলে এবং কার্যটি যথোচিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী করা হইয়া থাকিলে পরিশেষে জিজ্ঞাসা করা হইবে-এই কার্য কাহার জন্য করিলে? প্রত্যেক কাজ কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ সংকল্পে করা তোমার প্রতি ওয়াজিব ছিল। তুমি কি ইহা আল্লাহর উদ্দেশ্যে করিয়াছ? তাহা হইলে ইহার যথোপযুক্ত পুরস্কার পাইবে। কিন্তু যদি ইখলাসের সহিত না করিয়া নিজের সাধুতা প্রদর্শনপূর্বক লোকের ভক্তি আকর্ষণ ও সম্মান লাভের বাসনায় এই কাজ করিয়া থাক তবে ইহার পুরস্কার লোকের নিকট হইতে চাহিয়া লও। আর যদি দুনিয়া অর্জনের বাসনায় করিয়া থাক তবে উহার সওয়াব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে কার্যটি অন্য কোন সৃষ্ট পদার্থের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকিলে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তিতে নিপতিত হইবে। কারণ, আল্লাহ তোমাকে পূর্বে জানাইয়া দিয়াছেন ঃ

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ –

অর্থাৎ "সাবধান, একমাত্র আল্লাহত্ম জন্যই খাঁটি ইবাদত।" (সূরা যুমর, ১ রুকূ, ২৩ পারা।) তিনি আরও জানাইয়া দিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ –

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাকিতেছ নিশ্চয়ই তাহারা তোমাদেরই ন্যায় দুর্বল দাসমাত্র।" (সূরা আ'রাফ ২৪ রুকূ, ৯ পারা।)

যে-ব্যক্তি এই বিষয়টি ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছে, বুদ্ধিমান হইলে সেই ব্যক্তি কার্যের উদ্দেশ্য পরীক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, মনে কোন খেয়াল প্রথম উদয় হইলে ইহার পরীক্ষায় মনোনিবেশ করা আবশ্যক। খেয়ালকে সংযত করিতে না পারিলে তৎপ্রতি মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে, তৎপর ইহার প্রতি উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইবে এবং অবিলম্বে ইহার প্রবল ইচ্ছা ফুটিয়া উঠিবে ও অবশেষে তদনুযায়ী অঙ্গপ্রতঙ্গের সঞ্চালনে কার্য সম্পন্ন হইবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন -"যখন তোমার মনে কোন কার্যের খেয়াল জন্মে তখন আল্লাহ্‌কে ভয় কর।"

মনের গতি নির্ধারণে অক্ষম হইলে খাঁটি আলিমের সংসর্গের আবশ্যকতা– মনের গতি পরীক্ষা করিয়া ভাল-মন্দ বুঝিয়া লওয়া একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং এই জ্ঞান বড় দুর্লভ। মনের কোন্ গতিটি আল্লাহ্‌র জন্য এবং কোন্‌টি প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সংঘটিত তাহা নির্ধারণে যে-ব্যক্তি অক্ষম তাহার পক্ষে আলিম বা-আমলের সংসর্গের আবশ্যক। এমন আলিমের সংসর্গ করিলে তাঁহাদের হৃদয়ের নূর নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে। দুনিয়াদার আলিমের সংসর্গ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। কারণ, দুনিয়াদার আলিম শয়তানের প্রতিনিধি। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিলেন-"হে দাঊদ, সংসারাসক্তি যে-আলিমকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না। সংসারাসক্ত আলিম তোমাকে আমার প্রেম হইতে বঞ্চিত করিবে। কারণ, এমন আলিম আমার বান্দাদের পক্ষে দস্যুস্বরূপ।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে-ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও দূরদর্শী এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে যাহার বুদ্ধি পূর্ণ থাকে, তাহাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।" দুইটি শক্তি পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে মানব চরম উন্নতি লাভের উপযুক্ত হয়; যথা-(১) প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা দর্শন করিয়া ভালমন্দ নির্বাচন করিবার

বিচক্ষণতা এবং (২) জ্ঞানের প্রভাবে প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিবার ক্ষমতা। এই দুইটি শক্তির মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক আছে। কারণ, প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমনের উপযোগী জ্ঞান যাহার নাই, ভালমন্দ নির্বাচনের বিচক্ষণতাও তাহার থাকে না। এইজন্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি পাপ করে তাহার জ্ঞান তাহা হইতে এমনভাবে দূরে সরিয়া যায় যে, আর এখনও ফিরিয়া আসে না।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"কর্ম তিন প্রকার (১) সুস্পষ্ট সৎকর্ম–ইহা তোমাদের করা উচিত; (২) সুস্পষ্ট মন্দ কার্য– ইহার ত্রিসীমায়ও যাইবে না, (৩) কার্যটি ভাল কি মন্দ বলিয়া স্পষ্টরূপে জানা যায় না, এইরূপ কার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আলিমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করিবে।"

মুরাকাবার দ্বিতীয় ধারা–কার্য যথারীতি ও যথানিয়মে সম্পন্ন হইতেছে কি না, পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা। কার্যানুষ্ঠানকালে ইহার আবশ্যক। সমস্ত কার্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা–(১) ইবাদত, (২) পাপ কার্য ও (৩) মুবাহ্ বা এমন নির্দোষ কার্য যাহাতে পাপও নাই পুণ্যও নাই। ইবাদত কার্যের মুরাকাবার ধারা এই যে, উহা বিশুদ্ধ সংকল্পে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য করা যাইতেছে কি না এবং তৎসময়ে আল্লাহ্র দিকে গাঢ় মনোযোগ আছে কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত উহা যথানিয়মে সম্পন্ন হইতেছে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে এবং অতিরিক্ত সওয়াব লাভের জন্য কার্যটি যথাসম্ভব সুন্দর ও নির্দোষভাবে করিতে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করা উচিত নহে। পাপ কার্যের ব্যাপারে আল্লাহ্কে যেরূপ লজ্জা করা আবশ্যক, যেরূপ অনুতাপের সহিত তওবা করা উচিত এবং যেমন কাফ্ফারা আদায় করা দরকার, তৎসমুদয় যথারীতি পালন করা হইতেছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা পাপ কার্যে মুরাকাবা। মুবাহ্ কার্যে মুরাকাবার নিয়ম এই–এই প্রকার কার্যে যেরূপ আদব ও নিয়ম রক্ষা করিতে হয়, ইহা পালন করা এবং নি'আমত পাইয়া নি'আমত দাতার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও সর্বদা আল্লাহ্ দেখিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করা। যেমন, বসিলে আদবের সহিত বসা, শয়নকালে পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া ডান পার্শ্বে শয়ন করা। তদ্রূপ আহারের সময় আল্লাহ্র করুণা ও কৌশলের চিন্তা ব্যতীত গাফিলভাবে আহার করা উচিত নহে। এইরূপ চিন্তা সর্বোৎকৃষ্ট আমল। প্রতিটি আহার্য বস্তুর আকার, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ও গঠনে সৃষ্টিকর্তার কিরূপ বিস্ময়কর শিল্প-কৌশল রহিয়াছে! মানবের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আল্লাহ্র

তা'আলার কি আশ্চর্য আশ্চর্য সৃষ্টি-কৌশল প্রকাশ পাইতেছে! মানবের যে-সকল অঙ্গ অন্ন গ্রহণ করে, যথা-অঙ্গুলী, মুখ, দন্ত, গলনালী, উদর, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি এবং যে সমস্ত অঙ্গ ভুক্তদ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিয়া হজম করার ও যেগুলি ক্ষুধা নিবারণের উপায় করিয়া দেয়, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটিই আল্লাহ্ তা'আলার আশ্চর্য শিল্পের নির্দশন। এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টির-কৌশল অবলম্বনে চিন্তা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এইরূপ চিন্তা করা আলিমগণের কার্য।

আবার কোন কোন আলিম এমন আছে যে, তাঁহারা আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুর এমন কি সামান্য খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্গত শিল্প-কৌশল যতই গভীর মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন ততই তাঁহাদের অন্তর পরম শিল্পী আল্লাহ্র ক্ষমতা ও জ্ঞান-গরিমার দিকে উন্নীত ও অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে তাঁহারা আল্লাহ্র প্রতাপ, গুণ ও সৌন্দর্যে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। তাওহীদভাবে তন্ময় ব্যক্তি ও সিদ্দীকগণই এরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা আহার গ্রহণ করাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে অসন্তোষজনক ও বিরক্তিকর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করত বলেন–"হায়, আহারের যদি প্রয়োজনই না হইত!' আহারের প্রয়োজন কেন হয়, এই সম্বন্ধেও তাঁহারা চিন্তা করেন। সংসার-বিরাগিগণ এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। অন্য একদল লোক আছে নিতান্ত লোভী। তাহারা আহারে অত্যন্ত আনন্দ পাইয়া থাকে এবং কি প্রকারে খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিলে সুস্বাদু হয় এবং অধিক পরিমাণে উদরস্থ করা যায়, এই চিন্তায় সর্বদা নিমজ্জিত থাকে। এই শ্রেণীর লোকে পক্ক খাদ্যদ্রব্যের দোষ ও পাচকের ত্রুটি ধরে, এমন কি স্বভাবজাত ফলমূলেরও নিন্দা করিয়া থাকে। তাহারা বুঝে না যে, সকল পদার্থ আল্লাহ্র অনন্ত শিল্প চাতুর্যে সৃষ্ট হইয়াছে এবং শিল্পদ্রব্যের দোষ ধরিলে শিল্পীর নিন্দা করা হয়। সংসারমুগ্ধ গাফিল লোকদের এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। সর্বপ্রকার মুবাহ্ বস্তু ভোগের সময়েই মুরাকাবার প্রভেদ অনুযায়ী লোকের এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে।

মুহাসাবা (কৃতকর্ম-পর্যালোচনা)– কার্যশেষে মুহাসাবা অর্থাৎ কৃতকর্ম পর্যালোচনা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যহ দৈনিক কাজ সম্পন্ন করিয়া রাত্রিতে শয়নকালে একবার প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া উচিত। তাহা হইলে লাভ-ক্ষতির একটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে। শরীয়তে যে-সকল কাজ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া

নির্ধারিত হইয়াছে, উহা যথাযথ পালন করিলে মূলধন ঠিক থাকে। উহা সম্পন্ন করার পর অতিরিক্ত সৎকার্য করিলে এইগুলি লাভে পরিগণিত হয়। সাংসারিক ক্ষতির আশঙ্কায় লোকে যেমন অংশী হইতে কড়াকড়িভাবে হিসাব-নিকাশ লইয়া থাকে তদ্রূপ স্বীয় প্রবৃত্তি হইতেও হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ, প্রবৃত্তি নিতান্ত বাকপটু ও প্রতারক। প্রবৃত্তি নিজের হীন স্বার্থকে তোমার সম্মুখে ইবাদতরূপে উপস্থাপিত করে যাহাতে তুমি ইহাকে লাভজনক মনে কর; অথচ ইহা তোমার জন্য নিতান্ত অনিষ্টকর। এমন কি নির্দোষ মুবাহ কার্যেও প্রবৃত্তির নিকট হইতে হিসাব লইবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে, কেন এ-কাজ করিলে? কাহার জন্য করিলে? প্রবৃত্তির কোন দোষ-ত্রুটি দেখিতে পাইলে তজ্জন্য ইহাকে দায়ী করিবে এবং ইহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিবে।

হযরত ইব্‌নে সাম্মাহ্ (র) নামক এক বুযুর্গ হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বয়স ষাইট বৎসর হইয়াছে। তিনি আরও হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, এই ষাইট বৎসরে একুশ হাজার ছয় শত দিন হয়। তৎপর তিনি নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন-"হায় আফসোস! প্রত্যহ এক একটি পাপ করিলেও একুশ হাজার ছয় শত পাপ হইয়াছে। হায়! এমতাবস্থায় পরিত্রাণ কিরূপে হইবে? বিশেষত এমন কোন দিনও যদি গত হইয়া থাকে যে-দিন হাজার পাপ সংঘটিত হইয়াছে; তবে কি অবস্থা হইবে!" এইরূপ চিন্তা করিয়া এক বিকট চিৎকারপূর্বক তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। লোকে দেখিল, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।

অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তির আচরণ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। তাহারা নিজের হিসাব লইতেছে না। অথচ তাহারা যে পাপ করিতেছে, ইহার প্রত্যেকটির জন্য যদি এক একটি কঙ্কর কোন গৃহে নিক্ষেপ করা যায় তবে সেই গৃহ কঙ্করে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। আবার 'কিরামান কাতিবীন' ফিরিশতা যদি পাপ লিখিবার জন্য মজুরি চাহিতেন তবে তাহাদের সমস্ত ধন নিঃশেষ হইয়া যাইত। মানুষের অবস্থা তো এই যে, কয়েকবার 'সুব্‌হানাল্লাহ' জপিলে ইহার সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য হাতে তসবীহ রাখে এবং এক ফেরা পড়া হইলে বলে-আমি একশত বার পড়িলাম। কিন্তু দিবারাত্র লোক যে সকল বেহুদা কথা বলিয়া থাকে ইহার কোন হিসাবই লয় না। ইহার সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য হাতে কোন কিছু রাখেও না। বেহুদা কথার হিসাব রাখিলে দেখা যাইত যে, প্রত্যহ সহস্রাধিক বেহুদা কথা বলা হইয়া থাকে। ইহা সত্ত্বেও নেকীর পাল্লা ভারী হইবে

বলিয়া আশা করা মূর্খতা বৈ আর কিছুই নহে। এইজন্যই হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন-"তোমার কার্য ওযন হইবার পূর্বে তুমি নিজেই উহা ওযন করিয়া লও।" তিনি যখন রাত্রিকালে গৃহে ফিরিতেন তখন স্বীয় পদে দুর্‌রা মারিতেন এবং বলিতেন-"তুই অদ্য কি করিয়াছিস?" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন যে, মৃত্যুকালে হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন -"ওমর (রা) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার বন্ধু নাই।" তৎক্ষণাৎ তিনি আবার বলিলেন-"হে আয়েশা, আমি কি বলিলাম?" হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন-"আপনি বলিয়াছেন, ওমর অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার বন্ধু নাই।" তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার উক্তি সংশোধন করিয়া বলিলেন-"তাহা নহে, ওমর অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার কেউ নাই।" দেখ হযরত আবূ বকর (রা) এতটুকু কথারও হিসাব লইয়া যখন বুঝিলেন যে, ইহা ঠিক হয় নাই তখনই তাঁহার উক্তি সংশোধন করিয়া লইলেন।

হযরত ইব্‌নে সালাম (র) একদা লাকড়ির বোঝা কাঁধে লইয়া যাইতেছিলেন। লোকে দেখিয়া বলিল-"বোঝা বহন করা গোলামের কাজ।" তিনি বলিলেন-"আমি মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে, এই কাজ করিয়া ইহার অবস্থা কিরূপ হয়।" হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন-'আমি একদিন দেওয়ালের আড়াল হইতে হযরত ওমরকে (রা) এক বাগানে দেখিয়াছিলাম। তিনি স্বীয় মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন-"সাবাস! লোকে তোমাকে আমীরুল মুমিনীন বলিয়া আহ্বান করে অথচ তুমি আল্লাহকে ভয় কর না। এই জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত থাক!" হযরত হাসান (রা) বলেন-"যে মন নিজকে তিরস্কার করে এবং কার্য শেষে সর্বদা এইরূপ হিসাব লয় যে, তুমি অমুক কাজ কেন করিলে, অমুক বস্তু কেন আহার করিলে?' এমন মনকেই 'নফসে লাওয়ামা' বলে।' ফলকথা এই যে, কৃতকর্মের হিসাব লওয়া প্রত্যেকের পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যক।

মু'আকাবা (প্রবৃত্তিকে শাস্তি দান)-প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ না করা অন্যায়। প্রবৃত্তিকে স্বাধীন ছাড়িয়া দিলে ইহা নির্ভয় ও অবাধ্য হইয়া পড়ে যখন ইহাকে বশে আনা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বরং অন্যায় কার্য করিবামাত্র ইহাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। সন্দেহের বস্তু খাইয়া থকিলে শাস্তিস্বরূপ ইহাকে উপবাস রাখিতে হইবে; নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন করিয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষু বন্ধ করিয়া

লইতে হইবে। অন্যায় কার্য ধরা পড়িলে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই তদ্রূপ শাস্তি প্রদান করিবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এইরূপই করিতেন।

এক আবিদ ঘটনাক্রমে এক মহিলার গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তিনি সেই হস্তখানি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইস্রাঈল বংশের এক দরবেশ বহুকাল গির্জার মধ্যে বাস করিতেন। এক রমণী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মবিক্রয়ের অভিলাষ জ্ঞাপন করে, দরবেশ তাহার নিকটবর্তী হইবার জন্য গির্জা হইতে একটি পা বাহির করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত হইলে তিনি গির্জাতে প্রবেশ করিতে চাহিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—" যে-পদ পাপপথে গির্জা হইতে বাহির হইয়াছে, ইহাকে পুনরায় ভিতরে আসিতে দেওয়া উচিত নহে।" কাজেও তাহাই হইল। সেই পদখানা গির্জার বাহিরেই রহিল। বাহিরে থাকিয়া প্রচণ্ড শীত ও গরমে উহা শরীর হইতে খসিয়া পড়িল। হযরত জুনায়দ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌নুল কুযায়নী (র) বলেন—"প্রচণ্ড শীতকালের এক রজনীতে আমার স্বপ্নদোষ ঘটে। আমি তৎক্ষণাৎ গোসল করিতে চাহিলাম। কিন্তু শীতের ভয়ে আমার প্রবৃত্তি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল–'এই শীতে গোসল করিয়া আত্মহত্যা করিবে কেন? সকালে হাম্মামে গিয়া গরম পানিতে গোসল করিও।' আমি শপথ করিয়া বলিলাম–'এখনই সমস্ত পরিহিত বস্ত্র ভিজাইয়া গোসল করিব এবং সেইগুলি শরীরে রাখিয়াই শুকাইয়া লইব।' আমি ইহাই করিলাম।" হযরত জুনায়দ (র) এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ "যে-প্রবৃত্তি আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে শৈথিল্য করে ইহাই তাহার উপযুক্ত শাস্তি।" এক সংসারবিরাগী এক মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎপর ইহার শাস্তিস্বরূপ শপথ করিলেন যে, তিনি কখনও ঠাণ্ডা পানি পান করিবেন না। ইহার পর জীবনে কখনও তিনি ঠাণ্ডা পানি পান করেন নাই।

হযরত হাস্‌সান ইবনে আবূ সেনান (র) একদা এক বিলাস ভবনের নিকট দিয়া যাইবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা কে নির্মাণ করিয়াছে?" তৎক্ষণাৎ তিনি নিজে নিজে বলিলেন—"যে-পদার্থের তোমার কোন আবশ্যকতা নাই, সেই সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আল্লাহর শপথ, এক বৎসর রোযা রাখিয়া তোমাকে শাস্তি দিব।" তিনি তাহাই করিলেন। হযরত আবূ তালহা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা স্বীয় খোরমা বাগানে নামায পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে একটি সুন্দর পাখি বাগানে উড়িতেছিল। সেই সৌন্দর্যের খেয়াল তাঁহার মনে

উদিত হইলে নামাযে অন্যমনস্ক ভাব প্রবেশ করে এবং কয় রাকাত নামায পড়া হইয়াছিল, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি সমস্ত বাগানটি দান করিয়া দিলেন। হযরত মালিক ইবনে যয়গাম (র) বলেন—"হযরত রিবাহুল কয়সী (র) একদা আগমন করত আসরের নামাযের পর আমার পিতাকে ডাকিলেন। আমি বলিলাম–'তিনি ঘুমাইতেছেন।' তিনি বলিলেন–'এখন কি ঘুমাইবার সময়?' তৎপর তিনি প্রস্থান করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। শুনিতে পাইলাম তিনি যাইবার কালে স্বীয় প্রবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন–'হে অপদার্থ, এখন নিদ্রার সময় কি না জিজ্ঞাসা করিবার তোর কি আবশ্যকতা আছে? আমি শপথ করিলাম তোর এই অনধিকার চর্চার জন্য তোকে এক বৎসর বালিশের উপর মাথা রাখিতে দিব না।' এই কথা বলিতে বলিতে এবং ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিতেছিলেন–'তুই কি আল্লাহ্‌কে ভয় করিস না?" হযরত তামীমে দারী (রা) একদা এমন নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন যে, তাঁহার তাহাজ্জুদের নামায কাযা হইয়া গেল। ইহাতে তিনি শপথ করিয়াছিলেন যে, পূর্ণ এক বৎসর তিনি রাত্রে শয়ন করিবেন না।

হযরত আবূ তাল্‌হা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি উত্তপ্ত বালুকা ও কঙ্করের উপর গড়াগড়ি করিতেছিলেন এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন—"হে রজনীর মরা ও দিবসের অলস, তোর অত্যাচার কত দিন সহ্য করিব?' রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে, তুমি এরূপ করিতেছ কেন?" সেই ব্যক্তি বলিলেন—"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার প্রবৃত্তি আমার উপর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।" হযরত (সা) বলিলেন –'এখন আকাশের দ্বার তোমার জন্য খোলা হইয়াছে এবং তোমার কারণে ফিরিশতাগণের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলা গর্ব করিতেছেন।' তৎপর হযরত (সা) সাহাবাগণকে বলিলেন—"এই ব্যক্তি নিকট হইতে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লও।" সাহাবাগণ প্রত্যেকে তাঁহার নিকট যাইয়া দু'আ চাহিতে লাগিলেন এবং তিনি প্রত্যেকের জন্য দো'আ করিতেছিলেন। তৎপর হযরত (সা) সেই ব্যক্তিকে সমবেতভাবে সকলের জন্য দু'আ করিতে বলিলেন। সেই ব্যক্তি দু'আ করিতে লাগিলেন—"হে আল্লাহ্ পরহেযগারীকে তাঁহাদের পাথেয়স্বরূপ কর এবং সকলকেই সৎপথে রাখ।"

হযরত (সা) ইহা শুনিয়া দু'আ করিলেন—"ইয়া আল্লাহ্, তাহাকে থামাও অর্থাৎ যে-দু'আ উত্তম তাহাই তাহার মুখ দিয়া বাহির করিয়া দাও।" তখন সেই ব্যক্তি এইরূপ দু'আ করিতে লাগিলেন—"ইয়া আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে বেহেশ্‌তে স্থান দাও।"

হযরত মজমা (র) নামক এক বুযুর্গ একদা এক ছাদের দিকে তাকাইলে এক মহিলার দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—"এখন হইতে আর আকাশের দিকেই দৃষ্টিপাত করিব না।" হযরত আহ্‌নফ ইব্‌নে কায়স (র) দিবসের কাজ সমাপনান্তে রজনীতে প্রদীপ জ্বালাইয়া স্বীয় প্রবৃত্তির হিসাব লইতে বসিতেন। তিনি বারবার প্রদীপ শিখার উপর স্বীয় অঙ্গুলী স্থাপনপূর্বক বলিতেন—"অমুক দিন তুই অমুক কাজ কেন করিলি? অমুক দ্রব্য কেন খাইলি?

মোটের উপর কথা এই যে, সতর্ক জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তিকে হঠকারী জানিয়া সর্বদাই উক্ত প্রকারে শাস্তি দিতেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, শাস্তি না দিলে প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিবে এবং ধর্ম-জীবন বিনাশ করিয়া ফেলিবে। এই আশঙ্কায় তাঁহারা সর্বদা প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখিতেন।

মুজাহাদা (প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ—বুযুর্গগণ স্বীয় প্রবৃত্তিকে সৎকার্যে অলস দেখিলে ইবাদতের পরিমাণ বৃদ্ধি করত উহা সমাপনে বাধ্য করিয়া প্রবৃত্তিকে শাস্তি দিতেন। হযরত ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমার এই অবস্থা ছিল যে, এক ওয়াক্ত নামায জমা'আতে পড়িতে না পারিলে এক রাত্রি তিনি নিদ্রা যাইতেন না। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ওয়াক্ত নামায জমা'আতে পড়িতেন না পারায় ইহার কাফ্‌ফারাস্বরূপ দুই লক্ষ দিরহাম মূল্যের জমি দান করিয়া দিলেন। একদা হযরত ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মাগরিবের নামাযে এতটুকু বিলম্ব ঘটিল যে, এই সময়ে দুইটি তারকা আকাশে দেখা গিয়াছিল। ইহার কাফ্‌ফারাস্বরূপ তিনি দুইজন গোলাম আযাদ করিয়া দিলেন। এই প্রকার বহু কাহিনী আছে।

ইবাদতে প্রবৃত্তির শিথিলতা দূর করিবার উপায় – প্রবৃত্তি ইবাদতে শৈথিল্য করিতে আরম্ভ করিলে সাধনায় রত কোন বুযুর্গের সংসর্গে অবস্থান করা আবশ্যক। তাহা হইলে বুযুর্গের কঠোর সাধনা দর্শনে প্রবৃত্তির শৈথিল্য দূর হইবে

এবং তাহারও তদ্রূপ সাধনার প্রবল ইচ্ছা জন্মিবে। এক বুযুর্গ বলেন—"যখনই আমার মধ্যে ইবাদতের কঠোর সাধনার শৈথিল্য অনুভব করিতাম তখনই আমি হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসিকে (র) দেখিতে যাইতাম। তাঁহাকে দেখিলে আমার মনে ইবাদতের অনুরাগ এক সপ্তাহকাল সতেজ থাকিত।" তদ্রূপ বুযুর্গ পাওয়া না গেলে সেই প্রকার রিয়াযতকারী ব্যক্তিগণের জীবচরিত ও কার্যাবলীর কাহিনী পাঠ ও শ্রবণ করা আবশ্যক। এ-স্থলে কয়েকজন বুযুর্গের অবস্থা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

হযরত দাউদ তায়ী (র) রুটি খাইতেন না। দিবসে রোযা রাখিয়া রাত্রে আটা পানিতে মিশাইয়া পান করিতেন। তিনি বলিতেন—"রুটি না খাইয়া আটা পানিতে মিশাইয়া খাইলে যে-সময় বাঁচে সেই সময়ে কুরআন শরীফের পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করা যায়। আমি সেই মূল্যবান সময়টুকু বৃথা নষ্ট করিব কেন?" এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার গৃহের ছাদের কড়িকাঠ কবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে?" তিনি বলিলেন—"আমি ত্রিশ বৎসর যাবত এই গৃহে বাস করিতেছি। কিন্তু কখনও ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই।" বৃথা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করাকে বুযুর্গগণ মক্‌রূহ বলিয়া মনে করেন।

হযরত আহমদ ইব্‌নে রযীন (র) ফজরের নামাযের পর হইতে আসর পর্যন্ত একই স্থানে বসিয়া থাকিতেন এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। লোকে তাঁহাকে তদ্রূপ উপবিষ্ট থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে চক্ষু এইজন্য দান করিয়াছেন যে, তাহারা চতুষ্পার্শের পদার্থ দর্শন করিয়া আল্লাহ্‌র আশ্চর্য সৃষ্টি-কৌশল ও ক্ষমতা বুঝিয়া লইবে; যে-ব্যক্তি এই সকল দর্শন করিবে, অথচ উপদেশ গ্রহণ করিবে না, তাহার নামে এক একটি গোনাহ লিপিবদ্ধ হইবে।" হযরত আবূ দরদা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন—"তিনটি কার্যের জন্য আমি জীবিত থাকাকে পছন্দ করি— (১) সুদীর্ঘ রাত্রি সিজদায় কর্তন করিব, (২) বড় বড় দিনগুলি পিপাসায় অতিবাহিত করিব (অর্থাৎ রোযা রাখিব) এবং (৩) যাঁহারা সর্ব বিষয়ে পবিত্র ও যাঁহাদের আপাদমস্তক হিক্‌মতে পরিপূর্ণ তাঁহাদের সংসর্গ লাভ করিব।" হযরত আলকাম ইব্‌নে কায়সকে (র) লোকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি নিজকে এত কষ্টে রাখেন কেন?" তিনি বলিলেন—"আমি নিজকে ভালবাসি বলিয়া তাহাকে দোযখের শাস্তি হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছি।" তাহারা আবার বলিল—"শরীরকে

এরূপ কষ্ট দেওয়া আপনার উপর ওয়াজিব নহে।” তিনি বলিলেন–“আগামীকল্য কিয়ামত দিবস যেন এইজন্য অনুতাপ করিতে না হয় যে, দুনিয়াতে এই কার্যটি কেন করি নাই? তজ্জন্য এখন যতদূর সাধ্য প্রাণপণে কাজ করিয়া লইতেছি।” হযরত জুনায়দ (র) বলেন–“আমি হযরত সরী সকতীর (র) মধ্যে এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি যে, তাহা আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার বয়স আটান্ন বৎসর হইয়াছিল অথচ মৃত্যুর সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তাঁহাকে কেহই শয্যা গ্রহণ করিতে দেখে নাই।

হযরত আবূ মুহাম্মদ হারীরী (র) একবার পূর্ণ এক বৎসর মক্কা শরীফে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি কোন কথা বলেন নাই, ঘুমান নাই, কিংবা কোন বস্তুর উপর পৃষ্ঠ রাখিয়া হেলান দেন নাই বা পা বিস্তার করিয়া বসেন নাই। হযরত আবূ বকর কাত্তানী (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–“আপনি এত কঠোর রিয়াযত (প্রবৃত্তিনিগ্রহ) কিরূপে করিতে সমর্থ হইলেন?” তিনি বলিলেন–“আমার অন্তরের সত্যপরায়ণতার দরুন আমি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, ইহাই আমাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এরূপ রিয়াযত করিতে সামর্থ্য দিয়াছে।” এক বুযুর্গ বলেন–“আমি একদিন দেখিলাম হযরত ফতেহ্ মুসল্লী (র) রোদন করিতেছেন এবং তাঁহার চক্ষু হইতে রক্তমিশ্রিত অশ্রু নির্গত হইতেছে। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–“আমার পাপ স্মরণ করিয়া আমি বহু দিন পর্যন্ত চক্ষু হইতে অশ্রুজল বাহির করিয়াছি। কিন্তু এ রোদনে আন্তরিকতা ছিল না। এখন সেই ত্রুটি স্মরণে চক্ষু হইতে রক্তপাত করিতেছি।” তাঁহার ইন্তিকালের পর লোকে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–“আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলিলেন–“ঐ রোদনের ফলে আল্লাহ্ আমাকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং তাঁহার মহত্ত্বের শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, গত চল্লিশ বৎসর ফিরিশ্‌তাগণ যে আমলনামা পৌঁছাইয়াছেন তন্মধ্যে আমার কোন পাপ ছিল না।” হযরত দাঊদ তায়ীকে (র) লোকে জিজ্ঞাসা করিল–“আপনি দাড়ি আঁচড়াইলে কি অন্যায় হইবে?” তিনি বলিলেন–“চিরুণী করিতে মনোবিবেশ করিলে আমি গাফিল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িব।”

হযরত উয়াইস্ করনী রাযিয়াল্লাহু আন্হু রাত্রিসমূহকে পৃথক পৃথক ইবাদতের জন্য ভাগ করিয়া লইতেন। যে রাত্রিকে তিনি রুকূর রাত্রি বলিতেন,

এক রুকূতেই তিনি সেই রাত্রি প্রভাত করিয়া দিতেন। যে রাত্রিকে সিজদার রাত্রি বলিতেন সেই রাত্রি এক সিজদায় অতিবাহিত করিতেন। হযরত ওত্‌বাতুল গোলাম (র) কঠোর রিয়াযত করিতেন। এইজন্য তিনি সুস্বাদু দ্রব্য পানাহার করিতেন না। একদা তাঁহার জননী সন্তান-স্নেহের বশবর্তী হইয়া বলিলেন–“বৎস, নিজের উপর একটু দয়া কর।” তিনি বলিলেন–“স্নেহময়ী জননী, আমি আল্লাহ্‌র দয়ার ভিখারী। দুনিয়ার এই সামান্য কয়েক দিন কিছু কষ্ট সহ্য করিয়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে যেন অনন্তকালের আরাম পাই, এই চেষ্টা করতেছি।” হযরত রবী' রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–“একদা আমি হযরত উয়াইস্ করনী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম; দেখিলাম তিনি ফজরের নামাযে লিপ্ত আছেন। তিনি নামায শেষ করিলে আমি মনে করিলাম, এখন বাক্যালাপ করিত গেলে তাঁহার তসবীহ পাঠে ব্যাঘাত ঘটিবে। এইরূপ ভাবিয়া আমি ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলাম। তিনি স্বস্থানে পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন, ক্ষণকালের জন্যও তথা হইতে উঠিলেন না। এমন কি তিনি সেই স্থানে যুহর ও আসরের নামায পড়িলেন। সেই অবস্থায় রজনী প্রভাতে দ্বিতীয় দিবসে তিনি ফজরের নামাযও তথায় পড়িলেন। এমন সময় তাঁহার চক্ষে সামান্য তন্দ্রার ভাব আসিল। অকস্মাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে তিনি বলিতে লাগিলেন–‘ইয়া আল্লাহ্, নিদ্রাতুর চক্ষু ও ভোজনপটু উদরের দৌরাত্ম্য হইতে আমাকে রক্ষা কর।” আমি নিজে নিজে বলিলাম–‘ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট।’ তৎপর আমি কিছু বাক্যালাপ না করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম।’

হযরত আবূ বকর আব্বাসী (র) একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর কাল শয়ন করেন নাই। এইরূপ অনিদ্রায় তাঁহার চক্ষে কালপানি নামিয়াছিল। কিন্তু বিশ বৎসর পর্যন্ত এই পীড়ার সংবাদ তিনি গৃহবাসী কাহাকেও জানিতে দেন নাই। তিনি প্রত্যহ পাঁচশত রাকাত নামায পড়িতেন। এবং যৌবনকালে প্রতিদিন ত্রিশ হাজার বার সূরা ইখলাস পাঠ করিতেন হযরত কর্য ইব্‌নে দব্‌রা (র) একজন আবদাল দিলেন। তিনি প্রত্যেহ তিনবার কুরআন শরীফ খতম করিতেন। ইহাতে লোকে তাঁহাকে বলিল–“আপনি নিজের উপর বড় কঠিন কষ্ট চাপাইয়া লইয়াছেন।” তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন–“দুনিয়ার বয়স কত?” তাহারা বলিল–“সাত হাজার বছর।” তিনি পুনরায় বলিলেন–“কিয়ামতের এক এক দিন কত বড় হইবে?” তাহারা বলিল–“পঞ্চশ হাজার বছর।” তিনি বলিতে লাগেন–“আচ্ছা এমন লোক কে আছে, যে পঞ্চাশ দিনের আরাম পাইবার

আশায় সাত দিন কিছু কষ্ট সহ্য করে না? অর্থাৎ আমি যদি পূর্ণ সাত হাজার বছর জীবিত থাকি তবেও কিয়ামতের একদিন যাহা দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, সেই এক দিনের কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য সাত হাজার বছর কষ্ট করি তাহাও নিতান্ত তুচ্ছ হইবে। কিয়ামতের সেই দীর্ঘ বিচারের পরেও পরজগতে অনন্তকাল থাকিতে হইবে, এই কথা আর কি বলিব? এমতাবস্থায় অনন্তকালের দুঃখকষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য জীবনের এই সামান্য কয়েকটা দিনের পরিশ্রম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন–"আমি এক রজনীতে হযরত রাবিয়ার (র) গৃহে যাইয়া দেখিলাম, তিনি স্বীয় উপাসনা-গৃহে নামাযে রত আছেন। ফজর পর্যন্ত তিনি নামাযে লিপ্ত ছিলেন। আমিও তাঁহার গৃহের এক কোণে নামায পড়িতেছিলাম। ফজরের পর আমি বলিলাম–"আল্লাহ্ আমাদিগকে সমস্ত রজনী নামায পড়িবার ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহার শুকরিয়া কিরূপে আদায় করিব?" তিনি বলিলেন–"আগামীকল্য রোযা রাখিয়া ইহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

রিয়াযতকারী সাধক বুযুর্গগণের কার্যপ্রণালী এইরূপ অসাধারণ ছিল। তদ্রূপ অসংখ্য কাহিনী আছে। এ-ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই সমস্তের সমাবেশ হইতে পারে না। "ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে বুযুর্গগণের তদ্রূপ বহু কাহিনী গৃহীত হইয়াছে। সাধারণ লোকে তাঁহাদের ন্যায় সাধনা ও পরিশ্রম করিতে না পারিলেও পূর্বকালে বুযুর্গগণের জীবন যাপন প্রণালী মনোযোগের সহিত শুনিয়া নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটি তো একবার বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহ অন্তরে জন্মাইয়া লওয়া তো উচিত। তাহা হইলেও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের ক্ষমতা লাভ হইতে পারে।

মু'আতাবা (প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করা)– মানব প্রবৃত্তি এমনভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে, ইহা সৎকর্ম হইতে পলায়ন করে এবং অপকর্মের দিকে ধাবিত হয়। সৎকর্মে অলসতা এবং লোভ-লালসা-কামনাদি রিপু চরিতার্থ করা ইহার স্বভাব। প্রবৃত্তির স্বভাব হইতে এই দোষ দূর করিয়া ফেলিতে এবং ইহাকে বিপথ হইতে সুপথে আনয়ন করিতে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ। কোন সময় কঠিন ব্যবহারে, কোন সময় কোমল ব্যবহারে, কখনও কর্মে, আবার কখনও বা উপদেশে প্রবৃত্তিকে সংশোধন করা যায়। কারণ, প্রবৃত্তির স্বভাব এই যে, কোন কার্যে লাভ দেখিলে সে ইহা সম্পন্ন করিলে প্রস্তুত হয়। এমন কি লাভজনক

কার্যনির্বাহ করিতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইলেও উহা সহ্য করে। কিন্তু অধিকাংশ সময় অজ্ঞানতা ও অন্যমনস্কতা প্রবৃত্তির সম্মুখে এমন এক দুর্ভেদ্য পর্দার সৃষ্টি করে যে, তজ্জন্য কার্যের লাভ-লোকসান দেখিতে পায় না। অমনোযোগিতা হইতে জাগ্রত করত লাভ-ক্ষতি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতে পারিলে প্রবৃত্তি লাভজনক কাজ করিতে প্রস্তুত হয়। এইজন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ –

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন; কেননা নিশ্চয়ই উপদেশ ঈমানদারগণের উপকার করে।" (সূরা যারিয়াত, ৩ রুকূ, ২৭ পারা।) তোমার প্রবৃত্তিও অপরের প্রবৃত্তির ন্যায় উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং প্রথমে ইহাকে উপদেশ দেওয়া ও তিরস্কার করা আবশ্যক, বরং তিরস্কার কোন সময়ই বন্ধ করা উচিত নহে।

প্রবৃত্তিকে উপদেশ প্রদানের নিয়ম– প্রবৃত্তিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করা উচিত–"হে প্রবৃত্তি, তুমি নিজকে বুদ্ধিমান বলিয়া দাবী কর। কেহ তোমাকে নির্বোধ বলিলে তুমি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হও অথচ তোমা অপেক্ষা অধিক নির্বোধ আর কেহই নাই। কারণ, যাহাকে ধরিবার জন্য একদল সৈন্য সেই নগরের তোরণ দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছে এবং অপর একজন সিপাই তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিবার জন্য নগরে প্রবেশ করিয়াছে, এমতাবস্থায় সেই আসামী যদি ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যাপৃত থাকে, তবে তাহার অপেক্ষা নির্বোধ আর কে হইতে পারে? হে প্রবৃত্তি, মৃত ব্যক্তিগণ সৈন্য দলের ন্যায় নগর-দ্বারে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহারা অঙ্গীকার করিয়াছে যে-পর্যন্ত তোমাকে সঙ্গে না লইবে সেই পর্যন্ত প্রস্থান করিবে না। বেহেশ্ত বা দোযখ তোমার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সৈন্যদল হয়ত আজই তোমাকে তাহাদের সঙ্গে লইয়া যাইবে। অদ্য না ধরিলেও একদিন না একদিন অবশ্যই তোমাকে ধরিবে এবং তাহাদের দলে তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। অতএব যাহা অবশ্যই ঘটিবে তাহা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াই মনে কর। কেননা মৃত্যু কখন আসিবে তাহা কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই–রাত্রিকে আসিবে, কি দিবসে–শীঘ্র আসিবে কি বিলম্বে–শীতকালে আসিবে কি গ্রীষ্মকারে আসিবে, কিছুই জানা নাই। মৃত্যু সকলকেই হঠাৎ আসিয়া লইয়া যায়। লোকে যখন নিতান্ত নিরুদ্বেগে থাকে তখনই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় তুমি যদি মৃত্যুর জন্য

প্রস্তুত না থাক তবে তোমা অপেক্ষা নির্বোধ আর কে হইতে পারে?

"হে মন, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, তুমি সমস্ত দিন পাপে রত থাক। যদি মনে করিয়া থাক যে, আল্লাহ্ তোমার পাপ দেখিতেছেন না তবে তুমি কাফির। আর যদি জান যে, তিনি পাপ করিতে দেখিতেছেন এবং ইহা জানা সত্ত্বেও পাপ কর, তবে তুমি নিতান্ত দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ। তাঁহার চক্ষের উপর পাপ করিয়া চলিয়াছ, অথচ ভীত হইতেছ না। হে মন, একটু ভাবিয়া দেখ–তোমার গোলাম তোমার আদেশ লংঘন করিলে তুমি তাহার প্রতি কিরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া থাক। আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করিয়া তুমি কিরূপে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ রহিলে? যদি ধোঁকায় পড়িয়া মনে করিয়া থাক যে, আল্লাহ্র শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে তবে অল্পক্ষণের জন্য একটি অঙ্গুলী প্রদীপশিখার উপর ধরিয়া দেখ বা প্রখর রৌদ্রের মধ্যে তপ্ত বালুকার উপর বসিয়া থাক অথবা ফুটন্ত গরম পানিপূর্ণ ডেগচির মধ্যে ডুব দাও, তাহা হইলেই তোমার অক্ষমতা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবে। পক্ষান্তরে যদি ভাবিয়া থাক যে, তুমি যাহা করিতেছ তজ্জন্য আল্লাহ্র আইনে ধৃত হইবে না তবে তুমি কুরআন শরীফকে এবং এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ। কারণ আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ –

অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি মন্দ কার্য করিবে সে ইহার শাস্তি পাইব।" (সূরা নিসা, ১৭ রুকূ, ৫ পারা।)

"হে প্রবৃত্তি, তুমি হয়ত বলিবে–'আল্লাহ্ করুণাময় ও দয়ালু; তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন না।" ইহার উত্তর তুমি কান পাতিয়া শুনিয়া লও। সেই করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ কেন দুনিয়াতে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অনাহারে মারিতেছেন এবং পীড়া ও বিপদাপদে নিপতিত করিতেছেন? বিনা বীজ বপনে তিনি শস্য দান করিতেছেন না কেন? হে মন, আল্লাহ্ তো করুণাময় ও দয়ালু। তবে কেন তুমি কাম্য ধন অর্জনের জন্য দুনিয়ার কৌশল ও উপায় অবলম্বন কর? সেই সময়ে কেন বল না–"আল্লাহ্ করুণাময় ও দয়ালু। আমি পরিশ্রম করিয়া কষ্ট সহ্য করিব না। আল্লাহ্ স্বয় আমার কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবেন।' হে মন, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর শতদিক! হে মন, তুমি এখন হয়ত বলিবে–'আমি তর্কে হারিলাম, তুমি জিতিলে। তুমি সত্যই বলিতেছ। কিন্তু কি বলিব, আমি

যে পরিশ্রমের কষ্ট সহ্য করিতে পারি না।' রে নির্বোধ, তুমি এতটুকু জান না যে, যাহারা গুরুতর কষ্ট সহ্য করিতে না পারে তাহাদের পক্ষে পরকালে দোযখের ভীষণ শাস্তি হইতে বাঁচিবার জন্য সামান্য কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক? কারণ যে ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করে না সে যন্ত্রণা হইতেও বাঁচিতে পারে না। তুমি অদ্য এই সামান্য কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছ না, বল তো কল্য কিয়ামতের দিন দোযখের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা লজ্জা-অপমান তিরস্কার-ভর্ৎসনা কিরূপে সহ্য করিবে? হে নির্লজ্জ, ধনসম্পদ উপার্জন করতে কত কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া থাক এবং স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় এক বিধর্মী চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী সমস্ত অভিলাষের দ্রব্য পরিত্যাগ কর। কিন্তু এই কথাটি বুঝিতে পারিলে না যে, দরিদ্রতা ও পীড়া অপেক্ষা দোযখের যন্ত্রণা অধিক কষ্টদায়ক এবং পরকালের অনন্ত জীবন ইহকালের জীবন অপেক্ষা অসীম।

"হে অবুঝ, তুমি বোধ হয় মনে করিতেছ যে, তওবা করিয়া সুপথে ফিরিবে, তৎপর সৎকার্য করিয়া লইবে। তওবা করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইতে পারে। তখন অনুতাপ অনুশোচনা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না। হে নফ্স, যদি তুমি ভাবিয়া থাক যে, অদ্য অপেক্ষা আগামীকল্য তওবা করা তোমার পক্ষে সহজ হইবে, তবে ইহা তোমার মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যত বিলম্ব করিবে তওবা করা ততই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। পর্বতোপরি আরোহণের সময়ে বাহনের পশুকে বলবান করিবার উদ্দেশ্যে উদর পূর্তি করিয়া আহার করাইলে যেমন ফল পাওয়া যায়, মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে তওবা করাও তদ্রূপ। আরোহণের পূর্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করাইলে পশু বলবান হইয়া উঠিত। ঠিক আরোহণের সময়ে আহার করাইলে কতটুকু বলবান হইবে? হে মন, তোমাকে এমন এক বিদ্যাশিক্ষার্থীর সহিত তুলনা করা যায় যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করে; অথচ আলস্যবশত বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম না করিয়া সে আশা করিয়া রহিল যে, গৃহে প্রত্যাগমনের সময়ে বিশেষ পরিশ্রমে বিদ্যা শিক্ষা করত পণ্ডিত হইয়া দেশে ফিরিবে। সে এতটুকু বুঝে না যে, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইতে বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের আবশ্যক হয়।

হে অপবিত্রতাপূর্ণ নফস, তোমাকে তদ্রূপ দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হইবে। তাহা হইলে তুমি বিশুদ্ধ হইয়া আল্লাহ্র মহব্বত ও মারিফাতের উন্নত মকামে উপনীত হইতে পারিবে এবং ধর্মপথের বিপদসমাকীর্ণ স্থানসমূহ

অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে। সমস্ত জীবন নিঃশেষ ও বৃথা নষ্ট করিয়া যখন আর অবকাশই পাইবে না তখন পরিশ্রম ও সাধনা করিবে কিরূপে? বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, পীড়ার অগ্রে স্বাস্থ্যকে, কর্মব্যস্ততার পূর্বে শান্তিকে, মৃত্যু না আসিতে জীবনকে অমূল্য জ্ঞানে কেন সদ্ব্যবহার করিলে না? হে মন, শীত আসিবার পূর্বে গ্রীষ্মকালেই শীতবস্ত্র সংগ্রহ কর কেন? তখন কেন আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করত নিশ্চিন্ত থাক না? 'যমহরীর' নামক দোযখের শীত, 'চিল্লাবাসের শীত অপেক্ষা এবং দোযখের উষ্ণতা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠর উষ্ণতা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। দুনিয়ার শীত-গ্রীষ্ম নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে তুমি কিছুমাত্র ত্রুটি কর না। কিন্তু পরকালের কার্যনির্বাহের বেলায় নানা ওযর-আপত্তি উত্থাপনপূর্বক অবহেলা কর। এরূপ ব্যবহারের কারণ হয়ত ইহাই যে, তুমি পরকালও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস কর না। এই প্রকার অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা তুমি স্বীয় অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়াছ এবং নিজকেও জানিতে দিতেছ না। ওহে নির্বোধ, ইহাই তোমার ধ্বংস ও দুঃখের কারণ হইবে।

হে মন, তুমি হয়ত বুঝিয়া রাখিয়াছ যে, মারিফাতের নূরে তুমি নিজকে সজ্জিত করিতে না পারিলেও মৃত্যুর পর লালসা-কামনাদি রিপুর অগ্নি তোমার প্রাণ দগ্ধ করিবে না। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—মনে কর, এক ব্যক্তি নিজে নিজে ভাবিতে লাগিল যে, আমি শীতবস্ত্র পরিধান না করিলেও আল্লাহ্র অনুগ্রহে মাঘের শীত আমার শরীর স্পর্শ করিবে না। এই ব্যক্তি এত বড় বোকা যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ কাহাকে বলে তাহাও সে বুঝে না। আল্লাহ্ই শীত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহা নিবারণের জন্য শীতবস্ত্র নির্মাণের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন ও সেই শীতবস্ত্র নির্মাণের উপকরণও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; ইহাকেই আল্লাহ্র অনুগ্রহ বলে। শীতবস্ত্র পরিধান না করিলেও শীত না লাগাকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বলে না। হে মন, তুমি যদি ভাবিয়া থাক যে পাপকার্য করিলে আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাস্তি দিবেন, এবং তজ্জন্য তোমার মনে এই ধারণা উদয় হইয়া থাকে যে, আমি পাপ করিলে আল্লাহ্র কি ক্ষতি যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাস্তি দিবেন? তবে তুমি ভুলে পতিত হইয়াছ। কেননা আল্লাহ্র ক্রোধের কারণে শাস্তি হইবে না। বরং তোমার বাসনা-কামনাদি রিপুই তোমার মধ্যে দোযখের অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে। দেখ বিষ বা কোন ক্ষতিকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে লোকের শরীরে পীড়া জন্মে এবং তজ্জন্য কষ্টও ভোগ করিতে হয়। চিকিৎসক তদ্রূপ

বস্তু ভক্ষণে নিষেধ করেন বটে কিন্তু তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন-জনিত ক্রোধ সেই ব্যক্তির পীড়া ও কষ্টের কারণ নহে। হে নফ্স, তোমার বুদ্ধির উপর শত ধিক! তুমি দুনিয়ার ঐশ্বর্য ও ভোগসম্ভোগের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ এবং সংসারের প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছ। উহা ব্যতীত অন্য কিছুই তোমাকে আল্লাহ্ হইতে ভুলাইয়া রাখে নাই।

হে হতভাগ্য, বেহেশ্ত ও দোযখের প্রতি যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে তবে মৃত্যু যে অবশ্যই ঘটিবে, এই বিশ্বাস ত নিশ্চয়ই আছে। তুমি যখন মরিবে তখন দুনিয়ার সমস্ত ধনৈশ্বর্য ও সুখসম্ভোগ তোমা হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইবে। তখন তৎসমুদয়ের বিচ্ছেদের অগ্নি তোমার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিবে। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য, তদনুযায়ী কার্য করা না করা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তোমার ইচ্ছানুযায়ী দুনিয়ার মহব্বত স্বীয় অন্তরে প্রবল ও মযবুত করিয়া লইতে পারে। তবে এতটুকু জানিয়া রাখ যে, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি যে পরিমাণে বলবান হইবে, বিচ্ছেদ-যাতনা সেই পরিমাণে তীব্র হইয়া উঠিবে।

হে মন, আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়েত করুন। সংসারের পশ্চাতে দৌড়িয়া তুমি কেন ধ্বংস হইতে চলিয়াছ? সসাগরা ধরার আধিপত্য যদি তুমি লাভ কর এবং সমস্ত জগত যদি তোমাকে সিজদা করিতে তাকে তথাপি অল্প দিনের মধ্যেই তুমি ও তৎসমুদয় মাটিতে মিশিয়া যাইবে। পূর্ববর্তী নরপতিগণ যেমন এখন বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ তোমার নাম-নিশানাও থাকিবে না। আবার সসাগর ধরার আধিপত্যও তুমি লাভ করিবে না, ইহার সামান্য অংশই হয়ত তোমার ভাগ্যে ঘটিবে। যতটুকু তুমি পাইবে তাহাও অপবিত্র, বিধ্বস্ত ও ক্ষণভঙ্গুর। এমন সাংসারিক রাজত্বের বিনিময়ে চিরস্থায়ী এবং অতি মনোরম বেহেশ্ত তুমি কিরূপে বিক্রয় করিতে পার? হে মন, ইহা বিশেষ বিবেচনা করিবার বিষয়—যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী বহুমূল্য হীরকের পরিবর্তে মাটির ভাঙ্গা পেয়ালা খরিদ করে তাহার প্রতি তোমরা কিরূপ উপহাস কর? সমস্ত জগত মাটির ভাঙ্গা পেয়ালাসদৃশ। জানিয়া রাখ, এই পেয়ালা অকস্মাৎ তোমার হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। পরকালের অনন্ত সৌভাগ্য চিরস্থায়ী বহুমূল্য হীরকতুল্য। পরকালের সেই সৌভাগ্যের বিনিময়ে এই ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিক সুখ গ্রহণ করিলে এবং মৃত্যুকালে ইহাও ফেলিয়া পরলোকে গমন করিলে ও তথাকার অপরিসীম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিলে তজ্জন্য

কেবল ভীষণ অনুতাপ ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

ফলকথা, এই প্রকারে স্বীয় প্রবৃত্তিকে সর্বদা উপদেশ সহকারে তিরস্কার করিতে থাকিবে। তাহা হইলে নিজ কর্তব্য সম্পন্ন হইবে। আবার অপরকে উপদেশ দিবার পূর্বে নিজকেই উপদেশ দিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধু-চিন্তা (তাফাক্কুর)

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ –

অর্থাৎ "এক ঘণ্টাকালের সাধু-চিন্তা এক বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।" আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফের বহু স্থানে তাফাক্কুর, তাদাব্বুর, নযর ও ই'তিবারের আদেশ দিয়াছেন। এই চারটি শব্দই প্রায় সমার্থবোধক। এই চারিটি কার্যের প্রকৃত অর্থ সৎবিষয় লইয়া চিন্তা করা। লোকে যে-পর্যন্ত সাধু-চিন্তার পূর্ণ পরিচয় ও অবস্থা জানিতে না পারে এবং কোন বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে হয়, সেই বিষয় কি প্রকার ও তাহা অবলম্বনে চিন্তা করিলে কি লাভ হয়, এই সকল বিষয় বুঝিতে না পারে, সেই পর্যন্ত ইহার ফযীলত জানিতে পারে না। এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা প্রথমে ইহার ফযীলত বর্ণনা করিব; পরে ইহার পরিচয় দিব; তৎপর কি উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতে হয়, তাহা বলিব এবং পরিশেষে যে বিষয়বস্তু অবলম্বনে চিন্তা করিতে হয়, তাহার সন্ধান দিব।

সাধু-চিন্তার ফযীলত –যে-কাজ এক ঘণ্টা করিলে সারা বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়, সেই কাজটির মরতবা কত উচ্চ ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"কতক লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব লইয়া চিন্তা করিতেছিল। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন–"তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা কর, তাঁহার অস্তিত্ব অবলম্বনে চিন্তা করিও না। কারণ সেই তেজ তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না এবং তাঁহার মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিবে না।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন এবং রোদন করিতেছিলেন। আমি নিবেদন

করিলাম-"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ ত আপনাকে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিই দিয়াছেন, তথাপি আপনি রোদন করেন কেন?' তিনি বলিলেন-'আমি কিরূপে রোদন না করিয়া থাকিতে পারি? আমার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে-

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবারাত্রের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।" (সূরা আলে ইমরান, ২০ রুকূ, ৪ পারা।) তৎপর তিনি বলিলেন-'এই আয়াত যে-ব্যক্তি পাঠ করে অথচ উক্ত বিষয়সমূহ লইয়া চিন্তা করে না তাহার জন্য আফসোস।"

হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল-"হে রূহুল্লাহ দুনিয়াতে আপনার ন্যায় আর কেহ আছে কি?" তিনি বলিলেন-"হাঁ, আছে; যাহার প্রত্যেক বচনই আল্লাহ্‌র যিকির এবং নীরবতা কেবল সদ্ভাব চিন্তনে ব্যয়িত হয় ও প্রত্যেক দৃষ্টিপাত হইতেই উপদেশ লাভ হয়, সেই ব্যক্তি আমার সমতুল্য।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন-"তোমার স্বীয় চক্ষুকে ইবাদতে অংশগ্রহণ করিতে দাও।" সাহাবাগণ (র) নিবেদন করিলেন— "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কিরূপে দিব?" তিনি বলিলেন—"কুরআন শরীফ দেখিয়া পাঠ কর, ইহার মর্ম লইয়া গভীরভাবে চিন্তা কর এবং ইহার অভিনব বিষয়বস্তু হইতে উপদেশ গ্রহণ কর, তবেই তোমার চক্ষু ইবাদতে অংশ গ্রহণ করিল।" হযরত আবু সুলায়মান দারানী (র) বলেন-"পার্থিব বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে পরকালের বিঘ্ন ঘটে। পক্ষান্তরে পরকালের বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে আত্মা সঞ্জীবিত হয় ও জ্ঞানের পথ খুলিয়া যায়।"

হযরত দাউদ তায়ী (র) একদা রাত্রিকালে স্বীয় গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া গগনমণ্ডলের বিষয় অবলম্বনে চিন্তামগ্ন হইয়া রোদন করিতেছিলেন। রোদন করিতে করিতে অচেতন হইয়া তিনি প্রতিবেশীর আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন। প্রতিবেশী চোর আসিয়াছে বিবেচনায় তলওয়ার খুলিয়া অগ্রসর হইল এবং তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল-"আপনাকে কে ফেলিয়া দিল?" তিনি বলিলেন-"আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই বলিতে পারি না।"

সাধু-চিন্তার পরিচয়-'তাফাক্কুর' শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞান অনুসন্ধান করা অর্থাৎ নূতন জ্ঞান লাভের উপায় অবলম্বন করা।

নূতন নূতন জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা-যে-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ নহে তাহা পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত অর্জন করা অসম্ভব। কোন নূতন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পূর্বসঞ্চিত দুইটি জ্ঞান একত্রে সংযোগ করা আবশ্যক। তাহাতে দুই জ্ঞানের মিলনে একটি নূতন তৃতীয় জ্ঞান জন্মলাভ করিতে পারে। নরনারীর একত্র মিলনে যেমন সন্তান জন্মে, জ্ঞান উৎপত্তির নিয়মও ঠিক তদ্রূপ। যে-দুই মূল জ্ঞানের সংযোগে নব জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহাদিগকে সেই নবজাত তৃতীয় জ্ঞানের দুইটি মূল বলা যায়। উক্ত নবজাত তৃতীয় জ্ঞানের সঙ্গে অপর একটি জ্ঞান মিলাইয়া দিলে অন্য একটি চতুর্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। এইরূপ একটি জ্ঞানের সহিত অপর জ্ঞান ক্রমশ মিলাইতে থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান-বংশ অসীমরূপে বর্ধিত হইয়া পড়ে।

জ্ঞানার্জনে অক্ষমতার কারণ-কোন কোন লোক তদ্রূপ জ্ঞান অর্জন করিতে পারে না। ইহার দুইটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ-নূতন নূতন জ্ঞানোৎপাদক মৌলিক জ্ঞানের অভাব। বণিক যেমন মূলধন বা পাইলে ধন উপার্জন করিতে পারে না, তদ্রূপ মৌলিক জ্ঞানরূপ মূলধন না পাইলে কেহই নূতন জ্ঞান অর্জন করিতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ-মৌলিক জ্ঞান অর্জিত হইলেও অনেকে দুই দুইটি জ্ঞানকে একত্র মিলাইবার কৌশল না জানাতে নূতন জ্ঞান অর্জন করিতে পারে না। যেমন, যে-ব্যক্তি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কৌশল না জানে তাহার প্রচুর মূলধন থাকিলেও সে ধনোপার্জনে অক্ষম হয়।

জ্ঞানার্জনে অক্ষমতার বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃত। তথাপি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 'দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল উৎকৃষ্ট' এই কথাটি যে-ব্যক্তি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চায় তাহাকে তৎপূর্বলব্ধ দুইটি জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। তন্মধ্যে একটি-'যাহা স্থায়ী তাহা অস্থায়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট'; অপরটি-'পরকাল স্থায়ী এবং দুনিয়া অস্থায়ী'। এই দুইটি জ্ঞান যদি পূর্ব হইতেই সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদিগকে একত্র মিলন করা যায় তবেই 'দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল উৎকৃষ্ট' এই জ্ঞানটি অতি সহজেই মনে জন্মিবে। কিন্তু উক্ত দুইটি জ্ঞান পূর্ব হইতে সঞ্চিত না থাকিলে শেষোক্ত জ্ঞানটি কখনই জন্মিতে পারে না। এস্থলে যাহা বর্ণিত হইল তাহাতে আমরা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের

মতের পোষকতা করিতেছি না। যাহাই হউক, এই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাও অত্যন্ত বিস্তৃত।

ফলকথা, পূর্বলব্ধ দুইটি জ্ঞানের মিলনে হৃদয়ে যে অপর একটি নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, সেই জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই তাফাক্কুরের বাস্তবিক অর্থ। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঘোটক-ঘোটকীয় সংযোগে যেমন অশ্ব শাবকই জন্মে, ছাগশিশু উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ সমশ্রেণীস্থ জ্ঞানের মিলনে সেই জাতীয় জ্ঞান পাওয়া যায়—এক জাতীয় দুই জ্ঞানের মিলনে ভিন্ন জাতীয় জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। আবার বিভিন্ন রকমের দুই জ্ঞান হইতে কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জ্ঞানলাভের জন্য সেই জাতীয় দুইটি মূল জ্ঞান একত্র করা আবশ্যক। অভিলষিত জ্ঞানের সমশ্রেণীর দুইটি মূল জ্ঞান যে-পর্যন্ত হৃদয়ে একত্র করিতে না পারিবে, সেই পর্যন্ত বাঞ্ছিত জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা হৃদয়ে জন্মিবে না।

সাধু-চিন্তার উদ্দেশ্য—আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে অন্ধকার ও অজ্ঞানতার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্যই তাহার একটি আলোকের আবশ্যক যাহাতে সেই আলোকের সাহায্যে সে অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া স্বীয় গন্তব্যপথ অবলম্বন করিতে পারে এবং ইহারই প্রভাবে জানিতে পারে—তাহাকে কোন্ কাজ করিতে হইবে, কোন পথ দিয়া চলিতে হইবে—পার্থিব পথ দিয়া চলিতে হইবে না পারলৌকিক পথ দিয়া? কাহার প্রতি আসক্ত হইতে হইবে? নিজের প্রতি আসক্ত হইবে কি আল্লাহ্র প্রেমে তন্ময় হইয়া থাকিতে হইবে? জ্ঞানের আলোক ব্যতীত মানব এই সমস্ত কথা জানিতে পারে না এবং তাফাক্কুর ব্যতীত জ্ঞানালোক লাভ করা যায় না; যেমন হাদীস শরীফে উক্ত আছে—

خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ –

অর্থাৎ "অন্ধকারের মধ্যে মানবকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তৎপর তাহার উপর আল্লাহ্র নূরের ছিটা বর্ষিত হইয়াছে।"

পথিক অন্ধকারে পড়িলে যখন দিশাহারা হইয়া চলিতে পারে না, তখন সে লৌহদ দ্বারা চক্‌মকি পাথর ঠুকিয়া অগ্নি উৎপাদন করত প্রদীপ জ্বালিয়া লয়। প্রদীপ জ্বালিলে আলোকের সাহায্যে সে যেমন চতুষ্পার্শ্বের অবস্থা দেখিতে পায়, কষ্টকর অবস্থা দূরীভূত হয়; কোন্‌টি সুপথ ও কোনটি বিপথ নির্বাচন করিয়া লইতে পারে এবং সরল পথ অবলম্বনে নিরাপদে চলিয়া যাইতে পারে, মানবের

অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। সে অন্ধকারময় দুনিয়াতে পতিত হইয়া কি করিবে, কোন্ দিকে যাইবে, বুঝিয়া উঠিতে পারে না। নিরাপদে সুখের স্থানে পৌঁছিবার জন্য তাহারও একটি আলোকের নিতান্ত আবশ্যক। 'যাহা স্থায়ী তাহা অস্থায়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট' এবং 'পরকাল স্থায়ী এবং দুনিয়া অস্থায়ী' এই দুইটি জ্ঞানের একটি প্রস্তর ও অপরটি লৌহদণ্ড সদৃশ। তাফাক্কুর (চিন্তা) প্রস্তরোপরি লৌহদণ্ডের আঘাতসদৃশ এবং চিন্তাসম্ভূত জ্ঞান আঘাতে উৎপন্ন আলোকতুল্য। এইরূপ আলোকপ্রাপ্ত হইলেই মানবের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তৎসঙ্গে তাহার কার্যকলাপেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, যখন সে বুঝিতে পারে যে, দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল উৎকৃষ্ট তখন দুনিয়া হইতে পরান্মুখ হইয়া পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে।

সাধু-চিন্তা সর্ববিধ সৎকর্মের মূল কারণ—উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, সাধু-চিন্তা হইতে মারিফাত (পরিচয়-জ্ঞান), হালাত (অবস্থা) এবং আমলের উৎপত্তি হয়। যেমন, পরজগত স্থায়ী, আর ইহজগত অস্থায়ী—এই দুইটি মৌলিক জ্ঞানকে সংযোগ করাই হইল তাফাক্কুর বা সাধু-চিন্তা। এই সংযোজনার ফলে 'পরকাল ইহকাল হইতে উত্তম' এই কথাটি আমরা জানিতে পারি। ইহাই হইল মারিফাত বা পরিচয়-লাভ। এই পরিচয়-লাভের ফলে আমাদের অন্তরে ইহকালের প্রতি অনাকর্ষণ ও পরকালের প্রতি আকর্ষণের উৎপত্তি হইবে। ইহাই হইল হালাত বা অবস্থা। এই অবস্থার ফলে আমরা পরকালের চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে বদকাজ বর্জন করত নেককাজে মনোনিবেশ করি। ইহাই হইল আমল বা কাজ। ইহা হইতেই তাফাক্কুরের ফযীলত প্রতিপন্ন হয়। কেননা, তাফাক্কুরই হইল সর্ববিধ সৎকর্মের কারণ বা কুঞ্জী।

তাফাক্কুরের পটভূমি—তাফাক্কুরের পটভূমি নিতান্ত প্রশস্ত। কারণ, জ্ঞানের কোন সীমা নাই। দুনিয়ার প্রত্যেক পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা করিলে নব নব জ্ঞানের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু যে সকল বিষয় ধর্মপথের সহিত সম্বন্ধ রাখে না, তৎসমুদয়ের ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল ধর্মপথের সহিত সম্পর্কিত বিষয় বর্ণিত হইবে। ইহার ব্যাখ্যাও নিতান্ত বিস্তৃত; তথাপি ইহাকে কয়েকটি ভাগে বিভিক্ত করিয়া তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে।

যে-সকল ব্যবহার বা কার্য আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহাকেই এস্থলে আমরা ধর্মপথ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। কেননা যে-পথ অবলম্বন করিলে মানব আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে একমাত্র ইহাই তাহার গন্তব্যপথ।

ধর্মপথ-সম্পর্কিত চিন্তার পটভূমির বিভাগ—মানুষের চিন্তার পটভূমি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—নিজের সম্বন্ধে ও আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে। আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে চিন্তার পটভূমিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) তাঁহার 'যাত ও সিফাত' অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব ও গুণাবলী লইয়া চিন্তা করা এবং (খ) আল্লাহ্‌র কার্যাবলী ও তাঁহার বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল অবলম্বনে চিন্তন। নিজের সম্বন্ধে চিন্তার পটভূমিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) নিজের সেই দোষসমূহ যাহা আল্লাহ্‌র অপ্রিয় ও যাহা হইতে মুক্ত না হইল আল্লাহ্ হইতে দূরবর্তী হইতে হয়। এইরূপ দোষগুলিকে পাপ ও ধ্বংসকর দোষ বলে। (খ) মানুষের কতকগুলি গুণ যাহা আল্লাহ্‌র প্রিয় ও যাহা কল্যাণে মানুষ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। এইগুলিকে পুণ্য ও পরিত্রাণকারী গুণ বলে। অতএব চিন্তার পটভূমি উপরিউক্ত চারি ভাগে বিভক্ত হইল।

ধর্মপথ যাত্রীর সহিত প্রেমাসক্ত ব্যক্তির তুলনা—ধর্মপথ-যাত্রীর অবস্থা প্রেমাসক্ত ব্যক্তির তুল্য। প্রেমাসক্ত ব্যক্তির চিন্তা প্রিয়জনের দিক ভিন্ন অন্যদিকে ধাবিতই হয় না। তাহার মন অন্যদিকে ধাবিত হইলে তাহার প্রেমকে প্রকৃত পূর্ণ প্রেম বলা চলে না। প্রেমের পূর্ণ উন্নতি হইলে ইহা এইরূপে প্রেমিকের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া জুড়িয়া বসে যে, সেই হৃদয়ে অপর কিছু প্রবেশের স্থান থাকে না। প্রেমিক হয়ত প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অথবা তাহার গুণ ও কার্যাবলী চিন্তনে নিমগ্ন থাকে। প্রেমিক নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এবং সদ্‌গুণরাজির দিকে লক্ষ্য করে যাহা তাহাকে প্রেমাস্পদের নিকট অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলে এবং সেই সদ্‌গুণসমূহ অর্জনে প্রবৃত্ত হয়, অথবা প্রেমাস্পদের অপ্রিয় দোষসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া উহা বর্জনের চষ্টা করে। প্রেমাসক্ত লোকের চিন্তার পটভূমি যেমন চারিভাগে বিভক্ত, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমাসক্ত ধর্মপথ যাত্রীর চিন্তার ময়দান তদ্রূপ চতুর্বিধ।

ধর্মপথ-সম্পর্কিত চিন্তার প্রথম পটভূতি—নিজের স্বভাব ও কার্য সম্বন্ধে দোষগুণ চিন্তন। সর্বপথমে চিন্তা ও অনুসন্ধান করা কর্তব্য যে, নিজের স্বভাবে কোন্ কোনটি মন্দ এবং কার্যাবলী মধ্যে কোন্ কোনটি দুষণীয়। মন্দ বা দুষণীয় কিছু থাকিলে তাহা হইতে নিজকে পবিত্র করিতে হইবে। এইগুলি প্রকাশ্য পাপ ও গুপ্ত মন্দ স্বভাব। পাপ ও মন্দ স্বভাব অসংখ্য। পাপের মধ্যে কতকগুলি কার্য সপ্ত অঙ্গের সাহায্যে করা হয়; যথা—রসনা, চক্ষু, হস্তপদ ইত্যাদি, এবং কতকগুলি কার্য সমস্ত দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখে। অন্তরের মন্দ স্বভাবসমূহের অবস্থাও ঠিক এইরূপ।

কার্য ও স্বভাব অবলম্বনে চিন্তার ত্রিবিধ ধাপ— কার্য ও স্বভাব অবলম্বনে চিন্তা করিবার তিনটি ধাপ আছে; যথা— (১) অমুক কাজ বা স্বভাব ভাল কি মন্দ অনুসন্ধান করিয়া দেখা। চিন্তা ব্যতীত ইহা বুঝা যায় না (২) ঐ প্রকার মন্দ কার্য আমি করিতেছি কিনা এবং ঐ প্রকার মন্দ স্বভাব আমার মধ্যে আছে কিনা অনুসন্ধান করা। প্রবৃত্তির দোষগুণও চিন্তা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা যায় না। (৩) নিজের মধ্যে যে যে মন্দ স্বভাব আছে বলিয়া বুঝা যায়, উহা বিদূরিত করিবার উপায় চিন্তার প্রভাবে স্থির করিয়া লওয়া। সুতরাং প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিছুক্ষণ ঐ প্রকারে আত্মপরীক্ষার জন্য চিন্তা করা আবশ্যক।

আত্মপরীক্ষার জন্য চিন্তার ধারা—প্রথমে প্রকাশ্য পাপ সম্বন্ধে চিন্তা করিবে। এইজন্য এক একটি কর্মেন্দ্রিয় লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক; যথা—অদ্য আমার রসনা হইতে কিরূপ কথা নিঃসৃত হইবে। হয়ত গীবত ও মিথ্যা কথনে লিপ্ত হইয়া পড়িব। অতএব উহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা চিন্তার সাহায্যে অবধারণ করিতে হইবে। এইরূপ হারাম ভক্ষণের কোন আশঙ্কা দেখা দিলে তাহা হইতে বাঁচিবার উপায় চিন্তাপূর্বক স্থির করিয়া লইতে হইবে। ফলকথা, রসনা দ্বারা যে-সকল পাপ ঘটিতে পারে, একে একে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান করত অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয় লইয়া বিচার আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে যে পাপ সংঘটিত হইতে পারে, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান করত উহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় অবলম্বন করিবে। পাপ লইয়া চিন্তা করিবার পর কোন্ কোন্ অঙ্গ দ্বারা কি কি ইবাদত করা যাইতে পারে তাহাও অনুসন্ধান করিয়া উহা সম্পাদনে তৎপর হইবে। ইবাদত সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও চিন্তার পর কোন্ কোন্ অঙ্গ দ্বারা কিরূপ অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ করা যাইতে পারে তাহা চিন্তা করিবে এবং তৎসমুদয় কাজও সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে।

কর্মেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা কিরূপে অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ করা যাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত এই—মনে মনে চিন্তা করিবে, আল্লাহ্‌র যিকির ও মঙ্গলজনক প্রীতিকর কথা বলিয়া অপরকে শান্তি প্রদানের জন্য রসনার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি অমুক যিকির করিতে পারি এবং অমুকের শান্তির জন্য আমি অমুক সুকথা বলিতে সমর্থ। চক্ষুকে ধর্মের ফাঁদস্বরূপ বানানো হইয়াছে যেন ইহার সাহায্যে সৌভাগ্যরূপ শিকার ধরিয়া লইতে পারি এবং অমুক আল্লাহ্‌র প্রিয় আলিমের প্রতি ভক্তিসহকারে দৃষ্টিপাত করিতে ও ফাসিকের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে

অবলোকন করিতে পারি। তাহা হইলে চক্ষের কর্তব্য সম্পন্ন হইবে। মুসলমানগণের আরাম সাধনের জন্য ধন সৃষ্ট হইয়াছে। এই ধন অমুক ব্যক্তিকে দান করিতে পারি এবং নিজ কার্যে ব্যয় না করিয়া অপরের অভাব মোচনে ব্যয় করিতে পারি। এইরূপ এবং এই ধরনের চিন্তা প্রত্যহ করিলে হয়ত এক ঘণ্টার চিন্তার ফলে হৃদয়ে এমন সুপ্রভাব উৎপন্ন হইতে পারে যাহা মানবকে চিরজীবন পাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। এইজন্যই এক ঘণ্টার চিন্তাকে সারা বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। কেননা ইহার ফল যাবজ্জীবন স্থায়ী থাকে।

প্রকাশ্য ইবাদত ও পাপ লইয়া চিন্তা করিবার পর অন্তরের দিকে মনোনিবেশ করিবে। তোমার হৃদয়ে কোন্ কোন্ ধ্বংসকর মন্দ স্বভাব আছে এবং পরিত্রাণকারী সদ্‌গুণের মধ্যে কোন্ কোনটি নাই, তাহা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। মন্দ স্বভাবের মধ্যে যেগুলি দেখিতে পাইবে সংশোধন করিবে এবং যে সদ্‌গুণের অভাব দেখিবে তাহা অর্জনে তৎপর হইবে। মন্দ স্বভাব ও সদ্‌গুণ বহু এবং তৎসমুদয় লইয়া চিন্তা করিবার পথও নিতান্ত বিস্তৃত। কিন্তু মূল ধ্বংসকর মন্দ স্বভাব দশটি; যথা (১) কৃপণতা (২) অহংকার (৩) আত্মশ্লাঘা (৪) রিয়া (৫) ঈর্ষা (৬) ক্রোধ (৭) ভোজন-লিপ্সা (৮) অতিরিক্ত কথনের লোভ (৯) ধন-লালসা এবং (১০) সম্মান-লিপ্সা। এই দশটি মূল দোষ হইতে অব্যাহতি পাইলে লোকে বিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তদ্রূপ পরিত্রাণকারী মূল সদ্‌গুণও দশটি; যথা- (১) তওবা (২) সবর (৩) আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তোষ (৪) কৃতজ্ঞতা (৫) আল্লাহ্‌র ভয় (৬) আল্লাহ্‌র রহমতের আশা (৭) সংসার-বিরাগ (৮) ইখলাস (একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইবাদত করা) (৯) সর্বজীবের সহিত সদ্ব্যবহার এবং (১০) আল্লাহ্‌র মহব্বত।

উপরিউক্ত দোষ ও গুণ লইয়া চিন্তা করিতে গেলে চিন্তারাজ্যের অসীম ময়দান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। চিন্তার এবংবিধ পথ সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত হয় না। তবে এই সকল দোষ-গুণের পরিচয় এই গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয় যাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, কেবল তদ্রূপ লোকের সম্মুখে সাধুচিন্তার পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক ধর্মপথ-যাত্রীর জন্য উক্ত দশটি গুণের একট তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিজের নিকট রাখা আবশ্যক। তন্মধ্যে যে গুণটি অর্জিত হইয়া যায় ইহাতে একটি রেখাপাত করিয়া অপর একটি গুণ অর্জনে তৎপর হইতে হইবে। নিজের

ঐ সকল দোষ-গুণ লইয়া চিন্তা করিবার কালে কাহারও পক্ষে হয়ত কোন বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ সেই ব্যক্তি কোন বিশেষ দোষে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, কোন একজন পরহেযগার আলিম সমস্ত মন্দ স্বভাব হইতে নিস্তার পাইয়াছে, কিন্তু স্বীয় ইলমের জন্য বড়াই করেন; লোকের নিকট নিজের ইবাদত ও বাহ্য আকার প্রকার সাজাইয়া রাখেন; লোকে আলিম বলিয়া ভক্তি করিলে আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিলে নিন্দুকের প্রতি তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। এই সমস্ত ভাবই অন্তরের গোপনীয় দোষ এবং ধর্মজীবনের নিতান্ত অনিষ্টকর। তদ্রূপ আলোকে প্রত্যহ চিন্তা করা আবশ্যক, কি উপায়ে এই সমস্ত দোষ দূর করিয়া নিজকে রক্ষা করিতে পারা যায় এবং তাহার নিকট লোকের প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সমান হইয়া পড়ে ও দৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এই সকল বিষয়ে চিন্তার ময়দান নিতান্ত প্রসারিত। অতএব বুঝা গেল যে, মানব নিজের দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করিতে বসিলে দেখিতে পাইবে যে, তদ্রূপ চিন্তার একটি অসীম ময়দান এবং এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভব নহে। এইজন্য কলম সংযত করিলাম।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে চিন্তা—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী অবলম্বনে চিন্তার ময়দান অত্যন্ত প্রশস্ত। কিন্তু মানব এই চিন্তা করিতে অক্ষম এবং তাহাদের বুদ্ধিও তত উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। এইজন্যই আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত (অস্তিত্ব ও গুণাবলী) লইয়া চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া হাদীস শরীফে উক্ত আছে—"আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত লইয়া চিন্তা করিও না; কারণ তোমরা তাহার যথার্থ মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইবে না।" মনে করিও না যে, আল্লাহ্‌র অপ্রতিহত প্রতাপ ও গৌরব গুপ্ত আছে বলিয়া লোকে তাহার যথার্থ মর্যাদা বুঝিতে অক্ষম; বরং তাহার জ্যোতি এতই উজ্জ্বল ও প্রখর যে, দুর্বল মানব তাহা সহ্য করিতে পারে না। এইজন্যই তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে মানব বেহুঁশ ও দিশাহারা হইয়া পড়ে। দেখ, চামচিকা দিনের বেলা বাহির হয় না; ইহার কারণ এই যে, ইহার দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত দুর্বল, সূর্যের প্রখর জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না। এইজন্য দিবাভাগে সূর্যের দিকে ইহারা দৃষ্টিপাত করে না; বরং সন্ধ্যাকারে সূর্য অস্ত গেলে সামান্য আলোকরশ্মি অবশিষ্ট থাকিলে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। সাধারণ লোকের অবস্থাও ঠিক চামচিকাসদৃশ। তাহারাও

আল্লাহ্র এত উজ্জ্বল জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না। কেবর সিদ্দীক ও বুযুর্গগণই উহা দর্শনের ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারাও সর্বদা দেখিবার ক্ষমতা রাখেন না। সর্বদা আল্লাহর জ্যোতি দর্শন করিতে গেলে তাঁহাদেরও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। মানুষ যেমন সূর্যের দিকে তাকাইলে অন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তদ্রূপ আল্লাহ্র জ্যোতির দিকেও সর্বদা তাকাইলে মানুষ হতজ্ঞান ও পাগল হইয়া যাইতে পারে।

যাহাই হউক, আল্লাহ্র গুণরাজির যতটুকু আভাস বুযুর্গগণ পাইয়া থাকেন তাহাও সাধারণ লোকের সম্মুখে বর্ণনা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যে সমস্ত কথায় মানুষের গুণেরও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় তদ্রূপ উক্তি দ্বারা আল্লাহ্র গুণ বর্ণনা করার অনুমতি আছে, যথা–আল্লাহ জ্ঞানময়, ইচ্ছাময় এবং বাক-শক্তিমান। এইরূপ কথা বলিলে নিজ গুণের সমজাতীয় ভাবিয়া সাদৃশ্যের, সাহায্যে যৎসামান্য বুঝিয়া লইতে পারে। তবে আল্লাহ্র তদ্রূপ গুণ বর্ণনাকালে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিতে হইবে যে, আল্লাহ্র কথা মানুষের কথার ন্যায় অক্ষরে প্রকাশিত বা ধ্বনিময় নহে এবং তাঁহার বাক্যে সংযুক্তি বা অসংযুক্তি কিছু নাই। কিন্তু এই কথা বলিলে মানুষ হয়ত বুঝিতে পারিবে না এবং অবিশ্বাস করিয়া বসিবে ও ভাবিবে আল্লাহ্র বাক্য বিনা-অক্ষরে ও বিনা-ধ্বনিতে কিরূপে হইতে পারে? এইরূপ তুমি যদি মানুষকে জানাও যে, আল্লাহ্র অস্তিত্ব তোমাদের অস্তিত্বের ন্যায় নহে। কারণ, তিনি কোন পদার্থও নহেন; তিনি কোন স্থানের মধ্যে নহেন; আবার গুণাধার পদার্থও নহেন; তিনি কোন স্থানের মধ্যে নহেন, বা কোন স্থানের উপরেও নহেন; দিকের সহিত তাঁহার কেনা সংশ্রব নাই। জগতের সহিত তিনি সংযুক্তও নহেন আবার পৃথকও নহেন; তিনি জগতের ভিতরেও নহেন আবার বাহিরেও নহেন। এই সমস্তও তুমি হয়ত অসম্ভব ভাবি-য়া অবিশ্বাস করিয়া বসিবে। কারণ, আল্লাহ্র অস্তিত্বকে তুমি স্বীয় অস্তিত্বের ন্যায় অনুমান করিয়া তাহার অসীম গৌরব ও অনন্ত প্রতাপ বুঝিতে পার না। লোকে মানব সমাজে কেবল সম্রাটের গৌরব ও প্রতাপ দেখিয়া থাকে–সম্রাট উচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং গোলামগণ তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকে। সুতরাং আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ বুঝিবার সময়ও উক্ত পরিজ্ঞাত রাজসভার প্রত্যেক বিষয় ও পদার্থের সাদৃশ্যে আল্লাহ্র সম্বন্ধে সেইরূপ একটা অসম্ভব কল্পনা আঁকিয়া লয় এবং মনে করে নিশ্চয়ই পার্থিব সম্রাটের ন্যায় আল্লাহ্র হস্ত-পদ, চক্ষু, মুখ, রসনা আছে। কেননা লোকে নিজের

মধ্যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে দেখিয়া মনে করে, আল্লাহ্র মধ্যে এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না থাকা ত্রুটির বিষয়। মাছিরও এইরূপ সাধারণ লোকের ন্যায় বুদ্ধি থাকিলে ইহারাও মনে করিত, অবশ্যই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্রও পাখা এবং পালক আছে; কেননা যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের বল ও স্বচ্ছন্দতার কারণ, সেই সমস্ত আল্লাহ্র না থাকা অসম্ভব কথা। এইরূপ মানুষও প্রত্যেক বিষয় নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া অনুমান করে। এইজন্যই আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলী লইয়া চিন্তা করা শরীয়তে নিষেধ আছে।

প্রাচীন বুযুর্গগণ আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণের সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ জগতের ভিতরেও নহেন, বাহিরেও নহেন; তিনি জগতের সহিত সংযুক্তও নহেন, আবার পৃথকও নহে'–এই কথা পরিষ্কারভাবে বলাও তাঁহারা সঙ্গত মনে করেন নাই। বরং তাঁহারা কুরআন শরীফের এই কথা বলিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতেন–لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ "কোন বস্তু তাঁহার তুল্য নহে।" (সূরা শুরা, ২ রুকূ, ২৫ পারা)

কোন বস্তু আল্লাহ্র তুল্য নহে এবং তিনিও কোন বস্তুর তুল্য নহেন। তাঁহারা সংক্ষেপ এই কথা বলিয়াই চুপ থাকিতেন–সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিতেন না। তাঁহারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে খুলিয়া বর্ণনা করাকে বি'দআত মনে করিতেন। কারণ এই যে, অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি উহার বিস্তৃত বিবরণ ও অর্থ অনুধাবন করিতে অক্ষম। এই কারণেই কোন কোন পয়গম্বরের (আ) উপর ওহী নাযিল হইয়াছিল–"আমার বান্দাগণের নিকট আমার গুণের পরিচয় খুলিয়া বলিও না; কারণ তাঁহারা অবিশ্বাস করিতে পারে। তাহারা যতটুকু বুঝিবার শক্তি রাখে তাহাদের সঙ্গে তদ্রূপ কথা বল।"

যাহাই হউক, কামিল বুযুর্গগণ ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণাবলী লইয়া আলোচনা ও চিন্তা না করাই ভাল, এমন কি কামিল বুযুর্গগণও আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণ চিন্তা করিতে গিয়া চমকিত ও বুদ্ধিহারা হইয়া পড়েন। এইজন্য আল্লাহ্র বিস্ময়কর সৃষ্টিকৌশল দর্শনপূর্বক তাঁহার প্রতাপ ও গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লওয়া উচিত। কারণ, বিশ্বজগতে যাহা কিছু বর্তমান আছে, তৎসমুদয় তাঁহার অসীম মহত্ত্ব ও কুদরতের একটি আলোক হইতে প্রকাশিত। প্রখর প্রতাপবিশিষ্ট সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লোকে অক্ষম হইলেও ভূপৃষ্ঠে যে-কিরণ পরিব্যাপ্ত হইয়া পতিত হয়, ইহা দর্শন করিবার ক্ষমতা অবশ্যই তাহার আছে।

আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্টি-কৌশল বিষয়ক চিন্তা–বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর ও অদ্ভুত সৃষ্ট শিল্প পদার্থ। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ এমন কি আকাশ-পাতাল ও তদন্তর্গত প্রত্যেক বালুকা কণা পর্যন্ত নিজ নিজ ভাষায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতার স্তূতি পাঠ করিতেছে–তাঁহার পূর্ণ শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের বর্ণনা করিতেছে। ঐ সমস্ত বিস্ময়কর পদার্থ এত অসীম যে, তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বর্ণনা করা যাইতে পারে না। যদি জগতের সমস্ত জলাশয় ও সমুদ্রের পানি লিখিবার কালি হইত এবং সমস্ত বৃক্ষ-গুল্মাদি কলম হইত ও সমস্ত প্রাণী লিখক হইত এবং দীর্ঘ সময় ধরিয়া লিখিত তথাপি সৃষ্ট পদার্থে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র জ্ঞান, কৌশল ও ক্ষমতার প্রকৃত অবস্থা অতি সামান্যই লিখিতে পারিত। যেমন আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا –

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), আপনি বলিয়া দেন যে, যদি আল্লাহ্‌র মহিমাসমূহ লিখিবার জন্য সমুদ্র-পানি কালি হয় অবশ্যই তাঁহার মহিমা বাক্য সকল সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে সমুদ্রের পানি ফুরাইয়া যাইবে এবং যদি সমস্ত সমুদ্রের পানি পরিমিত আরও কালি আনিয়া দেই তাহাও ফুরাইয়া যাইবে। (সূরা কাহাফ, ১২ রুকূ, ১৬ পারা।)

সৃষ্ট পদার্থ মোটামুটি দুই প্রকার। ইহার মধ্যে এক প্রকার পদার্থের খবর আমরা আদৌ পাইতে পারি না। সুতরাং তৎসমুদয়ের চিন্তা আমরা কি প্রকারে করিতে পারি? যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُوْنَ –

অর্থাৎ "সব মহিমা আল্লাহ্‌র, যিনি সকল বস্তুর মধ্যে জোড়া পয়দা করিয়াছেন। যাহা যমীন হইতে উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে এবং মানুষের নিজেদের মধ্যে এবং যাহা তাহারা জানে না তাহার মধ্যেও।" (ইয়াসীন, ৩ রুকূ, ২৩ পারা।) আবার যে প্রকার পদার্থ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আছে, তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর পদার্থ আমরা দেখিতে পাই না,

যথা–আরশ, কুর্সী, ফিরিশতা, জিন ইত্যাদি। এইরূপ অদৃশ্য পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা করিবার ধরন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। যে সমস্ত পদার্থ আমরা দেখিতে পাই তৎসমুদয় লইয়া কি প্রকারে চিন্তা করিতে হয়, ইহার পন্থা দেখাইয়াই আমরা নিরস্ত হইব।

দৃশ্যমান পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা–দৃশ্যমান পদার্থ যেমন, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ পদার্থ যথা–পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নগর, ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ ও মণি-মাণিক্যাদি এবং ভূতলস্থ নানা প্রকার উদ্ভিদ লতা এবং জলচর স্থলচর খেচর ইতর জীবজন্তু হইতে বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানব পর্যন্ত সমস্ত পদার্থই চিন্তার বিষয়। এই সকলের মধ্যে মানব সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর। এতদ্ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ, রামধনু এবং যে নিদর্শনাবলী আকাশ ও বায়ুমণ্ডলে দেখা দেয় ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ, সকলই চিন্তার বিষয়। এই সমস্তই আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্ট পদার্থ। এই সকল পদার্থের কতকগুলি অবলম্বনে কিরূপে চিন্তা করিতে হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা দেওয়া হইতেছে। এই সমস্তই আল্লাহ্‌র নিদর্শন। এই সকলের প্রতি লক্ষ্যপূর্বক উহা লইয়া চিন্তা করিতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন; যেমন তিনি বলেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ –

অর্থাৎ "আকাশে ও ভূমণ্ডলে কত নিদর্শন রহিয়াছে যে উহার সম্মুখ দিয়া তাহারা যাতায়াত করিতেছে, অথচ তৎপতি তাহারা উদাসীন।" (সূরা ইউসুফ, ১২ রুকূ, ১৩ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ –

অর্থাৎ "তাহারা কি গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্বের প্রতি এবং প্রত্যেক বস্তু যাহা আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না?" (সূরা আরাফ, ২৩ রুকূ, ৯ পারা।) আল্লাহ্ পুনরায় বলেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা ও রাত্রির পরিবর্তনে অবশ্য বুদ্ধিমান লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।" সূরা আলে ইম্‌রান, ২০ রুকূ, ৪ পারা।) যাহাই হউক, এইরূপ আরও বহু নিদর্শন আছে। সেই সকল লইয়া চিন্তা করা কর্তব্য।

মানবদেহ অবলম্বনে চিন্তা–আল্লাহ্ তা'আলার ঐ অগণিত নিদর্শনের প্রথম নিদর্শন যাহা তোমার নিকটবর্তী তাহা তুমি নিজেই। বিশ্বজগতে তোমা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর আর কিছুই নাই, অথচ তুমি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে উদাসীন। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

অর্থাৎ "হে মানব, তোমরা নিজের সম্বন্ধে চিন্তা কর। তাহা হইলে আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও প্রতাপ তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।"

মানবদেহের উৎপত্তি ও বিকাশ– প্রিয় পাঠক, প্রথমে তুমি নিজের আদিম অবস্থার বিষয় চিন্তা কর–তুমি কোথা হইতে আসিলে? আল্লাহ তোমাকে এক বিন্দু পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পানি সর্বপ্রথমে পিতার পৃষ্ঠে ও মাতার বক্ষে তোমার জন্মের বীজস্বরূপ সংরক্ষিত ছিল। ইহার পর কামভাবকে মাতাপিতার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। নারীর জরায়ুকে ক্ষেত্রস্বরূপ এবং পুরুষের পৃষ্ঠস্থিত পানিকে বীজসদৃশ করা হইল। নরনারীর মনে কামভাব উত্তেজনা দিতে আরম্ভ করিলে পুরুষের পৃষ্ঠ ও নারীর বক্ষ হইতে শুক্র স্খলিত হইয়া বীজস্বরূপ জরায়ু ক্ষেত্রে গিয়া নিপতিত হইল। তৎপর ঋতু-রক্তবিন্দু দ্বারা এই বীজকে সিঞ্চন করা হইল। এইরূপে শুক্র-বিন্দু ও হায়েযের রক্ত দ্বারা তোমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সর্বপ্রথমে এই বীজ একটি জমাট রক্তখণ্ডে পরিণত হয়। পরে এই জমাট রক্ত মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করে। পরিশেষে ইহাতে জীবন সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয়। এখন ভাবিয়া দেখ, এক বিন্দু শুভ্র পানি ও লোহিত পানির মিশ্রণ হইতে তোমার মধ্যে কত বিভিন্ন পদার্থ. ধা- গোশ্ত, চর্ম, রগ, শিরা এবং অস্থি প্রস্তুত হইয়াছে। তৎপর এই সমস্ত দ্বারা তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার গঠিত হইয়াছে। মস্তক গোলাকার করা হইয়াছে

এবং হস্তপদ লম্বা করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। হস্তপদের প্রান্তভাগে পাঁচ পাঁচটি অঙ্গুলী বানানো হইয়াছে। এইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, জিহবা ইত্যাদি অঙ্গগুলি দেহের বহির্ভাগে সাজানো হইয়াছে এবং দেহের অভ্যন্তর ভাগে উদর, হৃদপিণ্ড, মূত্রাশয়, গুহ্য, জরায়ু ও নাড়ীভুঁড়ি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ–মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার ও গঠন বিভিন্ন প্রকার, গুণ ও উপযোগিতা পৃথক পৃথক এবং আয়তনও ভিন্ন প্রকার। আবার ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অঙ্গুলীকে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি গ্রন্থিযুক্ত করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন। গোশ্ত, চর্ম, রগ, শিরা ও অস্থিযোগে তিনি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সাজাইয়াছেন। তোমার চক্ষু-গোলক পরিমাণে ও আয়তনে একটি আখরোট অপেক্ষা বড় নহে; তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে সাতটি পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিটি বিভাগের কার্য ও উপযোগিতা পৃথক পৃথক। ইহাদের মধ্যে যদি এক ভাগও নষ্ট হইয়া যায়, তবে পৃথিবীর কোন পদার্থই তুমি দেখিতে পাইবে না। যাহাই হউক, কেবল চক্ষুর বিস্ময়কর অবস্থা এবং আশ্চর্যজনক কার্য বর্ণনা করিতে গেলেও এক বিরাট গ্রন্থ রচিত হইবে।

অস্থি–অনন্তর তোমার অস্থিসমূহের প্রতিও মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখ। এইগুলি নিতান্ত শক্ত হইলেও তরল পানি হইতে বানানো হইয়াছে। উহার প্রত্যেক জোড় ও টুকরার আকার, গঠন ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের–কোন হাড় গোলাকার, কোনটি লম্বা, কোনটি চওড়া, কোনটি শূন্যগর্ভ, আবার কোনটি ছিদ্রহীন। এই সমস্ত হাড় পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটির পরিমাণ, আকার ও গঠনের মধ্যে পৃথক পৃথক কৌশল রহিয়াছে, এমন কি বহু উদ্দেশ্য ও কৌশল নিহিত আছে। অস্থিসমূহকে তোমার দেহ-গৃহের স্তম্ভস্বরূপ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। অস্থিগুলি খণ্ডিত না করিয়া ও পরস্পর জোড় না লাগাইয়া যদি একটানাভাবে আস্ত প্রস্তুত করা হইত, তবে পিঠ ঝুঁকাইতে এবং মস্তক নত করিতে পারা যাইত না। আবার সেইগুলি খণ্ডিত হইলে অথচ পরস্পর জোড় লাগানো না হইলে পিঠ সোজা করিয়া পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়ানো যাইত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক খণ্ড হাড়ের সহিত শিরা ও স্নায়ু দ্বারা অপর এক খণ্ডের জোড় দেওয়া হইয়াছে। হাড়গুলির এক প্রান্তে চারিটি গোল বর্তুলাকৃতি দাঁত এবং অন্য প্রান্তে সেই দাঁত ঠিকরূপে বসিতে পারে এমন চারিটি

গর্তাকৃতি খাঁজ কাটা হইয়াছে। এক খন্ড হাড়ের প্রান্তস্থিত বর্তুল অন্য খণ্ডের প্রান্তস্থিত গর্তাকৃতি খাঁজের মধ্যে সুন্দরভাবে বসে। নত করিলে বা হেলাইলে ঐ অস্থিখণ্ডের এক প্রান্ত কনুই-প্রান্তের ন্যায় সামান্য বাহির হইয়া পড়ে। যাহাই হউক, স্নায়ু-সূত্র, মাংসপেশী, রগ এবং শিরা দ্বারা সেই খণ্ডের জোড়া মযবুতভাবে রাখা হইয়াছে। এইজন্য একেবারে স্থানচ্যুত হয় না।

মস্তক– এইরূপ তোমার মাথার খুলি পঞ্চান্নটি অস্থিখণ্ডের সংযোগে নির্মিত হইয়াছে। এই সমস্ত জোড় সূক্ষ্ম সেলাই দ্বারা টাঁকা আছে। এইরূপ জোড় থাকাতে খুলির এক অংশে কোন দুঃখ পাইলে অপর অংশ নিরাপদে থাকে এবং মস্তক সমস্ত ভাঙ্গিয়া যায় না।

দাঁত– দাঁতের সৃজন কৌশলের প্রতি লক্ষ্য কর। কতকগুলি দাঁতের মাথা বেশ চওড়া; উহার উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া চিবানো যায়। অপর কতকগুলি দাঁতের মাথা ছুরি ধারের ন্যায় পাতলা এই সকল দাঁতের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কর্তনপূর্বক পার্শ্বস্থ প্রশস্ত-মস্তক দাঁতের উপর চর্বণের জন্য স্থাপন করা হয়। ইহা দেখিয়া মনে হয় যেন খাদ্যদ্রব্য পিষিবার জন্য জাঁতির উপর দেওয়া হইতেছে।

গ্রীবা ও মেরুদণ্ড– তোমার গ্রীবা সাত খণ্ড অস্থি সংযোগে নির্মাণ করা হইয়াছে এবং শিরা, ধমনী ও স্নায়ুসূত্রে জড়াইয়া ইহাকে দৃঢ় করা হইয়াছে। তৎপর গ্রীবার উপরিভাগে মস্তক স্থাপন করা হইয়াছে। মেরুদণ্ড চব্বিশটি অস্থিখণ্ড সহযোগে নির্মিত হইয়াছে এবং ইহার উপর অংশে গ্রীবা রক্ষিত হইয়াছে। আবার লক্ষ্য করিয়া দেখ, পঞ্জরাস্থিসমূহ শলাকার ন্যায় কেমন কৌশলে মেরুদণ্ডের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সমস্ত অস্থিখণ্ড–তদ্রূপ আরও বহু অস্থি বিশেষ কৌশলের সহিত আল্লাহ্ তা'আলা নির্মাণ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এই সমস্তের বর্ণনা নিতান্ত বিস্তৃত। মোটের উপর কথা এই যে, তোমার দেহে দুই শত সাতচল্লিশটি অস্থি নির্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক অস্থিখণ্ড দ্বারা পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য ও কার্য সুকৌশলে সাধিত হইয়াছে। এই সমস্ত এক বিন্দু তরল পানি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ঐ অস্থিসমূহের মধ্যে একটির অভাব হইলে তুমি কোন কাজ করিতে পারিতে না এবং কোন একটি অধিক হইলেও তোমার আরামে ব্যাঘাত ঘটিত।

মাংসপেশী–শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সঞ্চালনশীল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্য তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের জোড়ে পাঁচ শত সাতাইশটি মাংসপেশী সৃজন করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি মাংসপেশীর গঠন মাছের আকৃতির মত—মধ্যভাগ মোটা, প্রান্তের দিকে ক্রমশ সূক্ষ্ম। ইহাদের আয়তন ও গঠন বিভিন্ন প্রকার–কতকগুলি ক্ষুদ্র এবং কতকগুলি বৃহৎ। মাংসপেশীগুলি স্নায়ু-সূত্র ও পর্দা দ্বারা জড়িত ও আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পর্দা যেন ইহাদের আবেষ্টনী। উহাদের মধ্যে চব্বিশটি মাংসপেশী কেবল চক্ষুগোলকের আশেপাশে স্থাপিত আছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহাদের সাহায্যে যেন চক্ষুগোলক ও পলক সর্বদিকে সঞ্চালিত হইতে পারে। অন্যান্য মাংসপেশীসমূহ সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া লও। এই সমস্তের বিবরণও বহু বিস্তৃত।

মানবদেহের তিনটি শক্তি কেন্দ্র–তোমার দেহে তিনটি হাওয স্থাপিত আছে। তন্মধ্য হইতে নালী-প্রণালী বাহির করিয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত এবং পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রথম শক্তি কেন্দ্র–মস্তিষ্ক। ইহা হইতে স্নায়ু-সূত্রসমূহ নালী-প্রণালীর ন্যায় বাহির হইয়া সমস্ত দেহে জালের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। স্পর্শ ও সঞ্চালন শক্তি মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া স্নায়ুপথে সমস্ত দেহে প্রবাহিত হয়। মস্তিষ্ক হইতে আর একটি স্নায়ুসূত্র নালার ন্যায় বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে এবং মেরুদণ্ডের প্রতিটি জোড় হইতে ইহার শাখা-প্রশাখা বহির্গত হইয়া দেহময় পরিব্যাপ্ত আছে। এইরূপ বিধানের উদ্দেশ্য এই যে, কোন অঙ্গের স্নায়ুজাল যেন মস্তিষ্ক হইতে দূরে না পড়ে এবং মগজ হইতে দূরে পড়িয়া স্নায়ুসূত্রগুলি শুষ্ক হইয়া না যায়।

দ্বিতীয় শক্তি কেন্দ্র– হৃদপিণ্ড। ইহা হইতে রগ ও শিরাসমূহ বাহির হইয়া দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ পরিব্যাপ্তি হইয়া রহিয়াছে এবং ইহাদের ভিতর দিয়া দেহপোষক রক্ত সর্বত্র প্রবাহিত হইতেছে।

তৃতীয় শক্তি কেন্দ্র– হৃদয়। এ-স্থান হইতে রগ ও ধমনীসকল বাহির হইয়া সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া রাহিয়াছে এবং তৎসমুদয়ের ভিতর দিয়া সর্বাঙ্গে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হইতেছে।

যাহাই হউক তুমি নিজের এক একটি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ অবলম্বনে চিন্তা কর–আল্লাহ্ তা'আলা কি ধরনের এবং কি উদ্দেশ্যে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন।

চক্ষু–চক্ষুকে যেরূপ আকৃতি ও রং দিয়া সুপ্ত অংশে নির্মাণ করিয়াছেন ইহা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই। চক্ষুকে ধূলাবালি হইতে রক্ষার জন্য চক্ষুর পাতাকে ঢাকনিস্বরূপ সৃজন করা হইয়াছে এবং এই পাতার প্রান্তভাগে কতকগুলি লোম অতি চমৎকারভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। লোমগুলি সরল ও কৃষ্ণবর্ণ করাতে এক দিকে চক্ষুর শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরপক্ষে দৃষ্টিশক্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই লোমগুলি চক্ষে ধূলাবালি পড়িতে দেয় না। উপর হইতে ধূলাবালি পড়িতে গেলে লোমে আটকিয়া যায়। আবার লোমগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া সাজানো হইয়াছে বলিয়া দর্শনেরও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এতদপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার অতীব আশ্চর্য কৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য এই যে, চক্ষুর পুতলি পরিমাণে দুই-তিনটি মুসুরদানার সমান হইলেও অসীম আকাশ এবং বিশাল ভূতলের প্রকাণ্ড ছবি ধারণ করিবার ক্ষমতা রাখে। আকাশ এত দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও চক্ষু খুলিবামাত্র ইহার বিশাল ছবি তোমার ক্ষুদ্র চক্ষু-পুতলির মধ্যে আসিয়া পড়ে। চাক্ষুষ দর্শনের বিস্ময়কর ব্যাপার ও দর্পণের মধ্যে দর্শনের বিচিত্র অবস্থা এবং ইহাতে অবাস্তব আকৃতি দর্শনের কারণ বর্ণনা করিতে গেলে বিরাট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

কর্ণ–ইহার পর কর্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ। আল্লাহ্ তা'আলা কর্ণ সৃজনপূর্বক ইহাতে এক প্রকার কটু ও বিস্বাদ ময়লা সঞ্চিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেন ইহার দুর্গন্ধে কোন কীট কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না পারে। কর্ণের ছিদ্র শামুকের ন্যায় পেঁচালো করাতে শব্দ ইহার মধ্যে প্রতিহত হইয়া গাঢ় হয় এবং উচ্চভাবে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। আবার যখন তুমি নিদ্রা যাও তখন পিপীলিকা তোমার অজ্ঞাতসারে কর্ণে প্রবেশ করিতে গেলে ইহার পথ পেঁচালো হওয়াতে তাহাকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, সুতরাং সময়ও অধিক লাগে। ইতিমধ্যে তুমি জাগ্রত হইয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিবে–এই উদ্দেশ্যে কর্ণের ছিদ্র পেঁচালো করা হইয়াছে।

মুখ, নাক এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচিত হইবে। যাহাই হউক, উপরে অতি সংক্ষেপে যাহা কিছু বর্ণিত হইল তাহাতে তুমি চিন্তা করিবার পথ পাইবে এবং এইরূপে প্রত্যেক অঙ্গ অবলম্বনে চিন্তা করিতে শিখিলে সেই অঙ্গটি আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা নির্মাণে তাঁহার কি পরিমাণ শিল্পকৌশল, শ্রেষ্ঠত্ব, দয়া,

করুণা, জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও তুমি ক্রমে ক্রমে অবগত হইবে। তোমার আপাদমস্তক প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অসংখ্য বিস্ময়কর ব্যাপার বিদ্যমান আছে।

মানবদেহের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা– মানবদেহের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা আরও আশ্চর্যজনক। মস্তিষ্কের অন্তর্গত জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং অনুভব শক্তি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার। বক্ষের অভ্যন্তরে রক্তধারা ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কারখানা এবং উদরের কার্যাবলী নিতান্ত চমৎকারজনক। আল্লাহ তা'আলা পাকস্থলীকে ডেকচির ন্যায় করিয়াছেন, জ্বলন্ত চুল্লির উপর স্থাপিত ডেকচির ন্যায় পাকস্থলীতে তেজপ্রভাবে সর্বদা বলক উঠিতেছে। খাদ্যদ্রব্য ইহাতে পড়িলে পরিপাক হইা যায়। এই পরিপক্ক খাদ্যদ্রব্য হৃদপিণ্ডে গিয়া রক্তে পরিণত হয়। এ স্থান হইতে রগ ও শিরাসমূহ সমস্ত অঙ্গে রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেয়। পিত্তকোষ রক্তের অন্তর্গত পিত্ত ছাকিয়া ফেলে এবং রক্তের গাদ প্লীহা নামক যন্ত্র চুষিয়া ছাকিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। রক্তের মধ্যে অতিরিক্ত জলীয় অংশ যকৃৎ নামক যন্ত্র টানিয়া লইয়া মূত্রাধারের দিকে প্রেরণ করে। এইরূপ গর্ভাশয় ও সন্তানোৎপাদক যন্ত্রসমূহও অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তৎপর দেহের ভিতর-বাহিরের যন্ত্রাদির শক্তি যথা–দর্শন, শ্রবণ, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি যাহা আল্লাহ্ দয়া করিয়া মানবকে দিয়াছেন তৎসমুদয়ই নিতান্ত বিস্ময়কর।

কোন চিত্রকর একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি প্রাচীরপৃষ্ঠে অঙ্কিত করিলে তুমি তাহার দক্ষতায় বিস্মত হও এবং তাহার অতি প্রশংসা করিয়া থাক। কিন্তু বিশ্বশিল্পী আল্লাহ যে এক বিন্দু পানির পৃষ্ঠে ও অভ্যন্তরে এই বিস্ময়কর চিত্র নরদেহ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা তোমরা দেখিতেছ না। উহা প্রস্তুত করিবার সময় শিল্পীর কলম বা স্বয়ং শিল্পীকে দেখা যায় না। এইরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর মহত্ত্বে তোমরা বিস্মিত হইতেছ না! সেই মহাশিল্পীর অপ্রতিহত শক্তি, পূর্ণজ্ঞান অনুধাবন করিয়া তোমরা আত্মহারা হইতেছে না! এমন সৃষ্টিকর্তার অনন্ত করুণা ও অসীম ভালবাসা বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেছ না!

সন্তান পোষণের সদয় কৌশল–মাতৃগর্ভে তুমি ক্ষুধার্ত হইলে পরম দয়ালু আল্লাহ কেমন সদয় ব্যবস্থায় তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি ও দেহ পোষণ করিয়াছেন, একেবার ভাবিয়া দেখ। সেই সময় মুখ দিয়া তোমার আহার দিবার ব্যবস্থা থাকিলে তুমি মুখ খোলামাত্র জননীর ঋতু-রক্ত অতিরিক্ত পরিমাণে তোমার মুখে

প্রবেশ করিয়া তোমার বিনাশ সাধন করিত। এই জন্য তিনি নাভী-পথে তোমাকে আহার দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে নাভী-পথে আহার দানের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কারণ মাতা তখন আপন সন্তানকে পরিমাণমত আহার দিতে পারেন। অতি শৈশবে তোমার শরীর অত্যন্ত কোমল ও দুর্বল ছিল বলিয়া কঠিন খাদ্য তখন আহার পারিপাক করিবার ক্ষমতা তোমার ছিল না; এইজন্য তরল ও লঘু মাতৃদুগ্ধের ব্যবস্থা তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বহু পূর্ব হইতেই মাতৃ-বক্ষে দুগ্ধ-ভাণ্ডার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মাতৃস্তনের বোঁটার আয়তন তোমার মুখের আয়তনের পরিমাণমত বানানো হইয়াছে যেন অধিক পরিমাণে দুগ্ধ তোমার মুখে না পড়ে। জননীর বক্ষস্থলে এক স্বাভাবিক শক্তি বসাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহা ধোপার ন্যায় কাজ করে। জননীয় স্তনে লোহিত বর্ণের যে রক্ত আসে তাহাকে ঐ শক্তি ধুইয়া শুভ্র দুগ্ধে পরিণত করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও লঘুপাক করিয়া তোমার মুখে দেয়। বাৎসল্যকে আল্লাহ্ তোমার মাতার হৃদয়ে দণ্ডধারী প্রহরীর ন্যায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি ক্ষুধিত হওয়া মাত্র মাতা ব্যাকুল হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধ পানের সময়ে দাঁতের প্রয়োজন হয় না, এইজন্য অতি শৈশবে দাঁত সৃজন করা হয় নাই। সেই সময়ে তোমার মুখে দাঁত থাকিলে দাঁতের আঘাতে মাতার স্তন ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত। যখন শক্ত দ্রব্য খাইবার শক্তি জন্মিল তখন আল্লাহ্ তোমাকে দাঁত দিলেন এবং উহার সাহায্যে তুমি শক্ত দ্রব্য খাইতে সক্ষম হইলে।

যে ব্যক্তি এই সকল শিল্পকার্য ও সৃষ্ট পদার্থ দেখিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও অপ্রতিহত ক্ষমতা চিন্তনে হতবুদ্ধি না হয় এবং তাঁহার পূর্ণ দয়া ও অনুগ্রহ স্মরণে বিস্মিত না হয়, এবং তাঁহার অপার মহিমা ও অনন্ত সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ না হয়, সেইব্যক্তি বাস্তবিকই অন্ধ। এইরূপ আশ্চার্যজনক পদার্থ অবলম্বনে যে ব্যক্তি চিন্তা করে না এবং নিজের দেহেরও খবর রাখে না, বিশেষত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পদার্থ যে বুদ্ধি তাহাও বৃথা নষ্ট করে সে নরাকৃতি পশু, বড় গাফিল। সে এইমাত্র বুঝে যে, ক্ষুধা লাগিলে আহার করিতে হয়, ক্রোধ আসিলে উত্তেজিত হইতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্র মারিফাতের উদ্যানে ভ্রমণ হইতে সে পশুর ন্যায়ই বঞ্চিত থাকে।

মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে উপরে যতটুকু বর্ণিত হইল বুদ্ধিমানের জন্য ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু যাহা বলা হইল তাহা তোমার শরীরের

আশ্চর্য পদার্থের লক্ষ ভাগের এক ভাগও নহে। তোমার দেহের যে সকল বিস্ময়কর পদার্থের উল্লেখ করা হইল তাহা ক্ষুদ্র মশা হইতে বৃহৎ হস্তী পর্যন্ত সকল প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। ইহার বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তৃত।

আল্লাহ্র অনন্ত গুণাবলীর দ্বিতীয় নিদর্শন পৃথিবী এবং তদুপরিস্থিত ও তদভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ–তুমি যদি নিজ দেহসংক্রান্ত বিস্ময়কর পদার্থের চিন্তা সমাপ্ত করিয়া চিন্তারাজ্যে অধিক অগ্রসর হইতে চাও তবে পৃথিবী অবলম্বনে চিন্তায় প্রবৃত্ত হও।

ভূপৃষ্ঠ– ইহাকে আল্লাহ্ তা'আলা কেমন কৌশলে তোমার শয্যাস্বরূপ বিছাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীকে এমন প্রশস্ত করিয়াছেন যে, তুমি ইহার শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে পারিবে না। ভূপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে আল্লাহ পাহাড়-পর্বতরূপ পেরেক গাড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে ভূপৃষ্ঠ শক্ত হইয়াছে, নড়াচড়া করে না। কঠিন প্রস্তর হইতে সেই মহাকৌশলী আল্লাহ্ ধীরে ধীরে পানি নির্গত করিতেছেন। এই পানি সমস্ত পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতেছে, কঠিন প্রস্তরের চাপে পানির গতি আবদ্ধ না হইলে পানি একেবারে বাহির হইয়া সমস্ত দুনিয়া ডুবাইয়া দিত অথবা শস্য ও উদ্ভিদের পক্ষে পানি সেচনের উপযোগী সময়ের পূর্বেই একেবারে পানি আসিয়া উহা বিনাশ করিয়া ফেলিত। তৎপর বসন্তকাল সম্বন্ধে চিন্তা কর। দারুন শীতের প্রভাবে মাটি মরিয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। বসন্তের বৃষ্টিপাতে সেই মরা মাটি তৃণ-শস্যে কিরূপ সুন্দর ও সজীব হইয়া উঠে! ভূপৃষ্ঠ সপ্ত বর্ণের সোনালী বস্ত্রের শোভা ধারণ করে। সপ্ত বর্ণ নহে, বরং ভূপৃষ্ঠ তখন সহস্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

উদ্ভিদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য–যে সকল উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তাহা অবলম্বনে চিন্তা কর। কোনটিতে ফুল ফুটিতেছে; কোনটিতে আবার কলিকা দুলিতেছে। প্রতিটি ফুল ও কলিকার বর্ণ ও আকৃতি পৃথক পৃথক। একটি অপেক্ষা অপরটি উৎকৃষ্ট। তৎপর নানা প্রকার বৃক্ষ ও ফল লইয়া চিন্তা কর। ইহাদের সৌন্দর্য, আস্বাদ, গন্ধ ও গুণের প্রতি লক্ষ্য কর। আবার আল্লাহ্ এমন সহস্র সহস্র গুল্ম-লতা উৎপন্ন করিতেছেন যাহাদের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। এই সমস্ত অজ্ঞাত গুল্ম-লতার মধ্যে তিনি অতি আশ্চর্য গুণ ও উপযোগিতা রাখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোনটি মিষ্ট, কোনটি কটু, কোনটি টক। কোনটির প্রভাব এমন যে, মানুষের রোগ উৎপন্ন করে, অপর পক্ষে কোনটির উপকারিতা এইরূপ যে

রোগ বিদূরিত করে। কোনটি প্রাণ রক্ষা করে, আবার কোনটি প্রাণ সংহারক বিষ। কোনটি পিত্ত বৃদ্ধি করে, কোনটি উহা বিনাশ করে। কোনটি উন্মাদ রোগ বৃদ্ধি করে, কোনটি শিরা উপশিরা হইতে বায়ু রোগ নির্গত করিয়া দেয়। কোনটি গরম, কোনটি ঠাণ্ডা; কোনটি শুষ্কতা বৃদ্ধি করে, কোনটি আবার আর্দ্রতা আনয়ন করে। কোনটি নিদ্রা বৃদ্ধি করে, কোনটিতে নিদ্রা বিদূরিত হয়! কোন কোন গাছ-গাছড়া মানব-মনের প্রফুল্লতা জন্মায়, কোনটিতে বিমর্ষতা ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। কোন উদ্ভিদ মানুষের খাদ্য, কোনটি পশুর খাদ্য। আবার কোনটি পক্ষীর আহার। এখন অনুধাবন করিয়া দেখ, জগতে এইরূপ সহস্র সহস্র উদ্ভিদ রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে হাজার হাজার বিস্ময়কর ব্যাপার পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত সৃজনে পরম কৌশলী আল্লাহ তা'আলার যে অপরিসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিয়া জগতের মহাজ্ঞানী অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের পক্ষে হতবুদ্ধি হওয়াই সমীচীন। এই সকল উদ্ভিদের সংখ্যাও আবার অসীম।

আল্লাহ্র অনন্ত গুণাবলীর তৃতীয় নিদর্শন ঃ ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ–তন্মধ্যে কতকগুলি অতি মূল্যবান ও দুর্লভ। আল্লাহ্ ইহাদিগকে পাহাড়-পর্বতে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি মানবদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়; যেমন– স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, ফীরোযাহ্, ইয়াকুত প্রভৃতি বহুমূল্য মণি-মাণিক্য। আবার কতকগুলি তৈজসপত্র প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়; যথা–লৌহ, তামা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু। আর কতকগুলি বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়; যেমন–লবণ, গন্ধক, নেফ্তা, আলকাতরা ইত্যাদি। তন্মধ্যে লবণ খুব সুলভ ও সামান্য পদার্থ। কিন্তু ইহার গুণে সাধ্যদ্রব্য হযম হয়। কোন লোকালয়ে লবণের অভাব ঘটিলে সেই স্থানের খাদ্যদ্রব্য বিস্বাদ হইা যায়, অধিবাসীগণ পীড়িত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের বিনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং আল্লাহ্র দান ও দয়া অবলম্বনে চিন্তা কর। তোমার দেহ রক্ষার জন্য খাদ্যের আবশ্যক। এই খাদ্য সুস্বাদু করিতে যে লবণের প্রয়োজন তাহা তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করিয়াছেন। বৃষ্টির পানি হইতে তিনি লবণ উৎপত্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ভূগর্ভে বৃষ্টির পানি সঞ্চিত হইয়া লবণরূপে পরিণত হয়। এইরূপ অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপারও অসংখ্য এবং অগণিত।

আল্লাহ্র অনন্ত গুণাবলীর চতুর্থ নিদর্শন ঃ জগতের সকল জীবজন্তু– ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পায়ে চলে, কতকগুলি উড়ে। কতকগুলি দুই পায়ে চলে, কতকগুলি বুকের উপর ভর করিয়া চলে, আবার কতকগুলি বহু পায়ে চলে। তৎপর খেচর প্রাণী ও ভূচর পোকামাকড় প্রভৃতি লইয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখা। এই সকল প্রাণীর আকৃতি বিভিন্ন প্রকারের। একটি অপরটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাদের প্রত্যেকের পক্ষে জীবন ধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তৎসমুদয়ই আল্লাহ্ দান করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে জীবন যাপনের কৌশল ও নিয়ম শিখাইয়াছেন। তদনুযায়ী ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে ও নিজ নিজ সন্তান পালন করে এবং বাসা নির্মাণ করিয়া লয়।

পিপীলিকা–পিপীলিকার দিকেই মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর। ইহারা উপযুক্ত সময়ে কেমন দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সহিত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। গমের দানাগুলি গোটা রাখিলে ভিতরে কীট জন্মিয়া বা অন্য প্রকারে নষ্ট হইবে ভাবিয়া ইহারা দানাগুলি দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাখে। ইহারা ধনিয়া বীজ পাইলে বিবেচনা করিয়া দেখে যে, আস্ত না রাখিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে, তজ্জন্য এইগুল আস্তই রাখিয়া দেয়।

মাকড়সা–মাকড়সার প্রতি একবার লক্ষ্য কর। ইহারা শিকার ধরিবার জাল কিরূপ কৌশলে তৈয়ার করে। যেরূপে জাল বুনিলে মশা-মাছি প্রভৃতি শিকার সহজে ধরা পড়ে তৎপ্রতি ইহারা কেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখে! মুখের লালা দিয়া সূতা প্রস্তুত করত দেওয়ালের এক কোণে জালসূত্রের এক প্রান্ত আটকাইয়া অপর কোণে তানা টানিয়া লইয়া যায়। তানা দেওয়া শেষ হইলে বোনা আরম্ভ করে। তানা ও বোনার সূতাগুলি সমান সমান ব্যবধানে স্থাপন করে; ইহাতে জাল দেখিতে বেশ সুন্দর হয়। জাল বোনা শেষ হইর মাকড়কা একগাছী সূতা মুখে লইয়া দেওয়ালের এক কোণে জালের একটি সূতা ধরিয়া মশা-মাছির প্রতীক্ষায় লটকিয়া থাকে। মশা-মাছি আসিয়া জালে পড়িলে মাকড়সা তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে আসিয়া ইহাকে আক্রমণ করে ও মুখের সূতা দিয়া শিকারের হাত-পা জড়াইয়া আবদ্ধ করিয়া ফেলে যাহাতে ইহা উড়িয়া পলায়ন করিতে না পারে। যখন বুঝিতে পারে যে শিকার আর উড়িয়া যাইতে পারিবে না তখন ইহাকে রাখিয়া নূতন শিকারের প্রতীক্ষায় থাকে।

ভীমরুল ও মৌমাছি– ভীমরুল ও মৌমাছির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। ইহারা কেমন ছয় কোণবিশিষ্ট কামরা নির্মাণ করে। যদি চতুর্ভুজ কামরা হইত

ইহাদের গোল দেহ তন্মধ্যে স্থাপন করিলে কামরার ভিতরে অনেক স্থান অনর্থক পড়িয়া থাকিত। আবার ইহাদের কামরা যদি গোল হইত তবে একই ছাদের নীচে বহু কামরা সন্নিবেশিত করা হইলে কামরার বাহিরে বহু শূন্য স্থান থাকিয়া যাইত। অঙ্কশাস্ত্রে প্রমাণিত আছে যে, ছয় কোণবিশিষ্ট ক্ষেত্রই আকারে গোলাকার ক্ষেত্রের অধিক নিকটবর্তী। কামরার ভিতরে ও বাহিরে যেন অধিক পরিমাণে শূন্যস্থান না থাকে তজ্জন্য অঙ্কশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ছয় কোণবিশিষ্ট কামরা তৈয়ার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং ইহারাও তাহাই করে। অতএব ভাবিয়া দেখ, এই ক্ষুদ্র প্রাণীর উপর আল্লাহ্‌র দয়া কিরূপ। তিনি দয়া করিয়া এই সামান্য প্রাণীকেও অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে গৃহ-নির্মাণের আশ্চর্য কৌশল শিখাইয়া দিয়াছেন।

মশা—মশার খাদ্য রক্ত। ইহা আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। এবং রক্ত চুষিয়া লইবার জন্য তিনি মশাকে একটি শুঁড় প্রদান করিয়াছেন। মশা এই শুঁড় মানবদেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া রক্ত চুষিয়া পান করে। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে দুইটি হালকা পাত্‌লা ডানা দান করিয়াছেন। মানুষ ইহাকে ধরিতে চাহিলে সে বুঝিতে পারে এবং ডানার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলায়ন করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসে। মশাকে আল্লাহ কথা বলিবার ক্ষমতা ও বুদ্ধি প্রদান করিলে ইহা আল্লাহ্‌কে এত অধিক ধন্যবাদ দিত যে, মানুষ ইহাতে চমৎকৃত হইয়া থাকিত। কিন্তু ইহার সমস্ত দেহ হইতে যে অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে তাহা যেন বাকশক্তি ধারণ করিয়া স্বীয় ভাষায় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা ও পবিত্রতা বর্ণনায় লিপ্ত রহিয়াছে। অথচ আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ –

অর্থাৎ "আর কিন্তু তোমরা তাহাদের তসবীহ বুঝিতে পার না।" (সূরা বানী ইস্‌রাঈল, ৫ রুকূ ১৫ পারা।)

বিস্ময়কর সৃষ্টির উপলব্ধি ও বর্ণনা মানবের অসাধ্য—জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ সম্বন্ধীয় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ব্যাপারের অন্ত নাই। এমন শক্তি কাহার আছে যে, উহার লক্ষ ভাগের এক ভাগও উপলব্ধি করত বর্ণনা করিতে পারে? এই যে অসংখ্য জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ তাহারা কেমনে এমন চমৎকার আকৃতি, নানা রঙের মনোরম মূর্তি এবং সুগঠিত অঙ্গ লাভ করিল! প্রিয় পাঠক, ইহারা কি

নিজেকে নিজে এইরূপ সুন্দর করিয়া বানাইয়াছে? না, তুমি এইরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছ? সুব্‌হানাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র মহিমা কি অসীম! তিনি মানবকে দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা সত্ত্বেও তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন যেন সে দেখিতে না পায়। চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধি বিবেচনা তাহাকে দিয়াও তাহার মনকে তিনি অচেতন করিয়া রাখিতে পারেন। তদ্রূপ অবস্থায় সে চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপ বহু লোক আছে যাহারা প্রকাশ্য চর্মচক্ষে দেখে বটে কিন্তু অন্তরের চক্ষে দর্শন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। যে বাক্য শ্রবণের যোগ্য তাহা তাহারা শুনে না। পশুদের ন্যায় তাহাদের কর্ণ-বিবরে আওয়ায ব্যতীত আর কিছুই প্রবেশ করে না। তাহাদের কর্ণে উপদেশ-বাক্য পাখির কলরবের ন্যায় শ্রুত হয়—ইহা হইতে তাহারা কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহা দেখা কর্তব্য ইহা দর্শনে তাহারা অক্ষম হইয়া থাকে। কাগজের উপর অক্ষর দ্বারা যাহা লিপিবদ্ধ হয় তাহা তাহারা পড়িতে পারে বটে, কিন্তু বিশ্বজগতের সর্বত্র এমন কি প্রতিটি রেণুর উপর বিনা-অক্ষরে ও বিনা-আকৃতিতে আল্লাহর মহান কলমে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহারা দেখিতে পারে না।

পিপীলিকার ডিম্ব কি ঘোষণা করে?—পিপীলিকার ডিম্ব একটি বালুকাকণা তুল্য ক্ষুদ্র পদার্থ। একবার ইহার প্রতি মনোযোগ দাও এবং কান লাগাইয়া শুন, ইহা কি বলিতেছে। ইহা পরিষ্কার ভাষায় উচ্চস্বরে বলিতেছে—"হে চিন্তাশূন্য মানব, চিত্রকর প্রাচীরপৃষ্ঠে একটি সুন্দর চিত্র অংকিত করিলে তোমরা সেই চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্য ও দক্ষতার জন্য বিস্ময় প্রকাশ কর। এস, আমার প্রতি লক্ষ্য কর, আল্লাহ্ তা'আলার শিল্পনৈপুণ্য ও চিত্রকৌশল দেখিতে পাইবে। আমি একটি ক্ষুদ্র রেণু অপেক্ষা বৃহৎ নহি। আমা হইতে পরিশেষে সেই মহাশিল্পী আল্লাহ্ পিপীলিকা বানাইবেন। চিন্তা করিয়া দেখ, তিনি আমার অঙ্গসমূহ কিরূপে ভাগ করিবেন—আমা হইতে মন, মস্তিষ্ক, হস্ত-পদ এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুত করিবেন; আমার মস্তক ও মস্তিষ্ক-ভাণ্ডারকে কয়েকটি কুঠরীতে ভাগ করিবেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক কুঠরীতে বিভিন্ন শক্তি স্থাপন করিবেন—একটিতে আস্বাদনশক্তি অপরটিতে ঘ্রাণশক্তি এবং অন্যটিকে দর্শনশক্তি স্থাপন করিবেন। আমার মস্তিষ্কের বহির্ভাগে কত সুন্দর দৃশ্যের সৃজন করিবেন এবং উহাতে অমূল্য বস্তু স্থাপন করিবেন। তৎসঙ্গে মস্তকের এক অংশে নাসিকা ও মুখ-বিবর সৃজন করত আহার গিলিবার পথ প্রস্তুত করিবেন এবং আমা হইতে

হস্ত-পদও বাহির করিবেন। আমার উদরে খাদ্য পরিপাকের স্থান রাখিবেন এবং এমন পথও প্রস্তুত করিবেন যদ্দারা খাদ্যের অসার ভাগ বাহির হইয়া যাইবে। এইরূপ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্রস্তুত করিবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আমার দেহ নিতান্ত লঘু, দ্রুত গতিশীল ও সক্রিয় হইবে। আমার শরীর তিন ভাগে ভাগ করত সুনিপুণভাবে এক ভাগকে অপর ভাগের সহিত মিলাইয়া দিবেন। চৌকিদারের কোমরে যেমন পেটি বাঁধা থাকে আমার কোমরেও তদ্রূপ পেটি বাঁধিয়া দিবেন এবং আমার শরীরে কৃষ্ণবর্ণের কাবা পরাইয়া দিবেন।

হে মানব, তুমি মনে করিতেছ, বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তু এবং জীবজন্তু তোমার সুবিধা ও পরিচর্যার জন্য আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু শুনিয়া রাখ, যখন তিনি আমাকে এই ডিম হইতে বাহির করিবেন তখন আমিও তোমাদের ন্যায় ভূতলে চলাফেরা করিব। সেই সময় আমিও দেখিতে পাইব যে, এই পৃথিবী আমার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি যেমন সম্পদ ভোগ করিতেছ, আমিও তদ্রূপ নি'আমত ভোগ করিতে থাকিব। আরও দেখিবে যে, জগতের সকলেই আমার খেদমত করিতেছে, এমন কি তোমাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জীব মানুষও আমার খেদমতে নিযুক্ত আছে। দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ভূমি কর্ষণ, বীজ-বপন ও পানি-সেচন করিয়া মানব ধান্য, গম প্রভৃতি যাহা উৎপন্ন করে তাহা আমরা সুখে ভোগ করিতে পাইব। মানুষ আমার সুখের জন্যই পরিশ্রম করিয়া যাইবে। তোমরা শস্য কাটিয়া যে স্থানেই লুকাইয়া রাখ না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার মত নগণ্য পিপীলিকাকে ইহার সন্ধান দিবেন। আমি মাটির নিচে গর্তে থাকিলেও তোমাদের শস্যের গন্ধ পাইয়া ইহার অনুসরণে তোমাদের শস্য-ভাণ্ডারে গিয়া উপস্থিত হইব। কঠোর পরিশ্রমে তোমরা যাহা উপার্জন কর তাহাতে হয়ত তোমাদের সারা বৎসরের আহারের সংস্থান হয় না। কিন্তু আমি তোমার শস্য-ভাণ্ডার হইতে এত খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইব যে, ইহাতে আমার এক বৎসরের, এমন কি তদপেক্ষা অধিক সময়ের আহার চলিতে পারে। সেই খাদ্যদ্রব্য অতি সাবধানে এমন নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিব যে, কিছু মাত্রই অপচয় হইতে পারিবে না। আমাদের সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য রৌদ্রে শুকাইবার জন্য ময়দানে আনিলে আল্লাহ্ আমাদিগকে বৃষ্টিপাতের সংবাদ ইলহাম দ্বারা পূর্বেই জানাইয়া দিয়া থাকেন। সুতরাং বৃষ্টিপাতের পূর্বেই আমরা সেই দ্রব্য ময়দান হইতে সরাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিব যাহাতে বৃষ্টিপাত ইহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে। হে মানব, তোমরা যদি ময়দানে শস্য-গোলা দিয়া রাখ

এমন সময় যদি শিলা ও বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় তবে তোমাদের সঞ্চিত খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কেননা তোমরা ইহার খবর পূর্বে পাওনা।

অতএব করুণাময় আল্লাহ্ আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা কিরূপে শোধ করিব! তিনি যে আমার ন্যায় এত তুচ্ছ রেণু হইতে এমন চালাক ও কর্মদক্ষ প্রাণী সৃষ্টি করিবেন এবং তোমাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জীবকে আমাদের ন্যায় তুচ্ছপ্রাণীর খেদমতগার বানাইয়া দিবেন—তোমরা আমাদের খাদ্য জোগাইবে, ভূমি কর্ষণ করিবে, শস্য বপন করিবে এবং শস্য কাটিবে; এইরূপে কত দুঃখকষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করিবে। অপর দিকে আমরা মজা করিয়া আরামে বসিয়া খাইব। এমতাবস্থায় আমরা দয়াময় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ কিরূপে পরিশোধ করিতে পারি!

মোটের উপর কথা এই যে, বিশ্বের ছোট-বড় প্রাণীর মধ্যে এমন কেহই নাই, যে স্বীয় ভাষায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন করিতেছে না। সদ্যজাত প্রতিটি পক্ষীশাবক, প্রতিটি রেণু, এমন কি প্রতিটি লতাপাতা হইতেও আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসাবাদ সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতেছে। কিন্তু মানব সে তাস্‌বীহ্‌র দিকে কান দিতেছে না–অন্যমনস্কভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ –

অর্থাৎ "তাহাদিগকে অবশ্য অবশ্যই শ্রবণ হইতে নিবারিত রাখা হইয়াছে।" (সূরা শু'আরা, ১১ রুকূ, ১৯ পারা।) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ –

অর্থাৎ "আর তাঁহার প্রশংসার সহিত তাস্‌বীহ পড়ে না এমন কোন বস্তু নাই। কিন্তু তোমরা তাহাদের তাস্‌বীহ বুঝ না।" (সূরা বানী ইসরাঈল, ৫ রুকূ, ১৫ পারা।) এই বিশ্বে বিস্ময়কর বস্তু ও জীবজন্তুর অন্ত নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

আল্লাহর অনন্ত গুণাবলীর পঞ্চম নির্দশন ঃ বিশাল সমুদ্র যাহা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে– প্রত্যেক সাগর-উপসাগর, নদী-উপনদী এই মহাসমুদ্রের পৃথক পৃথক খণ্ড। এই মহাসমুদ্র সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে বেষ্টন করিয়া আছে।

বাস্তবপক্ষে স্থলভাগ সমুদ্রের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, ভূপৃষ্ঠে কতকগুলি আস্তাবল যেরূপ সমুদ্রের মধ্যে স্থলভাগও তদ্রূপ। প্রিয় পাঠক, তুমি স্থলভাগের পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার ধারা শিক্ষা করিলে, এখন জলভাগের বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে প্রদত্ত হও। জলভাগ যেমন স্থলভাগ অপেক্ষ বৃহৎ, তদন্তর্গত বিস্ময়কর ব্যাপারও তদ্রূপ অধিক। স্থলভাগে যেমন জীবজন্তু আছে, জলভাগেও তদ্রূপ জীবজন্তু আছে। কিন্তু জলভাগে এমন বহু জীবজন্তু আছে যাহা স্থলভাগে নাই। আবার এই সকল প্রাণীর প্রত্যেকটির আকৃতি ও প্রকৃতি পৃথক পৃথক।

জলজ প্রাণী– কোন জলজপ্রাণী এত ছোট যে, দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার কোনটি এত বড় যে, জাহাজ ইহার পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িলে লোকে মনে করে, উহা ভূপৃষ্ঠে লাগিয়া গিয়াছে। স্থলভাগ ভ্রমে লোকে এই প্রাণীর পৃষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে অগ্নির তেজে উহার পৃষ্ঠে কিছু আছে বলিয়া সে টের পায় এবং নড়িয়া উঠে। তখন লোকে বুঝিতে পারে যে, উহা ভূপৃষ্ঠ নহে–জলজ প্রাণীর পৃষ্ঠ। সমুদ্রের ও তদন্তর্গত বস্তুর বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা করিয়া বহু লোকে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ইহার সমাবেশ হইবে কিভাবে?

ঝিনুক–আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রগর্ভে এক প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার আবরণকে ঝিনুক বলে। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে বৃষ্টিপাতের সময় মেঘের বারিবিন্দু উদরস্থ করিয়া লইতে ইলহাম করিয়াছেন। বৃষ্টিপাতের সময় ইহারা সমুদ্রের লবণাক্ত পানির তল হইতে ভাসিয়া উঠে এবং মেঘের দিকে মুখ খুলিয়া থাকে। বৃষ্টির মিষ্ট পানির বিন্দু উদরস্থ হইলে মুখ মদ্রিত করত ইহারা আবার সমুদ্রতলে চলিয়া যায়। এই বৃষ্টির পানি ইহাদের উদরে মাতৃগর্ভে শুক্রবিন্দুর ন্যায় সযত্নে রক্ষিত হয়। বহুকাল পর এই বৃষ্টি বিন্দুগুলি মুক্তারূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্র কোনটি বৃহৎ। এই সকল মুক্তা দ্বারা মানব শোভা বৃদ্ধির জন্য হার ও অন্যান্য ভূষণ প্রস্তুত করে।

প্রবাল ও আম্বর–সমুদ্রগর্ভে আল্লাহ্ লোহিত প্রস্তরবৎ এক প্রকার গাছ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার আকার অবিকল স্থলভাগের বৃক্ষের ন্যায়। ইহা হইতে বহুমূল্য রত্ন উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষকে মরজান বা প্রবাল বলে। প্রবাল বৃক্ষের ফেনা হইতে আবার সমুদ্রতীরে এক প্রকার পদার্থ তৈয়ার হয়। ইহাকে আম্বর বলে। প্রাণীদেহের বাহিরে ও সমুদ্রে এইরূপ বিস্ময়কর বস্তু বহু আছে।

জলপথে যাতায়াত–পানির উপর দিয়া জাহাজ ও নৌকা চলাচল অবলম্বনেও চিন্তা করা উচিত। পানিতে না ডুবে এমনভাবে নৌকা বানাইতে মানবকে আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়াছেন এবং মাঝিকে অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু চিনাইয়া দিয়াছেন, নক্ষত্ররাজি সৃজনের মধ্যে আল্লাহ্র ইহাও এক উদ্দেশ্য ছিল যে, অকূল সমুদ্রের মধ্যে যেখানে একমাত্র পানি ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হয় না, তথায় এই নক্ষত্র দেখিয়া নাবিকগণ পথ নির্ণয় করে। ইহা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার।

পানির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য– পানির প্রকার, তরলতা ও স্বচ্ছলতা অবলম্বনে চিন্তা কর। সকল বস্তুর সহিতই ইহার যোগাযোগ আছে। পানিকে আল্লাহ্ সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি সকল প্রাণীর জীবনস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। আবার ভাবিয়া দেখ, প্রবল পিপাসার সময় তুমি যখন এক ঢোক পানির জন্য লালায়িত হও তখন যদি পানির অভাব হয় তবে তুমি ততটুকু পানির বিনিময়ে তোমার যথাসর্বস্ব ধন দিতে প্রস্তুত হও। আবার সেই পানি পান করিয়া যদি ইহা মূত্রাধারে আটকাইয়া যায়, প্রস্রাবের পথে বাহির না হয়, তখনও তুমি সেই মূত্র বাহির করিয়া ইহার যন্ত্রণা হইতে বাঁচিবার নিমিত্ত তোমার যথাসর্বস্ব প্রদান করিতে প্রস্তুত হও। মোটের উপর কথা এই যে, পানি ও সমুদ্রের বিস্ময়কর ব্যাপারের সীমা নাই।

আল্লাহ্র অনন্ত গুণাবলীর ষষ্ঠ নিদর্শন ঃ বায়ু ও বায়ু মণ্ডলের অন্তর্গত বস্তুসমূহ–বায়ুমণ্ডল তরঙ্গায়িত সমুদ্রসদৃশ। বায়ু প্রবাহই বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গ।

বায়ু–ইহা এত সূক্ষ্ম ও লঘু যে, দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এমন স্বচ্ছ যে ইহার ভিতর দিয়া দেখিতে বাধা জন্মায় না। এই বায়ু সর্বক্ষণের জন্য তোমার প্রাণের খাদ্য। দিবসের মধ্যে একবার পানাহার করিলেই চলে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও উদরে বায়ু প্রবেশ না করিলে এবং শ্বাস রুদ্ধ থাকিলে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অথচ এই কথা তুমি চিন্তা করিতেছ না। বায়ুর অপর এক বিশেষত্ব এই য, ইহার প্রভাবে নৌকা পানির উপর ভাসিতে থাকে এবং নৌকা ডুবে না। বাতাসের গুণ ও উপকারিতার বর্ণনা নিতান্ত বিস্তৃত গগনমণ্ডলে লক্ষ্য করিবার পূর্বে একবার বাতাসের কথা চিন্তা কর। দেখ, এই বাতাস হইতেই আল্লাহ তা'আলা মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ, বরফ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘন মেঘের বিষয় চিন্তা কর–ইহা অদৃশ্য বাতাসে অকস্মাৎ উৎপন্ন হইতেছে। সমুদ্র,

নদী ইত্যাদি জলাশয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় বায়ু উহা হইতে পানি বহন করিয়া আনিয়া বা পাহাড়-পর্বত হইতে তেজের প্রভাবে বাষ্প উত্তোলন করিয়া এই মেঘ উৎপন্ন করে; অথবা বায়ুর উপাদানস্থ পাদর্থ হইতে মেঘ প্রস্তুত হয়। পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, ঝরণা প্রভৃতি জলাশয় হইতে দূরে অবস্থিত দেশে এই মেঘ বায়ুপ্রবাহে চালিত হয় এবং তথায় বিন্দু বিন্দু আকারে ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

বৃষ্টিবিন্দু–বৃষ্টিবিন্দু সোজাভাবে উপর হইতে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। যে বিন্দুকে আল্লাহ্ যে স্থানে নিক্ষেপ করিবার বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঠিক সেই স্থানে সেই বিন্দু আসিয়া পড়ে। যে কীট পিপাসায় কাতর আছে, ইহার পিপাসা নিবারণের জন্য যে বৃষ্টি-বিন্দু নির্ধারিত আছে, ঠিক তাহাই সেই কীটের নিকট বর্ষিত হয়। যে উদ্ভিদ পানির অভাবে শুকাইতেছিল এইরূপ বিধানে তাহার নির্ধারিত বৃষ্টিবিন্দু পাইয়া সজীবন হইয়া উঠে। যে শস্যদানা পরিপুষ্ট করিবার জন্য যে বারিবিন্দু নির্দিষ্ট ছিল ঠিক সেই বিন্দুগুলি ইহার উপর পতিত হয়। বৃক্ষের উচ্চ শাখায় পানির অভাবে যে ফলটি শুষ্ক হইতেছিল, ঠিক সেই বৃক্ষের মূলে নির্ধারিত বৃষ্টিবিন্দু ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই পানির যে অংশে সেই ফলটিকে তাজা করিবার বিধান হইয়াছিল সেই পানিটুকু বৃক্ষমূলের অভ্যন্তরস্থ কেশ হইতে সূক্ষ্ম শিরাপথে ঠিক সেই শুষ্কপ্রায় ফলের মধ্যে প্রবেশ করত ইহাকে সরল করিয়া তোলে। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এইরূপ অসীম করুণার প্রতি উদাসীন হইয়া চিন্তাশূন্য অবস্থায় সেই ফল আহার করিয়া থাক। বৃষ্টির প্রতিটি বিন্দুর উপর আল্লাহ্ লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, এই বিন্দুটি অমুক স্থানে পড়িবে এবং অমুকের জীবিকারূপে পরিণত হইবে। বৃষ্টিবিন্দু গণনা করিবার জন্য যদি বিশ্বের সমস্ত লোক একত্র হয় তথাপি গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না। বৃষ্টি যদি একবারেই বর্ষিত হইত হবে উদ্ভিদের ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত পানি আবশ্যক মত পাওয়া যাইত না।

বরফ– উদ্ভিদ জাতির জন্য ক্রমে ক্রমে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে আল্লাহ্ তা'আলা শীত ঋতু সৃষ্টি করিয়াছেন। শীতের প্রভাবে পানি বরফে পরিণত হয় এবং ধুনিত তুলার ন্যায় রেণু-রেণুরূপে পতিত হয়। আল্লাহ্ পাহাড়-পর্বতকে বরফের আলয় বানাইয়া রাখিয়াছেন। পার্বত্য অঞ্চলে বায়ু অধিক শীতল বলিয়া পর্বতগাত্রে বরফ জমিয়া থাকে এবং শীঘ্র গলিয়া যায় না। বসন্ত আগমনে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে ক্রমে বরফ গলিতে আরম্ভ করে। তখন

ঝরণা ও নদী দিয়া আবশ্যকমত পানি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে সমস্ত গ্রীষ্মকালে শস্যক্ষেত্রসমূহে অল্প অল্প পানি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, সর্বদা বৃষ্টিপাত হইলে লোকের কষ্ট হইত। অপর দিকে একইবারে সমস্ত পানি বর্ষাইয়া দিয়া বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখিলে, উদ্ভিদরাজি সারা বৎসর শুষ্ক হইয়া থাকিত। এখন ভাবিয়া দেখ, বরফ সৃষ্টির মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলার কত দয়া নিহিত রহিয়াছে।

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দয়া যে কেবল বরফ সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে তাহাই নহে। প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র অপার করুণা প্রকাশ পাইতেছে। বরং ভূমণ্ডল এবং গগনমণ্ডলের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি বস্তু তিনি বিচারপূর্বক এবং কৌশলপূর্ণ সদয়ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ - مَا خَلَقْنٰهُمَا
اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ "গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহার কোন পদার্থ নিরর্থক ক্রীড়াচ্ছলে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেন নাই। সমস্ত বস্তুই সত্য সহকারে, যেখাবে সৃজন করা উচিত ছিল ঠিক সেইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকে ইহা বুঝে না।" (সূরা দুখান, ২য় রুকূ, ২৫ পারা।)

আল্লাহ্‌র অনন্ত গুণাবলীর সপ্তম নির্দশন ঃ গগনরাজ্য গ্রহ-নক্ষত্র এবং তন্মধ্যস্থ বিস্ময়কর ব্যাপারসমূহ–গগনরাজ্যের বিস্ময়সমূহের তুলনায় ভূমণ্ডলের ব্যাপার অতি সামান্য। আকাশ ও নক্ষত্ররাজি অবলম্বনে চিন্তা করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে আদেশ করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ -

অর্থাৎ "আর আকাশকে আমি সুরক্ষিত ছাদ করিয়াছি এবং তাহারা ইহার নির্দশনসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।" (সূরা আম্বিয়া, ৩ রুকূ, ১৭ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ –

অর্থাৎ "অবশ্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা বড়! কিন্তু অধিকাংশ লোকে জানে না।" (সূরা মুমিন, ৬ রুকূ, ২৪ পারা।) গগনরাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে আদেশ করিয়াছেন; চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আকাশের নীলিমা ও নক্ষত্রের শুভ্রতা দেখিতে বলেন নাই। কারণ, তদ্রূপ দর্শন পশুগণও করিয়া থাকে।

চিন্তার বিষয়বস্তুর ক্রমোন্নতি– তোমার শরীর সম্বন্ধীয় বিস্ময়কর ব্যাপার তোমার যত নিকটবর্তী, গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তোমার তত নিকটবর্তী নহে। আবার গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আশ্চর্য ঘটনার সহিত তোমার শরীর সম্বন্ধীয় আশ্চর্য ঘটনা তুলনা করিলে একটি রেণুতুল্যও হইতে পারে না। এমতাবস্থায় তুমি যখন তোমার শরীর সম্বন্ধীর বিস্ময়কর ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ জানিতে পার নাই, তখন অসীম গগনরাজ্যের অত্যাশ্চর্য ঘটনাসমূহ কিরূপে জানিতে পারিবে? বরং তোমাকে উন্নতির পথে ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইবে। সর্বপ্রথমে তোমার নিজের সম্বন্ধে অবগত হও এবং তৎপর পৃথিবী, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও সমস্ত খনিজ পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা কর। ইহার পর বায়ু, মেঘ ও ইহাদের বিস্ময়কর ব্যাপার সম্বন্ধে অনুধাবন কর। তৎপর আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির অদ্ভুত ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য কর। অবশেষে কুরসী আরশ লইয়া চিন্তা কর। তাহার পর জড়জগত পরিত্যাগ করত আধ্যাত্মিক জগতের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হও। অনন্তর ফিরিশ্তা ও শয়তান সম্বন্ধে জানিতে চেষ্টা কর। ইহার পর ফিরিশ্তাগণের শ্রেণীবিভাগ ও তাঁহাদের বিভিন্ন মকাম চিনিয়া লও।

গ্রহ-নক্ষত্র অবলম্বনে চিন্তাধারা–গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও ঘূর্ণনের অবস্থা অবগত হও। ইহাদের উদয় ও অস্তস্থল সম্বন্ধে অনুধাবন কর এবং ইহারা কি পদার্থ ও কেন সৃষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধে চিন্তা কর। অগণিত নক্ষত্রের সংখ্যা সম্বন্ধেও ভাবিয়া দেখ। বর্ণে ইহারা পৃথক পৃথক–কোনটি শুভ্র, কোনটি লোহিত, আবার কোনটির রং পারদ-ধাতুর ন্যায়। আকৃতিতেই কোনটি ক্ষুদ্র, কোনটি বৃহৎ। দলবদ্ধরূপে ইহাদিগকে চিন্তা করিলে প্রতিটি দলের আকৃতি পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়–কোন দল ছাগলের আকার, কোন দল গরুর ন্যায়, কোন দল বিচ্ছুর

মত দেখায়। এইরূপে কল্পনা করিলে পৃথিবীতে যত প্রকার বস্তু আছে তৎসমুদয়ের মূর্তি আকাশের তারা দ্বারা অঙ্কিত আছে বলিয়া মনে করা চলে। ইহার পর তারকারাজির গতি সম্বন্ধে চিন্তা কর কোনটি এক মাসে সমস্ত আকাশ পরিভ্রমণ করে, কোনটি এক বৎসরে, কোনটি বার বৎসরে, আবার কোনটি ত্রিশ বৎসরে আকাশপথ পরিভ্রমণ করে। অধিকাংশ তারা এইরূপ ধীর যে, গগনমণ্ডল যদি চিরস্থায়ী থাকিত এবং প্রলয় না হইত তবে ইহারা ছয়ত্রিশ হাজার বৎসরে সমস্ত আকাশপথ অতিক্রম করিত। গগনমণ্ডলের বিস্ময়কর ব্যাপার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা নাই।

প্রিয় পাঠক, তোমরা যখন পৃথিবীর বিস্ময়কর ব্যাপারের কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছ, তখন এই কথাও বুঝিয়া লও যে, পদার্থ যত দূরে থাকে তাহার আকারও তত ক্ষুদ্র দেখা যায়। পৃথিবীর আকার এত বড় যে, কেহ ইহার সীমায় উপস্থিত হইতে পারে না। সূর্য পৃথিবীর একশত ষাইট গুণ বৃহৎ। পৃথিবী হইতে এত বড় প্রকাণ্ড সূর্য কতদূর ব্যবধানে থাকায় উহাকে এত ক্ষুদ্র দেখা যাইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখ। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে সূর্য কিরূপ দ্রুতগতিতে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সূর্যের পরিধি ভূচক্রবাল অতিক্রম করে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য পৃথিবীর দূরত্বের একশত ষাইট গুণ পথ আকাশমার্গের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। এইজন্যই একদা যখন রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "সূর্য কি ঢলিয়াছে?" তখন তিনি উত্তরে বলিলেন– لَا نَعَمْ "না- হাঁ" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) আবার জিজ্ঞসা করিলেন–"ইহার অর্থ কি?" হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন–"না–হাঁ" বলিবার সময়ের মধ্যে সূর্য পাঁচশত বৎসরের পথ চলিয়া গেল।"

কোন কোন নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষা শত গুণ বৃহৎ; কিন্তু দূরত্বের কারণে এত ক্ষুদ্র দেখা যায়। এখন ভাবিয়া দেখ, এক একটি তারা যখন এত বড় তখন আকাশ কত বড়। এত বড় আকাশের ছবি তোমার এই ক্ষুদ্র চক্ষে অতি সহজে সমাবেশ হয়। ইহা হইতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অনন্ত ক্ষমতা ও অসীম শ্রেষ্ঠত্বের কিছু পরিচয় পাইতে পার। প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে এক একটি হেকমত নিহিত রহিয়াছে–ইহাদের গতিস্থিতি, প্রত্যাবর্তন, অবস্থান এবং উদয়-অস্তের মধ্যে পৃথক পৃথক হেকমত নিহিত আছে। তন্মধ্যে সূর্যের হেকমতই সর্বপেক্ষা উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। পরম কৌশলী আল্লাহ্ সূর্যের পথটি রাশিচক্রের মধ্যে

এমনভাবে সুবিন্যাস্ত করিয়াছেন যে, এক ঋতুতে সূর্য মস্তকের উপর মধ্য গগন দিয়া চলিয়া যায় এবং অন্য ঋতুতে মাথার উপর দিয়া না গিয়া দূর দিয়া চলে। এই কারণেই বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে, শীত-গ্রীষ্ম ঋতুভেদ হয়; কখনও আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ থাকে। একই কারণ দিবারাত্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে।

মানব জ্ঞানের স্বল্পতা–আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া আমাদিগকে এই অল্পকাল বয়সের মধ্যে যত প্রকার জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতে গেলে বহু বৎসর সময় লাগিবে। কিন্তু আমাদের এই সকল জ্ঞান আম্বিয়া এবং আউলিয়াগণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত কম। আবার সৃষ্টি বিষয় সম্বন্ধে আউলিয়াগণের জ্ঞান নবীগণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত অল্প। অপরপক্ষে নবীগণের জ্ঞান প্রধান প্রধান ফিরিশ্তাগণের তুলনায় অত্যন্ত কম। আবার এই সমস্ত জ্ঞান একত্র করিয়া আল্লাহ্র জ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে এই জ্ঞান সমষ্টিকে জ্ঞান বলাই শোভা পায় না। সুব্হানাল্লাহ্! আল্লাহর শান কত ঊর্ধ্বে! মানবকে এত অধিক জ্ঞান দান করা সত্ত্বেও তিনি তাহার উপর অজ্ঞানতার ছাপ মারিয়া দিয়াছেন। তিন বলেন ঃ

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً –

"আর তোমাদিগকে অল্প ব্যতীত জ্ঞান দেয়া হয় নাই।" (সূরা বানী ইসরাঈল, ১০ রুকূ, ১৫ পারা।)

বিশ্বজগত আল্লাহ্র গৃহ–চিন্তার ধারা বুঝাইবার জন্য এই পর্যন্ত যাহা কিছু বর্ণিত হইল তাহা নমুনামাত্র। এই ধরনের চিন্তা করিতে থাকিলে নিজের গাফ্লত (উদাসীনতা) বুঝিতে পারিবে। তুমি কোন ধনাঢ্য লোকের মনোরম সৌধ ও নানারূপ চিত্রবিচিত্র বালাখানা দেখিলে ইহার শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হও এবং বহু দিন পর্যন্ত ইহার প্রশংসা করিতে থাক। কিন্তু তোমরা সর্বদা আল্লাহ্র এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্যময় গৃহে অবস্থান করিতেছ অথচ ইহার অত্যাশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে মোটেই মুগ্ধ হইতেছে না! এই বিশ্বজগত আল্লাহ্র গৃহ। ভূতল ইহার বিছানা এবং আকাশ ইহার ছাদ। বিনা-স্তম্ভে এত বড় ছাদ স্থির রহিয়াছে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। পাহাড়-পর্বত এই গৃহের ধনভাণ্ডার এবং সমুদ্র ইহার রত্নাগার। জীবজন্তু ও উদ্ভিদ ইহার গৃহসামগ্রী। চন্দ্র এই গৃহের প্রদীপ, সূর্য মশাল, তারকারাজি ঝাড়লণ্ঠন এবং ফেরেশ্তাগণ ইহার মশালধার।

কিন্তু তুমি এই রাজপ্রাসাদারের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একেবারে অচেতন। কারণ এই রাজপ্রাসাদ অতি বড়; কিন্তু তোমার চক্ষু নিতান্ত ছোট। এই ক্ষুদ্র চক্ষে এত বড় রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইতেছ না। তুমি এমন পিপীলিকাসদৃশ যে রাজপ্রসাদে কোন একটি ছিদ্র করিয়া ইহাতে বাস কর। সে নিজের বাসগৃহ, আহার এবং বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের খবরও রাখে না। সে রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য, দাসদাসীর প্রাচুর্য, রাজসিংহাসনের প্রতাপ এবং স্বয়ং সম্রাটেরও কোন সংবাদ রাখে না।

আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে মানবের ক্ষমতা–তুমি যদি উপরিউক্ত পিপীলিকার ন্যায় জীবন যাপন করিতে চাও তবে যেমনভাবে আছ তেমনই থাক। কিন্তু তোমাকে আল্লাহ্র মারিফাতরূপ উদ্যানে অনন্ত সৌন্দর্য দর্শনের পন্থা দেখানো হইল। তুমি একবার বাহিরে আসিয়া নয়ন খোল, আল্লাহ্র শিল্পনৈপুণ্য তোমার নয়নগোচর হইবে এবং তোমাকে অচেতন ও হতভম্ব হইয়া পড়িতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা)

আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বহু মকাম আছে। তন্মধ্যে তাওয়াক্কুল একটি অতি উন্নত মকাম। কিন্তু ইহার জ্ঞান নিতান্ত সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য এবং তদনুযায়ী কাজ করাও অত্যন্ত দুষ্কর। তাওয়াক্কুল অনুযায়ী কাজ করা নিতান্ত দুষ্কর হওয়ার কারণ এই– (১) যদি কোন ব্যক্তি মানুষের কার্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের দখল আছে বলিয়া মনে করে তবে তাহাকে তাওহীদে প্রকৃত বিশ্বাসী বলা যায় না। (২) আবার সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও মানবীয় কার্য এতদুভয়ের মধ্য হইতে উপকরণ বা মধ্যবর্তী কারণসমূহ বাদ দিলে শরীয়তের প্রতি নিন্দাবাদ করা হয়। আর (৩) মানবীয় কার্যাবলীর প্রকাশ্য কারণসমূহের কোন কারণ বাদ দিলে বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। অপর দিকে (৪) প্রকাশ্য কারণসমূহের কোন একটিকে প্রধান বিবেচনা করিয়া তৎপ্রতি ভরসা করিলে খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া যায় না। সুতরাং তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা এইরূপ হওয়া আবশ্যক যাহা যুক্তি, শরীয়ত এবং তাওহীদ-সঙ্গত হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সকলে উহা বুঝিতে পারে না। এইজন্য প্রথমে তাওয়াক্কুলের ফযীলত বর্ণনা করিব। তৎপর ইহার প্রকৃত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। পরিশেষে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তির মনের যে অবস্থা ঘটে এবং যেরূপ কার্য সম্পাদনের চেষ্টা হয়, তৎসমুদয় বর্ণনা করিব।

তাওয়াক্কুলের ফযীলত–আল্লাহ্ তা'আলা সকলকেই তাওয়াক্কুল করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং ইহাকে ঈমানের শর্তরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ –

অর্থাৎ "তোমারা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল কর।" (সূরা মায়িদা, ৪ রুকূ, ৬ পারা।) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ –

অর্থাৎ "যাহারা তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, ১৭ রুকূ ৪ পারা।) আল্লাহ্ আর বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ –

অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্‌র তাহার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা তালাক, ১ রুকূ, ২৮ পারা।) তিনি আবার বলেন ঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন?" (সূরা যুমর, ৪ রুকূ, ২৪ পারা।) তাওয়াক্কুলের ফযীলত সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন শরীফে এবংবিধ আরও বহু আয়াত আছে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমাকে আমার সকল উম্মত দেখানো হইল। আমি আমার উম্মতে পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমি পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম। আমার উম্মতের আধিক্য দেখিয়া আমি বিস্মিত ও প্রীত হইলাম। আল্লাহ্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,–'আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি?" আমি নিবেদন করিলাম–'হাঁ সন্তুষ্ট হইয়াছি।' আল্লাহ্ বলিলেন–'তন্মধ্যে সত্তর হাযার লোক বিনা-হিসাবে বেহেশতে যাইবে।" ইহা শুনিয়া সাহাবাগণ (রা) হযরত (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন–"যাহারা বিনা-হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবেন, তাঁহারা কে?" হযরত (সা) বলিলেন–"যাহারা মন্ত্রতন্ত্রের উপর নির্ভর করে না (রোগমুক্তির জন্য লোহা পোড়া দিয়া দাগ দেয় না এবং শুভাশুভ লগ্ন দেখিয়া কাজ করে না), বরং একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর ভরসা করে না।" ইহা শুনিয়া হযরত ওকাশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাকে এই সত্তর হাযারের অন্তর্ভুক্ত করেন।" হযরত (সা) প্রার্থনা করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্ এই ব্যক্তিকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত কর।" তৎপর অপর একজন সাহাবী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জন্য তদ্রূপ দু'আ করিতে হযরত (সা)-কে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন–"এই ক্ষেত্রে ওকাশা (রা) তোমার পূর্বে কৃতকার্য হইয়াছে।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র উপর যেরূপ তাওয়াক্কুল করা উচিত তোমরা যদি তদ্রূপ তাওয়াক্কুল কর আল্লাহ

তোমাদিগকে এমনভাবে রুযী দান করিবেন যেমন তিনি পক্ষীদিগকে দিয়া থাকেন। পক্ষীগণ প্রাতে ক্ষুধার্থ অবস্থায় বাসা ত্যাগ করে সন্ধ্যাবেলায় তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।" তিনি বলেন–"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাহার সমস্ত কাজ সমাধা করিয়া থাকেন এবং এমন স্থান হইতে তাহাকে জীবিকা দান করেন যাহা পূর্বে তাহার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই। আর যে-ব্যক্তি দুনিয়ার আশ্রয় লয়, আল্লাহ্‌ও তাহাকে দুনিয়ার নিকট সোপর্দ করিয়া দেন।"

কাফিরগণ যখন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে চড়কে বসাইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন–

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্ আমার পক্ষে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্য-নির্বাহক।" চড়ক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তিনি যখন শূন্য হইতে পড়িতেছিলেন তখন হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"কোন সাহায্য চাহেন কি?" তিনি উত্তর দিলেন–"তোমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই।" হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম পূর্বেই বলিয়াছেন حَسْبِيَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট সহায়। এই উক্তির উপর দৃঢ়পদ থাকিবার জন্যই তিনি হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম অযাচিতভাবে যে সাহায্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। এই কারণেই আল্লাহ তাঁহাকে অঙ্গীকার রক্ষাকারী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলেন–

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى –

অর্থাৎ "ইবরাহীম সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছেন।" হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের উপর ওহী নাযিল হইয়াছিলঃ "হে দাঊদ, যে ব্যক্তি সমস্ত দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, সমগ্র ভূতল ও গগনমণ্ডল তাহার সহিত প্রবঞ্চনা করিলেও আমি তাহাকে সকলের প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা করি এবং তাহার সকল বিপদ দূর করিয়া দেই।"

হযরত সাঈদ ইব্‌নে জুবায়র রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর হস্তে একদা বিচ্ছু দংশন করিল। তাঁহার মাতা তাঁহাকে শপথ দিয়া হস্তখানি ঝাড়িবার জন্য মন্ত্রপাঠকের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে আদেশ করিলেন। তিনি ইহাতে বাধ্য হইয়া যে-হস্তখানি

সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ছিল, বিচ্ছু দংশন করে নাই, সেই হস্তখানি ওঝার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন–"রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন–'যে-ব্যক্তি মন্ত্র ও উত্তপ্ত লৌহের দাগের উপর ভরসা করে, সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী নহে।" হযরত ইবরাহীম আদ্‌হাম (রা) এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আপনি জীবিকা কোথা হইতে পাইয়া থাকেন?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন–'যিনি আমাকে জীবিকা দান করেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। কারণ, কোথা ইহতে তিনি আমাকে জীবিকা দান করেন তাহা আমি কিছুই জানি না।" এক ব্যক্তিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকেন; আহার চলে কিরূপে?" তিনি দাঁতের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন–"যিনি এই পেষণ যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি শস্য-দানাও পাঠাইয়া থাকেন।" "হযরত হরম ইব্‌নে হায়্যান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হযরত উয়াইস করনী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"কোন্ দেশে বাস করিব?" তিনি বলিলেন–"শ্যাম দেশে।" হযরত হরম (র) বলিলেন–"তথায় জীবিকা মিলিবে কি উপায়ে?" হযরত উয়াইস করনী (রা) বলিলেন ঃ

اُفٍّ لِّهٰذِهِ الْقُلُوْبِ قَدْ خَالَطَهَا الشَّكُّ وَلَا يَنْفَعُهَا الْمَوْعِظَةُ –

অর্থাৎ "যে মনে সন্দেহ প্রবল এবং কোন উপদেশে কোন উপকার হয় না তাহার জন্য আক্ষেপ!"

তাওয়াক্কুলের ভিত্তিরূপে তাওহীদের হাকীকত– মনের একটি উন্নত অবস্থার নাম তাওয়াক্কুল এবং ঈমানের ফলস্বরূপ এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঈমানের বহু শাখা-প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে দুইটি শাখার উপর ঈশান আনয়ন করাকেই তাওয়াক্কুল বলে, যথা–(১) তাওহীদ এবং (২) আল্লাহ্‌র অসীম করুণা ও দয়া। তাওহীদের জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের চরম সীমা এবং ইহার সম্যক বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এ-স্থলে তাওয়াক্কুলের ভিত্তিরূপে তাওহীদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইবে।

তাওহীদের শ্রেণীবিভাগ–তাওহীদের চারিটি শ্রেণী আছে। আবার তাওহীদের একটি মগজ ও একটি মগজের মগজ এবং একটি ছাল ও একটি ছালের ছাল রহিয়াছে। সুতরাং উহার দুইটি মগজ ও দুইটি ছাল হইল। উহা কাঁচা আখ্‌রোট সদৃশ্য; ইহার দুইটি ছাল, একটি প্রকাশ্য মগজ (সার ভাগ) এবং ইহার তৈলই মগজের মগজ।

প্রথম শ্রেণীর তাওহীদ– لا اله الا الله কলেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করা। কিন্তু ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করা। একমাত্র মুনাফিকগণই এইরূপ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর তাওহীদ–সর্বসাধারণ লোকের ন্যায়– لا اله الا الله (আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই) কলেমাতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখা অথবা যুক্তি অনুসন্ধানকারী ব্যক্তির ন্যায় এক প্রকার যুক্তিপ্রমাণে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদ–প্রত্যক্ষ দর্শনে উপলব্ধি করা। যাঁহারা এইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন-ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকল বস্তুর মূলে একমাত্র আল্লাহকে দেখিতে পান এবং এক আল্লাহ্কেই সকল কার্যের কর্তা বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা দেখিতে পান না। এই শ্রেণীর লোকের তাওহীদ জ্ঞান এক প্রকার নূর। ইহা হৃদয়ে উৎপন্ন হয় এবং এই নূরের প্রভাবে তাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন-ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস-জ্ঞান সর্বসাধারণ লোকের বিশ্বাস-জ্ঞান ও যুক্তিবাদীদের বিশ্বাস-জ্ঞানের অনুরূপ নহে। শেষোক্ত দুই রকম লোকের বিশ্বাস-জ্ঞান, অন্ধ-অনুকরণ বা যুক্তি-প্রমাণ প্রভাবে তাহাদের হৃদয়ে এক-প্রকার গ্রন্থিস্বরূপ লাগিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনজনিত বিশ্বাস-জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়, সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং যুক্তি-প্রমাণের সকল শর্তাদি বিদূরিত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদ-বিশ্বাসীদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এক ব্যক্তি অপরের মুখে শুনিল যে, অমুক ব্যক্তি গৃহের ভিতর আছে এবং ইহা সে বিশ্বাস করিয়া লইল। এই বিশ্বাস সাধারণ লোকের ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ হইল। কারণ সাধারণ লোকে তাহাদের পিতামাতার মুখে শ্রবণ করিয়াই বিশ্বাস স্থাপন করে। আর একজন লোক সেই ব্যক্তির গৃহদ্বারে তাহার বাহন অশ্ব ও ভৃত্যকে দেখিতে পাইল এবং এই প্রমাণ পাইয়া সে বিশ্বাস করিয়া লইল যে, ঐ ব্যক্তি গৃহের অভ্যন্তরে আছে। এই বিশ্বাস যুক্তিবাদী তার্কিকগণের বিশ্বাসের অনুরূপ। তৃতীয় ব্যক্তি সেই ব্যক্তির গৃহে প্রবেশপূর্বক স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়া লইল। ইহা প্রত্যক্ষদর্শী আরিফগণের বিশ্বাসের অনুরূপ, কারণ শেষোক্ত ব্যক্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লইল। এই প্রকার লোকের তাওহীদ-জ্ঞান অতীব উন্নত। কিন্তু আরিফ এই শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া

সৃষ্ট পদার্থও দেখিতে পান এবং সৃষ্টিকর্তাকেও দেখিতে পান। এইজন্য এই শ্রেণীর তাওহীদে বহুত্বেরও অধিকার আছে। আরিফ যতক্ষণ সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট পদার্থ উভয়কেই দেখিবে ততক্ষণ দ্বিত্বভাব বর্তমান থাকিবে এবং তাহার মন নির্বিকারভাবে একদিকে নিবিষ্ট থাকিবে না। এইজন্য ইহা চরম একত্ববাদ নহে।

চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদ–এই শ্রেণীর তাওহীদ-জ্ঞান লাভ করিলে আল্লাহ্ পরিচয়ে বিভূষিত ব্যক্তি এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। সমস্তই এক বলিয়া দেখিতে পান ও এক বলিয়াই বুঝিতে পারেন। এইরূপ আরিফের নিকট দ্বিত্বভাবের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না। সূফীগণের পরিভাষায় ইহাকে 'ফানা ফিত্তাওহীদ' (একত্ববাদে লয়প্রাপ্ত হওয়া) বলে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এই–একদা হযরত হুসায়ন হাল্লাজ (র) হযরত খাওওয়াসকে (র) বিজন প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি এখানে কি করিতেছ?" তিনি বলিলেন–"আমি নিজকে তাওয়াক্কুল বিষয়ে অটল শিক্ষা দিতেছি।" হযরত হুসায়ন হাল্লাজ (র) বলিলেন–"তুমি ত অভ্যন্তরীণ সৌষ্ঠব বর্ধনে সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছ। আচ্ছা বল ত, তুমি নিজের অস্তিত্ব কখন ভুলিবে এবং ইহার মাধ্যমে তাওহীদের মকামে কখন পৌঁছিবে?"

প্রথম শ্রেণীর তাওহীদ-বিশ্বাস অর্থাৎ মুখে ঈমানের কলেমা পাঠ করিয়া অন্তরে বিশ্বাস না করা মুনাফিকদের কাজ। ইহা কাঁচা আখরোটের বাহিরের ছাল সদৃশ। ইহা দেখিতে সুন্দর ও সবুজ কিন্তু খাইতে গেলে নিতান্ত বিস্বাদ লাগে। এই ছালের ভিতরের ভাগও মন্দ। ইহা পোড়াইতে গেলেও ধূম নির্গত হইয়া অগ্নি নিবাইয়া ফেলে। আবার ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও কোন কাজে লাগে না; বরং অনর্থক গৃহের খালি স্থান আবদ্ধ করিয়া রাখে। বাহিরের ছালটির একমাত্র উপকারিতা এই যে, ইহাকে কিছু দিন আখরোটের পৃষ্ঠে লাগিয়া থাকিতে দিলে ভিতরের ছালটি তাজা থাকে এবং ফলটি বিপদাপদ হইতে রক্ষা পায়। মুনাফিকদের তাওহীদের ঠিক এই অবস্থা। ইহা ত কোন কাজের নহে, তথাপি ইহা মুনাফিকদের দেহকে মুসলমানদের তলওয়ার হইতে রক্ষা করে। মুনাফিকগণ মুখে আল্লাহ্কে এক বলিয়া প্রকাশ করে এবং নিজদিগকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়। এইজন্য জিহাদে তাহাদিগকে মুসলমানদের শত্রু বলিয়া ধরা যায় না এবং বধও করা হয় না। এইরূপে তাহাদের মৌখিক তাওহীদের কারণে তাহারা মুসলমানের তলওয়ার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া

থাকে। কিন্তু মৃত্যু-ঘটনায় যখন তাহাদের দেহ লয়প্রাপ্ত হইয়া কেবল আত্মাই আত্মা অবশিষ্ট থাকিবে তখন তাহাদের মৌখিক তাওহীদ আত্মারূপ শাঁসকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

নাজাতের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর তাওহীদ আবশ্যক– আখরোটের ভিতরের ছাল জ্বালাইবার কাজে লাগে না। ইহা আখরোটের পৃষ্ঠে লাগিয়া থাকিলে ইহার আবরণে শাঁস রক্ষা পায়—নষ্ট হয় না। কিন্তু শাঁসের তুলনায় এই ছাল নিতান্ত তুচ্ছ। সাধারণ লোক ও যুক্তিবাদীদের তাওহীদেরও ঠিক এই অবস্থা। এই শ্রেণীর তাওহীদ আত্মাকে দোযখের অগ্নি হইতে বাঁচাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধুর্য পাওয়া যায় না। আখরোটের শাঁস কাম্য ও প্রিয় বস্তু। কিন্তু শাঁসলব্ধ তৈলের সহিত তুলনা করিলে স্থূল পদার্থ হিসাবে ইহার মূল্য সামান্য মাত্র। আর শাঁস আখরোট ফলের সৌন্দর্যের চরম বিকাশও নহে। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদে পার্থক্য-জ্ঞান ও বহুত্বভাব বিদ্যমান থাকে এবং ইহা পূর্ণ হাওহীদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বরং চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদই ইহার চরম উন্নত সোপান। এই সোপানে উপনীত হইলে জগতের সকল পদার্থের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া কেবল এক আল্লাহ্ অবশিষ্ট থাকেন এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখা যায় না; তখন নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। ফলকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত নিজের সত্ত্বাও তখন দৃষ্টিগোচর হয় না।

চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদ নিতান্ত কঠিন ও তাওয়াক্কুলের জন্য আবশ্যক নহে– প্রিয় পাঠক, তুমি হয়তো বলিবে, তাওহীদের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ নিতান্ত দুর্বোধ্য। এই ক্ষেত্রে জানা আবশ্যক যে, চক্ষের সম্মুখে অসংখ্য পদার্থ আছে, যেমন–আকাশ, পৃথিবী এবং অগণিত সৃষ্টবস্তু; আর এই সকল এক নহে; এমতাবস্থায় সবগুলিকে কি করিয়া এক মনে করিব? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মুনাফিকের তাওহীদ মৌখিক, সর্বসাধারণের তাওহীদ অন্ধ অনুকরণপ্রসূত ও যুক্তবাদীদের তাওহীদ যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আরিফগণের তাওহীদ প্রত্যক্ষদর্শনলব্ধ। এই তিন শ্রেণীর তাওহীদ তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদ বুঝিতে পারাই নিতান্ত কঠিন। তাওয়াক্কুলের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদের প্রয়োজন হয় না। ইহার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদই যথেষ্ট।

যে-ব্যক্তি চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদের উচ্চতম সোপানে উপনীত হয় নাই

তাহাকে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা বুঝানো নিতান্ত কঠিন। কিন্তু মোটামুটিভাবে এখানে কিছু বর্ণনা করা যাইতেছে। বিশ্বজগতে এমন বহু পদার্থ আছে যাহারা সংখ্যায় বহু হইলেও তাহাদের মধ্যে এক প্রকার মিল থাকার দরুন তাহারা এক হইয়া পড়ে। আরিফগণ এইভাবেই অবলোকন করিয়া থাকনে। এইজন্য বিশ্বচরাচরের অগণিত পদার্থ তাহাদের নয়নগোচর হয় না; একমাত্র একজনকেই তাঁহারা দেখিয়া থাকেন। মানবদেহে গোশ্‌ত, চর্ম, মস্তিষ্ক, হস্তপদ, উদর, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস থাকিলেও বাস্তবপক্ষে গোটা মানুষটি এক ও অভিন্ন। কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হইলে সকলেই তাহাকে এক ও অভিন্ন বস্তু বলিয়াই মনে করে; তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় না। মনে কর, তুমি এক ব্যক্তির কোন একটি অঙ্গমাত্র দেখিতে পাইলে, এমন সময় অপর কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কি দেখিলে?' ইহার উত্তরে তুমি নিশ্চয়ই বলিবে–"আমি একের অধিক কিছুই দেখি নাই, একজন মানুষমাত্র।" কোন ব্যক্তি তাহার প্রিয়জনের ভালবাসার বিষয় চিন্তা করিতেছে, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়–"তুমি কি ভাবিতেছ?" সে উত্তরে বলিবে–"আমি একের অধিক কিছুই ভাবিতেছি না–যাহার কথা ভাবিতেছি তিনি আমার একজন প্রেমাস্পদমাত্র।" উপরিউক্ত উভয় উত্তরেই বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও গোটা মানুষটিকে এক বলিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে।

মারিফাতের পথে এমন এক উন্নত মকাম আছে যেখানে উপস্থিত হইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশ্বজগতের সকল পদার্থ এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া মিলিত আছে এবং এই মিলনের দরুন উহারা একই প্রাণীদেহবৎ হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেমন পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর মধ্যেও তদ্রূপ পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ইহার প্রাণের সহিত যেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে, বিশ্ব-জগতের সমস্ত পদার্থেরও স্বীয় পরিচালকের সহিত এক হিসাবে তদ্রূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অবশ্য দেহ-পরিচালক প্রাণের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের যেরূপ সম্বন্ধ আছে, বিশ্ব পরিচালক আল্লাহ্‌র সহিত সর্ববিষয়ে সৃষ্ট পদার্থে তদ্রূপ সম্বন্ধ নাই। আর এক কথা এই যে–

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ –

এই বাক্যের মর্ম যতক্ষণ কেহ বুঝিতে না পারিবে ততক্ষণ তাওহীদ সম্বন্ধে উক্ত

সূক্ষ্ম বিষয়ও কেহ বুঝিতে পারিবে না। 'দর্শন' খণ্ডে এই বিষয়ে আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক না বলিয়া নীরব থাকাই উত্তম। কারণ, ইহার বিস্তৃত আলোচনা ভাবোন্মত্ত লোকের জিঞ্জির ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং সাধারণ লোকেরাও উহা বুঝিতে পারে না।

তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদকে 'তাওহীদে ফে'লী' (ক্রিয়া-সম্পর্কিত তাওহীদ) বলা হয়। এই সম্বন্ধে 'ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয় বুঝিবার মত তোমার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে তথায় দেখিয়া লইতে পার। 'পরিত্রাণ' পুস্তকের 'শুকর' অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্যকরূপে বুঝিয়া লওয়াই এই স্থলে যথেষ্ট মনে করি। তথায় যাহা বলা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

জাগতিক কার্যাবলীর মূল কারণ– চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘ-বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি যাহাদিগকে তোমরা জাগতিক কার্যবলীর কারণ বলিয়া মনে করিতেছ, তৎসমুদয় লেখকের হস্তস্থিত কলমের ন্যায় পরম কৌশলী আল্লাহ্‌র নিতান্ত অধীন। ইহারা স্বীয় স্বাধীন ক্ষমতায় একটু হেলিতে দুলিতেও পারে না। বরং আল্লাহ্ ইহাদিগকে প্রয়োজন মত যথাসময়ে সঞ্চালন করিয়া থাকেন। যদি ইহাদিগকে কেহ কার্যের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে তবে মহা ভুল করা হইবে। এইরূপ বিবেচনা করা এবং পুরস্কার দানের আদেশ কলম দ্বারা লিখিত হয় বলিয়া কলম ও কাগজের উপর পুরস্কার দানের ক্ষমতা আরোপ করা একই কথা। তবে দেখা দরকার জীবনের কোন স্বাধীন ক্ষমতা আছে কি না। কেননা তোমরা মনে কর মানুষেরও কিছু ক্ষমতা আছে। অথচ এইরূপ মনে করা, মহাভ্রম। কেননা মানুষ অত্যন্ত নিঃসহায় ও একান্ত বশীভূত। এই কথা একাধিকবার বলা হইয়াছে। অবশ্য মানুষের কার্য তাহার ক্ষমতার সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু ক্ষমতা ইচ্ছার আজ্ঞাধীন। এমনকি মনে যেরূপ ইচ্ছা জন্মে মানুষ তদনুসারেই কাজ করিয়া থাকে। এই ইচ্ছা আবার আল্লাহ্ জন্মাইয়া থাকেন এবং মানুষও তদনুসারেই ইচ্ছা করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ক্ষমতা যখন ইচ্ছার অধীন এবং ইচ্ছা মানুষের আয়ত্তে নাই তখন কোন কার্যই মানুষের আয়ত্তে নাই।

মানুষের কার্যের ত্রিবিধ সোপান–মানুষের কার্য কত প্রকার এবং কিরূপে উহা সম্পন্ন হয় যখন ইহা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে তখন বুঝিতে পারিবে যে, কার্যের উপর মানুষের বাস্তবিকই কোন ক্ষমতা নাই। মানুষের

কার্যের তিনটি সোপান আছে। **প্রথম**–স্বাভাবিক কার্য। ইহার দৃষ্টান্ত এই—লোকে পানির উপর পা রাখিলে পা তৎক্ষণাৎ পানির মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা দেখিয়া লোকে বলিবে, মানুষের পা পানিরাশি বিদীর্ণ করিয়া ইহার এক ভাগকে অপর ভাগ হইতে পৃথক করত ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাকে স্বাভাবিক কার্য বলে। **দ্বিতীয়**–ঐচ্ছিক কার্য। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এই শ্রেণীর কার্যের অন্তর্ভুক্ত। **তৃতীয়**–এখতিয়ারী কার্য। চলাফেরা করা, কথা বলা ইত্যাদি এই শ্রেণীর কার্যের অন্তর্গত।

এখন উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই কথা কাহারও অবিদিত নহে যে, স্বাভাবিক কার্যের উপর মানুষের কোন ক্ষমতা চলে না। মানুষ কামনা করুক বা না করুক, স্বাভাবিক কার্য প্রাকৃতিক নিয়মে নিষ্পন্ন হইবেই। পানি উপর পা রাখিলে পায়ের চাপে পানি আপনা-আপনি দুই ভাগ হইয়া পড়ে। ইহা মানুষের ক্ষমতাধীন নহে। পানিতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে প্রস্তরও ডুবিয়া যাইবে। ডুবিয়া যাওয়া প্রস্তরের ক্ষমতাভুক্ত কার্য নহে। পাথর ভারী বলিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই ইহা পানিতে ডুবিয়া যায়। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ন্যায় ঐচ্ছিক কার্যগুলিও মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত। কারণ সে চেষ্টা করিলেও নিশ্বাস বন্ধ রাখিতে পারে না। মানুষকে এমন করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ইচ্ছা তাহার মধ্যে আপনা-আপনি জন্মে। কোন ব্যক্তি যদি দূর হইতে কাহারও চক্ষে সূচ নিক্ষেপ করিতে চাহে তবে অবশ্যই সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া লইবে। সে ইচ্ছা করিলেও চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া থাকিতে পারিবে না; কারণ তাহাকে এমন করিয়া সৃষ্টিই করা হইয়াছে যে, আপনা-আপনিই তখন চক্ষু মুদ্রণ করিবার ইচ্ছা তাহার মনে উদিত হয়। পানি উপর দাঁড়াইলে মানুষ যেমন ডুবিয়া যায়, চক্ষু-মুদ্রণ কার্যে তদ্রূপ আল্লাহ্‌র প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানবকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতছে যে, স্বাভাবিক এবং ঐচ্ছিক উভয় শ্রেণীর কার্য আল্লাহ্-সৃষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইতেছে, তন্মধ্যে মানুষের কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই।

এখন বাকী রহিল চলাফেরা করা, কথা বলা ইত্যাদি এখতিয়ারী কার্য। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, এই শ্রেণীর কার্যগুলি লোকে ইচ্ছা করিলে করিতে পারে আর ইচ্ছা না করিলে বন্ধ রাখিতে পারে। সুতরাং এই শ্রেণীর কার্য করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই–এই কথা বলিলে প্রথমে স্বীকার

করিয়া লওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। জানিয়া রাখ, যে-কার্যে মঙ্গল আছে বলিয়া বুদ্ধি নির্দেশ দেয়, সেই কার্য করিতে মনে স্বভাবতই ইচ্ছা জন্মে। কখন কখন সেই কার্যে মঙ্গেল আছে কি না, কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। মঙ্গল আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে ইচ্ছা অবিলম্বে জাগ্রত হয় এবং সেই কর্ম সম্পাদন করিতে যে-অঙ্গের আবশ্যক মানুষ তাহা সঞ্চালন করিয়া থাকে। এই কারণে চক্ষে সূচ নিক্ষেপের ভয় দেখাইলে তৎক্ষণাৎ মনে এই কথার বিচার নিষ্পত্তি হয় যে, সূচ নিক্ষেপ করিলে ক্ষতি হইবে এবং চক্ষু বন্ধ করিলে উপকার হইবে। এইস্থলে এইরূপ জ্ঞানটি স্বতঃসিদ্ধরূপে সর্বদা মনে জাগ্রত থাকে বলিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। বিনা-চিন্তাতেই বুঝা যায় যে, চক্ষু মুদ্রিত করিলে উপকার হইবে। এই জ্ঞান-তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদ্রণের ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয় এবং ইচ্ছার প্রভাবে সঞ্চালন-শক্তি আসিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলে। ধীর-স্থিরে চিন্তা করিয়া কার্য করিলেও এইক্ষেত্রে অনুরূপ কার্যই করিতে হইত। আবার দেখ, কাহাকেও প্রহার করিতে লাঠি উঠলে সে স্বাবতই দৌড়িয়া পলায়ন করে। এমতাবস্থায় যদি সে দৌড়িয়া কোন ছাদের কিনারায় যাইয়া উপস্থিত হয় এবং আঘাত করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার পশ্চাদানুসরণ করে তবে সেই ব্যক্তি আঘাত অপেক্ষা লাফ দিয়া পড়া সহজ বোধ করিলে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া নিচে পড়িবে। কিন্তু যদি বুঝিতে পারে যে, লাফ দিয়া পড়া অপেক্ষা আঘাত সহ্য করা সহজ তবে আপনা-আপনিই তাহার পা নিশ্চল হইয়া যাইবে এবং, লাফ দিয়া পড়িবার ক্ষমতাই তাহার মধ্যে থাকিবে না। কারণ লাফ দেওয়া ইচ্ছার অধীন এবং ইচ্ছা আবার বিবেকের নির্দেশ অনুসারে জাগ্রত হয়। বিবেকের বিচারে যে কার্য ভাল ও করিবার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়, ইচ্ছা সেই কার্যের দিকেই ঝুকিয়া পড়ে।

আবার দেখ, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করিলে চাহিল। কিন্তু তাহার হস্তে প্রচুর শক্তি ও ছুরি থাকা সত্ত্বেও সে আত্মহত্যা করিতে পারে না। কারণ, হস্তের শক্তি ইচ্ছার অধীন এবং ইচ্ছা বিবেকের নির্দেশে চলে। বিবেক যখন বলে যে, এই কার্য তোমার জন্য ভাল এবং করিবার উপযুক্ত তখনই ইচ্ছার উদয় হয়। আবার বিবেকও নিতান্ত পরাধীন এবং ইহার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। কেননা, ইহা নির্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। যে-কার্য ভাল ইহার ছবি বিবেকরূপ দর্পণের উপর প্রতিফলিত হয়। আত্মহত্যা মন্দ কাজ; এইজন্য ইহার ছবি বিবেকরূপ দর্পণের উপর প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বিপদাপদে

জর্জরিত হইতে থাকে ও সহ্য করিতে অক্ষম হয় এবং যন্ত্রণা-ভোগ অপেক্ষা আত্মহত্যা সহজ বলিয়া মনে হয় তখন বিবেকরূপ দর্পণে উহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়।

এই শ্রেণীর কার্যকে এখ্তিয়ারী বলার কারণ এই যে, বুদ্ধিবলে কার্যের উপকারিতা বুঝা যায় মাত্র। নতুনা এই শ্রেণীর কার্যও অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই সকল কার্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এবং সূচবিদ্ধ হওয়ার ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করার ন্যায়ই। আবার শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া এবং চক্ষু বন্ধ করা কার্যদ্বয়ও পানিতে ডুবার ন্যায় আল্লাহ্-প্রদত্ত স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই সংঘটিত হয়। এইরূপে যাবতীয় কার্য-কারণের মধ্যে একটি কারণ অপর কারণের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে কারণগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া একটি শিকলের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। এই শিকলের কড়ি বহু। 'ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে এই কারণ শৃঙ্খলের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে যে ক্ষমতা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা জাগতিক কারণ-শৃঙ্খলের অন্তর্গত একটি কড়ি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইজন্যই লোকে মনে করে যে তাহার ক্ষমতা আছে। এইরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল।

মানবের ক্ষমতা নিজস্ব নহে, সে আল্লাহ্র ক্ষমতা-প্রবাহের স্থানমাত্র—মানব কেবল আল্লাহ্র ক্ষমতা-প্রবাহের একটি স্থানমাত্র। এতদ্ব্যতীত ক্ষমতার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইজন্যই মানবকে ক্ষমতাবান বলিয়া মনে করা মহা ভুল। ফলকথা, মানব আল্লাহ্র ক্ষমতা-প্রবাহের অন্তর্গত একটি মধ্যবর্তী স্থানমাত্র। আল্লাহ্ই এই ক্ষমতা মানবের মধ্যে জন্মাইয়া দিয়া থাকে। বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষ নড়ে বটে, কিন্তু আল্লাহ্ ইহাতে নড়িবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কিছুই সৃষ্টি করেন না। এইজন্যই বৃক্ষকে কেহ আল্লাহ্র ক্ষমতা-প্রবাহের স্থান বলিয়া মনে করে না এবং বায়ু-প্রবাহে বৃক্ষের দোলনকে পরপরিচালিত বলা হয়। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সংঘটিত হয় এবং তাঁহার ক্ষমতা কোন কিছুরই অধীন নহে। এই কারণে ইহাতে 'ইখ্তিরা' (সৃষ্টি) বলে। মানুষের কার্য বৃক্ষের দোলনের ন্যায় সম্পূর্ণ পরপরিচালিত নহে; আবার আল্লাহ্র কার্যের ন্যায় সম্পূর্ণ নিজ অধিকারেও নহে। মানুষের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অন্যান্য কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সকল কারণের উপর তাহার কোন ক্ষমতা চলে না। মানুষের কার্য আল্লাহ্র কার্যের ন্যায় নহে বলিয়া ইহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। আবার মানুষ আল্লাহ্র ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রবাহস্থান হওয়াতে তিনি আবশ্যকমত মানুষের মধ্যে ক্ষমতা

ও ইচ্ছা জন্মাইয়া দেন। তজ্জন্য বৃক্ষের ন্যায় মানুষ সম্পূর্ণ পরপরিচালিত নহে। কাজেই মানুষের কার্যকে অন্যের পরিচালিতও বলা চলে না। মানুষের কার্য সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এইজন্যই মানুষের কার্যের নিমিত্ত অপর একটি নাম বাহির করা হইয়াছে এবং ইহাকে 'কসব' (অর্জন) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে, যদিও মানুষের কার্য এক হিসাবে তাহার ক্ষমতার মধ্যে আছে তথাপি তাহার নিজস্ব স্বাধীন ক্ষমতা না থাকায় এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় তাহার ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত হওয়ায় বাস্তবপক্ষে মানুষের স্বাধীন ক্ষমতায় কোন কার্য সংঘটিত হয় না।

তিনটি প্রশ্ন–প্রিয় পাঠক, এই স্থলে তুমি হয়ত বলিতে পার– (১) কার্যের উপর মানুষের যখন কোন ক্ষমতা নাই তখন মানুষ কেন পুরস্কার বা শাস্তি পাইবে? (২) শরীয়তই বা তাহার জন্য কেন নির্ধারিত হইয়াছে? (৩) অনেকে এইরূপ মনে করে যে, মানুষের ক্ষমতার মধ্যে কিছুই নাই, সমস্তই আল্লাহ্ করিয়া থাকেন। তাহারা আরও বুঝে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে শত চেষ্টা করিলেও দুর্গতি হইতে বাঁচিতে পারিবে না এবং যাহার অদৃষ্টে তখন সৌভাগ্যের আদেশ হইয়াছে তাহার পক্ষে চেষ্টার কোন দরকার নাই। এমতাবস্থায় চেষ্টা-তদবীর করিয়া কি লাভ? এইরূপ বিশ্বাস পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার নিদর্শন এবং বিনাশের কারণ। এই সকল বিষয়ের হাকীকত কোন গ্রন্থে লেখা উচিত নহে। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে যখন এতটুকু বলা হইল তখন কিছুটা আভাস দেওয়া যাইতেছে।

সাধারণের পক্ষে একটি ভয়াবহ বিনাশের স্থান–প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, তাওহীদের একটি ভয়াবহ মারাত্মক স্থান আছে। দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট বহু লোক এই অতল সমুদ্রে ডুবিয়া মরে। পানির উপর দিয়া যে-ব্যক্তি চলিতে পারে সেই ব্যক্তি এইরূপ বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। পানির উপর দিয়া চলিবার শক্তি না থাকিলেও অন্ততপক্ষে যাহারা সন্তরণপটু তাহারাও রক্ষা পাইয়া থাকে। ডুবিয়া মরার ভয়ে সেই দুস্তর সমুদ্রের ভীষণ আবর্তে কেহ কেহ পদই স্থাপন করে না; এইরূপে তাহারা বাঁচিয়া যায়। সর্বসাধারণ লোক এই সমুদ্রের সংবাদ পায় নাই। সংবাদ পাইলে তাহারা অকস্মাৎ ইহাতে ডুবিয়া মরিতে পারে। সুতরাং তাহাদিগকে উক্ত উচ্চশ্রেণীর তাওহীদ-সমুদ্রের দিকে যাইতে না দেওয়া তাহাদের প্রতি মহাঅনুগ্রহ। এই সমুদ্রে যাহারা ডুবিয়া মরে তাহাদের

অধিকাংশই সন্তরণপটু নহে বলিয়া মারা যায়। আবার কতক লোক সন্তরণ বিদ্যা শিক্ষা না করার দরুন বা ইহা আবশ্যক বলিয়া না জানার নিমিত্ত ডুবিয়া মরে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর – প্রিয় পাঠক, তুমি বলিয়াছ–মানুষের যখন কোন স্বাধীন কার্যক্ষমতা নাই তখন পুরস্কার বা শাস্তি কেন হইবে? ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত কথা ভালরূপে বুঝিয়া লও।

মন্দ কার্য করিলে আল্লাহ্ যে ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাস্তি দিবেন এই কথা ঠিক নহে। তদ্রূপ সৎকার্য করিলে আল্লাহ্ যে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে পুরস্কার দিবেন, ইহাও মনে করিও না। এইরূপ কার্য আল্লাহর পবিত্র স্বভাবের বিরুদ্ধ। তোমার শরীরে রক্ত, পিত্ত বা অন্য কোন ধাতু প্রবল হইয়া উঠিলে ইহার প্রভাবে তোমার শরীরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাকে রোগ বলে। তৎপর ঔষধপত্রাদি ব্যবহার করিলে ও উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে শরীরে অন্য প্রকার অবস্থা আবির্ভূত হয়, তাহাকে স্বাস্থ্য বলে। এইরূপ, লোভ ও ক্রোধ তোমার মনে প্রবল হইয়া উঠিলে তুমি তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়। তাহাতে তোমার অন্তরে এক প্রকার অগ্নি উৎপন্ন হইয়া অন্তরের অন্তঃস্থল দগ্ধ করিতে থাকে এবং ইহাতেই তোমার বিনাশ সাধন হয়। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন–

اَلْغَضَبُ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ –

অর্থাৎ 'ক্রোধ দোযখের এক টুকরা।" অর্থাৎ যে-ক্রোধ তুমি অন্তরে জন্মাইয়া লইলে, অগ্নি-খণ্ডের ন্যায় ইহা তোমার অন্তর পোড়াইতে থাকে। বিবেকের আলোক শক্তিশালী হইলে যেমন ক্রোধরূপ অগ্নি নির্বাণ করিয়া দেয়, তদ্রূপ ঈমানের আলোক দোযখের অগ্নি নির্বাণ করে। এইজন্য দোযখ বলিবে–

جُزْيَا مُؤْمِنُ فَاِنَّ نُوْرَكَ اَطْفَأَ نَارِيْ –

অর্থাৎ "হে ঈমানদার, চলিয়া যাও। অবশ্যই তোমার নূর আমার অগ্নি নির্বাণ করিয়া দিবে।" দোযখের এই ফরিয়াদ ভাষার সাহায্যে প্রকাশ না পাইলেও অবস্থারূপ ভাষায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঈমানের নূর দর্শন করিবার শক্তি দোযখের নাই বলিয়াই সে পলায়ন করিবে। মশা যেমন বায়ু-প্রবাহ দেখিলে পলায়ন করে, ঈমানদারের নূর দেখিয়া দোযখও তদ্রূপ পলাইবে। এইরূপ বিবেকের আলোক দেখিয়া লোভাগ্নিও দূরে পলায়ন করে।

ফলকথা এই যে, তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অন্য স্থান হইতে কোন কিছুই আনয়ন করা হইবে না। বরং তোমার অর্জিত জিনিসই তোমাকে দেওয়া হইবে। এইজন্যই বর্ণিত আছে–

إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ –

অর্থাৎ "তোমাদের কৃতকার্যই দোযখের রূপ ধারণপূর্বক তোমাদের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে।" সুতরাং তোমার ক্রোধ ও বাসনা-কামনাই তোমার দোযখের মূল কারণ। ইহা তোমার সঙ্গে তোমার অন্তরেই বর্তমান আছে। ধ্রুবজ্ঞান থাকিলে তুমি অবশ্যই ইহা দেখিতে পাইতে; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ –

অর্থাৎ "কখনই নহে। তোমাদের যদি ধ্রুবজ্ঞান থাকিত তবে নিশ্চয়ই দোযখ দেখিতে পাইতে।" (সূরা তাকাসুর, ৩০ পারা।)

বিষ পান করিলে মানুষ পীড়িত হয় এবং অবশেষে প্রাণ হারায়। বিষের এইরূপ প্রতিক্রিয়া হয় বলিয়া কেহই তৎপ্রতি ক্রুদ্ধও হয় না এবং প্রতিশোধও গ্রহণ করেন না। বিষ যেমন মানবদেহ পীড়িত করে, পাপ কার্য এবং বাসনা-কামনাও তদ্রূপ মানবাত্মাকে পীড়িত করিয়া ফেলে। আত্মার পীড়া মানবাত্মাকে অগ্নির ন্যায় পোড়াইতে থাকে। এই অগ্নি দোযখের অগ্নির সমজাতীয়–এই জগতের অগ্নির সমজাতীয় নহে। চুম্বক লোহা যেমন ইহার সমজাতীয় লোহাকে স্বীয় অভিমুখে আকর্ষণ করে, দোযখও তদ্রূপ দোযখী লোককে স্বীয় অভিমুখে টানিয়া আনে। ইহা কাহারও ক্রোধের ফলে হয় না। সওয়াবের অবস্থাও এই প্রকার অনুমান করিয়া লও। কেননা, এই সম্বন্ধে বলিতে গেলে বর্ণনা নিতান্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর–তুমি বলিয়াছিলে–শরীয়ত কি উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা কেন জগতে এত পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন? ইহার উত্তর এই—মানুষকে শাসনে রাখিয়া জবরদস্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ করত বেহেশ্তে লইয়া যাইবার জন্যই আল্লাহ এত পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন এবং শরীয়তবিধি প্রচার করিয়াছেন। যেমন রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন–

أَتَعْجَبُ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ –

অর্থাৎ "তুমি কি সেই কওম দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিতেছ, যাহারা শিকলে আবদ্ধ হইয়া বেহেশতের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে?" ইহার মর্ম এই যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ মানবকে জোরজবরদস্তি ফাঁদে আটকাইয়া দোযখের পথ হইতে টানিয়া লইতেছেন। এই সম্বন্ধে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন–

أَنْتُمْ تَتَهَافَتُوْنَ عَلَى النَّارِ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ –

অর্থাৎ "তোমরা পতঙ্গের ন্যায় নিজকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ। আর আমি তোমাদিগকে আগুনে পতিত হইতে না দিবার জন্য তোমাদের কোমরে ধরিয়া টানিতেছি।"

আল্লাহ্ তা'আলা যে-শিকলে আবদ্ধ করিয়া মানবকে দোযখের দিক হইতে টানিয়া লইতেছেন, পয়গম্বরগণের উপদেশ সেই শিকলের একটি কড়ি। তাঁহাদের উপদেশে মনে জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানে তোমরা কোন্‌টি সুপথ, কোন্‌টি কুপথ চিনিয়া লইতে পার। পয়গম্বরগণ সেই সকল কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাতে মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এই জ্ঞান ও ভয় জ্ঞানরূপ দর্পণে সঞ্চিত ধূলাবালি দূর করে। ফলে পার্থিব রাস্তা পরিত্যাগ করত পরকালের পন্থা অবলম্বন করা যে হিতকর, এই ছবি জ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিফলিত হয় এবং পরকালের পন্থা অবলম্বনের ইচ্ছা মনে জাগিয়া ওঠে। এমন কি ইচ্ছার প্রভাবে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনা-আপনিই সঞ্চালিত হয়; কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইচ্ছার অধীন। এখন ভাবিয়া দেখ, পয়গম্বরের উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ম চেষ্টা পর্যন্ত কার্য ও কারণসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া কেমন শিকলের ন্যায় হইল এবং এই শিকলে বন্ধন করত কেমন জবরদস্তির সহিত দোযখ হইতে টানিয়া আনিয়া তোমাদিগকে বেহেশ্তে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

পয়গম্বর আলায়হিস্ সালামগণকে এমন রাখালের সহিত তুলনা করা চলে যাহার নিকট একটি পশুপাল ও একটি শস্যশ্যামল চারণভূমি আছে এবং বাম পার্শ্বে বহু ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ পর্বতগুহা বর্তমান রহিয়াছে। আর রাখাল গুহার ধারে দণ্ডায়মান থাকিয়া লাঠি সঞ্চালন করিতেছে যেন লাঠির ভয়ে ছাগলগুলি গুহার ত্রিসীমায়ও না আসে এবং চারণভূমির দিকে গমন করে। ইহা পয়গম্বরগণকে

জগতে পাঠাইবার উদ্দেশ্য। তাঁহারা দোযখের ধারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই দিক হইতে মানবজাতিকে বেহেশ্‌তের দিকে প্রেরণ করিতেছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর – তৃতীয় প্রশ্ন এই–সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার পক্ষে চেষ্টা-তদবীর করিলে কি লাভ? যাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্ তাহার মনে এইকথা নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন–'চেষ্টা-তদবীর করিলেও কোন লাভ নাই।' তজ্জন্য সে চেষ্টা হইতে বিরত থাকে। অতএব সে বীজও বপন করে না এবং শস্যও কাটিতে পারে না। যাহার ভাগ্যে অনাহারে মৃত্যু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার লক্ষণ এই যে, তাহার মনে এইকথা নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে–'যখন অনাহারে মরিতেই হইবে তখন আহার গ্রহণে কি লাভ?" এইরূপ ব্যক্তি আহার গ্রহণ না করিলে অবশ্যই অনাহারে মরিবে। এইরূপ যাহার অদৃষ্টে দরিদ্রতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে মনে করে–'আমার অদৃষ্টে যখন দরিদ্রতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তখন কৃষিকার্য করিয়া কি লাভ?' এই কথা ভাবিয়া সে বীজও বপন করিবে না এবং শস্যও কাটিবে না। আল্লাহ্ যাহার ভাগ্যে সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি এই কথাও বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাকে ধনী হইতে হইবে এবং জীবিকা নির্বাহের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্য অবলম্বনপূর্বক সংস্থান করিতে হইবে।

এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধবদ্ধ ব্যাপার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করা নিরর্থক নহে; বরং কার্য-করণের সহিত সকল কাজই সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ যাহাকে যে-কার্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্যের উপকরণও সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। বিনা-উপকরণে তিনি কাহাকেও কোন কার্য সম্পাদনে প্রেরণ করেন না। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন–

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهٗ –

অর্থাৎ "কার্য করিয়া যাও। যাহাকে যে-কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই কাজ তাহার জন্য সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

আল্লাহ্ জবরদস্তির সহিত তোমার মনে যে অবস্থা সৃষ্টি করেন এবং যে-কার্য তোমার দ্বারা করাইয়া লইয়া থাকেন, উহাকে তুমি স্বীয় পরিণামের পূর্বসংবাদ বলিয়া গ্রহণ কর। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তোমার আসক্তি ও চেষ্টা প্রবল থাকিলে এবং তৎসঙ্গে পূর্ণ অধ্যবসায় ও সচেতন আলস্যহীনতা বর্তমান থাকিলে বুঝিবে

আল্লাহ্ তোমাকে বিদ্বান করিয়া সমাজের নেতা করিবেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপর পক্ষে অকর্মণ্যতা ও অলসতা যদি তোমার মনে প্রবল হইয়া থাকে তবে এই নিরর্থক কথা তোমার মনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে–'সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার ভাগ্যে মূর্খতার আদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমতাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া কি লাভ?" তাহা হইলে এই ভাবকে তোমার দুর্ভাগ্যের হুকুমনামা বলিয়া মনে করিবে এবং জানিয়া রাখিবে যে, তুমি কখনও সমাজের নেতা হইতে পারিবে না। পরকালের কার্য দুনিয়ার কার্যের অনুরূপ অনুমান করিয়া লও। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ –

অর্থাৎ "তোমাদের সৃজন এবং উত্থান একজনের সৃজন-উত্থানের সদৃশ ব্যতীত আর কিছু নহে।" (সূরা লুকমান, ৩ রুকূ, ২১ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ –

অর্থাৎ "তাহাদের জীবন এবং মরণ উভয়ই সমান।" (সূরা জাসিয়া, ২ রুকূ, ২৫ পারা)।

উপরিউক্তি তত্ত্বসমূহ বুঝিয়া লইলে পূর্বোক্ত তিনটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর তোমার নিকট সহজ হইয়া উঠিবে এবং তাওহীদের উপর তুমি দৃঢ় থাকিতে পারিবে। ইহাও ভালরূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, শরীয়ত, বিবেক এবং তাওহীদের মধ্যে কোন বিপরীত ভাব নাই, উপরে যাহা বর্ণিত হইল তদপেক্ষা অধিক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণনা করা চলে না।

তাওয়াক্কুলের অপর ভিত্তি ঃ আল্লাহকে পূর্ণ দয়াবান বলিয়া বিশ্বাস–পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তাওয়াক্কুল দুইটি বিষয়ে ঈমানের ফল। প্রথম তাওহীদের প্রতি ঈমান। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। দ্বিতীয় এই–তুমি এই কথা বিশ্বাস কর এবং জানিয়া লও যে, আল্লাহ্ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও তিনি বিশ্বজগতের সকল পদার্থের কারণ। তাঁহা হইতে সব হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, অতিশয় জ্ঞানী এবং পরম করুণাময়। প্রতিটি পিপীলিকা, মশামাছি হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির সেরা মানুষ পর্যন্ত সকলের প্রতি তাঁহার দান ও মমতা সন্তানের প্রতি জননীর দান ও মমতা অপেক্ষা অধিক। এই মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে। এই কথাও জানিয়া লও যে, আল্লাহ্ বিশ্বজগত ও তদন্তর্গত

প্রত্যেক বস্তু এরূপ পূর্ণতা দিয়া, এমন সৌন্দর্য ও কৌশল সহকারে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। তৎসঙ্গে ইহাও জানিয়া লও যে, আল্লাহ্ কাহাকেও স্বীয় দয়া হইতে বঞ্চিত করেন না এবং তিনি যে পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যেরূপ করা উচিত, ঠিক সেইরূপই করিয়াছেন। জগতের সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যদি পূর্ণবুদ্ধি ও জ্ঞান দেওয়া হয় এবং তাহারা সকলে একত্র হইয়া বিশ্বজগতের কোন প্রাণীর কেশাগ্র ও মশার পালক যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি হইয়াছে উহা লইয়া চিন্তা করিতে থাকে তবে এমন মন্তব্য কেহই করিতে পারিবে না যে, উহা এইরূপ হওয়া উচিত ছিল না, বরং তেমন হইলে ভাল হইত–অথবা ছোট বা বড়, নিকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল। তাহারা এরূপ কোন ত্রুটিই খুঁজিয়া পাইবে না এবং বুঝিতে পারিবে যে, উহা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে।

যে পদার্থ নিতান্ত কদর্য ইহার পূর্ণতা সেই কদর্যতার মধ্যেই রহিয়াছে। ইহা যদি কদর্য না হইত তবে অপূর্ণ থাকিয়া যাইত এবং কদর্য পদার্থ সৃষ্টির মধ্যে যে হেকমত নিহিত আছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইত। কেননা মন্দ দ্রব্য না থাকিলে কেহই উত্তম দ্রব্যের মর্যাদা বুঝিত না এবং উত্তম দ্রব্য উপভোগে আরামও পাইত না। অপূর্ণ বস্তু না থাকিলে 'পূর্ণ' বলিয়া কোন কথাই থাকিত না এবং যে পূর্ণ সে স্বীয় পূর্ণতার মাধুর্য লাভ করিত না। কারণ, পূর্ণকে অপূর্ণের পাশাপাশি রাখিলে পরস্পর তুলনা করিয়া উভয়কে চেনা যায়। যেমন, একজন পিতা হইলেই অপর জন্য পুত্র হয়। পুত্র না হইলে পিতা কথাটিই থাকিত না। এই সকল স্থানে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের তুলনা করিলে চেনা যায়। তুলনা স্থলে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন। দ্বিত্বভাব তিরোহিত হইলে তাওহীদ-জ্ঞান লাভ হয়। তখনই সমস্ত পদার্থ এক হইয়া পড়ে এবং তুলনা ও তুলনীয় বস্তু সবই লোপ পায়।

প্রিয় পাঠক, অবগত হও যে, আল্লাহ্ কার্যাবলীর হেকমত মানব হইতে গোপন রাখিয়াছেন। মানবের মঙ্গলের জন্যই তিনি ইহা করিয়াছেন। আরও বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ যে কার্যের আদেশ করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন এবং যেরূপ হওয়া উচিত তিনি তদ্রূপই করিয়া লন। দুনিয়াতে রোগ-শোক, অক্ষমতা, এমন কি পাপ, কুফ্র, বিনাশ, ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ের প্রত্যেকের মধ্যে আল্লাহ্ হেকমত রাখিয়াছেন এবং তৎসমুদয় যেরূপ হওয়া আবশ্যক ছিল, ঠিক সেইরূপই করিয়াছেন। যাহাকে

তিনি দরিদ্র করিয়াছেন, সেই অবস্থাতে তাহার মঙ্গল রহিয়াছে। দরিদ্র না হইয়া ধনী হইলে সে বিনাশ পাইত। যাহাকে তিনি ধনী করিয়াছেন তাহার মঙ্গলও তদ্রূপ তাহার অবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে।

আল্লাহ্ যে পূর্ণ করুণাময় এই কথার মর্মও তাওহীদের ন্যায় এক অতল সমুদ্র। অনেক লোক এই সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। ইহাতে অদৃষ্টবাদের গোপন রহস্য রহিয়াছে এবং সাধারণ লোকের নিকট এই রহস্য উদ্ঘাটনের অনুমতি নাই। এই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করিতে গেলে কথা অতি লম্বা হইয়া যাইবে। যাহা হউক, উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই ঈমানের দৃঢ় মর্ম এবং তাওয়াক্কুলের জন্য ইহাই আবশ্যক

তাওয়াক্কুলের হাকীকত–তাওয়াক্কুলে মানব-হৃদয়ের একটি উন্নত অবস্থা। তাওহীদ ও আল্লাহ্র পূর্ণ দয়ার উপর ঈমান আনার ফলে মানব এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাওয়াক্কুলের অবস্থা লাভের উপায় হইল প্রকৃত কার্য-নির্বাহক আল্লাহ্ তা'আলার উপর আন্তরিক ভরসা স্থাপন করা ও এই ভরসাকে সুদৃঢ় করিয়া লওয়া এবং তাহার ফলে মন নিরুদ্বিগ্ন ও শান্ত হইয়া পড়া যাহাতে মন জীবিকা সংগ্রহে আবদ্ধ না থাকে। তৎসঙ্গে জীবিকা সম্বন্ধীয় বাহ্য উপায় বিনষ্ট হইয়া গেলে ভগ্নহৃদয় না হওয়া বরং এমতাবস্থায় আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা করিয়া থাকা যে, তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা দান করিবেন। এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি প্রবঞ্চনাপূর্বক অপর একজনের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার জন্য এক মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিল। সম্পত্তির মালিক বাদীর দাবী ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে একজন উকীলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। উকীলের তিনটি গুণের উপর তাহার পূর্ণ বিশ্বাস হইলে সে তাহার উপর খাঁটিভাবে নির্ভর করিতে পারে; যথা–(১) সর্বপ্রকার দুরভিসন্ধি ও প্রতারণা সম্বন্ধে উকিল ভালরূপে অবগত আছে। (২) যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে প্রতারকের দাবী খণ্ডন করিতে উকীলের যথেষ্ট সাহস ও বাকপটুতা আছে। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, আইন-বিশারদ হইলেও সাহস ও বাকপটুতার অভাবে উকীল স্বীয় ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। (৩) বাদীর প্রতি উকীল অত্যন্ত দয়ালু এবং তাহার স্বার্থ রক্ষার্থে সে খুব আগ্রহশীল। উকীলের এই ত্রিবিধ গুণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে মানুষ স্বীয় কার্য তাহার উপর অর্পণ করত নিজে নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারে এবং সেই মোকদ্দমায় অন্যান্য সকল চেষ্টা-তদবীর পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে। এইরূপ যে ব্যক্তি–

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্ অতি উত্তম প্রভু এবং অতি উত্তম কার্য-নির্বাহক"–এই আয়াতের মর্ম ভালরূপে বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে যে, যাহা কিছু হয় তাহা আল্লাহ্ কর্তৃকই হইয়া থাকে–তিনি ব্যতীত অপর কোন কর্মকর্তা নাই, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তিতে বিন্দুমাত্রও কমতি নাই এবং তাঁহার রহমত এত অসীম যে, ইহা অপেক্ষা অধিক হওয়াই অসম্ভব। এইরূপ ব্যক্তি তখন আল্লাহ্র দান ও করুণার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা তদ্বীর পরিত্যাগ করিতে পারে এবং বুঝে যে, জীবিকা নির্ধারিত আছে; সময় মত ইহা আসিয়া পৌঁছিবে এবং আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহে সমস্ত কার্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে।

মানব-প্রকৃতি বিশ্বাসের খেলাফ হওয়া অসম্ভব নহে–যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরিউক্ত ত্রিবিধ গুণের প্রতি অকাট্যভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহার মনে যে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক টানে অপরিপক্কতা এবং নৈরাশ্যভাব থাকিতে পারে না, এমন নহে। কারণ, মানুষ কোন বিষয় অকাট্যভাবে জানিতে পারিলেও তাহা প্রকৃতি সহসা ইহা গ্রহণ করিতে চায় না। বরং কোন কোন সময় মানব-প্রকৃতি অলীক কল্পনার বশীভূত হইয়া চলে যদিও তাহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে তদ্রূপ কল্পনা করা নিতান্ত ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তি হালুয়া খাইতেছে, এমন সময় অপর ব্যক্তি এই হালুয়াকে পায়খানার সহিত তুলনা করিল। তখন সেই ব্যক্তি ইহা খাইতে পারে না; অথচ সে ভালরূপে অবগত আছে যে, তুলনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আবার দেখ, মৃতদেহকে সকলেই প্রস্তরবৎ নিতান্ত অক্ষম এবং নিশ্চল বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে। তথাপি কেহ ইচ্ছা করিলেও একাকী রাত্রিকালে মৃতদেহের সহিত শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না।

ফলকথা এই যে, আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রচুর মানসিক বল অপরিহার্য। কারণ, মনের দুর্ভাবনা বিদূরিত না হইলে শান্তি পাওয়া যায় না এবং সম্পূর্ণরূপে ভরসা করা চলে না। আবার সম্পূর্ণরূপে ভরসা করিতে না পারিলে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হইতে পারা যায় না। কেননা সর্ববিধ কার্যকলাপে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র উপর ভরসা করাকেই তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা) বলে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমান ছিল। কিন্তু তবুও তিনি বলিয়াছিলেন–

رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও। আল্লাহ্ বলিলেন–'তুমি কি বিশ্বাস কর না?' হযরত ইব্রাহীম (আ) বলিলেন–'হাঁ, বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু আমার অন্তরের শান্তির জন্য দেখাও।" (সূরা বাকারাহ, ৩৫ রুকূ, ৩ পারা।) তিনি এইজন্য ইহা বলিয়াছিলেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় অন্তরের শান্তি খেয়ালের অধীন থাকে। কিন্তু সেই অবস্থা উন্নত হইয়া চরম সীমায় উপনীত হইলে অন্তর বিশ্বাসের অধীন হইয়া পড়ে এবং তখন আর প্রত্যক্ষ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

তাওয়াক্কুলের শ্রেণীবিভাগ–তাওয়াক্কুল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী ব্যক্তির অবস্থা এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য একজন সুচতুর, অভিজ্ঞ, বাকপটু, সাহসী, দয়ালু উকীল নিযুক্ত করত তাহার উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী লোকের অবস্থা দুগ্ধপোষ্য শিশুর তুল্য; সকল বিপদাপদে মাতা ব্যতীত অপর কাহাকেও সে জানে না, ক্ষুধিত হইলে মাতার নিকট ক্রন্দন করে এবং ভয় পাইলে তাহার কোলেই আশ্রয় লয়। শিশু নিজ ক্ষমতায় চেষ্টাচরিত্র করিয়া এইরূপ করে না; বরং ইহাই তাহার স্বভাব। এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র গুণে মুগ্ধ হইয়া এরূপ ডুবিয়া থাকে যে, স্বীয় নির্ভরশীলতার খবরও তাহারা রাখে না। প্রথম শ্রেণীর লোক নিজের নির্ভরশীলতা নিজে বুঝে এবং নিজ ক্ষমতায় চেষ্টা-চরিত্র করিয়া নিজকে তাওয়াক্কুল করিতে শিখায়। যে-ব্যক্তি মৃতদেহকে গোসল দেয় তাহার হস্তে মৃতদেহের অবস্থা যেরূপ তৃতীয় শ্রেণীর তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী লোকের অবস্থাও তদ্রূপ। এই শ্রেণীর লোকে নিজকে মৃতদেহের ন্যায় অক্ষম বিবেচনা করে এবং তাহার দেহের নড়াচড়া তাহা হইতে হয় বলিয়া মনে করে না; বরং আল্লাহ্র শক্তির প্রভাবে হয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে, যেমন মৃতের গোসল প্রদানকারী নড়াইলে মৃতদেহ নড়িয়া থাকে নচেৎ অচল থাকে। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে শিশু যেমন মাতাকে আহবান করে, তাহারা কিন্তু তদ্রূপ প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্র নিকট তজ্জন্য দু'আ করে না। বরং তাহাদের অবস্থা এমন

শিশুর সদৃশ যে-শিশু জানে যে মাতা তাহার অবস্থা ভালরূপে অবগত আছে এবং বিনা প্রার্থনায় নিজে নিজে তাহার অভাব মোচন করিবে।

তিন শ্রেণীর নির্ভরশীল লোকের তুলনা–যাহা হউক, তৃতীয় শ্রেণীর নির্ভরশীল লোকের কোন ক্ষমতা থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরও ক্ষমতা থাকে না বটে, কিন্তু নিজের অক্ষমতা, প্রার্থনা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা বাকী থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা থাকে, কিন্তু উকীলের স্বভাব ও অভ্যাস হইতে যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক বুঝা যায়, তৎসমুদয় সংগ্রহে একই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, উকীলের অভাস জানা আছে যে, মুওয়াক্কেল উপস্থিত না থাকিলে এবং দলীলপত্র হাযির না করিলে সে মোকদ্দমা চালায় না তবে বাধ্য হইয়াই তদ্রূপ আয়োজন ও যোগাড় করিয়া দিতে হয়। মুওয়াক্কেল এই সকল করিয়াও উকীলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত তাহার দিকেই চাহিয়া থাকে এবং যে-ফল লাভ হয় উকীলকেই ইহার কর্তা বলিয়া গণ্য করে। এমন কি উকীলের নির্দেশে দলীলপত্র হাযির করা হইয়াছিল বলিয়া এই কাজটিকেও সে উকীলের কৃতকর্ম বলিয়াই বিবেচনা করে।

যাহা হউক, প্রথম শ্রেণীর তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী লোকেরা প্রচলিত ধারা অনুসারে যে কার্যের জন্য যে উপকরণ-উপাদান সংগ্রহের নিয়ম আছে, যেমন–বাণিজ্য, কৃষিকার্য ইত্যাদি বাহ্য উপকরণ-উপাদন–অবলম্বনে বিরত থাকে না। এই সকল উপাদান-উপকরণ পরিত্যাগ না করিলেও তাহারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। কারণ তাহারা কৃষি-বাণিজ্যের উপর ভরসা করে না; বরং আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণার উপর করিয়া থাকে। তাহারা বিবেচনা করে যে, আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে যেরূপ চেষ্টা ও বল জন্মাইয়া দেন—কৃষি-বাণিজ্যের উপাদান-উপকরণ দেখাইয়া ও সংগ্রহ করিয়া দেন এবং কার্যপদ্ধতি শিখাইয়া দেন, তদ্রূপ তিনিই কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্যে অভিষ্ট সিদ্ধ করিবেন। তাহাদের সম্মুখে যে বস্তু বা ব্যাপার আসিয়া পড়ে তাহা আল্লাহ্‌র দিক হইতেই আসে বলিয়া তাহারা মনে করে। (ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে আসিবে।) ইহাই – لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বাক্যের সারমর্ম। কেননা حول শব্দের অর্থ 'গতি' এবং قوة শব্দের অর্থ 'শক্তি'। মানুষ যখন বুঝে যে, গতি ও শক্তি তাহার নিজের নহে, বরং উহা আল্লাহ্‌র দিক হইতে আসিতেছে তখন যাহা কিছু দেখা যায় তাহা আল্লাহ্‌র দিক হইতেই দেখা যায়।

মোটের উপর কথা এই, বিশ্বজগতের সমস্ত কার্য একমাত্র আল্লাহ্ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে ও তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে, অপর কোন প্রকাশ্য কারণ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে না, ইহা যে ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল।

উচ্চশ্রেণীর তাওয়াক্কুল –সর্বোচ্চ শ্রেণীর তাওয়াক্কুল কাহাকে বলে, তাহা হযরত আবূ ইয়াযীদ বুস্তামী (র) প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত আবূ মূসা দায়েলী (র) তাঁহাকে তাওয়াক্কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন– "তোমরা কাহাকে তাওয়াক্কুল বল?" উত্তরে হযরত আবূ মূসা দায়েলী (র) বলিলেন–"বুযুর্গগণ বলিয়াছেন–অগণিত বিষধর সর্পে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তোমার হৃদয় যদি সূক্ষ্ম কেশাগ্র পরিমাণও বিচলিত ও ভীত না হয় তবে ইহাকেই তাওয়াক্কুল বলে।" হযরত আবূ ইয়াযীদ (র) বলিলেন–"ইহা ত নিতান্ত সহজ। আমার মতে দোযখবাসীদিগকে সর্ববিধ শাস্তিতে এবং বেহেশ্‌তবাসীদিগকে অফুরন্ত সুখ ও আনন্দে বিভোর দেখিয়া যে ব্যক্তি এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রভেদ করে, সে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল নহে।" কিন্তু হযরত মূসা দায়েলী (র) যে তাওয়াক্কুলের কথা বলিয়াছেন তাহাও অতি উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে সাবধানতা অবলম্বন না করা জরুরী নহে। কারণ, হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু যখন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লামের সহিত পর্বতকন্দরে ছিলেন তখন স্বীয় পায়ের গোড়ালি দ্বারা সর্পগর্তের মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন; অথচ তিনি আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহার সাপের ভয় ছিল না; বরং সৃষ্টিকর্তার ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন–কি জানি, আল্লাহ্ সাপের মনে দংশনের ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মাইয়া দিতে পারে। এইরূপ নির্ভরশীল ব্যক্তি সকল পদার্থে – لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কলেমার অর্থ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। হযরত আবূ ইয়াযীদ বুস্তামীর (র) উক্তিতে সেই ঈমানের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যাহা তাওয়াক্কুলের মূল এবং উহা অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। এই ঈমান হইল আল্লাহ্‌র হেকমত, ন্যায়বিচার, দয়া ও করুণার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ভালরূপে উপলব্ধি করা যে, আল্লাহ্ যাহা কিছু মনে করেন তাহা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল তিনি ঠিক তদ্রূপই করিয়া থাকেন। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে আল্লাহ্-প্রদত্ত শাস্তি ও পুরস্কারে কোনই পার্থক্য থাকে না।

তাওয়াক্কুলের ক্রিয়াকলাপ–তিনটি মূলের উপর ধর্মের মকামসমূহ স্থাপিত আছে; যথা– (১) ইলম, (২) হাল (মানসিক অবস্থা) (৩) আমল। কোন্ প্রকার ইল্ম অর্জন করিলে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করা যায় এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিলে মনের অবস্থা কিরূপ হয় তৎসমুদয় ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কি প্রকার আমল (কাজ) করিলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা হয়, এই বর্ণনাই এখন বাকী আছে।

তাওয়াক্কুলের নামে কর্ম-পরিত্যাগ শরীয়ত-বিরুদ্ধ–এ-স্থলে কেহ হয়ত মনে করিবে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করিতে হইলে সকল কাজ আল্লাহ্র উপর ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে; এমন কি কৃষি-বাণিজ্য বর্জন করিবে, আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিতে হইবে না; সর্প, বিচ্ছু, ব্যাঘ্র হইতে পালাইতে হইবে না; পীড়া হইলে ঔষধ সেবন করিবে না–এইরূপ সকল ধারণাই ভুল। কারণ, এই সমস্তই শরীয়ত-বিরুদ্ধ। তাওয়াক্কুলের ভিত্তি শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শরীয়ত-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া কিরূপে তাওয়াক্কুল হইতে পারে?

তাওয়াক্কুলের চতুর্বিধ মকাম–বরং চারিটি বিষয়ে মানবের অধিকার আছে; যথা–(১) যে-সম্পদ নাই তাহা সংগ্রহ করা, (২) সঞ্চিত সম্পদের হেফাযত করা, (৩) উপস্থিত ক্ষতি হইতে অব্যাহতির জন্য উপায় অবলম্বন এবং (৪) যে-ক্ষতি এখন সম্মুখে আসে নাই ইহাকে আসিতে না দিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। এই চারিটি মকামের প্রত্যেকটিতে কি নিয়মে কার্য চালাইলে আল্লাহ্র উপর ভরসা বজায় থাকে তৎসম্বন্ধে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে। অতএব সেই সকল কার্য পরিচালনের নিয়ম বর্ণনা করা আবশ্যক। নিম্নে উহা বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম মকাম–উপকারী বস্তু বর্জন। ইহার তিনটি শ্রেণী আছে।

প্রথম শ্রেণী– আল্লাহ্র প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে-উপকরণ অবলম্বন না করিলে কার্যনির্বাহ হয় না, উহা পরিত্যাগ করা পাগলামি, তাওয়াক্কুল নহে। যেমন–আল্লাহ্ স্বয়ং উদর পূর্ণ করিয়া দিবেন, এই খেয়ালে হাতে আহার ধরিয়া মুখে না দেওয়া; অথবা খাদ্যদ্রব্যকে আহ্বান করা যেন ইহা আপনা-আপনি গলার মধ্য দিয়া উদরে প্রবেশ করে। আবার বিবাহ ও স্ত্রীসহবাস না করিয়া সন্তান লাভের আশা করা। এবংবিধ উপকরণাদি পরিত্যাগপূর্বক আল্লাহ্র উপর

ভরসা করিয়া থাকা বাস্তবপক্ষে নিতান্ত মূর্খতা। যে-স্থলে নিশ্চিত কার্যকারণ আছে তথায় ক্রিয়াকলাপে (অর্থাৎ উক্ত কারণ পরিত্যাগে) তাওয়াক্কুল হয় না; বরং জ্ঞান ও মানসিক অবস্থাতে তাওয়াক্কুল হইয়া থাকে। জ্ঞান এই–নিশ্চিতভাবে জানা যে, হস্ত, আহার, শক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, মুখ, দন্ত ইত্যাদি সকলই আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন। আর মানসিক অবস্থা–আল্লাহ্র দয়া ও করুণার প্রতি মনের ভরসা থাকা, হস্ত ও আহার্য সামগ্রীর উপর ভরসা না করা। কারণ, অসম্ভব কি যে, অকস্মাৎ মানুষের হস্ত অবশ হইয়া পড়িতে পারে এবং অপর কেহ তাহার সম্মুখস্থ খাদ্য কাড়িয়া লইতে পারে! সুতরাং একমাত্র আল্লাহর করুণার উপর ভরসা রাখা আবশ্যক; কারণ তিনি তোমার হস্ত ও খাদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা নিরাপদে রাখিয়াছেন। নিজ বাহুবলের উপর ভরসা করা মানুষের উচিত নহে।

দ্বিতীয় শ্রেণী– এই শ্রেণীর উপকরণগুলি অপরিহার্য নহে; কিন্তু সচরাচর উহার অভাবে কার্য সম্পন্ন হয় না। উহা ব্যতীত লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া বড় দুষ্কর। পাথেয় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাওয়াক্কুলের জন্য পাথেয় পরিত্যাগ করা আবশ্যক নহে; বরং পাথেয় সঙ্গে লওয়া রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম ও পূর্বকালের বুযুর্গগণের অভ্যাস। কিন্তু পাথেয়ের উপর ভরসা করা উচিত নহে; কেননা, পাথেয় দ্রব্য অপর লোকে কাড়িয়া লইয়াও যাইতে পারে। বরং যে-আল্লাহ্ পাথেয় সৃষ্টি করিয়া নিরাপদে রাখেন তাঁহার উপর ভরসা করা উচিত। অপর দিকে যে-ব্যক্তির সপ্তাহকাল পর্যন্ত অনাহারে ক্ষুধা সহ্য করিবার বা ঘাসপাতা খাইয়া জীবনধারণ করিবার শক্তি আছে তাহার পক্ষে পাথেয় না লইয়া বিজন অরণ্যে যাওয়া তাওয়াক্কুলের বহির্ভূত নহে। কারণ, উহা তখন তাহার জন্য একেবারে আহার ত্যাগের ন্যায় শরীয়ত-বিরুদ্ধ নহে এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে উহা অসঙ্গতও নহে। এইরূপ নির্ভরশীল পথিকের জন্য বিজন অরণ্যেও এমন স্থান হইতে আহার্য মিলিতে পারে যাহা কল্পনাও তাহার মনে উদিত হয় না। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) আল্লাহ্র উপর পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে উক্ত দুইটি গুণ অর্থাৎ আহার্যসামগ্রী পাওয়া না গেলে সপ্তাহকাল অনাহারে থাকা বা ঘাস-পাতা খাইয়া জীবন যাপনের ক্ষমতা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তিনি পাথেয় সঙ্গে না লইয়া বন-জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সুঁচ, ছুরি, দড়ি, বালতি থাকিত। কারণ, বিজন বনে এই সমস্ত জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য উপকরণরূপে

পরিগণিত। কেননা, বিজন অরণ্যে দড়ি-বালতি কোথায় পাওয়া যায়! সুতরাং পানি তোলা অসম্ভব হয়। আবার পরিধানের বস্ত্র ছিড়িয়া গেলে সূঁচ ব্যতীত সেলাই করা যায় না।

ফলকথা এই যে, অপরিহার্য উপকরণ পরিহার করা তাওয়াক্কুল নহে। বরং মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়ার উপর ভরসা রাখা এবং উপকরণের উপর ভরসা না করাকে তাওয়াক্কুল বলে। ঘাস-পাতাও জন্মে না, এমন বিজন পর্বত-কন্দরে গিয়া যদি কেহ মনে করে 'জীবিকা বিষয়ে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়াছি' তবে এরূপ তাওয়াক্কুল করা হারাম। এমন নির্ভরশীল ব্যক্তি নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয় এবং আল্লাহ্‌র প্রচলিত নিয়ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকেই এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ নির্ভরশীল লোককে এমন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা চলে, যে উকীলের নিকট দলীলপত্র উপস্থিত করে না; অথচ সে ভালরূপে অবগত আছে যে, দলীলপত্র উপস্থিত না করিলে উকীল একটি কথাও বলে না। পূর্বকালের এক সংসারবিরাগী দরবেশ লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক এক পর্বত গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং স্বীয় নির্ধারিত উপজীবিকা পাইবার আশায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়া রহিল। এক সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল না। সুতরাং সেই ব্যক্তি মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। তখন তৎকালীন পয়গম্বরের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল-"অমুক ব্যক্তিকে বলিয়া দাও, সে-পর্যন্ত সে লোকালয়ে ফিরিয়া না আসিবে এবং মানুষের সহিত না মিলিবে সেই পর্যন্ত সে রিযিক পাইবে না।" সেই ব্যক্তি লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলে চতুর্দিক হইতে তাহার নিকট উপঢৌকনাদি আসিতে লাগিল। ইহাতে তাহার মনে খটকা উপস্থিত হইলে আবার ওহী অবতীর্ণ হইল-"তুমি সংসারবিরাগ ও তাওয়াক্কুল প্রভাবে আমার হেকমত রহিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলে। কিন্তু তুমি বুঝ না যে, আমি স্বীয় বান্দাগণকে যে জীবিকা দিয়া থাকি তাহা আমার বান্দাগণের হস্ত দিয়া দেওয়াই অধিকতর পছন্দ করি।"

আবার দরজা বন্ধ করত নিজ গৃহে গুপ্তভাবে থাকিয়া আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জীবিকা পাইবার ভরসা রাখাও হারাম। কারণ, অপরিহার্য আস্‌বাব হইতে দূরে সরিয়া থাকা উচিত নহে। কিন্তু গৃহদ্বার বন্ধ না করিয়া তাওয়াক্কুল করিয়া থাকা জায়েয আছে; তবে ইহার শর্ত এই যে, দরজা দিয়া কেহ কিছু লইয়া আসিতেছে কি না উদ্বিগ্ন চিত্তে বারবার সেই দিকে দৃষ্টি না করা; মনকে মানুষের সহিত

আবদ্ধ না রাখিয়া আল্লাহ্‌র দিকে লাগাইয়া রাখা ও তাঁহার ইবাদতে সর্বদা মগ্ন থাকা এবং তৎসঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, যখন আসবাব হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করি নাই তখন জীবিকা অবশ্যই পাইব। এ-স্থলে বুযুর্গগণের উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাঁহারা বলেন-"মানুষ জীবিকা হইতে পলায়ন করিলেও জীবিকা তাহার পিছনে পিছনে গমন করে এবং তাহাকে অনুসন্ধান করে। কেহ যদি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়া বলে-'হে আল্লাহ্, আমাকে জীবিকা দিও না', তবে তিনি তাহাকে বলেন-"হে নির্বোধ, আমি কি তোমাকে অনাহারে রাখিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি? আমি তোমাকে আহার প্রদানে কখনও বিরত থাকিব না।"

যাহাই হউক, জীবিকা অর্জনের জন্য কার্যের উপকরণ-উপাদান পরিহার না করা, আবার উপকরণ-উপাদান অবলম্বনের কারণেই জীবিকা পাওয়া যায় বলিয়া মনে না করা, বরং বিশ্ব-কারণ একমাত্র আল্লাহ্ হইতেই সকলের জীবিকা পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা তাওয়াক্কুল। তবে তন্মধ্যে কতক লোক ভিক্ষার লাঞ্ছনার সহিত জীবিকা লাভ করিতেছে; আর কতক লোক প্রতীক্ষাজনিত কষ্ট ও পরিশ্রমে জীবিকা পাইয়া থাকে, যথা-ব্যবসায়ী। অপর এক শ্রেণীর লোক কঠিন পরিশ্রমে দেহপাত করিয়া জীবিকা ভোগ করিতেছে, যথা-বণিক ও শ্রমিক। আবার কতক লোক সম্মানের সহিত জীবিকা পাইয়া থাকে, যেমন-সূফী। সূফী ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে তাকাইয়া থাকে এবং জীবিকাস্বরূপ যাহা পাওয়া যায় তাহা আল্লাহ্‌র দিক হইতেই আসিতেছে বলিয়া বিবেচনা করে ও মানুষকে ইহার মধ্যবর্তী কারণ বলিয়াও মনে করে না।

তৃতীয় শ্রেণী-যে সকল উপাদান প্রাকৃতিক নিয়মে কার্যের অপরিহার্য কারণ নহে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় উহাদের আবশ্যকতা দেখা দেয়, যেমন ধনোপার্জনের জন্য কৌশলপূর্ণ চালাকি-চতুরতা অবলম্বন করা। রোগ দূর করিবার কার্যে মন্ত্র-তন্ত্র, ফাল, দাগ ইত্যাদির যেমন সম্বন্ধ, জীবিকা অর্জন ব্যাপারেও এই সকল চালাকি-চতুরতার তদ্রূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণের গুণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা মন্ত্র-তন্ত্র ও দাগের ত্রিসীমায়ও গমন করে না। কিন্তু তাওয়াক্কুলধারী লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য অবলম্বনে উপার্জন করে না বা লোকালয় পরিত্যাগ করত বিজন অরণ্যে চলিয়া যায়-এইরূপ কথা তিনি কখনও বলেন নাই।

উপার্জন-কার্যে তাওয়াক্কুলধারী লোকের শ্রেণীবিভাগ– যাহাই হউক, উপার্জন-কার্যে তাওয়াক্কুলধারী লোকের তিনটি শ্রেণী আছে। **প্রথম শ্রেণী**–নির্জনবাসী কামিল লোক। তাঁহারা বিনা সম্বলে বন-জঙ্গলে পরিভ্রমণ করেন। হযরত ইব্‌রাহীম খাওয়াস (র) তাঁহাদের কথাই বলিয়াছেন। ইহাই সর্বোচ্চ শ্রেণী। যাঁহারা অনাহারে বা ঘাস-পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, এমন কি ঘাস-পাতাও পাওয়া না গেলে অনাহার-মৃত্যুভয়ে ভীত হন না, বরং ইহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন, কেবল তাঁহারাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যাহারা পাথেয় লইয়া পরিভ্রমণ করে তাহাদের সম্বলও অপহৃত ইহতে পারে এবং তজ্জন্য তাহাদেরও অনাহারে মৃত্যু ঘটিতে পারে। পথিমধ্যে সর্বদাই অসাধারণ ঘটনা ঘটিতে পারে। ইহা হইতে সাবধানতা অবলম্বন করত সরিয়া থাকা ওয়াজিব নহে। **দ্বিতীয় শ্রেণী**– জীবিকা অর্জনের জন্য এই শ্রেণীর লোক কোন শিল্পবাণিজ্য অবলম্বন করেন না অথবা বনে-জঙ্গলেও যান না, বরং লোকালয়ের কোন মসজিদ আশ্রয় করিয়া বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা লোকের নিকট হইতে কিছু পাইবার আশা করেন না; কেবল আল্লাহ্‌র দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। **তৃতীয় শ্রেণী**–এই শ্রেণীর তাওয়াক্কুলধারী লোক উপার্জনের জন্য গৃহের বাহিরে যান। তাঁহারা শরীয়তের বিধান অনুসারে উপার্জন করিয়া থাকেন এবং উপার্জন কার্যে কোন ছল-চাতুরি, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করেন না। যে-ব্যক্তি উপার্জন-কার্যে ছল-চাতুরি অবলম্বন করে এবং যে-ব্যক্তি রোগ দূরীকরণার্থ মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার করে ও উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা রোগীকে দাগ দেয়, তাহাদের উভয়েই সমতুল। তাহাদের তাওয়াক্কুল থাকে না।

উপার্জন হইতে বিরত থাকা তাওয়াক্কুলের শর্ত নহে। ইহার প্রমাণ এই যে,, হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু পূর্ণ তাওয়াক্কুলধারী ছিলেন; তথাপি তিনি খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও কাপড়ের বোঝা লইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ যাইতেন। লোকে নিবেদন করিল–"হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও কেন ব্যবসায় করেন?" তিনি বলিলেন–"আমি যদি নিজ পরিবারকে বিনাশ করি তবে অপর লোকেও বিনাশ করিয়া ফেলিবে।" তৎপর জনসাধারণ তাঁহার ভরণপোষণের জন্য বায়তুল মাল হইতে বৃত্তি ধার্য করিয়া দিলে তিনি সর্বান্তঃকরণে একমাত্র খিলাফতের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার তাওয়াক্কুলের এই অবস্থা ছিল যে, ধনের প্রতি

তাঁহার মন একেবারে উদাসীন ছিল। তিনি যাহা কিছু পাইতেন ইহাকে তিনি স্বীয় অর্জিত ধন বলিয়া মনে করিতেন না; বরং ইহাকে আল্লাহর দান বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজের ধনকে অপর মুসলমানের ধন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া জানিতেন না।

সারকথা এই যে, অনাসক্তি ব্যতীত তাওয়াক্কুল হইতে পারে না। সুতরাং তাওয়াক্কুলের জন্য দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু অনাসক্তির জন্য তাওয়াক্কুলের আবশ্যকতা নাই। হযরত জুনায়দের (র) পীর হযরত আবূ জাফর হাদ্দাদ (র) অতি বড় তাওয়াক্কুলধারী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলিতেন–"আমি বিশ বৎসর পর্যন্ত স্বীয় তাওয়াক্কুল গোপন রাখিয়াছিলাম। বাজারে যাইয়া আমি প্রত্যহ একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা উপার্জন করিতাম। কিন্তু ইহা হইতে হাম্মামখানায় গোসল করিবার জন্যও এক কপর্দক ব্যয় করিতাম না। বরং সম্পূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতাম।" হযরত জুনায়দ (র) স্বীয় পীরের সম্মুখে নিজ তাওয়াক্কুলের কথা প্রকাশ করিতেন না এবং বলিতেন–"পীর যে-মকামে উপনীত হইয়াছে, তাঁহার সম্মুখে সেই মকাম সম্বন্ধে বলিতে আমি লজ্জাবোধ করি।" (অর্থাৎ তাওয়াক্কুল বিষয়ে উভয়ে সমতুল্য ছিলেন।)

যে সূফী স্বীয় খানকায় নির্জনে বসিয়া থাকেন এবং তাঁহার খাদেম তাঁহার জীবিকা সংগ্রহে বাহিরে যায়, তাঁহার তাওয়াক্কুল জীবিকা অর্জনে লিপ্ত লোকের তাওয়াক্কুলের ন্যায় দুর্বল। তাওয়াক্কুল শুদ্ধ হইবার অনেকগুলি শর্ত আছে। বিনা পরিশ্রমে জীবিকা পাইবার আশায় বসিয়া থাকা পূর্ণ তাওয়াক্কুল না হইলেও তাওয়াক্কুলের নিকটবর্তী বলা যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি কোন বিখ্যাত স্থানে তদ্রূপ উপবিষ্ট থাকে তাহাকে পেশাকারের সহিত তুলনা করা চলে এবং তাহার পক্ষে ভয়ের কারণ এই যে, লোকখ্যাতির দরুন তাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তাহার মন লোকখ্যাতির দিকে আকৃষ্ট না হইলে তাহার তাওয়াক্কুল জীবিকা অর্জনে লিপ্ত ব্যক্তির তাওয়াক্কুল সদৃশ। তাহার তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে অল্প কথা এই যে, উপার্জন বিষয়ে লোকে যেন কোন সৃষ্ট জীবন ও উপকরণের উপর ভাবনা না রাখিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখে। হযরত ইব্‌রাহীম খাওয়াস (র) বলেন–"আমি হযরত খিযির আলায়হিস্ সালামকে আমার সহিত অবস্থানে সম্মত পাইলাম। কিন্তু তাঁহার সহিত অবস্থান করিলে তাঁহার উপর ভরসা করিয়া আমার মন শান্তি লাভ করিতে পারে এবং তজ্জন্য

আমার তাওয়াক্কুল দুর্বল হইতে পারে, এই ভয়ে আমি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলাম।" হযরত ইমাম আহমদ হাম্বল (র) এক শ্রমজীবী দ্বারা কিছু কাজ করাইয়াছিলেন। শ্রমজীবীকে তাহার প্রাপ্যের কিছু অধিক দিবার জন্য তিনি তাঁহার ছাত্রকে আদেশ করিলেন। কিন্তু শ্রমজীবী অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তখন তিনি তাঁহার ছাত্রকে বলিলেন–'অতিরিক্ত অর্থ লইয়া শ্রমজীবীর পিছনে পিছনে গমন কর। হয়ত সে গ্রহণ করিতে পারে।" ছাত্র বলিলেন–"সে ত গ্রহণ করে নাই; এমতাবস্থায় তাহার পশ্চাতে যাইব কেন?" তিনি বলিলেন–"তখন হয়ত অতিরিক্ত অর্থের প্রতি তাহার লোভ জন্মিয়াছিল। এইজন্য সে গ্রহণ করে নাই। এখন হয়ত সেই লোভ বিদূরিত হইয়াছে; তাই গ্রহণ করিতে পারে।"

ফলকথা, এই–অর্জিত ধনের উপর ভরসা না করিয়া আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর নির্ভর করাই হইল উপার্জনকারী ব্যক্তির তাওয়াক্কুল। ইহার নির্দশন এই–ধন অপহৃত হইলেও তাহার মন বিমর্ষ হয় না এবং জীবিকা সম্বন্ধেও সে নিরাশ হয় না। কারণ, আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি ভরসা রাখে বলিয়া সে এইরূপ বিরূপ বিশ্বাস করে যে, তিনি তাহার জীবিকা এমন স্থান হইতে যোগাইয়া দিবেন যাহার কল্পনাও সে করে নাই। আবার আল্লাহ্ তাহাকে জীবিকা না দিলেও সে মনে করে, জীবিকা না দেওয়ার মধ্যেই তাহার মঙ্গল নিহিত আছে।

জীবিকা না দেওয়াতে মঙ্গল আছে, ইহা বুঝিবার মত মানসিক অবস্থা লাভের উপায়–কাহারও ধন চুরি গেল অথবা অন্য প্রকারে নষ্ট হইল, অথচ তাহার মন বিন্দুমাত্র বিমর্ষ হইল না–পূর্ব অবস্থায় মন প্রশস্ত থাকিল, মনের এমন অবস্থা নিতান্ত দুর্লভ হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। আল্লাহ্র পূর্ণ দয়া, অসীম অনুগ্রহ এবং পূর্ণশক্তির প্রতি যখন মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, এমনকি সে বুঝিয়া লয় আল্লাহ্ এরূপ যে, তিনি বহু রিক্তহস্ত ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা দান করিতেছেন; আবার বহু স্থলে সঞ্চিত ধনই ইহার অধিকারীর বিনাশের কারণ হইতেছে, সুতরাং এমন ধন বিনষ্ট হওয়াই মঙ্গলজনক–কেবল তখনই মানুষ সেইরূপ উন্নত মানসিক অবস্থা লাভ করিতে পারে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলেন–"এইরূপ ঘটে যে, রাত্রিকালে মানুষ এমন কার্যের কল্পনা করে যাহা তাহার বিনাশের কারণ হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ আরশের উপর হইতে করুণার চক্ষে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন; ইহাতে তাহার সেই কার্য ঘটিতে পারে না। অতএব প্রাতঃকালে সে দুঃখিত

হইয়া সন্দেহ করিয়া বলে–'কে এবং কেন এই কার্য বিগড়াইয়া দিয়াছে?' সে মনে করে, তাহার প্রতিবেশী বিগড়াইয়া দিয়াছে অথবা তাহার চাচাত ভাই কিংবা অমুক ব্যক্তি ইহা নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে সেই নিষ্ফলতার মধ্যে আল্লাহ্র করুণা মূর্তিমান রহিয়াছে।" এইজন্যই হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিতেন–"আমি প্রাতঃকালে দরিদ্র কি ধনীরূপে শয্যাত্যাগ করিব, তৎসম্বন্ধে আমি কিছুই ভয় করি না। কারণ আমার জানা নাই কোন অবস্থাতে মঙ্গল রহিয়াছে।"

পরিশেষে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, শয়তানই মানব হৃদয়ে দরিদ্রতার ভয় ও সন্দেহের উদ্রেক করে। আল্লাহ্র বলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ –

"অর্থাৎ শয়তান তোমাদের সহিত দরিদ্রতার অঙ্গীকার করিতেছে।" (সূরা বাকারাহ, ৩৭ রুকূ, ৩ পারা।) আল্লাহ্র সদয় দৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মারিফাতের পূর্ণতা। আবার এ-কথাও জানা আবশ্যক যে, জীবিকা অধিকাংশ সময়ে নিতান্ত গুপ্ত ও অজ্ঞাত আসবাবের মাধ্যমে আসিয়া থাকে। তাই বলিয়া এই গুপ্ত আসবাবের উপর ভরসা করা সঙ্গত নহে, বরং বিশ্ব-কারণ আল্লাহ্ সকলের জীবিকা দিবেন বলিয়া জিম্মাদার আছেন, ইহা উপরই ভরসা রাখা আবশ্যক। এক তাওয়াক্কুলধারী আবিদ কোন মসজিদে থাকিতেন। মসজিদের ইমাম তাঁহাকে কয়েকবার বলিলেন –"তুমি একেবারে নিঃস্ব-দরিদ্র। তুমি যদি জীবিকা অর্জনের জন্য কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য অবলম্বন করিতে তবে ভাল হইত।" আবিদ বলিলেন–"আমার এক ইয়াহূদী প্রতিবেশী আমাকে প্রত্যহ দুইটি রুটি দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।" মসজিদের ইমাম বলিলেন–তাহা হইলে কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য না করাই সঙ্গত।" তখন আবিদ বলিলেন–"তোমার পক্ষে ইমামতি না করাই উত্তম। কেননা তোমার নিকট একজন ইয়াহূদীর জিম্মাদারী আল্লাহ্র জিম্মাদারী অপেক্ষা অটল ও মযবুত।" তদ্রূপ অপর এক মসজিদের ইমাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনি কোথা হইতে আহার পাইয়া থাকেন?" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"একটু বিলম্ব করুন। আপনার পিছনে যে নামায পড়িলাম তাহা পুনরায় পড়িয়া আপনার কথার উত্তর দিতেছি। কারণ, আল্লাহ্ সকলের জীবিকার জিম্মাদার আছেন, এই কথার উপর আপনার ঈমান নাই।"

কল্পনাতীত স্থান হইতে জীবিকা লাভ–যাঁহারা উপরিউক্ত বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এমন স্থান হইতে জীবিকা পাওয়া যায় যাহার সম্বন্ধে কল্পনাও করেন নাই।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا –

অর্থাৎ "পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণকারী নাই যাহার জীবিকার ভার আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করা নাই। আল্লাহ্‌র এই বাক্যের প্রতি তাঁহাদের ঈমান অত্যন্ত মযবুত।

হযরত হুযায়ফা মারআ'শীকে (র) লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"হযরত ইব্‌রাহীম আদহামের (র) মধ্যে কি গুণ দেখিয়াছিলেন যে, আপনি তাঁহার সংসর্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন?" হযরত হুযায়ফা (র) বলিলেন–"মক্কা শরীফে যাইবার পথে আমরা উভয়ে ভীষণ ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম। আমরা কুফা শহরে উপস্থিত হইলে ক্ষুধার প্রতিক্রিয়া আমাতে প্রকাশ পাইল। ইহা দেখিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–'ক্ষুধায় কি তুমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ?' আমি বলিলাম–'হাঁ।' তখন তিনি আমাকে কলম, দোয়াত ও কাগজ আনিতে আদেশ করিলেন। আমি তৎসমুদয় আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি তৎপর লিখিলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ –

অর্থাৎ 'পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি'। ওহে, প্রত্যেক অবস্থায় তুমিই আমাদের উদ্দেশ্য এবং তুমিই সকলের ধ্রুব লক্ষ্য। আমি তোমার প্রশংসা ও যিকির করিয়া থাকি এবং আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি তৃষ্ণাতুর, ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র। তোমার প্রশংসা করা, ধন্যবাদ দেওয়া ও যিকির করা–এই তিনটি কাজ আমার কর্তব্য। এইজন্য আমি দায়ী রহিলাম। অন্ন, পানি, বস্ত্র–এই তিনটি প্রদান করা তোমার কাজ। তুমি এই সবের জিম্মাদান।' এই কথাগুলি লিখিয়া কাগজখানা আমার হাতে দিয়া তিনি বলিলেন–'ইহা লইয়া বাহিরে যাও' কিন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও দিকে মন লাগাইবে না, বরং প্রথমে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই এই কাগজের টুকরা দিবে।" আমি বাহিরে আসিয়া এক উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহার হস্তে সেই কাগজখানা দিলাম। তিনি ইহা পাঠ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং

জিজ্ঞাসা করিলেন–'ইহার লেখক কোথায়?" আমি বলিলাম–'তিনি মসজিদে আছেন।' তখন তিনি ছয় শত স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ এক থলিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি সেই উষ্ট্রারোহী ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি একজন খ্রীস্টান। আমি হযরত ইবরাহীম আদ্‌হামের (র) নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন–'এই থলিয়া স্পর্শ করিও না। অনতিবিলম্বেই ইহার মালিক আসিয়া পড়িতেছে।" বলিতে না বলিতেই উক্ত খ্রীস্টান ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত ইবরাহীম আদ্‌হামের (র) চরণ চুম্বনপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

হযরত আবূ ইয়াকুব বস্‌রী (র) বলেন–"আমি পবিত্র কাবাগৃহে দশ দিন অনাহারে থাকিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলাম এবং অবশেষে বাহির হইয়া আসিলাম। পথে একটি শালগম পতিত দেখিয়া ইহা কুড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিলাম। এমন সময়ে হৃদয়ের মধ্য হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল–'দশ দিন অনাহারে থাকার পর তোমার ভাগ্যে কি একটা পচা শালগম মিলিল?' তখন শালগমটিকে সেই অবস্থায় পতিত রাখিয়া আমি পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি মসজিদে আগমন করিলেন এবং এক বাক্স তৈলে ভাজা রুটি ও তৎসঙ্গে মিছরী ও বাদাম শাঁস আমার সম্মুখে স্থাপনপূর্বক বলিতে লাগিলেন–'আমি সমুদ্র ভ্রমণে ছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ একদিন তুফান উঠিল। তখন আমি মান্নত মানিলাম–নিরাপদে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলে এই সমস্ত বস্তু আমি সর্বপ্রথমে যে-দরবেশকে দেখিতে পাইব তাঁহাকে দিব।' ইহা শুনিয়া আমি প্রত্যেক বস্তু হইতে এক এক মুষ্টি তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম–'আল্লাহ বায়ুকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন সে সমুদ্রে তুফান তুলিয়া তোমাকে আহার আনিয়া দিবার বন্দোবস্ত করে।' কিন্তু তুমি অন্য স্থানে অন্ন খুঁজিয়া বেড়াইতেছ।" যাহাই হউক, এই ধরনের দুর্লভ কাহিনী শুনিলে মানুষের ঈমান বলবান ও মযবুত হইয়া থাকে।

পরিবারবিশিষ্ট লোকের তাওয়াক্কুল–পরিবারবিশিষ্ট লোকের পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিত্যাগপূর্বক বনে-জঙ্গলে ঘুরাফেরা করা উচিত নহে। পূর্ববর্ণিত তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোকের তাওয়াক্কুলই পরিবারবিশিষ্ট লোকের একমাত্র তাওয়াক্কুল। হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এই শ্রেণীর তাওয়াক্কুলই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, দুইটি গুণ না থাকিলে মানুষ

তাওয়াক্কুল করিবার উপযোগী হয় না। প্রথম–ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা এবং যাহা কিছুই পাওয়া যাউক না কেন, এমনকি ঘাস-পাতা হইলেও উহা লইয়া পরিতুষ্ট থাকার অভ্যাস। দ্বিতীয়–ক্ষুধা সহ্য করা অদৃষ্টে থাকিলে এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় প্রাণ-বিয়োগ ঘটিলে উহাতেই মঙ্গল রহিয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। মানুষ নিজে এই দুইটি গুণ অর্জন করিতে পারে বটে, কিন্তু পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অপর লোককে এই বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে না। বরং মানুষের স্বীয় প্রবৃত্তিও বাস্তবপক্ষে তাহার পরিবারভুক্ত একজন স্বতন্ত্র সদস্যস্বরূপ। যে-ব্যক্তি ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না এবং ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়ে তাহার পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিত্যাগ করত তাওয়াক্কুল করা উচিত নহে। কিন্তু পরিবারভুক্ত লোকেরাও যদি ক্ষুধা সহ্য করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকে এবং তাওয়াক্কুলের অনুমতি দেয় তবে উপার্জনে বিরত থাকা সঙ্গত হইবে। স্বীয় প্রবৃত্তি ও পরিবারভুক্ত অপর ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ এই যে, নিজকে জোরজবরদস্তির সহিত ক্ষুধার্ত রাখা জায়েয আছে; কিন্তু পরিবারস্থ অপরাপর লোককে বাধ্য করিয়া ক্ষুধিত রাখা জায়েয নহে।

কামিল ঈমানদারের জীবিকা–কামিল ঈমানদার ব্যক্তি পরেহেযগারিতে লিপ্ত থাকিয়া উপার্জন না করিলে আপনা-আপনিই তাঁহার জীবিকার উপায় হইয়া পড়ে। যেমন মনে কর, মাতৃগর্ভে, শিশু উপার্জনে অক্ষম থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জীবিকা তখন নাভী-নাড়ীর সাহায্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু ভূমিষ্ট হইলে জননীর স্তন হইতে তাহাকে খাদ্য দিয়া থাকেন। সে দুধ ভিন্ন অন্য বস্তু খাইবার উপযুক্ত হইলে আল্লাহ্ তাহাকে দাঁত দান করেন। শৈশবকালে পিতামাতার মৃত্যুতে সে ইয়াতীম হইয়া পড়িলে আল্লাহ্প্রদত্ত যে স্নেহ-মমতার তাড়নায় পিতামাতা সন্তানকে উত্তমরূপে লালনপালন করিত, আল্লাহ্ তৎপ্রতি তদ্রূপ স্নেহ-মমতা অপর লোকের হৃদয়ে জন্মাইয়া দেন। তখন সকলের মনই ইয়াতীমের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া উঠে। প্রথমে একমাত্র স্নেহময়ী জননী তাহাকে লালন-পালন করিত এবং এইজন্যই অপর লোকে শিশুকে জননীর উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু মাতৃবিয়োগের পর আল্লাহ্ বহু নরনারীকে তাহার লালন-পালনের জন্য উদগ্রীব করিয়া দিয়া থাকেন। শিশু বড় হইলে আল্লাহ্ তাহাকে জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা দান করেন এবং অর্জনের ইচ্ছা তাহার উপর চাপাইয়া দেন ও আত্মমমতা বোধ তাহার অন্তরে জন্মাইয়া দিয়া থাকেন। এইজন্যই শৈশবে মাতৃস্নেহে যেরূপ দেহ রক্ষা পাইয়াছে, প্রাপ্তবয়সে

আত্মমমতা-বোধও তদ্রূপ কোন শিল্প-ব্যবসায় অবলম্বনে স্বীয় দেহ রক্ষার উপায় করিয়া লয়। কিন্তু আল্লাহ্ যদি তাহার উপার্জনের ইচ্ছা রহিত করিয়া দেন এবং তজ্জন্য সে একমাত্র তাক্ওয়া-পরহেযগারিতে নিবিষ্ট থাকে তবে সমস্ত জগতবাসীর হৃদয়ে তিনি তাহার প্রতি স্নেহ-মমতা জাগাইয়া দিয়া থাকেন। তখন সকলেই বলিতে থাকে–'এই ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে লিপ্ত আছেন। উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি তাঁহাকে প্রদান করা উচিত।' যৌবনকালে আত্মমমতাবোধে সে একাই নিজের প্রতিপালনের উপায় করিয়া লইত, কিন্তু ইয়াতীমের প্রতি যেমন সকলেই দয়াবান হয় তদ্রূপ সকলেই এখন তাহার প্রতি দয়ালু হইয়া উঠে। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি উপার্জনে সমর্থ হয়, অথচ আলস্যবশত উপার্জন না করিয়া বেহুদা কাজে লিপ্ত থাকে, তবে লোকের মনে তাহার প্রতি দয়ার ভাব উদয় হয় না। তাওয়াক্কুল করত উপার্জনে বিরত থাকা এমন ব্যক্তির পক্ষে জায়েয নহে। কারণ, সে যখন স্বীয় প্রবৃত্তিতে নিবিষ্ট তখন নিজ প্রতিপালনের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করাও তাহার পক্ষে আবশ্যক।

ফলকথা এই যে, মানুষ যখন একমাত্র আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট থাকিয়া স্বীয় প্রতিপালনের সকল উপায় অবলম্বনে বিরত থাকে তখন আল্লাহ্ তা'আলা জগতবাসীর হৃদয় তৎপ্রতি দয়ার্দ্র করিয়া তোলেন। এইজন্যই কোন মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তিকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে দেখা যায় না। বিশ্বরাজ্য পালনার্থ আল্লাহ্র কৌশলময় পরিপক্ক বন্দোবস্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই–'পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণকারী নাই যাহার জীবিকার ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত নহে'–আল্লাহ্র এই উক্তির মর্ম মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং বুঝিতে সমর্থ হয় যে, তিনি এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে, কোন প্রাণীই জীবিকার অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। জীবিকার অভাবে কদাচিৎ কাহাকেও ধ্বংস হইতে দেখা গেলেও ইহাতেই তাহার মঙ্গল নিহিত আছে বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে, জীবিকা অর্জনে বিরত থাকার কারণে তাহার ধ্বংস হয় না। কারণ, অগাধ ধন উপার্জন করিয়াছে এমন ব্যক্তিকেও কখন কখন অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে দেখা যায়। এই ব্যাপারে হযরত হাসান বস্রীর (র) জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছিল বলিয়াই তিনি বলেন–"আমি চাই যে, বস্রার সকল অধিবাসী আমার পরিবারভুক্ত হউক এবং একটি গমের দানার মূল্য এক একটি স্বর্ণমুদ্রা হইয়া পড়ুক।" হযরত ওহাব ইবনুল ওয়ারদ (র) বলেন–"আকাশ লৌহনির্মিত এবং ভূতল কাঁসার হইলে জীবিকাপ্রাপ্তির উপায় না

দেখিয়া যদি আমার মন দুঃখিত হইত তবে আমি মুশরিক হইয়া যাইবার ভয় করিতাম।" আকাশে রিযিক বলিয়া আল্লাহ্ এইজন্য উল্লেখ করিয়াছেন যেন লোকে বুঝিতে পারে যে, জীবিকার উপর কাহারও হাত নাই।

কতক লোক হযরত জুনায়দের (র) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমরা আমাদের জীবিকা অন্বেষণ করিতেছি।" তিনি বলিলেন—"জীবিকা কোথায় আছে জানা থাকিলে অন্বেষণ কর।" তাহারা আবেদন করিল—"আল্লাহ্র নিকট চাহিব।" তিনি বলিলেন—"যদি বুঝিয়া থাক যে, তিনি তোমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছে তবে স্মরণ করাইয়া যাও।" তাহারা বলিল—"তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া দেখি কি হয়।" তিনি বলিলেন—"পরীক্ষার জন্য তাওয়াক্কুল করিলে তিনি যে জীবিকা দিবেন, ইহাতে সন্দেহ করা হয়।" অবশেষে তাহারা নিবেদন করিল—"তাহা হইলে আমরা কি তদবীর করিব?" তিনি বলিলেন—"সকল তদবীর হইতে বিরত থাক।"

মোটের উপর কথা আল্লাহ্ যে জীবিকা দানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। রিযিক অন্বেষণকারীকে তাহার দিকেই মনোনিবেশ করা উচিত।

দ্বিতীয় মকাম—যে-ব্যক্তি এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখে সে তাওয়াক্কুলধারী লোকের শ্রেণী হইতে বহিষ্কার হইয়া পড়ে। কেননা সেই ব্যক্তি জীবিকার অদৃশ্য কারণ আল্লাহ্কে পরিত্যাগপূর্বক বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৎসর ঘুরিয়া আসে। প্রত্যেক বৎসরেই বাহ্য বস্তুর উপর ভরসা থাকিলে আল্লাহ্র উপর ভরসা হইবে কিরূপে? তবে যে-ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে উদরপূর্তির পরিমিত খাদ্য ও প্রয়োজনের সময়ে শরীর ঢাকিবার উপযুক্ত বস্ত্র পাইয়া পরিতুষ্ট থাকে তাহার তাওয়াক্কুল অক্ষুণ্ন থাকে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেন—"চল্লিশ দিনের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে না; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিলে নষ্ট হইবে।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন—"পরিমাণে যতই হউক না কেন, সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে।" হযরত আবূ তালিব মক্কী (র) বলেন —চল্লিশ দিনের অপেক্ষা অধিক খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও যদি সেই সঞ্চিত দ্রব্যের উপর ভরসা করা না হয় তবে তাওয়াক্কুল হইবে না।"

হযরত বিশরে হাফীর (র) অন্যতম মুরীদ হযরত হুসায়ন মুগাযানী (র) বলেন—"একদা একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি হযরত বিশরে হাফীর (র) নিকট উপস্থিত

হইলেন। তিনি আমাকে একমুষ্টি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার এরূপ খাদ্য সংগ্রহের আদেশ আমি কখনও শুনি নাই। আমি তাহার আদেশমত খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আহার করিলেন। ইহার পূর্বে আমি তাঁহাকে কখনও অন্যের সহিত একত্রে আহার করিতে দেখি নাই। আহার শেষে দেখা গেল বহু খাদ্য বাঁচিয়া গিয়াছে। সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি উদ্বৃত্ত খাদ্য বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বিনা অনুমতিতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য বোধ করিলাম। হযরত বিশ্রে হাফী (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি আশ্চর্য বোধ করিতেছ?' আমি বলিলাম—'হাঁ।' তিনি বলিলেন—'আগন্তুক হযরত ফতেহ মওসেলী। তিনি মওসেল শহর হইতে অদ্য আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন এবং আমাকে এই শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া লইয়া গেলেন যে, আল্লাহ্র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল হইয়া গেলে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও কোন ক্ষতি হয় না।"

যাহা হউক, বাস্তব কথা এই যে, অল্প আশা তাওয়াক্কুলের মূল। ইহার সাধারণ নিয়ম এই যে, নিজের জন্য সঞ্চয় করা উচিত নহে। আবার সঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত ধনকে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডারের ধনের ন্যায় মনে করিলে এবং সঞ্চিত সম্পদের উপর ভরসা না করিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা পরিবারবিহীন একক লোকের সম্বন্ধে বর্ণিত হইল।

পরিবারের জন্য সঞ্চয় ও তাওয়াক্কুল—পরিবারবিশিষ্ট লোক এক বৎসরের জীবিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তাহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক সময়ের উপযোগী দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া দিতেন। পরিজনবর্গের হৃদয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। তিনি নিজের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবশ্যক খাদ্য-দ্রব্যও জমাইয়া রাখিতেন না। অথচ সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও তাঁহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হইত না। কারণ, তিনি নিজের হস্তস্থিত ধন ও অপরের হস্তস্থিত ধনকে সমান মনে করিতেন। তবে সাধারণ লোকের মানসিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সঞ্চয়ের সহজ নিয়ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আস্হাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত এক সাহাবী

দেখিয়া যদি আমার মন দুঃখিত হইত তবে আমি মুশরিক হইয়া যাইবার ভয় করিতাম।" আকাশে রিযিক বলিয়া আল্লাহ্ এইজন্য উল্লেখ করিয়াছেন যেন লোকে বুঝিতে পারে যে, জীবিকার উপর কাহারও হাত নাই।

কতক লোক হযরত জুনায়দের (র) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল-"আমরা আমাদের জীবিকা অন্বেষণ করিতেছি।" তিনি বলিলেন-"জীবিকা কোথায় আছে জানা থাকিলে অন্বেষণ কর।" তাহারা আবেদন করিল-"আল্লাহ্র নিকট চাহিব।" তিনি বলিলেন-"যদি বুঝিয়া থাক যে, তিনি তোমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছে তবে স্মরণ করাইয়া যাও।" তাহারা বলিল-"তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া দেখি কি হয়।" তিনি বলিলেন-"পরীক্ষার জন্য তাওয়াক্কুল করিলে তিনি যে জীবিকা দিবেন, ইহাতে সন্দেহ করা হয়।" অবশেষে তাহারা নিবেদন করিল-"তাহা হইলে আমরা কি তদবীর করিব?" তিনি বলিলেন-"সকল তদবীর হইতে বিরত থাক।"

মোটের উপর কথা আল্লাহ্ যে জীবিকা দানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। রিযিক অন্বেষণকারীকে তাহার দিকেই মনোনিবেশ করা উচিত।

দ্বিতীয় মকাম-যে-ব্যক্তি এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখে সে তাওয়াক্কুলধারী লোকের শ্রেণী হইতে বহিষ্কার হইয়া পড়ে। কেননা সেই ব্যক্তি জীবিকার অদৃশ্য কারণ আল্লাহ্কে পরিত্যাগপূর্বক বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৎসর ঘুরিয়া আসে। প্রত্যেক বৎসরেই বাহ্য বস্তুর উপর ভরসা থাকিলে আল্লাহ্র উপর ভরসা হইবে কিরূপে? তবে যে-ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে উদরপূর্তির পরিমিত খাদ্য ও প্রয়োজনের সময়ে শরীর ডাকিবার উপযুক্ত বস্ত্র পাইয়া পরিতুষ্ট থাকে তাহার তাওয়াক্কুল অক্ষুণ্ণ থাকে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেন-"চল্লিশ দিনের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে না; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিলে নষ্ট হইবে।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন-"পরিমাণে যতই হউক না কেন, সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে।" হযরত আবূ তালিব মক্কী (র) বলেন -চল্লিশ দিনের অপেক্ষা অধিক খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও যদি সেই সঞ্চিত দ্রব্যের উপর ভরসা করা না হয় তবে তাওয়াক্কুল হইবে না।"

হযরত বিশরে হাফীর (র) অন্যতম মুরীদ হযরত হুসায়ন মুগাযানী (র) বলেন-"একদা একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি হযরত বিশরে হাফীর (র) নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে একমুষ্টি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার এরূপ খাদ্য সংগ্রহের আদেশ আমি কখনও শুনি নাই। আমি তাহার আদেশমত খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আহার করিলেন। ইহার পূর্বে আমি তাঁহাকে কখনও অন্যের সহিত একত্রে আহার করিতে দেখি নাই। আহার শেষে দেখা গেল বহু খাদ্য বাঁচিয়া গিয়াছে। সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি উদ্বৃত্ত খাদ্য বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বিনা অনুমতিতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য বোধ করিলাম। হযরত বিশ্রে হাফী (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-'তুমি আশ্চর্য বোধ করিতেছ?' আমি বলিলাম-'হাঁ।' তিনি বলিলেন-'আগন্তুক হযরত ফতেহ মওসেলী। তিনি মওসেল শহর হইতে অদ্য আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন এবং আমাকে এই শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া লইয়া গেলেন যে, আল্লাহ্র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল হইয়া গেলে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও কোন ক্ষতি হয় না।"

যাহা হউক, বাস্তব কথা এই যে, অল্প আশা তাওয়াক্কুলের মূল। ইহার সাধারণ নিয়ম এই যে, নিজের জন্য সঞ্চয় করা উচিত নহে। আবার সঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত ধনকে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডারের ধনের ন্যায় মনে করিলে এবং সঞ্চিত সম্পদের উপর ভরসা না করিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা পরিবারবিহীন একক লোকের সম্বন্ধে বর্ণিত হইল।

পরিবারের জন্য সঞ্চয় ও তাওয়াক্কুল-পরিবারবিশিষ্ট লোক এক বৎসরের জীবিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তাহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক সময়ের উপযোগী দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া দিতেন। পরিজনবর্গের হৃদয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। তিনি নিজের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবশ্যক খাদ্য-দ্রব্যও জমাইয়া রাখিতেন না। অথচ সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও তাঁহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হইত না। কারণ, তিনি নিজের হস্তস্থিত ধন ও অপরের হস্তস্থিত ধনকে সমান মনে করিতেন। তবে সাধারণ লোকের মানসিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সঞ্চয়ের সহজ নিয়ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আস্হাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত এক সাহাবী

(রা) ইন্তিকাল করিলে লোকে তাঁহার বস্ত্র হইতে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা পাইল। তাঁহার সম্বন্ধে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলিলেন–"তাঁহার উপর দুইটি দাগ হইবে। এইরূপ দাগ পড়ার দুই কারণ হইতে পারে। প্রথম, হয়ত কোন অভিপ্রায়ে তিনি নিজকে পরিবারবিহীন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এইজন্য শাস্তিস্বরূপ অগ্নির দুইটি দাগ হইবে; অথবা ইহাও হইতে পারে না, তিনি কোন ভাণ করেন নাই, কিন্তু সঞ্চয় করত তাঁহার পারলৌকিক মর্যাদার হানি করিয়াছেন। মুখমণ্ডলে দুইটি দাগ থাকিলে যেমন সৌন্দর্যের হানি হয়, সঞ্চয়ের দরুন তদ্রূপ তাঁহার পারলৌকিক মর্যাদারও হানি ঘটিবে। যেমন অপর এক সাহাবী (রা) ইন্তিকাল করিলে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলেন–"কিয়ামত দিবস তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু তাঁহার স্বভাবের মধ্যে একটি অভ্যাস না থাকিলে তাহার বদনমণ্ডল সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইত। সেই অভ্যাসটি এই–সেই সাহাবী এক শীতের বস্ত্র অপর শীতের জন্য রাখিয়া দিতেন এবং এক গ্রীষ্মের বস্ত্র অপর গ্রীষ্মের জন্য রাখিতেন।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলেন–"ইয়াকীন ও সবর তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম দেখিতেছি।" অর্থাৎ এক মৌসুমের বস্ত্র অপর মৌসুমের জন্য রাখিয়া দেওয়া ইয়াকীন (আল্লাহ্‌র উপর অটল বিশ্বাস) কম হওয়ার কারণেই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে সকলেই একমত যে, দস্তরখান, কলসী, লোটা, পিয়ালা প্রভৃতি যাহা সর্বদা ব্যবহারে লাগে তৎসমুদয় জমাইয়া রাখা দুরস্ত আছে। ইহার কারণ এই যে, অন্ন-বস্ত্র নানাবিদ উপকরণে প্রতি বৎসরই উৎপন্ন হইয়া থাকে; অপরপক্ষে তৈজসপত্র সব সময় উৎপন্ন হয় না এবং আল্লাহ্‌র স্থাপিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা দুরস্ত নহে। কিন্তু গ্রীষ্মের বস্ত্র শীতের সময়ে কাজে লাগে না। তাই ইহা পরবর্তী গ্রীষ্মের জন্য রাখিয়া দেওয়া দুর্বল বিশ্বাসের নিদর্শন।

নিরুদ্বেগে ইবাদতের জন্য সঞ্চয় উত্তম– সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে যাহার মন চঞ্চল থাকে এবং অপরের মুখাপেক্ষা হয়, তাহার পক্ষে সঞ্চয় করাই উত্তম। আবশ্যক পরিমাণ শস্যক্ষেত্র না রাখিলে যাহার মন নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারে না এবং নিশ্চিন্ত মনে যিকির ও আল্লাহ্‌র চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারে না, তাহার পক্ষে পরিমিত শস্যক্ষেত্র রাখাই উত্তম ব্যবস্থা। এই সকল বিষয়ে মনের শান্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া নিরুদ্বেগে আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন থাকাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সঞ্চিত ধন থাকিলে আল্লাহ্‌র যিকিরে ডুবিয়া থাকে, এমন লোকও আছেন। এই প্রকার

লোকের মন অতি উচ্চশ্রেণীর। অভাব মোচনের উপযোগী ধন না থাকিলে যাহাদের মন চঞ্চল থাকে, এমন কতক লোক আছে। তাহাদের পক্ষে শস্যক্ষেত্র রাখা উত্তম। কিন্তু জাঁকজমক ও শান-শওকত ব্যতীত যাহাদের মন আরাম পায় না, তাহারা দীনদার লোকের অন্তর্ভুক্ত নহে। আবার জাঁকজমক এবং শান-শওকতেরও কোন পরিসীমা নেই।

তৃতীয় মকাম–মানব জীবনে যে সকর বিপদাপদ ঘটা অবশ্যম্ভাবী বা প্রয়ই ঘটিয়া থাকে, উহা হইতে আত্মরক্ষা করার উপকরণ সংগ্রহ করিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। চোরে চুরি করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে দরজা বন্ধ করিয়া তালা লাগাইলে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হয় না। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেও তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। এইরূপ শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে শীতবস্ত্র পরিধান করিলে তাওয়াক্কুল বিনাশ পায় না। কিন্তু শীতকালে দেহের অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া শীত দূর করিবার উদ্দেশ্যে উদর ভরিয়া আহার করিলে দাগ ও মন্ত্র ব্যবহারে যেমন তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় তদ্রূপ উহাতেও নষ্ট হইয়া থাকে। তবে প্রকাশ্য কার্যকারণ পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য নহে। একদা এক পল্লীবাসী উষ্ট্রারোহণে আগমন করত উষ্ট্রটি ছাড়িয়া দিয়া রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি পল্লীবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি উট কি করিলে?" পল্লীবাসী বলিল–"আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া উট ছাড়িয়া দিয়াছি।" তিনি বলিলেন–"উহাকে বাঁধিয়া রাখ এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।"

মানব-প্রদত্ত দুঃখ–মানব-প্রদত্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা এবং উহার প্রতিবিধান না করা তাওয়াক্কুলের অন্তর্গত; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

অর্থাৎ "তাহাদের প্রদত্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া যাও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।" (সূরা আহ্‌যাব, ৬ রুকূ, ২২ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا - وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা আমাদিগকে যে কষ্ট দিতেছ, আমরা তাহা অবশ্যই সহ্য করিব এবং নির্ভরশীলদের উচিত যে, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে।" (সূরা ইবরাহীম, ৩ রুকূ, ১৩ পারা।) কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত অপর জন্তু সাপ, বিচ্ছু

প্রভৃতি যন্ত্রণা দিলে সহ্য করা উচিত নহে; বরং উহা নিবারণ করা আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, অথচ সেই সময়ে নিজের বাহুবল ও অস্ত্রের উপর ভরসা না করিয়া কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করে, সে-ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল। গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া তালার দৃঢ়তার উপর ভরসা না করিয়া কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা আবশ্যক। কারণ, তালার দৃঢ়তা চোরকে প্রতিরোধ করে না।

তাওয়াক্কুলধারী লোকের নিদর্শন– চোরে গৃহ হইতে ধন লইয়া গেলে তাওয়াক্কুলধারী লোকের পক্ষে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে; বরং আল্লাহ্‌র কার্যে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া বাহির হওয়ার সময় অন্তরে বলা উচিত–"হে আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা ও বিধান উলটাইবার উদ্দেশ্যে আমি গৃহদ্বারে তালা লাগাইতেছি না; বরং তোমার সৃষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতেছি মাত্র। তুমি যদি এই ধন লইয়া যাইবার জন্য কাহাকেও নিযুক্ত কর তবে আমি তোমার এই আদেশে সন্তুষ্ট আছি। কারণ, এই ধন অপর কাহারও ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়া তুমি ক্ষণিকের তরে আমার জিম্মায় রাখিয়াছ বা আমার জীবিকার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা আমি জানি না।" গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে যাইবার পর পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যদি গৃহস্বামী দেখিতে পায় যে, তাহার ধন চুরি গিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার মনে দুঃখ হয় তবে তাহার জানা আবশ্যক যে, তাহার তাওয়াক্কুল ঠিক নহে এবং তাওয়াক্কুল করিয়াছে বলিয়া তাহার যে-ধারণা ছিল, ইহা নফসের ধোঁকামাত্র। এতদস্থলে চোরকে অপবাদ না দিয়া নীরব থাকিলে সে সবরের মর্যাদা পাইবে। কিন্তু চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে এবং চোরকে ধরিবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সবরের মর্যাদা হইতেও সে বঞ্চিত থাকিবে। এমন লোকের পক্ষে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, সে সবরকারী ও তাওয়াক্কুলধারী, এতদুভয়ের কোন দলে অন্তর্ভুক্ত নহে। এইরূপ দাবী তাহার পরিত্যাগ করা উচিত। এই চুরির কারণে তাহার এই উপকার হইল যে, সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার সবর ও তাওয়াক্কুলের উক্ত দাবী ভ্রান্তিমূলক ছিল।

তাওয়াক্কুলের ভিত্তি–এ-স্থলে কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে যে, ধনের অভাবী না হইরে গৃহস্বামী ঘরের দরজা বন্ধ করিত না এবং ধনের হেফাযতও করিত না। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি নিজের অভাব মোচনের জন্য যে-ধন যত্ন করিয়া রাখিয়াছে, চোরে তাহা লইয়া গেলে সে দুঃখিত না হইয়া কিরূপে থাকিতে পারে? ইহার উত্তর এই—আল্লাহ্‌ মানবের সম্বন্ধে যাহা করেন তাহা

তাহার মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। কিসে মানবের মঙ্গল নিহিত আছে, তাহা আল্লাহই ভাল জানেন, মানব কিছুই জানে না। এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ধন পাইয়া লোকে মনে করিবে, ইহাতেই তাহার মঙ্গল রহিয়াছে। কারণ, আল্লাহই তাহাকে ধন দান করিয়াছেন। আবার তাহার হস্ত হইতে ধন চলিয়া গেলে সে ধারণা করিবে, ইহাতেই তাহার মঙ্গল আছে; কেননা আল্লাহ্‌ই তাহার ধন তুলিয়া লইয়াছেন। এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে ধন থাকিলে বা অপহৃত হইলে, উভয় অবস্থায়ই মানব-মন প্রফুল্ল থাকে, কখনও দুঃখিত হয় না। বিষয়টি বুঝাইবার জন্য একটি উপমা দেওয়া হইতেছে। মনে কর, স্বয়ং দয়াময় পিতা এক পীড়িত বালকের চিকিৎসক। চিকিৎসক পিতা তাহাকে গোশ্‌ত আহার করিতে দিলে সে প্রফুল্ল চিত্তে বলে–'গোশ্‌ত আহারে আমার শরীর সুস্থ না হইলে তিনি কখনও আমাকে গোশ্‌ত খাইতে দিতেন না।' আবার তাহার হাত হইতে গোশ্‌ত কাড়িয়া লইলেও সে আনন্দিত হইয়া বলে–'গোশ্‌ত আহার আমার জন্য অনিষ্টকর না হইলে তিনি কখনই আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইতেন না।' ফলকথা এই–'আল্লাহ যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন' এই বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে মযবুত হয় নাই, সে তাওয়াক্কুল করিতে পারে না। এমন লোকের তাওয়াক্কুলের দাবী মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

তাওয়াক্কুলধারী ব্যক্তির কর্তব্য–ধন চুরি গেলে তাওয়াক্কুলধারী লোকের পক্ষে ছয়টি কর্তব্য পালন করা আবশ্যক।

প্রথম কর্তব্য–ধন নিরাপদে রাখিবার উদ্দেশ্যে দরজা বন্ধ করা উচিত বটে, কিন্তু বহু শিকল ও অনেক তালা লাগাইয়া বন্ধ করিতে বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে এবং প্রতিবেশীদিগকে ধনের পাহারা দিতে অনুরোধ করাও উচিত নহে। বরং সহজভাবে দরজা বন্ধ করা আবশ্যক। হযরত মালিক ইবনে দীনার (র) দড়ি দিয়া দরজা বাঁধিয়া রাখিতেন এবং বলিতেন–"কুকুর প্রবেশের ভয় না থাকিলে রজ্জু দ্বারাও গৃহদ্বার বন্ধ করিতাম না।"

দ্বিতীয় কর্তব্য–যে-প্রকার ধন থাকিলে ধনের লোভে চোর নিশ্চয়ই গৃহে প্রবেশ করিবে বুঝা যায়, এমন ধন গৃহে রাখা উচিত নহে। এরূপ লোভনীয় দ্রব্য গৃহে রাখিয়া চোরকে চুরি কার্যে উৎসাহ প্রদান করা হয়। আমীর মুগীরা একদা হযরত মালিক দীনারের (র) নিকট যাকাতের ধন প্রেরণ করিলেন। তিনি সমস্ত ধন ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন–"তোমার ধন তুমি গ্রহণ কর। কারণ চোরে উহা লইয়া যাইবে বলিয়া শয়তান আমার মনে সন্দেহ জন্মাইতেছে।"

সন্দেহ দোলায় তাঁহার মন যেন বিচলিত না থাকে এবং কেহ চুরি করিয়া যাহাতে পাপে নিপতিত না হয়, এইজন্যই তিনি যাকাতের মাল ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) এই ঘটনা শুনিয়া বলিলেন—"ইহা সূফীদিগের চিত্তের দুর্বলতামাত্র। মালিক দীনার সম্পূর্ণ সংসারবিরাগী। চোরে ধন লইয়া যাইবে, ইহাতে তাঁহার কি?" হযরত আবূ সুলায়মান দারানীর (র) এই ধারণা তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার নির্দশন।

তৃতীয় কর্তব্য—দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরে যাইবার সময় এইরূপ নিয়ত করিবে—'আমার ধন-সম্পদ যদি চোরে লইয়া যায় তবে উহা তাহারই হইয়া যাউক এবং তাহার জন্য হালাল হউক।' এইরূপ নিয়ত করিলে তোমার ধন দ্বারা অভাবী চোরের অভাব মোচন হইবে অথবা সে ধনী হইয়া পড়িবে। ধনী হইলে সে অন্যের ধন চুরি করিবে না। সুতরাং অন্যান্য মুসলমানের ধনরক্ষার্থে তোমার এই অপহৃদ সম্পদ উৎসর্গীকৃত হইল। ইহাতে চোরের প্রতি যেমন সদয় ব্যবহার করা হইল তদ্রূপ সর্বসাধারণ মুসলমানের প্রতিও উদারতা করা হইল। আর তুমি জানিয়া রাখিবে, তোমার এইরূপ নিয়ত করার কারণে আল্লাহ্‌র কলম রদ হইবে না (অর্থাৎ চুরি না হওয়া যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয় তবে কেহই চুরি করিবে না এবং চুরি করানোই যদি তাঁহার অভিপ্রায় থাকে তবে অবশ্যই চুরি হইবে।) উভয় অবস্থায়ই তুমি সদকার সওয়াব পাইবে। তুমি তোমার নিয়তের কল্যাণে এক দেরহামের পরিবর্তে সাত শত দেরহামের সওয়াব পাইবে। হাদিস শরীফে উক্ত আছে যে, স্ত্রীসহবাসকালে বীর্য বাহিরে নিক্ষেপ না করিয়া সন্তান উৎপাদনের নিয়তে জরায়ুতে নিক্ষেপ করিলে সন্তানের জন্ম হউক বা না হউক (উভয় অবস্থাতেই) তাহার ভাগ্যে এমন এক সুসন্তানের পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়, যে সন্তান জিহাদ করিতে করিতে কাফিরের হস্তে শহীদ হয়। এইরূপ সওয়াব পাওয়ার কারণ এই যে, তাহার যে কর্তব্য ছিল, সে তাহা যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছে। সন্তান জন্মানো ও তাহাকে জীবিত রাখা তাহার ক্ষমতাধীন নহে। যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে উক্ত সন্তানের পাপ-পুণ্য তাহার কর্ম অনুযায়ী হইয়া থাকে (ইহাতে পিতার জন্য বর্ণিত সওয়াবের মধ্যে কোন ত্রুটি আসিবে না।)

চতুর্থ কর্তব্য—ধন অপহৃত হইলে দুঃখিত হওয়া উচতি নহে এবং মনে করা উচিত যে, চুরি হওয়াতেই মঙ্গল রহিয়াছে। ধন চুরি গেলে যদি বলা হয়—'উহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিলাম,' তবে অপহৃত ধনের অনুসন্ধান করা উচিত নহে। এমন

কি চোরে ফিরাইয়া দিলেও উহা গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। তবে গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই; কেননা উহা তাহারই ধন। কিন্তু তাওয়াক্কুলধারী ব্যক্তির পক্ষে ইহা শোভা পায় না। হযরত ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর একটি উট চুরি হইয়া যায়। তিনি ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে হয়রান হইয়া পড়েন। তখন তিনি বলিলেন—"ইহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিলাম।" এই বলিয়া তিনি মসজিদে গমনপূর্বক নামাযে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া জানাইল—"উটটি অমুক স্থানে আছে।" তিনি উটের অনুসন্ধানে বাহির হইবার জন্য পাদুকা পরিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্' বলিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"উষ্ট্রটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেওয়া হইয়াছে। এখন ইহার ত্রিসীমায়ও যাইব না।"

এক বুযুর্গ স্বপ্নে জনৈক মুসলমানকে বেহেশতে দুঃখিত দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্যক্তি বলিল—"আমার এ-দুঃখ কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। কারণ, ইল্লীনে বহু উৎকৃষ্ট স্থান আমাকে দেখানো হইয়াছে, এমন স্থান সমস্ত বেহেশ্‌তে আর নাই আমি আনন্দিত হইয়া ঐ দিকে যাইতেছিলাম। এমন সময় আওয়ায আসিল—'এই ব্যক্তিকে দূর করিয়া দাও। কারণ যাহারা আল্লাহ্‌র পন্থা জারি রাখিয়াছে, তাহাদের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট স্থান।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আল্লাহ্‌র পন্থা জারি রাখার অর্থ কি?" উত্তর হইল—'তুমি একদা বলিয়াছিলে—অমুক বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিলাম। কিন্তু তৎপর ইহা পালন কর নাই। তুমি নিজ উক্তি পূর্ণ করিলে তোমাকে ঐ উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়া হইত।' এক ব্যক্তি মক্কা শরীফে নিদ্রিত ছিল। সে জাগ্রত হইয়া দেখিল যে, তাহার টাকার থলিয়াটি চুরি গিয়াছে। এক বুযুর্গ আবিদ তথায় ছিলেন। সেই ব্যক্তি আবিদের প্রতি চুরির দোষারোপ করিল। আবিদ তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার থলিয়াতে কত টাকা ছিল?" সেই ব্যক্তি যত টাকার কথা বলিল আবিদ তাহাকে তত টাকা দিয়া দিলেন। সে টাকাগুলি লইয়া বাহির হইয়া শুনিতে পাইল যে, তাহা কোন বন্ধু কৌতুকস্বরূপ থলিয়াটি তুলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সে আবিদের নিকট ফিরিয়া গেল এবং টাকাগুলি ফেরত লইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিল; কিন্তু আবিদ তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন—"আমি স্বেচ্ছায় এই টাকাগুলি আল্লাহ্‌র পথে দিয়াছি।" অবশেষে নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পড়িয়া তিনি বলিলেন—"আচ্ছা টাকাগুলি দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।" তৎপর সমুদয় টাকা দরিদ্রের মধ্যে

বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের আচরণ এইরূপই ছিল। উদাহারণস্বরূপ মনে কর, ফকীরকে দেওয়ার জন্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া গিয়া যদি দেখা যাইত যে, ফকীর চলিয়া গিয়াছে তবে সেই দ্রব্য ফিরাইয়া আনিয়া আহার করাকে তাঁহার মকরূহ জানিতেন এবং অপর ফকীরকে উহা দিয়া দিতেন।

পঞ্চম কর্তব্য– চোরের জন্য বদ দু'আ করা উচিত নহে। ইহাতে তাওয়াক্কুল ও পার্থিব সম্পদে অনাসক্তি উভয়ই নষ্ট হয়। কারণ যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য যে ব্যক্তি অনুশোচনা করে, সে সংসারবিরাগী নহে। হযরত রবী' ইব্‌নে খসীমের (র) কয়েক সহস্র দেরহাম মূল্যের একটি অশ্ব চোরে লইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, চোরে লইয়া যাইবার সময় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি চোরকে ঘোড়া লইয়া যাইতে দিলেন কেন?" তিনি বলিলেন–"আমি যে কার্যে রত ছিলাম উহা আমার নিকট ঘোড়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" অর্থাৎ তিনি তখন নামাযে ছিলেন। লোকে সেই সময় চোরকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন–"অভিসম্পাত করিও না। আমি ঘোড়াটি সদ্‌কা দিয়া তাহার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছি।" লোকে এক বুযুর্গকে তাঁহার অত্যাচারীর প্রতি অভিসম্পাত দিতে অনুরোধ করে। তিনি বলিলেন–"সে নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছে; আমার উপর করে নাই। তাহার নিজের দুষ্কর্ম তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে। তাহার উপর আমি আর অতিরিক্ত শাস্তি চাপাইতে পারি না।" হাদীস শরীফে আছে যে বান্দা স্বীয় অত্যাচারীর উপর অভিসম্পাত দেয় এবং তাহাকে মন্দ বলে। এইরূপে সে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এমনও হয় যে, (অতিরিক্ত অভিসম্পাদ ও গালিগালাজের দরুন) উল্টা অত্যাচারিতের উপর অত্যাচারীর হক থাকিয়া যায়।

ষষ্ঠ কর্তব্য–চোর যে পাপ করিয়া শাস্তির যোগ্য হইয়াছে তজ্জন্য তৎপ্রতি দয়া প্রদর্শনার্থ দুঃখিত হওয়া উচিত। ধনস্বামী অত্যাচারিত হইয়াছে, অত্যাচার করে নাই এবং তাহার ধনের ক্ষতি হইয়াছে, ধর্মের ক্ষতি হয় নাই বলিয়া আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য। কারণ যে-ব্যক্তি গোনাহ্‌কে হালাল মনে করে তৎপ্রতি তাহার মনে দয়ার সঞ্চার হয়, মানব জাতির প্রতি তাহার ভালবাসা নাই। হযরত ফুযায়ল (র) তদীয় পুত্র হযরত আলীকে (র) স্বীয় ধন চোরে লইয়া যাওয়াতে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি ধন চুরি হইয়াছে বলিয়া রোদন করিতেছ?" পুত্র বলিলেন–"না, আমি সেই চোর

বেচারার দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছি। বেচারা এমন দুষ্কর্ম করিয়াছে যে, কিয়ামত দিবস তাহার কোনও ওজর-আপত্তি করিবার পথ থাকিবে না।"

চতুর্থ মকাম–রোগের চিকিৎসা ও আগত বিপদাপদ দূরীকরণ সম্বন্ধে এ-স্থলে বর্ণিত হইতেছে। চিকিৎসার তিনটি শ্রেণী আছে। **প্রথম শ্রেণী**–যাহাতে সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত, যেমন অন্ন ক্ষুধা দূর করে, পানি পিপাসা নিবারণ করে এবং কোথাও আগুন লাগিলে পানি ঢালিয়া দিলে অগ্নি নির্বাপিত হয়। এবংবিধ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন না করা তাওয়াক্কুল নহে; বরং উহা বর্জন করা হারাম। **দ্বিতীয় শ্রেণী**–যে ব্যবস্থায় সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত নহে, আবার কল্পিতও নহে, বরং সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে; যথা–'মন্ত্র', 'দাগ' ও 'ফাল'। এই সকল বর্জন করা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে আছে যে, এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা বাহ্য উপকরণে বাড়াবাড়ি ও উহার উপর নির্ভরশীলতার নিদর্শন। ইহাদের মধ্যে 'দাগ' নিকৃষ্টতম। ইহার পরে মন্ত্র ও সর্বশেষে ফাল। **তৃতীয় শ্রেণী**–ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী, প্রথম শ্রেণীর ন্যায় নিশ্চিত নহে, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায় অযৌক্তিক এবং অনিশ্চিত নহে। শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করা, জোলাপ লওয়া, শীত লাগিলে উষ্ণ দ্রব্য ব্যবহার আবার তৃষ্ণা বোধ হইলে শীতল দ্রব্য গ্রহণ, এই শ্রেণীর চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি বর্জন হারাম নহে, আবার তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য নহে। কখন কখন এইরূপ পদার্থ ব্যবহার করা, না করা অপেক্ষা উত্তম। আবার কোন সময় ব্যবহার না করাই উত্তম। এই সকল পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য নহে। ইহার প্রমাণ এই যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই শ্রেণীর দ্রব্য ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং নিজেও ব্যবহার করিয়াছেন।

তিনি বলেন–"হে আল্লাহ্‌র বান্দা, তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর।" তিনি বলেন–"মৃত্যু ব্যতীত অপর সকল রোগের ঔষধ আছে; তবে মানুষ কোন সময় সেই ঔষধ জানে, আবার কোন সময় জানে না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ঔষধ এবং মন্ত্র কি আল্লাহ্‌র বিধান উলটাইয়া দিতে পারে?" তিনি বলেন–"ইহাও যে আল্লাহ্‌রই বিধান।" তিনি বলেন–"আমি ফিরিশতাগণের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের প্রত্যেক দল আমাকে বলিতেন 'আপনি আপনার উম্মতকে শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিতে উপদেশ

দিবেন।" তিনি বলেন– "(চান্দ্র) মাসের ১৭ই, ১৯শে এবং ২১ শে তারিখ শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির কর। অন্যথায় রক্তাধিক্য তোমাকে বিনাশ করিতে পারে।" তিনি অন্যত্র বলেন–"আল্লাহ্র আদেশে রক্তই বিনাশের কারণ হয়।" শরীর হইতে রক্ত বাহির করা, পরিহিত বস্ত্র হইতে সাপ ঝাড়িয়া ফেলা এবং গৃহে লাগানো অগ্নি নির্বাপণ করা সমান। কেননা এই সকল বিনাশের কারণ হইয়া থাকে এবং এইগুলি না করা তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য নহে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন–"মাসের ১৭ই তারিখ মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগইলে সারা বৎসর শরীরে রোগ থাকে না।" তিনি হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে শিঙ্গা লাগাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর চক্ষে বেদনা ছিল। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে তাজা খেজুর খাইতে নিষেধ করিলেন এবং বিটচিনিসহ এক প্রকার পাতা ও যবের আটা পাক করিয়া খাইতে আদেশ করিলেন। তিনি হযরত সুহব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলিলেন–"তোমার চক্ষে ব্যথা, অথচ খোরমা খাইতেছ?" তিনি কৌতুকরূপ নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহর রাসূল, যে চক্ষে ব্যথা হইয়াছে ইহার বিপরীত দিকের মাড়ী দ্বারা চিবাইয়া খাইতেছি।" উত্তর শুনিয়া হযরত (সা) হাসিয়া ফেলিলেন।

ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্র (সা) আচরণ– রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ রজনীতে চক্ষে সুরমা লাগাইতেন। প্রতি মাসে শিঙ্গা লাগাইতেন এবং প্রতি বৎসর ঔষধ সেবন করিতেন। ওহী নাযিলের সময় তাঁহার পবিত্র মস্তকে বেদনা হইত; তিনি বেদনাস্থলে মেহদী লাগাইতেন। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে তথায়ও তিনি মেহদী প্রয়োগ করিতেন এবং অধিকাংশ সময় ক্ষতস্থানে মৃত্তিকাচূর্ণ প্রক্ষেপ করিতেন। রোগের সময় রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে সকল ঔষধ স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন এবং অপরকে ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছেন তৎসমুদয় সংগ্রহ করত আলিমগণ 'তিব্বুন্ নবী' নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে হযরত মূসার (আ) উপর ওহী–হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম একবার পীড়িত হইলেন। বনী ইস্রাঈলের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিলেন–"অমুক দ্রব্য এই রোগের ঔষধ।" তিনি বলিলেন–"আমি ঔষধ সেবন করিব না; স্বয়ং আল্লাহই আমাকে নিরাময় করিবেন।" তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইল। লোকে বলিল–"ইহার ওষধ বিখ্যাত এবং অব্যর্থ। ইহা ব্যবহারমাত্র

লোক আরোগ্য লাভ করে।" তিনি ঔষধ সেবন করিতে সম্মত হইলেন না এবং পীড়াও দূর হইল না। তখন ওহী নাযিল হইল–"হে মূসা, আমি স্বীয় গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি–তুমি যে পর্যন্ত ঔষধ সেবন না করিবে, সেই পর্যন্ত আমি তোমাকে নিরাময় করিব না।" অবশেষে তিনি ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার মনে কিছু খটকা ছিল। তখন ওহী আসিল–"হে মূসা, তুমি কি তোমার তাওয়াক্কুল দ্বারা আমার হেকমত বাতিল করিয়া দিতে চাও? আমা ব্যতীত অপর কে ঔষধের মধ্যে উপকারিতা রাখিয়া দিয়াছে?"

এক নবী (আ) শারীরিক দুর্বলতার জন্য আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ করিলেন। ওহী আসিল–"গোশত আহার কর এবং দুধ পান কর।" এক কওম সমসাময়িক পয়গম্বরের নিকট তাহাদের সম্প্রদায়ে সুশ্রী সন্তান জন্ম গ্রহণ করে না বলিয়া অভিযোগ করিলে ওহী আসিল–"সেই সম্প্রদায়ের নারীদিগকে গর্ভাবস্থায় টাট্কা খাদ্য আহার করিতে বলিয়া দাও। তাহা হইলে তাহাদের সন্তান সুশ্রী হইবে।" তৎপর সেই কওমের নারীগণ গর্ভাবস্থায় এবং নেফাসের সময়ে টাটকা খাদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিল।

উপরিউক্তি বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট পানাহার যেমন পরিতৃপ্তি দান করে তদ্রূপ ঔষধ স্বাস্থ্য প্রদান করে। তবে এই সমস্ত একমাত্র বিশ্বকারণ আল্লাহ্র সৃষ্ট হিতকর কৌশলেই হইয়া থাকে। হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, রোগ কি কারণে হয় এবং আরোগ্যই বা কি কারণে ঘটে?" উত্তর আসিল–"উভয়েই আমার আদেশে ঘটে।" হযরত মূসা (আ) পুনরায় নিবেদন করিলেন–"তাহা হইরে চিকিৎসক কি কার্যে আসে?" উত্তর হইল–"চিকিৎসক ঔষধের উপলক্ষে জীবিকা পাইবে এবং আমার বান্দাদিগকে প্রফুল্ল রাখিবে।"

ফলকথা এই যে, চিকিৎসাক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল জ্ঞানমূলক ও মনের ভাবমূলক ব্যাপার। ঔষধের উপর ভরসা না করিয়া ঔষধের সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা করা মানুষের উচিত। কারণ বহু লোক ঔষধ সেবন করিয়াও মরিতেছে।

দাগ লওয়া অনুচিত কেন–রোগ দূর করিবার নিমিত্ত উত্তপ্ত লৌহের দাগ লওয়ার অভ্যাস বহু লোকের আছে। কিন্তু দাগ লইলে তাওয়াক্কুলের শ্রেণী হইতে লোক বহির্গত হইয়া পড়ে। বরং দাগ লওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে;

কিন্তু ঝাড়ফুঁক নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, আগুন দ্বারা পোড়াইয়া দাগ দিলে ক্ষত ভয়ানক আকার ধারণ করিতে পারে এবং শরীরের সর্বস্থানে আগুনের তাপ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ার আশংকা থাকে। দাগ লওয়া শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করার সমতুল নহে। আর দাগ লওয়ার উপকারও শিঙ্গা লাগানোর উপকারের ন্যায় নহে। তদুপরি দাগের পরিবর্তে অন্য ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হযরত ওমর ইব্‌নে হুসায়ন (র) পীড়িত হইয়াছেন। লোকে তাঁহাকে দাগ লইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু তৎপ্রতি তিনি কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি দাগ লইতে বাধ্য হইলেন। তৎপর তিনি বলেন—"পূর্বে আমি এক নূর দেখিতে পাইতাম, আকাশ-বাণী শুনিতাম এবং ফিরিশতাগণ 'আসসালামু আলায়কুম' বলিয়া আমাকে অভিনন্দন করিত। কিন্তু দাগ লওয়ার পর এই সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তৎপর আমি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।" হযরত মুতার্‌রাফ ইব্‌নে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট তিনি ইহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, বহুদিন পর আল্লাহ্ তাঁহাকে পূর্বাবস্থা পুনরায় প্রদান করিয়াছেন।

অবস্থা বিশেষে ঔষধ ব্যবহারে বিরতি সুন্নত-বিরোধিতা নহে; বরং কোন কোন স্থলে ঔষধ সেবন না করা উত্তম—অধিকাংশ বুযুর্গ ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। এ-কথা শুনিয়া কেহ হয়ত প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে যে, ঔষধ ব্যবহারে বিরত থাকা সর্বোৎকৃষ্ট হইলে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। এই প্রতিবাদ টিকিবে না। কারণ, ছয়টি কারণে লোকে ঔষধ ব্যবহারে বিরত থাকে। যথাঃ—**প্রথম কারণ**—যে-সকল কামিল লোকে কাশ্‌ফ দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের মৃত্যু অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আর ঔষধ সেবন করিতে চাহেন না। এইজন্যই হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত হইলে লোকেরা চিকিৎসক ডাকিবার অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু তিনি বলিলেন— "চিকিৎসক আমাকে দেখিয়া বলিয়াছেন – إِنِّيْ أَفْعَلُ مَا أُرِيْدُ অর্থাৎ আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করি।" [আল্লাহ্‌র দিকে লক্ষ্য করিয়াই হযরত আবূ বকর (রা) এই কথা বলিয়াছিলেন।] **দ্বিতীয় কারণ**—পীড়িত ব্যক্তি পরকালের চিন্তায় লিপ্ত থাকিলে তাহার মনে চিকিৎসার খেয়ালও উদিত হয় না। যেমন, হযরত আবূ দরদা

রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু পীড়িত অবস্থায় রোদন করিতেছিলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি রোদন করিতেছেন কেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"পাপের কারণে।" তাঁহারা বলিলেন—"আপনি কিসের আশা রাখেন?" তিনি বলিলেন—"আল্লাহ্‌র রহমতের।" তাঁহারা বলিলেন—"চিকিৎসক ডাকা হইবে কি?" তিনি বলিলেন—"চিকিৎসকই (অর্থাৎ আল্লাহ্) আমাকে পীড়িত করিয়াছেন।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর চক্ষে বেদনা ছিল। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ঔষধ ব্যবহার করেন না কেন?" তিনি বলিলেন—"আমি ঔষধ ব্যবহার অপেক্ষা বড় কাজে লিপ্ত আছি।" এই কথা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। মনে কর, কোন ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদানের জন্য বাদশাহ্‌র নিকট লইয়া যাওয়া হইতেছে। এমতাবস্থায় কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আহার করিতেছ না কেন?" তখন সে বলিল "ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমি উদ্বিগ্ন নহি।" এই কথা বলাতে আহার গ্রহণকারীর প্রতি তিরস্কার করা হয় না এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণও করা হয় না। পরকালের চিন্তায় মগ্ন লোকের অবস্থা হযরত সহলের (র) ন্যায় হইয়া থাকে। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আহার কি?" তিনি বলিলেন—"আল্লাহ্‌র যিকির।" তাহারা বলিল—"আমরা জীবন ধারণের উপকরণ সম্বন্ধে জানিতে চাহিতেছি।" তিনি উত্তর দিলেন—"ইহা ইলম।" তাহারা বলিল—"আমরা খাদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি।" তিনি বলিলেন—"ইহা আল্লাহ্‌র যিকির।" তাহারা অবশেষে বলিল"আমরা শরীর পোষক খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিতেছি।" তিনি বলিলেন— "শরীরের চিন্তার মগ্ন না হইয়া ইহাকে সৃষ্টিকর্তার উপর ছাড়িয়া দাও।" **তৃতীয় কারণ**—চিররোগী হওয়া। যে-ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবত রোগে ভুগিতেছে, বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন ফল না পাইয়া ঔষধকে মন্ত্রতন্ত্রের ন্যায় অকর্মণ্য বলিয়া মনে করিতেছে, তদ্রূপ ব্যক্তি পরিশেষে ঔষধ ব্যবহারে বিরত থাকে। যাহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহে, তাহারা অধিকাংশ ঔষধকে এইরূপ অকর্মণ্য বলিয়াই মনে করে। হযরত রবী' ইব্‌নে খসীম (র) বলেন—"রোগ হইলে চিকিৎসা করিতে আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আদ ও সামূদ প্রভৃতি যে সকল জাতি কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহাদের কথা স্মরণ হয়। তাহাদের মধ্যে বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন, তথাপি তাহারা মরিয়া গিয়াছে। চিকিৎসা বিদ্যা তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই।' ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ঔষধকে স্বাস্থ্য লাভের বাহ্য উপকরণ বলিয়াও মনে করিতেন না।

চতুর্থ কারণ–রোগের কারণে যে-সওয়াব পাওয়া যায়, ইহা লাভের আশায় রোগী রোগমুক্তি কামনা করে না; বরং রুগ্ন অবস্থায় থাকিয়া নিজের সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিতে চাহে। কারণ হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, স্বর্ণকার অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া যেরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা করে, আল্লাহর তদ্রূপ বিপদাপদ দ্বারা তাঁহার বান্দাগণকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। পরীক্ষায় কোন স্বর্ণ খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত হয় আবার কোনটি অখাঁটি বলিয়া ধরা পড়ে। হযরত সহল তস্তরী (র) অপর লোককে ঔষধ সেবনের আদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজের এক পীড়া ছিল; তিনি ইহার জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতেন না এবং বলিতেন–"রোগযন্ত্রণা সন্তোষের সহিত সহ্য করিয়া বসিয়া বসিয়া নামায পড়াকে আমি সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম বলিয়া জানি।" **পঞ্চম কারণ**–যে-রোগী বহু পাপ করিয়াছেন এবং আশা করে যে, রোগ এই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে, এমন ব্যক্তি ঔষধ সেবনে ক্ষান্ত থাকে। কারণ, হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য বান্দাকে জ্বররোগে আক্রান্ত করা হয়। জ্বরের তাপে পাপ এমনভাবে পরিষ্কার হইয়া যায়, যেমন বরফ হইতে ধূলাবালি দূর হইয়া থাকে। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"যে-ব্যক্তি পাপ মুক্তির আশায় সন্তুষ্ট চিত্তে দৈহিক পীড়া ও আর্থিক বিপদ সহ্য না করে, সে আলিম নহে।" হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এক রোগীকে দেখিয়া নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ, তাহার উপর দয়া কর।" প্রত্যাদেশ হইল–"আর কিরূপে তাহার উপর দয়া করিব? আমি ত এই রোগ দিয়া তাহার পাপ দূর করিয়া দিতেছি এবং তাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদান করিতেছি।" **ষষ্ঠ কারণ**–যে-ব্যক্তি ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে, শরীর সুস্থ থাকিলে মানুষ গর্বিত ও অবাধ্য হইয়া পড়ে এবং ইবাদত কার্যে অলসতা আসে, সে সর্বদা পীড়িত থাকিতেই পছন্দ করে যেন সে পরকালের কার্যে গাফিল না হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন, তাহাকে রোগশোক দ্বারা সর্বদা পরকালের জন্য সতর্ক রাখেন। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলিয়াছেন–"অভাব, রোগ ও লাঞ্ছনা হইতে মুসলমান কখনও মুক্ত থাকে না।" হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ্ বলেন–"রোগ আমার শৃঙ্খল এবং দরিদ্রতা আমার জেলখানা। আমি যাহাকে ভালবাসি তাহাকেই আমি আমার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত আমার জেলখানায় আটকাইয়া রাখি।" অতএব অটুট স্বাস্থ্য পাপের দিকে আকর্ষণ করে বলিয়া রোগের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এক

দল লোককে বেশভূষায় সজ্জিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"ইহা কি?' লোকে বলিল–"অদ্য তাহাদের ঈদের দিন।" তিনি বলিলেন–"যে দিন পাপকার্য করা না হয়, তাহাই আমাদের ঈদের দিন।" এক বুযুর্গ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞসাা করিলেন–"কেমন আছ?" সেই ব্যক্তি বলিল–"ভাল আছি।" তিনি বলিলেন–"যে দিন পাপ না কর, বাস্তবিকই সেইদিন তুমি ভাল থাক। কিন্তু যদি পাপ কর তবে ইহা অপেক্ষা গুরুতর পীড়া আর কি আছে?' বুযুর্গগণ বলেন–"ফিরআউন চারিশত বৎসর জীবিত ছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহার কোন সময় মাথা-বেদনা এবং জ্বরও হয় নাই। এইজন্যই সে নিজেকে খোদা বলিয়া দাবী করিয়াছিল। তাহার মাথায় যদি ঘণ্টাকাল আধ-কপালী বেদনাও থাকিত তবে সে কখনই তদ্রূপ মিথ্যা দাবী করিত না।" তাঁহারা অন্যত্র বলেন–"বান্দা এক দিনের জন্য পীড়িত হইয়াও যদি তওবা না করে তবে মওতের ফিরিশ্তা হযরত আযরাঈল আলায়হিস্ সালাম বলেন–'হে গাফিল আমি কয়েকবার তোমার নিকট আমার দূত পাঠাইয়াছিল; তথাপি তোমার কোন উপকারই হইল না।" তাঁহারা আরও বলেন–"বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে চল্লিশ দিন ধরিয়া দুঃখ রোগ, ভয় বা ক্ষতি হইতে মুক্ত থাকা উচিত নহে।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক নারীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল। লোকে সেই নারীর প্রশংসাস্থলে বলিল–"হে আল্লাহ্র রাসূল, সে কখনও পীড়িত হয় না।" তিনি বলিলেন–'তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা আমার নাই।" একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কথা প্রসঙ্গে শিরঃপীড়া সম্বন্ধে বলিতে ছিলেন। এমন সময় এক পল্লীবাসী আরবী বলিল–"শিরঃপীড়া আবার কি? আমার ত কখনও রোগই হয় না।" তিনি বলিলেন–"আমার নিকট হইতে দূর হও। কেহ দোযখী লোক দেখিতে চাহিলে তাহাকে বলিয়া দাও, সে যেন এই পল্লীবাসী আরবীকে দেখিয়া লয়।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, কেহ কি শহীদের মরতবা লাভ করিতে পারে?" হযরত (সা) বলিলেন–"হাঁ, যে-ব্যক্তি দিবারাত্রে বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে, সে (শহীদের মরতবা) পাইতে পারে।" পীড়িত ব্যক্তি সমস্ত দিনে বিশবারেরই অধিক মৃত্যু-চিন্তা করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল কারণেই কতক লোক ঔষধ ব্যবহারে বিরত রহিয়াছেন। কিন্তু উপরিউক্ত ফল লাভের উদ্দেশ্যে শরীরে রোগ পুষিয়া রাখিবার আবশ্যকতা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

ছিল না এবং এইজন্যই তিনি ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ফলকথা এই যে, বাহ্য উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুলের বিরোধী নহে।

মহামারীর স্থানে গমন বা তথা হইতে পলায়ন অনুচিত – হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এক সময়ে শাম দেশে যাইতেছিলেন। পথে সংবাদ পাইলেন যে, তথায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সঙ্গীদের কেহ কেহ যাইতে অসম্মত হইলেন; আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন–"আমরা আল্লাহ্র বিধান হইতে পলাইব না।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"আমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধি হইতে তাঁহার বিধির দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইব।" তৎপর তিনি বলিলেন–"তোমাদের মধ্যে কাহারও যদি দুইটি মাঠ থাকে–তন্মধ্যে একটি শ্যামল-শষ্য পরিপূর্ণ, অপরটি তৃণলতাশূন্য শুষ্ক ভূমি, তবে এমন স্থলে যে মাঠে রাখাল ছাগ চরাইতে যায় তাহা আল্লাহর নির্ধারিত বিধিলিপির আন্তর্গত।" অবশেষে হযরত ওমর (রা) হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আওফ রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে আহবান করিয়া এই বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন–"আমি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে শুনিয়াছি –'যদি তোমরা শুনিতে পাও যে, অমুক স্থানে মহামারী লাগিয়াছে তবে তথায় যাইবে না। আর তোমরা যে স্থানে আছ তথায় মহামারী থাকিলে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিও না।" ইহা শুনিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিলেন–"আল্হামদুলিল্লাহ্, আমার অভিমত হাদীসানুরূপ হইয়াছে। তৎপর অপর সাহাবাগণও এই বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন।

মহামারীর স্থান হইতে পলায়ন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ–দ্বিবিধ কারণে মহামারীর স্থান হইতে পলায়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রথম কারণ–সুস্থ লোক তথা হইতে চলিয়া গেলে সেবা-শুশ্রূষার অভাবে পীড়িত লোকের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় কারণ-মহামারীর স্থানের আবহাওয়া যখন সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করিয়াছে তখন অন্যত্র চলিয়া যাওয়াও বৃথা। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জিহাদের ময়দান হইতে কাফিরের ভয়ে পলায়ন করা এবং মহামারীর স্থান হইতে পলায়ন করা, এই উভয়ই সমান কথা। এই সমতার কারণ এই যে, জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিলে অবশিষ্ট যোদ্ধাগণের ও আহত সৈন্যদের যেরূপ মন ভাঙ্গিয়া যায় তদ্রূপ মহামারীর স্থান হইতে সুস্থ লোক চলিয়া গেলে পীড়িতদের হতাশা বৃদ্ধি পায়। তদুপরি পীড়িতদিগকে পথ্য দিবার ও তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিবার কেহই থাকে না। এমতাবস্থায় তাহারা

বিনাশপ্রাপ্ত হয়! অপর পক্ষে মহামারীর স্থান হইতে পলাইয়া রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়াও সন্দেহজনক।

রোগ প্রকাশ করা কখন সঙ্গত–রোগ প্রকাশ না করাই তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য এবং প্রকাশ ও অভিযোগ করা মাকরূহ। কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রকাশ করা মাকরূহ নহে, যেমন চিকিৎসকের নিকট নিজের রোগের বিষয় বর্ণনা করা অথবা মন হইতে ঔদ্ধত্য ও বাহাদুরির ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় দুর্বলতা প্রকাশ করা। ইহার প্রমাণ এই–হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু পীড়িত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি ভাল আছেন ত?" তিনি বলিলেন–"না।" ইহা শ্রবণে পার্শ্ববর্তী লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া একে অপরের দিকে চাহিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্র সহিতও কি বাহাদুরি দেখাইব?" জগত-বিখ্যাত বীর ও এত বড় বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষেই শোভা পায়। এইজন্যই তিনি দু'আ করিতেন–"হে আল্লাহ্, আমাকে সবর দান কর।" আর রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্র নিকট মঙ্গল ও স্বাস্থ্য প্রার্থনা কর, বিপদাপদ চাহিও না।"

ফলকথা এই যে, সঙ্গত কারণ থাকিলেও অভিযোগের সুরে রোগের কথা প্রকাশ করা হারাম। অভিযোগ প্রকাশ না পাইলে রোগের কথা প্রকাশ দুরস্ত আছে; কিন্তু প্রকাশ না করাই উত্তম। কারণ, হয়ত রোগের বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইয়া পড়িবে এবং অপর লোকে ইহাকে অভিযোগ প্রকাশ বলিয়া মনে করিতে পারে। আলিমগণ বলেন–"পীড়িত হইলে চিৎকার ও ক্রন্দন করা উচিত নহে, ইহাতে অভিযোগ প্রকাশ পায়।" হযরত ফুযায়ল ইবনে ইয়ায (র) হযরত বিশ্রে হাফী (র) ও হযরত ওহাব ইব্নে ওয়ারদ্ (র) পীড়িত হইলে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতেন যাহাতে অপর লোকে তাঁহাদের পীড়ার সংবাদ পাইতে না পারে এবং তাঁহারা বলিলেন–"পীড়িতাবস্থায় লোকে যেন আমাদিগকে দেখিতে না আসে, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।"

নবম অধ্যায়

মহব্বত, অনুরাগ ও সন্তোষ

আল্লাহ্‌র মহব্বত–আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সর্বোচ্চ মকাম। এমন কি এই মকামে উপনীত হওয়ার জন্যই অন্যান্য মকামগুলি হাসিল করিতে হয়। তাই যে-সকল দোষ মানবকে আল্লাহ্‌র মহব্বত হইতে বিরত রাখে, বিনাশন খণ্ডে সেই সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যেন তৎসমুদয় দোষ হইতে মানব-হৃদয় পাকসাফ হইতে পারে। ইতিপূর্বে পরিত্রাণ খণ্ডে তওবা, সবর, শুকর্‌, সংসার বিরাগ, ভয় ও আশা ইত্যাদি যে-কয়টি বিষয় লেখা হইয়াছে, উহাও মহব্বতের পূর্ববর্তী সোপানমাত্র। অতঃপর 'অনুরাগ' এবং 'সন্তোষ' বলিয়া যাহা কিছু বর্ণিত হইবে তাহাও আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের ফল ও ইহারই অধীন। আল্লাহ্‌র মহব্বত যখন প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া মানবের সমস্ত হৃদয়রাজ্য জুড়িয়া লয় তখনই তাহার পরম উৎকর্ষ লাভ হয়। আল্লাহ্‌র মহব্বত এত প্রবল হইয়া না উঠিলেও অন্যান্য সকল পদার্থের ভালবাসা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা মানব-হৃদয়ে অধিক হওয়া আবশ্যক।

আল্লাহ্‌র মহব্বত হৃদয়ঙ্গম করা এরূপ দুঃসাধ্য যে, মুতাকাল্লিম আলিমগণ ইহাকে অস্বীকার করিয়া বলেন–"সমশ্রেণী ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি মানব ভালবাসা স্থাপন করিতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার অর্থ তাঁহার আদেশ পালন ব্যতীত আর কিছুই নহে।" যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারা মূল ধর্মের কোন খবরই রাখেন না। অতএব ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক। প্রথমে আল্লাহর মহব্বত সম্বন্ধে শরীয়তের প্রমাণ প্রদান করিব এবং তৎপর ইহার হাকীকত ও বিধানসমূহ বর্ণনা করিব।

আল্লাহ্‌র মহব্বতের ফযীলত–আল্লাহ্‌র মহব্বত মানবের উপর ফরয–একথা সকল মুসলমান এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছে। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُمْ – অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌ লোকদিগকে ভালবাসেন এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন।" (সূরা মায়িদা, ৮ রুকূ, ৬ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে পর্যন্ত বান্দা আল্লাহ্‌ ও রাসূলকে

সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল না বাসিবে সেই পর্যন্ত তাহার ঈমান ঠিক হয় না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল–"ঈমান কি জিনিস?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্‌র ও রাসূলকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা।" তিনি অন্যত্র বলেন–"মানুষ যে-পর্যন্ত স্বীয় পরিবার-পরিজন, ধনদৌলত ও সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা আল্লাহ্‌ ও রাসূলকে অধিক ভাল না বাসিবে সেই পর্যন্ত সে ঈমানদার হইবে না।" আল্লাহ্‌ও ভীতি প্রদর্শনপূর্বক বলেন।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ – الاية

অর্থাৎ "হে রাসূল, আপনি বলুন–তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদরে পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীসকল তোমাদের আত্মীয়গণ ও তোমাদের ধনসম্পত্তি যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং বাণিজ্য যাহা বন্ধ হওয়াকে তোমারা ভয় করিতেছ ও যে-গৃহসমূহ তোমরা পছন্দ করিতেছ, এই সমুদয় যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, ও তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তবে আল্লাহ্‌ তাহার (শাস্তির) আদেশ উপস্থিত করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" (সূরা তওবা, ৩ রুকূ, ১০ পারা।)

এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল– "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি আপনাকে ভালবাসি।" তিনি বলিলেন–"(তাহা হইলে) দরিদ্রতা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাক।" সেই ব্যক্তি আবার বলিল–"আমি আল্লাহ্‌কে ভালবাসি।" তিনি বলিলেন –"(তবে) বিপদাপদ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাক।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আযরাঈল আলায়হিস সালাম হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের প্রাণহরণে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন–"তুমি কি কখনও দেখিয়াছ যে, বন্ধু বন্ধুর প্রাণ বিনাশ করে?" তৎক্ষণাৎ ওহী আসিল–"তুমি কি কখনও দেখিয়াছ যে, বন্ধু বন্ধুর সন্দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়।" ইহা শুনিয়া হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম বলিলেন–"হে আযরাঈল, এখন প্রাণ বাহির করিয়া লও; আমি অনুমতি দিলাম।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে-সকল দু'আ করিতেন নিম্নলিখিত দু'আটি ইহাদের অন্যতম ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَايُقَرِّبُوْنِىْ اِلٰى حُبِّكَ

وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার প্রতি ভালবাসা, তোমার প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসা এবং যে বস্তু আমাকে তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে তৎপ্রতি ভালবাসা আমাকে দান কর এবং শীতল পানি তৃষ্ণাতুরের নিকট যেরূপ প্রিয়, তোমার ভালবাসাকে আমার নিকট তদপেক্ষা প্রিয়তম কর।"

একজন আরব পল্লীবাসী নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কিয়ামত কবে হইবে?" হযরত (সা) বলিলেন–"হে পল্লীবাসী, সেই দিনের জন্য তুমি কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ?" তিনি বলিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, (নফল) নামায, রোযার সম্বল আমার বেশী নাই; কিন্তু আল্লহ্ ও রাসূলকে আমি ভালবাসি।" হযরত (সা) বলিলেন–"যাহাকে তুমি ভালবাস কিয়ামতের দিন তুমি তাহার সঙ্গেই থাকিবে।" হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাঁটি মহব্বতের অস্বাদ পাইয়াছে, সে দুনিয়া হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং সৃষ্ট জগতের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।" হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেন–"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে চিনিয়াছে, সে তাঁহাকে ভালবাসে এবং যে দুনিয়াকে চিনিয়াছে, সেই ইহাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে। আর মুসলমান উদাসীন না হইলে প্রফুল্ল থাকিতে পারে না, কারণ (পরকালের) চিন্তা করিলেই বিষণ্ন থাকিতে হয়।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদিগকে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমাদের উপর কি বিপদ বিপতিত হইয়াছে?" তাহারা বলিল–"আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে আমরা গলিয়া গিয়াছি।" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি হইতে নির্ভয় করিয়া দিবেন, এই আশা তোমরা তাঁহার নিকট করিতে পার।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম অপর এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা ঐ সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল ছিল। তিনি তাহাগিদকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "তোমাদের উপর কি বিপদ আসিয়াছে?" তাহারা নিবেদন করিল–"বেহেশ্‌তের লোভ আমাদিগকে এইরূপ করিয়া রাখিয়াছে।" তিনি বলিলেন–"তোমরা আশা করিতে পার যে, আল্লাহ্ তোমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।" অবশেষে তিনি অপর এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাহারা পূর্ববর্তী উভয় সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল ছিল। কিন্তু তাহাদের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল দর্পণের ন্যায় ঝকমক করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমরা কি অবস্থায় আছ? তাহারা বলিল–"আল্লাহর' মতব্বত

আমাদিগকে এই দশায় আনয়ন করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া তিনি তাহাদের নিকট উপবেশন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন– "তোমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত। তোমাদের নিকট উপবেশন করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

হযরত সররী সক্‌তী (র) বলেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার পয়গম্বরের নামের সহিত যোগ করিয়া আহবান করা হইবে, যেমন–হে অমুক, মূসার (আ) উম্মত, হে অমুক ইসার (আ) উম্মত, হে অমুক, মুহাম্মদের (সা) উম্মত। কিন্তু আল্লাহ্-প্রেমিকদিগকে বলা হইবে–হে আল্লাহ্‌র বন্ধু, নিকটে আইস।' এইজন্য তাঁহাদের মন আনন্দে ভরিয়া যাইবে। কোন কোন পয়গম্বরের (আ) কিতাবে বর্ণিত আছে–"হে বান্দা, আমাকে তুমি ভালবাস বলিয়া আমিও তোমাকে ভালবাসি। কারণ, তুমি আমাকে ভালবাসিলে তোমাকে ভালবাসা আমার কর্তব্য।"

আল্লাহর মহব্বতের হাকীকত–আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত এমন দুঃসাধ্য ব্যাপার যে, একদল আলিম ইহা অস্বীকার করিয়া বলেন–"আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত হইতেই পারে না।" আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত বিষয়টি এত সূক্ষ্ম যে, সকলে ইহা বুঝিতে পারে না। এইজন্য বিশদভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। দৃষ্টান্ত অবলম্বনে আমরা ইহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যে-ব্যক্তি তৎপ্রতি মনোযোগ দিবে, সে-ই বুঝিতে পারিবে।

মহব্বত ইশ্‌ক ও বিদ্বেষ–মহব্বতের মূল কি, তাহাই প্রথমে জানা আবশ্যক। যাহা ভাল বলিয়া বুঝা যায় তৎপ্রতি মনের আকর্ষণকে মহব্বত বলে। এই আকর্ষণ বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিলে ইহাকে ইশ্‌ক বলে। অপরপক্ষে যাহা মন্দ বলিয়া বুঝা যায় তৎপ্রতি মনে যে-ঘৃণা জন্মে, ইহাকে বিদ্বেষ বলে। যাহা ভাল বা মন্দ নহে, তৎপ্রতি মহব্বত বা বিদ্বেষ কিছুই জন্মে না।

এখন জানা আবশ্যক 'ভাল' কাহাকে বলে। মানব-স্বভাবের নিকট যাবতীয় বস্তু তিনভাগে বিভক্ত– (১) কতকগুলি বস্তুর স্বভাবের সহিত মিল আছে, এমন কি উহার প্রতি স্বভাবের আকর্ষণ থাকে এইরূপ বস্তুকে ভাল বস্তু বলে। (২) অপর কতকগুলি বস্তু স্বভাব-বিরোধী এবং ইহাদের স্বভাবের কোনই আকর্ষণ থাকে না। ইহা শ্রেণীর বস্তুকে মন্দ বস্তু বলে। (৩) আবার যে বস্তু স্বভাবের অনকূলও নহে এবং প্রতিকূলও নহে, তাহা ভালও নহে এবং মন্দও নহে।

জানিয়া রাখ, সম্যক পরিচয় লাভের পূর্বে কোন জিনিস ভাল কি মন্দ, ইহা

বুঝা যায় না এবং ইন্দ্রিয় ও বিবেকের সাহায্যে বস্তু পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয় পাঁচটি। আবার প্রতিটি ইন্দ্রয়ের উপভোগ্য বস্তু আছে। এইজন্যই ইন্দ্রয়ভোগ্য বস্তু মানব ভালবাসে; অর্থাৎ মানব-প্রকৃতি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। সুন্দর আকৃতি, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বতী দেখিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জন্মে। সুতরাং মানব এইসব ভালবাসে। সুমিষ্ট স্বর শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়। নাসিকার তৃপ্তি সুগন্ধ আঘ্রাণে, রসনার তৃপ্তি সুমিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে এবং ত্বকের তৃপ্তি কোমল দ্রব্য স্পর্শনে হইয়া থাকে। এইজন্যই এই সকল বস্তু মানুষের মনে ভাল লাগে; অর্থাৎ এইগুলির দিকে মানব-প্রকৃতি আকৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর তৃপ্তি চতুষ্পদ জন্তুগণও উপভোগ করিতে পারে।

মানব-হৃদয়ে আর একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। ইহাকে জ্ঞান, অন্তরচক্ষু বা নূর বলে, অথবা এইরূপ যে-কোন শব্দে ইহার নামকরণ করিতে পার। ইহার কারণেই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রয়েরও জ্ঞাতব্য বস্তুসমূহ আছে এবং এইগুলিও তাহার নিকট তৃপ্তিদায়ক ও মুগ্ধকর। উপরিউক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন বাহ্য উপভোগ বস্তুতে তৃপ্তি লাভ করে এবং তৎপ্রতি আসক্ত ও আকৃষ্ট হয় তদ্রূপ এই জ্ঞানালোকও স্বীয় জ্ঞাতব্য বস্তুসমূহে তৃপ্তি লাভ করে এবং তৎপ্রতি আসক্ত ও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্ দুনিয়াতে তিন বস্তু আমার প্রিয় করিয়া দিয়াছেন–স্ত্রী, সুগন্ধি দ্রব্য এবং নামাযে, আমার চোখের পুত্তলি শীতল হয়।" তিনি নামায হইতে পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন বলিয়া ইহার আসন অতি উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি আকৃতিতে মানুষ, কিন্তু স্বভাবে পশু এবং অন্তর রাজ্যের অবস্থা অবগত নহে ও নিজের দৈহিক দাবীদাওয়া ব্যতীত আর কিছুই জানে না, সেই ব্যক্তি কখনও নামাযকে উত্তম বলিয়া বিশ্বাস করে না এং নামাযকে ভালবাসিতেও পারে না। কিন্তু যাঁহার অন্তরে বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং যিনি পশু স্বভাবের সীমা অতিক্রম করত ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, তিনি আল্লাহ্‌র অনন্ত সৌন্দর্য ও বিস্ময়কর শিল্পকৌশল পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং তাঁহার সত্ত্বা ও গুণাবলীর প্রভাব অনুভব করত যেরূপ পরিতৃপ্ত হন, বাহ্য চর্মচক্ষে সুন্দর সুন্দর আকৃতি, শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও মনোরম স্রোতস্বতী দর্শনে তত পরিতৃপ্তি কখনও পাইতে পারেন না। বরং আল্লাহ্‌র অনুপম সৌন্দর্য জ্ঞানচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে যেরূপ অপূর্ব পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়, ইহার তুলনায় অন্যান্য সমস্ত তৃপ্তি নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া উঠে।

মহব্বতের কারণ–যে-সমস্ত কারণে হৃদয়ে মহব্বত জন্মে তাহা বুঝিতে পারিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেহই ভালবাসার পাত্র হইতে পারে না।

পাঁচটি কারণে ভালবাসা জন্মে।

প্রথম কারণ– লোকে স্বভাবতই নিজকে এবং নিজের জীবনকে ভালবাসে। আর বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর না হইলেও সে নিজের বিনাশ হওয়াকে পছন্দ করে না। মানব কিরূপে নিজকে ভালবাসিবে না? কারণ মানব যখন স্বীয় স্বভাব-সুলভ পদার্থ ভালবাসে তখন তাহার নিকট নিজ জীবন, চিরস্থায়ী অস্তিত্ব এবং নিজের পূর্ণ গুণাবলী অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় পদার্থ আর কি হইতে পারে? অপর দিকে নিজের বিনাশ ও গুণের বিলুপ্তি অপেক্ষা অধিক স্বভাববিরুদ্ধ ও অপছন্দনীয় আর কি থাকিতে পারে? এই জন্যই মানুষ নিজ সন্তানকেও ভালবাসে। কারণ সে সন্তানের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্বের অনুরূপ বলিয়াই মনে করে। মানব চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে না। তজ্জন্য সন্তানের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্বের অনুরূপ মনে করিয়া লোকে সন্তানকে ভালবাসে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে সে পুত্রকেই ভালবাসিতেছে না, বরং নিজেকেই ভালবাসিতেছে। ধন জীবন ধারণের উপকরণ বলিয়া ইহাকেও লোকে ভালবাসে। নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও লোকে ভালবাসিয়া থাকে। কারণ, সে তাহাদিগকে নিজ বাহু বলিয়া মনে করে এবং ধারণা করে যে, তাহাদের দ্বারাই সে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান আছে।

দ্বিতীয় কারণ– উপকার প্রাপ্তি। যাহার নিকট হইতে উপকার পাওয়া যায়, স্বভাবতই লোকে তাহাকে ভালবাসে। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন

اَلْاِنْسَانُ عَبِيْدُ الْاِحْسَانِ – অর্থাৎ "মানুষ উপকারের নিকৃষ্ট গোলাম" এবং রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করিতেন– " হে আল্লাহ্, তুমি কোন দুষ্ক্রিয়াশীল লোককে আমার উপকার করিবার ক্ষমতা দিও না। কারণ, তদ্রূপ লোক উপকার করিলে আমার মন তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিবে।" এই কথার অর্থ এই যে, উপকারীর প্রতি স্বভাবতই মানব মনে ভালবাসার সঞ্চার হয় এবং মনকে ভালবাসিতে বাধা দিয়া নিরস্ত করা যায় না। উপকারীর প্রতি যে ভালবাসার সঞ্চার হয় ইহাও আত্মপ্রেমের উপলক্ষেই জন্মিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, অপরের প্রতি এমন কাজ করাকে উপকার বলে

যাহা তাহার জীবন ধারণ এবং উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয়। এইজন্যই মানব অটুট স্বাস্থ্য ভালবাসে এবং স্বাস্থ্যলাভের জন্যই সে চিকিৎসককেও ভালবাসে। এইরূপ মানুষ স্বভাবতই নিজকে এবং নিজের শরীরকে ভালবাসে। উপকার পাইলেই মন উপকারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

তৃতীয় কারণ– সাক্ষাতভাবে কোন উপকার লাভ করিয়া না থাকিলেও মানুষ সৎলোককে ভালবাসে। কারণ, কেহ যদি শুনতে পায় যে, সুদূর পাশ্চাত্য দেশে এমন একজন জ্ঞানী ও সুবিচারক বাদশাহ আছেন যাঁহার সুশাসনে সেই দেশের অধিবাসিগণ পরম সুখ ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে, তবে এইরূপ বাদশাহ্র প্রতি তাহার মনে ভালবাসার উদ্রেক হইয়া থাকে, অথচ সে ভালরূপে জানে যে, সে কখনও পাশ্চাত্য দেশে যাইবে না এবং উক্ত বাদশাহ হইতে কোন উপকার লাভ করিবে না।

চতুর্থ কারণ–সুন্দর ব্যক্তিকে লোকে ভালবাসে। সুন্দর লোকের নিকট হইতে কিছু পাওয়ার আশা এই ভালবাসার কারণ নহে; বরং সৌন্দর্যের প্রতি মানব মনে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে তজ্জন্য সে স্বয়ং সৌন্দর্যকেই ভালবাসে। সবুজ শস্যক্ষেত্র ও স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতীকে লোকে যেমন ভালবাসে এই সমস্ত পানাহাররূপে তাহার উপভোগে আসিবে বলিয়াই তাহার হৃদয়ে তৎপ্রতি ভালবাসার সঞ্চার হয় না, বরং এই সকল নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়াই লোকে সুখ ও শান্তি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ সুন্দর আকৃতিকেও কামভাব ব্যতীতই মানবের পক্ষে ভালবাসা সম্ভবপর। কারণ সৌন্দর্য মানবের চিরপ্রিয় বস্তু। অতএব আল্লাহ্র অনুপম সৌন্দর্য অবগত হইলে মানব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। সৌন্দর্যের পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

পঞ্চম কারণ– স্বভাবের সাদৃশ্য। ইহার কারণ এই যে, যাহাদের স্বভাবে সাদৃশ্য থাকে তাহাদের মধ্যে স্বভাবত ভালবাসা জন্মে। এই সাদৃশ্য কখন কখন প্রকাশ্যে ধরা পড়ে; যেমন বালকের সহিত বালকের বন্ধুত্ব জন্মে এবং লম্পটের সহিত লম্পটের, আলিমের সহিত আলিমের এবং প্রতিটি ব্যক্তির তাহার সমশ্রেণীর লোকের সহিত বন্ধুত্ব জন্মিয়া থাকে। আবার কখন কখন এই সাদৃশ্য গুপ্তভাবে থাকে। সৃষ্টির মূলে যে-সকল স্বাভাবিক কারণ বিদ্যমান থাকে, মানব-জীবনের প্রারম্ভে সেই কারণের সমতা ঘটিলে ভবিষ্যত জীবনে তাহাদের মধ্যে সখ্যতা জন্মে। সৃষ্টিগত যে কারণে পরস্পর সখ্যতা জন্মে, ইহা কাহারও ক্ষমতাধীন নহে, উহা বুঝাইতে যাইয়াই রাসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ”

اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ –

অর্থাৎ “বিভিন্ন দলভুক্ত আত্মাসমুহকে একত্র করা হইল। তন্মধ্যে যাহাদের পরস্পর সাক্ষাত-পরিচয় ঘটিল তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মিল এবং যাহাদের মধ্যে কোনরূপ সাক্ষাত ও পরিচয় ঘটে নাই তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে নাই।” এই কথার অর্থ এই যে, আত্মাসমূহের পরস্পর আত্মীয়তা ও অনাত্মীয়তা উভয়ই ঘটে। আধ্যাত্মিক জগতে যাহাদের মধ্যে আত্মীয়তা ঘটিয়াছে ইহজগতেও তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। এই সাদৃশ্য (আত্মীয়তা) সম্বন্ধেই উপরে বলা হইয়াছে এবং ইহার বিস্তৃত বর্ণনা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত।

সৌন্দর্যের হাকীকত– যাহারা মর্যাদায় প্রায় পশুতুল্য এবং বাহ্য দৃষ্টিশক্তি রাখে মাত্র, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত, তাহারা একমাত্র শারীরিক গঠন ও মুখমণ্ডলের লালিত্য এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সুসামঞ্জস্য বর্ধনকেই সৌন্দর্য বলিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে, শুধু আকার ও বর্ণ অবলম্বনেই সৌন্দর্য বিরাজমান থাকে এবং যে পদার্থে আকার ও বর্ণ নাই, তাহা সুন্দর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভুল। কারণ, বুদ্ধিমান লোকেরা শরীরী ও অশরীরী উভয় প্রকার পদার্থকেই সুন্দর বলিয়া থাকেন। যেমন–লেখা সুন্দর, আওয়ায সুন্দর, বস্ত্র সুন্দর, অশ্ব সুন্দর, গৃহ সুন্দর, বাগান সুন্দর, শহর সুন্দর। প্রত্যেক পদার্থ যেরূপ বিকাশ পাওয়ার উপযোগী তদ্রূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে এবং ইহাতে কোন প্রকার কমতি না থাকিলেই ইহাকে সুন্দর বলা যায়। প্রত্যেক পদার্থের চরম বিকাশ ও পূর্ণত্ব এক রকমের নহে। লিখনের পূর্ণত্ব বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, ইহার হরফ, মাত্রা, ব্যবধান ইত্যাদির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সুন্দর লিখন ও সুন্দর গৃহ দর্শনে এক প্রকার আনন্দ অনুভবে আসে। সুতরাং মুখমণ্ডলের আকৃতি ও বর্ণের উপর সৌন্দর্য নির্ভরশীল নহে। বাহ্যিক সৌন্দর্য চর্মচক্ষে ধরা পড়ে। এই সকল কথা স্বীকার করিয়াও কেহ হয়ত বলিতে পারে–চক্ষে দর্শন না করিলে সৌন্দর্য জ্ঞান জন্মে না। বস্তুত এই কথা অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ, আকার ও বর্ণহীন বস্তুকেও আমরা সুন্দর বলিয়া থাকি। যেমন–অমুক ব্যক্তির স্বভাব সুন্দর, তাহার শিষ্টতা অতি সুন্দর। এতদ্ব্যতীত

ইহাও বলা হয়–পরহেযগারীর সহিত ইলম অতি সুন্দর, বদান্যতার সহিত বীরত্ব অতি সুন্দর গুণ; পরহেযগারী, নির্লোভতা, অল্পে পরিতৃপ্তি অতি সুন্দর। এবংবিধ কথা বিশেষ প্রচলিত এবং সকলেই জানে। কিন্তু এই গুণগুলি কেহই চর্মচক্ষে দেখিতে পায় না–কেবল জ্ঞানচক্ষে বুঝিতে পারে।

বিনাশন খণ্ডের 'রিয়াযত' নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষের আকৃতি দ্বিবিধ–একটি শরীরের বাহ্য আকৃতি ও অপরটি অন্তরের গুপ্ত আকৃতি। সৎস্বভাব তাহার অন্তরের গুপ্ত আকৃতি এবং স্বভাবতই মানুষ ইহা ভালবাসে। ইহার প্রমাণ এই যে, বর্তমান কালের লোকেও হযরত ইমাম আবূ হানিফা (র) এবং হযরত ইমাম শাফিঈকে (র), এমন কি তাঁহাদের বহু পূর্ববর্তী হযরত আবূ বরক সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু এবং হযরত ওমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আন্হুকেও ভালবাসিয়া থাকে। ইহা মোটেই অসম্ভব নহে। আর কিরূপেই বা অসম্ভব হইবে? কারণ, অদ্যাবধি বহু লোক তাঁহাদের মহব্বতে নিজেদের জান-মাল কুরবান করিতেছে। সুন্দর আকৃতি এই মহব্বতের কারণ নহে; কেননা এই সকল লোকে কখনও তাঁহাদিগকে দেখে নাই। তাঁহাদের দেহ মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে। বরং তাঁহাদের আন্তরিক সৌন্দর্য-মাধুরীর কারণেই এইসব লোকের হৃদয়ে তাঁহাদের প্রতি ভালবাসার উদ্রেক হইয়াছে। আর তাঁহাদের আন্তরিক সৌন্দর্যের উৎস হইল তাঁহাদের অপরিসীম জ্ঞান, অতুলনীয় পরহেযকারী, নিরপেক্ষ শাসন ইত্যাদি। এই কারণেই পয়গম্বরদিগকেও লোকে ভালবাসে। যাহারা হযরত আবূ বরক সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে ভালবাসে, তাহারা শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য তাঁহাকে ভালবাসে না বরং যে-গুণের কারণে তাঁহাকে সিদ্দীক বলা হয়, সেই গুণের জন্যই তাঁহাকে ভালবাসে। আর 'সিদ্দীক' হওয়ার গুণটি 'সিদক' (সত্যবাদিতা) ও 'ইলম' এই দুইটির সমন্বয়ে গঠিত একটি অবিভাজ্য গুণ। কারণ, ইহার কোন আকার ও বর্ণ নাই। এইজন্যই এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত এই গুণটির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে প্রকারেই হউক না কেন, এই গুণটির কোন আকৃতি ও বর্ণ নাই। এই গুণের কারণেই লোকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে ভালবাসে। ইহা ছাড়া তাঁহার শারীরিক আকৃতি ও সৌন্দর্যের জন্য তাহারা তাঁহাকে ভালবাসে না।

যাহাই হউক, এ-পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহা পাঠ করিলে কোন বুদ্ধিমান লোকই চরিত্রগত আন্তরিক সৌন্দর্য অস্বীকার করিতে পারিবে না এবং আকৃতি ও বর্ণগত সৌন্দর্য অপেক্ষা চরিত্রগত গুপ্ত সৌন্দর্যকে সে অধিক ভালবাসিতে

বাধ্য হইবে। প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত মূর্তিকে যাহারা ভালবাসে এবং যাহারা পয়গম্বরকে ভালবাসে, এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে কাহারও প্রতি অনুরক্ত করিতে চাহিলে তাহার সম্মুখে সেই ব্যক্তি ভ্রূযুগল, চক্ষু ও বদনমণ্ডলের সৌন্দর্যের প্রশংসা করিলে কোন ফল হয় না; বরং দানশীলতা, ইলম ও শক্তিমত্তার প্রশংসা করিয়া তাহাকে অনুরক্ত করিতে হয়। আবার বালককে শত্রু করিয়া তুলিবার ইচ্ছা করিলে তাহার সম্মুখে আন্তরিক কদর্যতার বর্ণনা করিতে হয়; শারীরিক কদর্যতার বর্ণনা করিলে কোন লাভ হয় না। এইজন্যই মুসলমানগণ সাহাবাগণকে ভালবাসে এবং আবূ জেহেলের প্রতি দুশমনি পোষণ করে।

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, সৌন্দর্য দুই প্রকার; যথাঃ–বাহ্য ও আন্তরিক এবং বাহ্য সৌন্দর্যের ন্যায় আন্তরিক সৌন্দর্যও লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আবার সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেও বাহ্য সৌন্দর্য অপেক্ষা আন্তরিক সৌন্দর্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

একমাত্র আল্লাহ্ই ভালবাসার উপযুক্ত–বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেহই ভালবাসার উপযুক্ত নহে। আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভালবাসিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিচয় পায় নাই। তবে যাঁহারা আল্লাহকে চিনিয়াছেন, তাঁহারা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার দরুনই অপরকে ভালবাসিয়া থাকেন; যেমন রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসাও আল্লাহ্কেই ভালবাসা। কারণ যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার প্রিয়পাত্রকেও ভালবাসিয়া থাকে। এইরূপ আলিম এবং মুত্তাকী লোকদের প্রতি ভালবাসাও আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হইতেই জন্মিয়া থাকে। ফলকথা এই যে, ভালবাসার কারণসমূহ লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে একমাত্র আল্লাহই যে ভালবাসার উৎস, এই বিষয়টি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথম বিচার– পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ নিজকে এবং স্বীয় গুণাবলীকে ভালবাসে। এই আত্মপ্রেমের কারণেই আল্লাহকে ভালবাসা মানুষের কর্তব্য; কেননা তাহার অস্তিত্ব এবং গুণাবলী সমস্তই আল্লাহর দান। তাঁহার দয়া না হইলে মানুষ নাস্তির পর্দার অপর পার হইতে অস্তিত্বের জগতে আসিতে পারিত না। আবার তাঁহার অপার করুণায়ই মানুষ রক্ষা পাইয়া থাকে। তৎপর আল্লাহ্ দয়া করিয়া মানুষকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গুণাবলী প্রদান না করিলে জগতে সে-ই সর্বাপেক্ষা অসম্পূর্ণ ও অধম থাকিত। কোন রৌদ্রদগ্ধ ব্যক্তি যদি রৌদ্রের উত্তাপ

হইতে বাঁচিবার জন্য গাছের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তজ্জন্য ছায়াকে ভালবাসে, কিন্তু যে বৃক্ষ হইতে ছায়া পাওয়া যায়, সেই বৃক্ষকে ভাল না বাসে, তবে ইহা অতীব আশ্চর্যের বিষয়। বৃক্ষ হইতে যেমন ছায়া পাওয়া যায় তদ্রূপ নিজ দেহ ও গুণাবলী সমস্তই আল্লাহ্ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই বিষয়টি যে ব্যক্তি বুঝিয়া লইয়াছে, সে আল্লাহকে ভাল না বাসিয়া কিরূপে থাকিতে পারে? ইহা সত্য যে, জাহিল আল্লাহকে ভালবাসে না। কারণ তাঁহার পরিচয়-জ্ঞানের ফলেই তৎপ্রতি ভালবাসা জন্মিয়া থাকে এবং জাহিল ব্যক্তি তাঁহার পরিচয়-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় বিচার–লোকে উপকারীকে ভালবাসে। এইজন্যই যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভালবাসে সে নিতান্ত মূর্খ; কারণ, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কেহ কোন উপকার করেও নাই এবং করিতেও পারে না। আল্লাহ্ কত প্রকারে মানুষের উপকার করেন, কেহই ইহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে না। এই সম্বন্ধে শুক্র ও তাফাক্কুর অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয় পাঠক কোন লোকের মধ্যস্থায় উপকার পাইয়া যদি মনে কর যে, সে নিজেই তোমার উপকার করিয়াছে তবে নিতান্ত ভুল করা হইবে। কারণ আল্লাহ তাহার অন্তরে এক দণ্ডধারী পিয়াদা নিযুক্ত করিয়া এই কথা মনে জাগরিত করিয়া দেন যে, তোমাকে কিছু দান করিলেই সে ইহপরকালের মঙ্গল লাভ করিবে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এই পিয়াদার বিরুদ্ধাচরণ সে করিতে পারে না। এইজন্যই সে দান করে; অন্যথায় সে কিছুই দিত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সে নিজেকেই দিতেছে; কেননা সে কিছু দান করিয়া ইহাকে পরকালের সওয়াব বা দুনিয়ার যশ ইত্যাদি লাভের উপকরণ করিয়া লইতেছে। বাস্তবপক্ষে তুমি ঐ উপকার আল্লাহ হইতেই পাইয়াছ। কারণ, তোমাকে দান করাতেই যে সেই ব্যক্তির ইহপরকালের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে আল্লাহ্ বিনা স্বার্থে জাগ্রত করিয়া দিয়া তাহাকে দানকার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। শুক্র অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় বিচার–পরোপকারী ব্যক্তিকে লোকে ভালবাসে যদিও সকলেই প্রত্যক্ষভাবে তাহার নিকট হইতে উপকার পায় না। মনে কর, এক ব্যক্তি শুনিল, সুদূর পাশ্চাত্য দেশের এক বাদশাহ বড় সুবিচারক এবং লোকের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ও অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনার্থে সর্বদা তিনি স্বীয় কোষাগার উন্মুক্ত রাখেন। আর তাঁহার রাজ্যের কেহই কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে

পারে না। শ্রোতা যদিও জানে যে, সেই বাদশাহ্র সঙ্গে তাহার দেখা হইবার ও তাঁহার নিকট হইতে উপকার পাইবার কোন সম্ভাবনাই তাহার নাই, তথাপি অবশ্যই সে তাঁহাকে ভাল না বলিয়া পারে না। এইজন্যই আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে ভালবাসা নিতান্ত মূর্খতা। কারণ, উপকার তাঁহাকে ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না। তাঁহার আদশ ও তাকিদেই দুনিয়াতে একে অন্যের উপকার করিয়া থাকে। মানবের প্রতি আল্লাহর দান কত অধিক! তিনি দয়া করিয়া মানব সৃষ্ট করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাও তিনি দান করিয়াছেন। এমন কি, যে-দ্রব্য প্রয়োজনীয় নহে কেবল শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক তাহা আল্লাহ্ পর্যাপ্ত পরিমাণে মানুষকে দান করিয়াছেন। ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের প্রতি গভীরভাবে মনোবিনেশ করিলে আল্লাহ্র আশ্চর্য সৃষ্টিকৌশল, অসীম দয়া, অতুলনীয় দানের কথা মানব উপলব্ধি করিতে পারে।

চতুর্থ বিচার– ভালবাসার অপর কারণ সৌন্দর্য। এ-স্থলে সৌন্দর্য অর্থে চরিত্রগত মাধুর্য ও আন্তরিক সৌন্দর্যকেই বুঝাইতেছে। এইজন্যই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও হযরত ইমাম শাফিঈকে (র) লোকে ভালবাসে। কেহ হযরত আলী রাযিল্লাহু আন্হুকে ভালবাসে। কেহবা হযরত আবূ বরক সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু ও হযরত ওমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে ভালবাসে। আবার কেহবা সকলকেই ভালবাসে, এমন কি, সকল পয়গম্বরকেও ভালবাসে। তাঁহাদের আন্তরিক সৌন্দর্য ও গুণই এই ভালবাসার একমাত্র কারণ।

লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, তিনটি বস্তুর কারণে আন্তরিক সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া থাকে; যথাঃ– (১) ইলম। কারণ, সৎ ও মহৎ বলিয়াই লোকে ইলম ও আলিমকে ভালবাসে। জ্ঞান যত অধিক ও জ্ঞাতব্য বিষয় যত মহৎ হয়, আন্তরিক সৌন্দর্য তত বৃদ্ধি পায়। যেহেতু জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব আল্লাহ্ এবং তাঁহার দরবার সম্পর্কীয় জ্ঞানও সর্বোত্তম। আল্লাহ্র দরবার বলিতে ফিরিশ্তা, আসমানী কিতাব, রাসূল ও পয়গম্বরের শরীয়ত এবং ভূমণ্ডল-নভোমণ্ডল ও ইহপরকালের পরিচালনা পদ্ধতিকে বুঝায়। এই জ্ঞানে পয়গম্বর ও সিদ্দীকগণ বিভূষিত বলিয়াই তাঁহারা লোকের নিকট এত প্রিয়। (২) ক্ষমতা অর্থাৎ যে ক্ষমতার বলে নিজ আত্মা ও আল্লাহর বান্দাগণের চরিত্র-সংশোধন, তাহাদের উপর সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং পার্থিব ও ধর্ম-রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান করা চলে। (৩) দোষত্রুটি শূন্যতা এবং যাবতীয় কুস্বভাব হইতে

পাক-পবিত্রতা এই সমস্ত গুণকেই লোকে ভালবাসে, কার্যকে ভালবাসে না। কারণ, যে কাজ এই সকল গুণের প্রভাবে না হইয়া ঘটনাচক্রে বা বেখেয়ালে সংগঠিত হয়, তাহা প্রশংসনীয় নহে। সুতরাং যাহার মধ্যে এই গুণসমূহ যত অধিক থাকে, সে তত অধিক ভালবাসা পাইয়া থাকে। এই কারণেই লোকে হযরত আবূ বক্‌র রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও হযরত ইমাম শাফিঈ (র) অপেক্ষা অধিক ভালবাসে।

উপরিউক্ত তিনটি গুণের সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখ। এই গুণগুলি আল্লাহ্‌র মধ্যে যেরূপ অসীম ও পূর্ণমাত্রায় আছে, সেই পরিমাণে মানুষের মধ্যে কখনও সম্ভবপর নহে। এইজন্য বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্‌ই ভালবাসা পাইবার যোগ্যতম পাত্র। কেননা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সহিত আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সকল ফিরিশ্‌তা ও জিন-মানবের জ্ঞান তুলনা করিলে সকলের জ্ঞানসমষ্টি তুচ্ছ ও নগণ্য বলিয়া বুঝিতে না পারে, এমন অজ্ঞ কেহই নাই। আল্লাহ্ সকলকে লক্ষ করিয়া বলেনঃ

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً –

অর্থাৎ "জ্ঞান হইতে তোমাদিগকে অতি সামান্যমাত্রই দেওয়া হইয়াছে।" (সূরা বানী ইসরাঈল, ১০ রুকূ, ১৫ পারা।) এমন কি, জগতের সমস্ত লোক একত্র হইয়া এক পিপীলিকা বা মশার সৃজনে আল্লাহ্‌র যে-জ্ঞান ও কৌশল রহিয়াছে, তাহা জানিতে চাহিলে ইহার পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। আর যাহা কিছু জানিবে তাহাও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই জানিবে। কারণ আল্লাহ্‌ই মানবকে ইলম দান করিয়াছেন; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ـ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্ মানব সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাকে কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন।" (সূরা আর্‌রাহমান, ১ রুকূ, ২৭ পারা।) সমস্ত মাখলূকাতের জ্ঞানসমষ্টিও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে যে দিক দিয়া বা যে-কোন বস্তুর সম্বন্ধে দেখা যাউক না কেন, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোনই সীমা নাই। মানুষের জ্ঞান আল্লাহ্ হইতেই লব্ধ। অতএব যাবতীয় জ্ঞান একমাত্র তাঁহারাই। তাঁহার জ্ঞান মাখ্‌লূকাত হইতে লব্ধ নহে।

ক্ষমতা সম্বন্ধে দেখিলে বুঝিতে পারিবে ইহাও মানুষের প্রিয় বস্তু। এইজন্যই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর বীরত্ব ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর সুবিচার ও সুশাসন লোকে ভালবাসে। কারণ, এই দ্বিবিধ গুণও এক

প্রকার ক্ষমতা। কিন্তু আল্লাহ্‌র সর্ববিধ পূর্ণ ক্ষমতার তুলনায় সমস্ত জগতবাসীর ক্ষমতা কিছুই নহে। মনুষ্যাদি জীবমাত্রই ক্ষমতা বিষয়ে নিতান্ত অপূর্ণ ও অসহায়। বরং আল্লাহ্ দয়া করিয়া তাহাদিগকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন তদভিন্ন তাহাদের কিছুই নাই। একটি মাছি মানুষের কোন দ্রব্য খাইলে সেই মাছির নিকট হইতে ইহা ফিরাইয়া লইতে তাহার ক্ষমতা নাই। এখন ভাবিয়া দেখ, মানুষ কত অক্ষম! আল্লাহ্‌র ক্ষমতা পূর্ণ; আবার ইহার পরিমাণ কত ইহারও অবধি নাই। কারণ, আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, যথাঃ–জিন, মানুষ জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার পূর্ণ অমোঘ ক্ষমতা দ্বারা উৎপন্ন। এতদ্ব্যতীত এবংবিধ অসংখ্য-অগণিত পদার্থ সৃজনে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে ক্ষমতার জন্য ভালবাসা পাইতে পারে?

অতঃপর বিচার করিয়া দেখ, মানুষ কখনও একেবারে দোষ-ত্রুটিশূন্য হইতে পারে না। মানুষের প্রথম ত্রুটি এই যে, সে সৃষ্ট দাস ও তাহার অস্তিত্ব নিজের দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই; বরং আল্লাহ কর্তৃক সে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মানবের আর কি বড় ত্রুটি হইতে পারে? তৎপর মানুষ নিজের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধেই একেবারে বেখবর। এমতাবস্থায় সে অপর পদার্থের জ্ঞান রাখিবে কিরূপে? মানব-মস্তকের একটি শিরা স্থানচ্যুত হইলে সে পাগল হইয়া যায়। কিন্তু সে ইহার কারণ বুঝিতে পারে না। আর সেই রোগের ঔষধ তাহার সম্মুখে বিরাজমান থাকিলেও সে ইহা চিনিয়া লইতে পারে না। মানুষের অসহায়তা ও অজ্ঞতার হিসাব করিলে বুঝিতে পারিবে, মানব সিদ্দীক বা পয়গম্বরই হউক না কেন, যে যৎসামান্য জ্ঞান ও ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাহা অজ্ঞানতা ও অসহায়তার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

অতএব, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ই সর্ববিধ দোষ-ত্রুটি হইতে একেবারে পাক পবিত্র! তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই—ইহাতে অজ্ঞানতার লেশমাত্রও নাই। আবার তিনি সর্বোপরি সর্বোচ্চ ও পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পাতাল তাঁহার ক্ষমতার হস্তে রক্ষিত এবং সমস্ত মাখলূকাত বিনাশ করিয়া ফেলিলেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বাদশাহীর বিন্দুমাত্রও লাঘব হইবে না; আবার তিনি চাহিলে নিমিষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ জগত সৃষ্টি করিতে পারেন এবং ইহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না। কেননা, তাঁহার সর্ববিধ গুণই পূর্ণ—ইহাতে হ্রাস বৃদ্ধির মোটেই অধিকার নাই। তিনি সর্ববিধ দোষ-ত্রুটি

হইতে মুক্ত। নাস্তি বা অভাব তাঁহার বা তাঁহার গুণের মধ্যে স্থান পায় না এবং তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি থাকা সম্ভবপরই নহে। সুতরাং এমন আল্লাহ্‌কে ভাল না বাসিয়া অপরকে ভালবাসিতে যাওয়া নিরেট মূর্খতা।

যাঁহার সমস্ত গুণই নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণ এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি যে ভালবাসা জন্মে ইহা উপকার-প্রাপ্তিজনিত ভালবাসা হইতে বহু উন্নত। কারণ, উপকারের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে উপকারজনিত ভালবাসায় তারতম্য হয়। কাজেই আল্লাহর প্রতি ভালবাসা যখন তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও পাক পবিত্রতার দরুন হয় তখন ইহা অতীব উন্নত ও পূর্ণ হইয়া থাকে। এইজন্যই হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের প্রতি আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করেন–"যে বান্দা শাস্তির ভয়ে ও প্রাপ্তি লোভে ইবাদত না করিয়া আমার প্রভুত্বের হক আদায় করণার্থ ইবাদত করে, সে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়।' যবূর কিতাবে বর্ণিত আছে–"যে-ব্যক্তি বেহেশ্‌তের আশায় ও দোযখের ভয়ে আমার ইবাদত করে, তাহা অপেক্ষা বড় যালিম আর কে? বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি না করিলে কি আমি ইবাদত ও বন্দেগী পাইবার উপযুক্ত হইতাম না?"

পঞ্চম বিচার–সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকিলে পরস্পরে ভালবাসা জন্মে। আল্লাহ্‌র সহিত মানুষের এক বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সম্পর্কের কথাই নিম্ন বাণীসমূহে বর্ণিত আছে ঃ

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ – অর্থাৎ "রূহ্ আল্লাহ্‌র আদেশে সৃষ্ট। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ – অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে (আ) তাঁহার গুণদ্বারা বিভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।" হাদীস শরীফে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ বলেন–"আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিলে আমি তাহাকে নিজের বন্ধু বানাইয়া লই; তখন আমিই তাহার কর্ণ, চক্ষু ও রসনা হইয়া থাকি।" (অর্থাৎ কর্ণ তখন শরীয়ত বিরুদ্ধ বিষয় শ্রবণ করে না, চক্ষু নিষিদ্ধ দর্শন করে না এবং রসনা শরীয়ত বিরুদ্ধ কথা বলে না।) হযরত মূসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী আসিল–"হে মূসা, আমি পীড়িত ছিলাম; তুমি আমাকে দেখিতে আস নাই কেন?' হযরত নিবেদন করিলেন-"হে আল্লাহ, তুমি সমস্ত বিশ্বজগতের মালিক এবং প্রভু; তুমি কিরূপে পীড়িত হইবে?" আল্লাহ্ বলিলেন–"অমুক বান্দা পীড়িত ছিল। দেখিতে গেলে যেন আমাকেই দেখিতে

যাওয়া হইত।" মোটকথা, আল্লাহ্‌র সহিত মানবের যে এক বিশেষ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, ইহা সর্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া বড় দুষ্কর ব্যাপার।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ভালবাসার কারণসমূহ যদি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তবে বুঝিতে পারিবে, আল্লাহকে ভাল না বাসিয়া অপরকে ভালবাসিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতার নিদর্শন। আর তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন–"সমজাতীয় না হইলে ভালবাসা স্থাপন করা যায় না। যেহেতু আল্লাহ আমাদের সমজাতীয় নহেন, কাজেই তাঁহার সহিত ভালবাসা স্থাপন সম্ভবপর নহে।" তাঁহাদের এই কথার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের নামই তাঁহার প্রতি ভালবাসা। অনভিজ্ঞ তার্কিক পণ্ডিত বেচারাগণ ভালবাসা বলিতে স্ত্রী-পুরুষের কামভাব পূর্ণ ভালবাসা ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কামজ-ভালবাসা সমজাতীয়ত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে ভালবাসার কথা আমরা বলিতেছি, তাহাতে আন্তরিক সৌন্দর্য ও পূর্ণত্বের প্রয়োজন–আকৃতিগত স্বজাতীয়ত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই কারণ, যাহারা পয়গম্বরগণকে ভালবাসে, তাহারা এইজন্য ভালবাসে না যে, তাহার ন্যায় পয়গম্বরগণের হস্ত, পদ ও বদনমণ্ডল আছে; বরং এইজন্য লোকে পয়গম্বরগণকে ভালবাসে যে, তাঁহাদের আন্তরিক সদ্‌গুণরাজির সহিত লোকের আন্তরিক গুণের সাদৃশ্য আছে। কেননা তাহারাও পয়গম্বরগণের ন্যায় জ্ঞান রাখে, ইচ্ছা করিয়া থাকে, কথা বলিতে ও শুনিতে পারে এবং দেখিতে পারে। তবে পয়গম্বরগণের এই সমস্ত শক্তি বা গুণ নিতান্ত উন্নত। সাধারণ মানবের মধ্যেও এই মৌলিক গুণরাজি বিদ্যমান আছে, সুতরাং সাদৃশ্যও আছে। কিন্তু তাঁহাদের ও সাধারণ মানবের ঐ সকল গুণরাজির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। পয়গম্বরগণ এত অধিক উন্নত গুণের অধিকারী হওয়াতে সাধারণ লোক হইতে তাঁহাদের মর্যাদার দূরত্ব ঘটিয়াছে বটে কিন্তু সাদৃশ্যের কারণে যে-ভালবাসা জন্মে, এই দূরত্বের দরুন তাহা হ্রাস পায় না; বরং তাহাতেই ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এতটুকু সাদৃশ্য সকলেই স্বীকার করে ও বুঝিতে পারে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, সকলে এই সাদৃশ্যের রহস্য ও হাকীকত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না।

আল্লাহ্‌র দীদার সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক–সকল মুসলমানের মুখেই শুনা যায় যে, আল্লাহ্‌র দীদারের (প্রত্যক্ষ দর্শনের) ন্যায় আনন্দদায়ক আর কিছুই নাই। কিন্তু আপন মনে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে না যে, যে-পদার্থ অনন্ত, কোন দিক বা অভিমুখের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, এবং যাহার কোন আকার ও বর্ণ

নাই, তাহাতে কি আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে? তবে বিষয়টি শরীয়তে বর্ণিত আছে বলিয়া সকলেই ইহা মুখে মানিয়া লয়। সুতরাং এমন লোকের মনে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা জন্মিতে পারে না। কারণ, মানুষ যে-বস্তু জানে না তৎপ্রতি কিরূপে তাহার ভালবাসা জন্মিতে পারে? যাহাই হউক, এ-বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বড় দুষ্কর। তথাপি এ-স্থলে ইঙ্গিতে বর্ণিত হইবে।

আল্লাহ্র দীদার সম্ভবপর বুঝিবার জন্য চারিটি মূল তথ্য–আল্লাহ্র দীদার যে সম্ভবপর ইহার বিচার চারিটি মূল তথ্য-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে; যথাঃ– (১) আল্লাহ্র দীদার (প্রত্যক্ষ দর্শন) আল্লাহ্র মা'রিফাত (পরিচয়-জ্ঞান) অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক; (২) আল্লাহ্র পরিচয়-জ্ঞান অপর পদার্থের পরিচয়-জ্ঞান অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক। (৩) চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দিয় আনন্দ না পাইলেও মানব হৃদয় ইলম ও পরিচয়-জ্ঞানে আনন্দ পাইয়া থাকে এবং (৪) হৃদয় জ্ঞান হইতে যে আনন্দ পাইয়া থাকে, তাহা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়লব্ধ আনন্দ হইতে অধিক সুখকর, প্রবল এবং বলবান। মানুষ যখন এই চারিটি মূল তথ্য জানিতে পরিবে তখন অবশ্যই সে বুঝিতে পারিবে যে, অন্য কোন পদার্থই আল্লাহ্র দীদার অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক নহে।

প্রথম মূল তথ্য–পরিচয়ে হৃদয় আনন্দ পাইয়া থাকে; দেহ এই আনন্দের অংশ পায় না। মানবের মধ্যে আল্লাহ্ বহু শক্তি সৃজন করিয়াছেন এবং ইহাদের প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যে-কাজের জন্য যে-শক্তি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই ইহার স্বভাবসুলভ এবং স্বভাবসুলভ বস্তুতেই ইহার আনন্দ। যেমন প্রভুত্ব ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ক্রোধ-শক্তিকে সৃজন করা হইয়াছে। ক্রোধ এই কার্যের আনন্দ পায়। খাদ্য ও ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য লোভকে সৃজন করা হইয়াছে এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহেই ইহার তৃপ্তি। তদ্রূপ শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি এবং অপরাপর শক্তি নিজ নিজ কার্য করিয়া বিভিন্ন প্রকার আনন্দ পাইয়া থাকে। প্রত্যেক শক্তির আনন্দ পৃথক পৃথক। কারণ কাম-প্রবৃত্তির আনন্দ এবং ক্রোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণের আনন্দ এক নহে। আবার শক্তির তারতম্যানুসারে আনন্দের তরতম্য হইয়া থাক। কোন আনন্দ অত্যন্ত প্রবল, আবার কোনটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। এইজন্য সুগন্ধি আঘ্রাণে লোকে যে-আনন্দ পায় তদপেক্ষা রমণীয় আকৃতি দর্শনের আনন্দ প্রবল হইয়া থাকে। মানব মনে আল্লাহ্ এক শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই জ্ঞানালোক। বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যে-

সকল বস্তু জানা যায় না তৎসমুদয়ের পরিচয় লাভের জন্য এই জ্ঞানালোকের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞানালোক ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসমূহের পরিচয় লাভ করিয়া থাকে। বুদ্ধিবলে মানুষ জানিতে পারুক যে, এই বিশাল বিশ্বজগতের অশ্যই একজন পরমকৌশলী সর্বশক্তিমান নিয়ন্তা বিদ্যমান আছেন। ইহাতেই উহার আনন্দ। সৃষ্ট পদার্থে ও কারুকার্যের মধ্যে যে কৌশল বিদ্যমান আছে তাহা জ্ঞানালোক অবগত হইতে পারে; কিন্তু কোন বাহ্য ইন্দ্রিয় এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

আবার এই মানুষ বিভিন্ন প্রকারে সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করিলে পারে এবং এক জ্ঞানের সহিত অপর জ্ঞান মিলাইয়া নূতন জ্ঞান চয়নে সমর্থ হয়; যেমন–অভিধান প্রণয়ন, গ্রন্থ রচনা, অঙ্কশাস্ত্র আবিষ্কার এবং নূতন নূতন সূক্ষ্ম তথ্যের আবিষ্কার। এই সমস্ত কার্যেই বুদ্ধি আনন্দ পায়। এমন কি, তুচ্ছ বিষয়ে জ্ঞানের পারদর্শিতার জন্য প্রশংসা করিলেও লোকে আনন্দ পায়। আবার যদি বল—তুমি ইহা জান না, তবে সে দুঃখিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে লোকে নিজ ইলমকে পূর্ণ বলিয়া মনে করে। পাশা খেলায় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে খেলার চাল বলিয়া দিতে নিষেধ করত বহু শর্তাধীনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াও যদি তাহাকে খেলার মজলিসে বসিতে দাও তথাপি সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না। পাশা খেলার ন্যায় হীন কার্যের জ্ঞান যে তাহার আছে, এই আনন্দে বিভোর হইয়া সে নীরব থাকিতে পারে না, বরং আত্মগর্ব প্রকাশ করিবার জন্য অধীর হইয়া ওঠে। এমতাবস্থায় ইলমের কারণে মানুষ আনন্দিত ও গর্বিত হইবে না কিরূপে? কেননা, ইলম আল্লাহ্র একটি গুণ। ইলমের পূর্ণতা অপেক্ষা অধিক আনন্দের মানুষের আর কি থাকিতে পারে? যে ইলম আল্লাহ্র গুণ হইতে লব্ধ, কোন্ পদার্থ তদপেক্ষা অধিক গৌরবের বস্তু।

এই মূল তথ্য হইতে জানা গেল যে, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় আনন্দ না পাইলেও মন ইলম হইতে আনন্দ পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মূল তথ্য—মন ইলম ও পরিচয় জ্ঞান হইতে যে আনন্দ পায়, তাহা ইন্দ্রিয়লব্ধ ও কামলোভাদি প্রবৃত্তি চরিতার্থজনিত আনন্দ অপেক্ষা অধিক প্রবল। দেখ, পাশা ক্রীড়াসক্ত ব্যক্তি খেলায় প্রবৃত্ত হইলে সারাদিন অনাহারে কাটায়। তাহাকে খাইতে বলিলে সে শুনে না এবং খেলায় বিভোর থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, খেলায় জয়ী হওয়া ও প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার আনন্দ আহারের আনন্দ অপেক্ষা অধিক প্রবল। কারণ, সে পাশা খেলাকে আহার গ্রহণের উপর অগ্রাধিকার দিয়া রাখিয়াছে। দুইটি কার্যের মধ্যে কোন্‌টি অধিক আনন্দ দেয়,

জানিতে হইলে উভয় কার্যকে মনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেখিতে হয়। যাহার দিকে মন অধিক আকৃষ্ট হয়, তাহাই অধিক আনন্দদায়ক। যে-কার্যে মানসিক শক্তি চরিতার্থ হয়, তাহাতেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অত্যধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। কারণ, যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, সে সুমিষ্ট হালুয়া ও সুপক্ব গোশ্‌ত আহার করিবে, না এমন কার্য করিবে যাহাতে দুশ্‌মন পরাজিত হয় এবং এক বিরাট রাজত্ব হস্তগত হয় তবে সে বালকের ন্যায় অবোধ না হইলে বা তাহার বুদ্ধি একেবারে বিনষ্ট না হইয়া গেলে অথবা সে পাগল না হইয়া থাকিলে অবশ্যই সে বিজয় ও রাজত্বই গ্রহণ করিবে। অবোধ বালক ও বুদ্ধিবিনষ্ট পাগলের কথাই স্বতন্ত্র। সুতরাং যাহার মনে আহারের লোভ ও রাজকীয় সম্মান-লিপ্সা উভয়ই বর্তমান আছে, সে রাজসম্মান লাভের উপায় অবলম্বন করিবে। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানসম্ভূত আনন্দ অপর সকল আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ যে সকল ব্যক্তি গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা বা ধর্মবিধান ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন তাঁহারা উহাতে এক প্রকার আনন্দ পাইয়া থাকেন। আবার এই সকল বিদ্যায় তাঁহারা পরিপক্ব হইয়া থাকিলে উহাতেই তাঁহারা সর্বাধিক আনন্দ পাইয়া থাকেন। এমন কি, এই জ্ঞানসম্ভূত আনন্দকেই তাঁহারা রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনার আনন্দের উপর অগ্রাধিকার দিয়া থাকনে। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান অপরিপক্ব বলিয়া তদ্রূপ আনন্দ পায় না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

জ্ঞানের আনন্দ অন্যান্য সকল আনন্দ অপেক্ষা কত অধিক, তাহা উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। কিন্তু অপরিপক্বতা থাকিলে তদ্রূপ আনন্দ পাওয়া যায় না। মানবের মধ্যে একদিকে যেমন বাঁশী বাজাইবার স্পৃহা রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি স্ত্রীসম্ভোগ, রাজকীয় ক্ষমতা লাভের খাহেশও আছে। যদি কোন অপরিণত বয়স্ক বালক স্ত্রীসম্ভোগ ও রাজকীয় ক্ষমতা লাভের আনন্দ অপেক্ষা বাঁশী বাজাইবার আনন্দের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়, তবে আমাদের প্রতিপাদ্য উক্ত সত্যটিতে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় না। কারণ, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই বাঁশি বাজাইবার দিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়ে; কেননা তাহার হৃদয়ে এখনও কামভাব ও রাজত্ব-লিপ্সা জাগ্রত হয় নাই। শেষোক্ত দুইটি বাসনা জাগিয়া উঠিলে নিশ্চয়ই সে ইহাদের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হইত।

তৃতীয় মূল তথ্য– আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান সকল জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান নিতান্ত আনন্দদায়ক। ইহাতেও কোন সন্দেহ

নাই যে, এক জ্ঞান অপর জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয় যত উৎকৃষ্ট, ইহার জ্ঞানও তত উৎকৃষ্ট। পাশা খেলার পদ্ধতি আবিষ্কার কার্য, ইহার খেলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, রাজ্য শাসনের জ্ঞান কৃষিকার্য ও সেলাই কার্যের জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম-বিধান ও ইহার গুপ্ত রহস্যের জ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা ও ভাষা-জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মন্ত্রীদের কার্যের জ্ঞান নিম্নশ্রেণীর লোক ও লম্পটদের কার্যের জ্ঞান অপেক্ষা গৌরবজনক। রাজকার্যের জ্ঞান মন্ত্রীর কার্যের জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফলকথা এই যে, জ্ঞাতব্য বিষয় যত শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহার জ্ঞানও তত আনন্দদায়ক হইবে।

প্রিয় পাঠক, একটু ভাবিয়া দেখ–এই বিশ্বজগতের সকল পূর্ণতা এবং সমস্ত সৌন্দর্য একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও মহৎ এই বিশ্বজগতে অন্য কিছু আছে কি? আকাশ-পাতাল জুড়িয়া, ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া সুশৃঙ্খল ও ন্যায়বিচারের সহিত অপ্রতিহতভাবে তাঁহার যে বাদশাহী চলিয়াছে, দুনিয়ার কোন রাজার রাজ্যে তদ্রূপ চলিতেছে কি? আবার অপর কাহারও দরবার তাঁহার দরবার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পূর্ণতর আছে কি? আল্লাহ্ যাহাদিগকে তাঁহার অসীম রাজত্বের অবস্থা দর্শনের জন্য চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার রাজকীয় গোপন রহস্য যাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা কিরূপে ভূতলের রাজার রাজকীয় গুপ্ত রহস্যকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিতে পারে এবং আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর রাজ্যের দৃশ্যের প্রতি দৃকপাত না করিয়া অন্য কোন দৃশ্যের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে?

এই সমস্ত কথা হইতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী এবং তাঁহার রাজত্ব ও তদন্তর্গত গোপন রহস্য বিষয়ের জ্ঞান সর্ববিধ জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কেননা, এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই অতীব মহত্তর। বরং এইগুলিকে মহত্তর বলাও অন্যায়। কারণ, দুই পদার্থের মধ্যে তুলনা করিয়া একটি মহৎ হইলে অপরটিকে মহত্তর বলা হয়। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ সম্বন্ধীয় ব্যাপারের সহিত তুলনায় অপর কোন কিছুকেই মহৎ বলা যাইতে পারে না। এমতাবস্থায় আল্লাহকে কিরূপে মহত্তর বলা সঙ্গত হইবে? বরং তিনি অতুলনীয়, অতি উচ্চ, অতি মহান। সুতরাং প্রকৃত আরিফ (চক্ষুষ্মান ব্যক্তি) এই নশ্বর জগতে থাকিয়াও এমন এক বেহেশতে বিচরণ করিতে থাকেন যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ –

অর্থাৎ "গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বিস্তৃতির ন্যায় ইহার বিস্তৃতি (সূরা হাদীদ, ৩ রুকূ, ২৭ পারা।) বরং ইহার বিস্তৃতি তদপেক্ষা অধিক। কারণ, আকাশ-পাতালের বিস্তৃতির সীমানা আছে; কিন্তু মারিফাতের কোন পরিসীমা নাই। ইহা আরিফের মনোরম উদ্যানসদৃশ। আকাশ-পাতালের পরিসীমা আছে; কিন্তু ইহার কোন পরিসীমা নাই। এই উদ্যানের ফল অফুরন্ত ও অটুট এবং ইহা উপভোগে আরিফকে কেহই বাধা দেয় না; যেমন আল্লাহর বলেন ঃ – قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

অর্থাৎ "আর ইহার ফলগুলি অতি নিকটবর্তী (সহজপ্রাপ্য)।" (সূরা আলহাক্কাহ, ১ রুকূ, ২৯ পারা।) নিকটবর্তী বলার উদ্দেশ্য এই যে, আরিফগণের মনে মারিফাতের সুরসাল ফল বিরাজমান থাকে এবং মনের মধ্যে যাহা থাকে তদপেক্ষা নিকটবর্তী আর কি হইতে পারে? এই বেহেশতে কোন প্রকার বাধা-নিষেধ ও হিংসা-বিদ্বেষ নাই। কারণ, তত্ত্বদর্শন ক্ষেত্রে যাহার যত বেশী জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, সে তত বেশী আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। আর এই খোদা পরিচিতির বেহেশত এরূপ যে, লোকসংখ্যা যতই অসীম হউক না কেন, ইহাতে স্থানের অপ্রতুলতা কখনও ঘটে না। বরং লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বেহেশতের পরিসরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

চতুর্থ মূল তথ্য– আল্লাহ্‌র জ্ঞান অপেক্ষা আল্লাহ্‌র দীদার (দর্শন) উৎকৃষ্ট। জ্ঞান দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার কেবল খেয়ালে আসে; যেমন–বর্ণ ও আকৃতি। অপর প্রকার খেয়ালে আসে না, জ্ঞানবলে পাওয়া যায়; যথা–আল্লাহ্ ও তাঁহার গুণাবলী। এমন কি, মানবের কতকগুলি গুণও আমাদের খেয়ালে আসে না; যেমন, ক্ষমতা, ইচ্ছা, জীবন। কারণ, এই সমস্ত কি প্রকার, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। তদ্রূপ ক্রোধ, প্রেম, বাসনা, কামনা, সুখ-দুঃখ কেমন বস্তু, তাহাও বুঝাইয়া বলা চলে না। এই সকল কেবল জ্ঞানালোকের সাহায্যেই বুঝিয়া লইতে হয়। অপরপক্ষে যে-বস্তু খেয়ালে আসে, তাহা লোকে দুই প্রকারে জানিতে পারে। প্রথম প্রকার–বস্তুটি যেন লোকে দেখিতেছে এমনভাবে ইহাকে খেয়ালের সম্মুখে রাখিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়। সুতরাং এই উপায়লব্ধ জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় প্রকার–বস্তুটি বাস্তবচক্ষে দর্শন করা হয়। জ্ঞানলাভের এই পদ্ধতি প্রথম প্রকারের পদ্ধতি অপেক্ষা পূর্ণতর। এইজন্যই প্রিয়জনকে খেয়ালের

চক্ষে দর্শন করিলে যে-আনন্দ অনুভব হয় স্বচক্ষে দর্শন করিলে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই নহে যে, খেয়ালের চক্ষে যে আকৃতি নয়নগোচর হইয়াছিল, ইহা হইতে ভিন্ন বা উৎকৃষ্ট কোন আকৃতি স্বচক্ষে দর্শনের সময় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তবে কথা এই যে, স্বচক্ষে দর্শনের সময় ঐ একই আকৃতি অধিক উজ্জ্বলভাবে দেখা দিয়া থাকে। যেমন, কোন প্রেমিক তাহার প্রিয়জনকে ঊষার অন্ধকারে দেখিলে যেরূপ আনন্দ পায়, দিন চড়িলে রৌদ্রের আলোকে দেখিলে তদপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় বলিয়া সে পূর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ এই নহে যে, দিনমানে আকৃতিতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়; বরং কারণ এই য, দিবাভাগে রৌদ্রের আলোকে পূর্ব আকৃতিই অধিক উজ্জলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

তদ্রূপ যে বস্তু খেয়ালে আসে না, কেবল জ্ঞানবলে জানা যায়, তাহাও জানিবার দুই প্রকার উপায় আছে। প্রথমটি মারিফাত এবং দ্বিতীয়টি ইহারও এক সোপান ঊর্ধ্বে; ইহাকে দীদার বলে। চরম বিকাশের দিক দিয়া বলিতে গেলে খেয়াল ও দর্শনের মধ্যে যে-পার্থক্য রহিয়াছে, মারিফাত ও দীদারের মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক রহিয়াছে। আবার দর্শন অপেক্ষা খেয়াল অস্পষ্ট হইলেও দর্শনে প্রতিবন্ধকতা আছে, কিন্তু খেয়ালের পথ সর্বদা উন্মুক্ত থাকে; যেমন–চক্ষুর পলক বন্ধ করিলে দর্শনে বাধা পড়ে এবং পুনরায় চক্ষু না খুলিলে দেখা যায় না। এইরূপ, প্রত্যক্ষ দর্শন অপেক্ষা মারিফাত অস্পষ্ট হইলেও অবস্থা বিশেষে বাধা পড়িয়া প্রত্যক্ষ দর্শনের পথ বন্ধ হইয়া যায়; পুনরায় প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত না হইলে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করা যায় না। কিন্তু মারিফাতের পথ কখনও বন্ধ হয় না। যে-পানি ও মাটি হইতে মানবদেহ নির্মিত, উহার সহিত তাহার সম্বন্ধ এবং দুনিয়ার লোভ-লালসায় লিপ্ততা প্রত্যক্ষ দর্শনের পথে তাহার পক্ষে এক দুর্ভেদ্য অন্তরায়। এই অন্তরায় বিদূরিত না হইলে দীদারও লাভ করা যায় না। এইজন্যই হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে আল্লাহ বলেন লَنْ تَرَانِىْ – অর্থাৎ "তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবে না।" (সূরা আ'রাফ, ১১ রুকূ, ৯ পারা।)

যাহাই হউক, খেয়ালের তুলনায় দীদারের আনন্দ যেমন নিতান্ত অধিক তদ্রূপ দীদার যখন মারিফাত অপেক্ষা উজ্জ্বল ও পূর্ণ তখন তাহা হইতে লব্ধ আনন্দও যে অত্যন্ত বেশী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মা'রিফাতের পূর্ণ বিকাশই দীদার–শুক্রবিন্দু যেমন পরিশেষে মানবমূর্তি ধারণ করে বীজ বৃক্ষে পরিণত হয় তদ্রূপ মা'রিফাতও কিয়ামত দিবসে অন্য অবস্থা ধারণ করিবে এবং আদিম অবস্থার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তখন ইহার পূর্ণ উন্নতি বিকাশ পাইবে এবং ক্রমোন্নতির বিবর্তনে ইহা নিতান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ইহাকেই দীদার বা প্রত্যক্ষ দর্শন বলে। কারণ, দীদারের অর্থ হইল পূর্ণরূপে অনুধাবন করা এবং আল্লাহ্‌র দর্শনই পূর্ণরূপে অনুধাবন করার চরম সোপান। ইহকালে মা'রিফাত যেমন কোন দিক বা অভিমুখের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ার মুখাপেক্ষী নহে, তদ্রূপ পরকালে দীদারও কোন দিক বা অভিমুখের মুখাপেক্ষী নহে। সুতরাং মা'রিফাতই দীদারের বীজ। যে-ব্যক্তি মা'রিফাত লাভ করে নাই, সে চিরদিন আল্লাহ্‌র দীদার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কেননা, যে-ব্যক্তি বীজই বপন করে নাই, সে শস্য লাভ করিবে কিরূপে? যে-ব্যক্তি যত বড় আরিফ হইবেন, তাঁহার দীদারও তত পূর্ণ হইবে।

মনে করিও না যে, সকলেই দীদারের আনন্দ সমানভাবে উপভোগ করিবে; বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মা'রিফাত অনুযায়ী দীদার লাভ করিবে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে–"নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বীয় জ্যোতি সকল মানুষের উপর সাধারণভাবে প্রকাশ করিবেন; কিন্তু আবূ বকরের (রা) উপর বিশেষভাবে প্রকাশ করিবেন।" এই হাদীসের মর্ম ইহা নহে যে, হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একবার একাকী আল্লাহকে দর্শন করিবেন এবং অন্যান্য সকলে একত্রে একবার তাঁহাকে দর্শন করিবে। বরং সকলেই একত্রে আল্লাহকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু যে-বিশেষ দর্শন লাভ করিবেন, ইহা হইতে অপর সকল লোক বঞ্চিত থাকিবে। হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু মা'রিফাতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বিশেষ দীদার লাভ করিবেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন যে, অতিরিক্ত নামায-রোযার কারণে অপর সাহাবীগণের উপর আবূ বকরের (র) অধিক ফযীলত নাই; বরং তাঁহার অন্তর্নিহিত এক গোপন রহস্যের কারণে সকলের উপর তাঁহার ফযীলত রহিয়াছে। এই উক্তিতেও হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু যে মা'রিফাতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন তৎপ্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে। এই মা'রিফাতের কারণেই তিনি আল্লাহ্‌র বিশেষ দীদার লাভ করিবেন।

আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন হইলেও মা'রিফাতের তারতম্য অনুসারে দীদারে

পার্থক্য ঘটিবে। একই পদার্থের ছবি যেমন পৃথক পৃথক দর্পণে বিভিন্ন রূপ দেখা যায় ইহাও ঠিক তদ্রূপ। কোন দর্পণে ক্ষুদ্র, কোনটিতে সরল, আবার কোনটিতে বা বক্র দেখা যায়। এমন কি বক্রতায় কোন কোন সময় এতটুকু যাইয়া পৌঁছে যে, সুন্দর মূর্তিও নিতান্ত কুৎসিত বলিয়া মনে হয়। যেমন সুন্দর মূর্তির ছবি পরিষ্কার দর্পণে সুন্দরই দেখায়; কিন্তু তলওয়ারের পাতের উপর দেখিতে গেলে নিতান্ত কুৎসিত দেখা যায়। যে-ব্যক্তি নিজের হৃদয়রূপ দর্পণ এই জগত হইতে মলিন বা বক্র করিয়া লইয়া পরলোকে গমন করে, তাহার হৃদয়-ফলকে আল্লাহর দীদার ঠিকভাবে প্রতিফলিত হইবে না এবং তজ্জন্য যে-দীদার অপরের জন্য অসীম আনন্দদায়ক হইবে, ইহাই তাহার জন্য অসীম কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিবে।

মহব্বতের তারতম্যানুসারে দীদারের আনন্দে তারতম্য–পয়গম্বরগণ আল্লাহ্‌র দীদারে যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিবেন অপর লোকেও তদ্রূপ আনন্দ পাইবে, ইহা মনে করিও না। আর ইহাও ধারণ করিও না যে, আলিমগণ যে আনন্দ পাইবেন সাধারণ লোকেও সেই আনন্দ পাইবে এবং খোদাভীরু ও আল্লাহ-প্রেমিক আলিমগণ যেরূপ আনন্দ লাভ করিবেন, সাধারণ আলিমগণও তদ্রূপ আনন্দ পাইবেন। যে আরিফের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং যে আরিফের অন্তরে মহব্বত তত প্রবল হইয়া উঠে নাই, তাঁহাদের দীদারের আনন্দও তদ্রূপ পার্থক্য হইবে। দীদারের তারতম্যানুসারে এই প্রার্থক্য হইবে না, কেননা উভয় আরিফ এক আল্লাহ্‌কেই দেখিবেন। তবে দীদারের মূল কারণ মা'রিফাতে সমান হইলেও মহব্বতের তারতম্যে তাঁহাদের দীদারের আনন্দে তারতম্য হইবে। এই দুই জন আরিফের দৃষ্টান্ত এই যে, মনে কর দুইজন লোকের দর্শনশক্তি সমান প্রখর। তাহারা উভয়ে একজন সুন্দর ব্যক্তি দেখিতে পাইল। তাহাদের একজন এই সুন্দর ব্যক্তিকে ভালবাসে, কিন্তু অপরজন তাহাকে ভালবাসে না। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তাহাকে ভালবাসে সে অবশ্যই তাহাকে দেখিয়া অধিক আনন্দ পাইবে। আবার মনে কর উভয় দর্শকই সেই সুন্দর ব্যক্তিকে ভালবাসে। কিন্তু তন্মেধ্যে একজন তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত পড়িয়াছে এবং অন্যজন তত আসক্ত হয় নাই। এমন স্থলে যে-ব্যক্তি অধিক আসক্ত সে-ই মাশুক দেখিয়া অধিক আনন্দ লাভ করিবে।

উপরিউক্তি বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, পরকালে চরম সৌভাগ্য লাভের জন্য কেবল মা'রিফাতই যথেষ্ট নহে; বরং মা'রিফাতের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে

আল্লাহ্‌র মহব্বতও প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে। আল্লাহ্-প্রেম এমন প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে যেন ইহার প্রভাবে মানব হৃদয় দুনিয়ার মহব্বত হইতে একেবারে পাক-পবিত্র হইয়া পড়ে। সংসার-বিরাগ ও পরহেযগারী ব্যতীত অন্তরের এইরূপ পবিত্রতা হাসিল হয় না। সুতরাং সংসার-বিরাগী ও আল্লাহ-প্রেমিক আরিফই দীদারের পূর্ণ আনন্দ লাভ করিবেন।

মা'রিফাতের আনন্দ অপেক্ষা দীদারের আনন্দ অত্যধিক—তুমি হয়ত বলিতে পার যে, দীদারের আনন্দ মা'রিফাতের আনন্দের সমজাতীয় না হইলে ইহা কোন আনন্দই নহে। মা'রিফাতের আনন্দ সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতাই এইরূপ উক্তির একমাত্র কারণ। তুমি হয়ত মা'রিফাত সম্বন্ধে কিছু কথা কোন কিতাবে একত্র সম্বলিত দেখিয়া মুখস্থ করিয়া লইয়াছ অথবা কাহারও নিকট হইতে কথাগুলি শিক্ষা করিয়া এইগুলির নাম রাখিয়াছ 'মা'রিফাত'। তাহা হইলে তুমি মা'রিফাতের আনন্দ পাইবে না। চাউল ভাজাকে সুমিষ্ট হালুয়া নাম দিয়া খাইতে থাকিলে উহাতে কখনই হালুয়ার স্বাদ পাওয়া যাইবে না। যে-ব্যক্তি মা'রিফাতের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে ইহার বিনিময়ে দুনিয়াতেই বেহেশ্‌ত দিতে চাহিলে তিনি উহা গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন রাজত্ব পাওয়ার আনন্দকে উদর তৃপ্তির সুখ বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আনন্দ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে তদ্রুপ জ্ঞানী লোকেরাও মা'রিফাতের আনন্দকে এই দুনিয়াতে বেহেশ্‌ত লাভের আনন্দ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করিয়া থাকেন। মা'রিফাতের আনন্দ এত অধিক হইলেও আল্লাহ্‌র দীদারের আনন্দের সহিত কোন তুলনাই চলে না।

দৃষ্টান্ত ব্যতীত একথা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। মনে কর, মা'শূকের প্রতি আশিকের প্রেম এখনও তত গাঢ় হইয়া উঠে নাই এবং তাহার দিকে আশিকের আকর্ষণও নিতান্ত কম। অপর দিকে কতকগুলি ভীমরুল ও বিচ্ছু আশিকের পরিহিত বস্ত্রে থাকিয়া তাহাকে অনবরত দংশন করিতেছে। এই সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও তাহাকে আরও কতকগুলি কার্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে এবং সর্ব বিষয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত রহিয়াছে। এমন ব্যক্তি ঊষার প্রাক্কালে অন্ধকারের কিছু ঘোর থাকিতে মা'শূকের দর্শন লাভ করিলে তদ্রূপ অবস্থায় প্রিয়জন দর্শনের পূর্ণ আনন্দ অবশ্যই সে পাইবে না। কিন্তু তৎপর হঠাৎ যদি সূর্যোদয়ের ফলে চতুর্দিক আলোকিত হয়, তাহার প্রেম প্রবল বেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কর্ম-ব্যাপৃতি ছিন্ন ও ভয় বিদূরিত হয় এবং ভীমরুল ও বিচ্ছুর দংশন-যন্ত্রণা

হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তবে এমন ব্যক্তি ইতঃপূর্বে বিপদাপদে জড়িত থাকিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিল, এই আনন্দের সহিত উহার কোন তুলনাই হইতে পারে না। দুনিয়াতে আরিফের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়াতে মা'রিফাতের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না বলিয়া আরিফের ইহলৌকিক দর্শনকার্য পর্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট। যে পর্যন্ত মানব ইহজগতে থাকে, সেই পর্যন্ত সে অপূর্ণ থাকে এবং তজ্জন্য তাহার আল্লাহ-প্রেম পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া দুর্বল থাকে। দুনিয়ার লোভ-লালসা, সাংসারিক শোক-দুঃখ ও ক্রোধ উপরিউক্ত ভীমরুল, বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনজনিত যন্ত্রণাসদৃশ। কারণ, ইহাদের উৎপাতে মা'রিফাতের মাধুর্য হ্রাস পায়। জীবিকা সংগ্রহের কার্য ও এবংবিধ নানা ব্যাপারে মানুষ দুনিয়াতে কর্মব্যস্ত ও ভীত থাকে। মৃত্যু ঘটিলে এ সকল অন্তরায় ঘুচিয়া যায়। তখন দীদারের ইচ্ছা ও মহব্বত পূর্ণমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; জীবিতকালে যে সকল অবস্থা গোপন ছিল উহাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা বিদূরিত হয় ও কর্মব্যস্ততা ছিন্ন হইা যায়। এইজন্য দীদারের আনন্দ চরমে যাইয়া পৌঁছে। অবশ্য এই আনন্দ মা'রিফাতের তারতম্যানুসারেই হইয়া থাকে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আহার্যদ্রব্যের আঘ্রাণে যে আনন্দ পায়, ইহার সহিত ভক্ষণজনিত আনন্দের যেমন কোন তুলনা চলে না, তদ্রূপ দীদারের আনন্দের সহিত মা'রিফাতের আনন্দেরও কোন তুলনা চলে না, অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য আঘ্রাণের আনন্দ অপেক্ষা ভক্ষণের আনন্দ যেমন অতীব অধিক, মা'রিফাতের আনন্দ অপেক্ষা দীদারের আনন্দও তেমনি অধিক।

সাধারণ দর্শন ও আল্লাহ্‌র দীদারে পার্থক্য— এ-স্থলে হয়ত বলিতে পার, মা'রিফাত হৃদয়ে জন্মে এবং চক্ষু দ্বারা দীদার লাভ হয়। সুতরাং দীদারের আনন্দ কিরূপে অধিক হইতে পারে? জানিয়া রাখ, পূর্ণ খেয়াল হইতে উদ্ভব হয় বলিয়াই দর্শনকে দীদার বলে। দর্শনকার্য চক্ষু দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়াই ইহাকে দীদার বলে না; কারণ, আল্লাহ্ দীদার লাভের ক্ষমতা মস্তকে সৃজন করিয়া দিলেও দীদার লাভ হইত। কাজেই দীদারকে কোন নির্দিষ্ট অঙ্গের সহিত আটকাইয়া বুঝিতে যাওয়া অনর্থক পরিশ্রমমাত্র। কেননা 'দীদার' শব্দে শরীয়তে উক্ত হইয়াছে এবং প্রকাশ্যভাবে দীদার চক্ষু দ্বারাই লব্ধ হয় বলিয়া পরকালের দীদারের সহিতও চক্ষুর সংস্রব রহিয়াছে। আর ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, পরকালের চক্ষু দুনিয়ার চক্ষুর ন্যায় হইবে না। দিকের সঙ্গে দুনিয়ার চক্ষুর

দর্শনশক্তি সীমাবদ্ধ; কিন্তু পরকালের চক্ষুর দর্শনশক্তি তদ্রূপ সীমাবদ্ধ নহে। সকল দিকেই সেই চক্ষু দিয়া দেখা যাইবে।

এই বিষয়ে সর্বসাধারণের তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ করা সঙ্গত নহে। কারণ, ইহা তাহাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত। বানর দ্বারা সূত্রধরের কার্য সম্পন্ন হয় না। যে সকল আলিম কেবল ফিকাহ্ ও হাদীস-তফসীর অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাও একথা বুঝিতে পারেন না। এমন কি, তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিমগণও দীদারের হাকীকত উপলব্ধি করিতে অক্ষম। কেননা, তাঁহাদের কর্তব্য হইল জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভুলত্রুটি সংশোধন করা। বেদ'আতী লোকগণ নব নব প্রথা প্রচলনপূর্বক অজ্ঞ লোকদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল করিবার এবং সমাজদেহে নানারূপ অনিষ্ট ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া থাকে। তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিমগণ এই সমস্তের প্রতিরোধ করেন। এবং ধর্ম-বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক করাকেই ইহার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মা'রিফাতের পথই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এই পথের পথিকগণের স্বভাবও অন্য প্রকার। কবি বলেন–

منزل عشقش مکان دیگر ست ـ مردان راه اشان دیگر ست –

"অর্থাৎ আল্লাহ-প্রেমের পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঐ পথের পথিকদিগকে চিনিবার নির্দশন স্বতন্ত্র।" এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার বর্ণনা হইতে পারে না। সুতরাং এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

দীদারের আনন্দ সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইবার উপায়–তুমি হয়ত বলিতে পার, যে-আনন্দ পাইলে বেহেশ্‌তের আনন্দের কথা লোকে ভুলিয়া যায়, ইহা আমি কোন প্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই সম্বন্ধে আলিমগণ বহু কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার আনন্দ ভাগ্যে না ঘটিলেও ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপায় কি, তাহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। এই বিশ্বাস জন্মাইবার তিনটি উপায় আছে।

প্রথম উপায়– দীদারের আনন্দ সম্বন্ধে যে সকর কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে তৎপ্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা যেন ইহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। কারণ, যে-কথা একবার মাত্র শুনা যায় তাহা অধিকক্ষণ মনে থাকে না।

দ্বিতীয় উপায়–মানবের সকল প্রবৃত্তি—আনন্দানুভব শক্তি ও কামভাব ইত্যাদি একবারে একই সময়ে বিকাশ পায় না। শিশুর হৃদয়ে সর্বপ্রথম আহার

প্রবৃত্তি এবং আহারজনিত আনন্দবোধের শক্তি জাগ্রত হয়। ইহা ছাড়া শিশু আর কিছু জানেই না। প্রায় সাত বৎসর বয়সের সময় তাহার মনে খেলাধুলার অভিলাষ বিকষিত হয় এবং এই অভিলাষ চরিতার্থ করিয়া সে আনন্দ উপভোগ করেন। এমন কি, তখন সে মুখের অন্ন ফেলিয়া দিয়া খেলা করিতে দৌড়ায়। বয়স দশ বৎসরের নিকটবর্তী হইলে সাজসজ্জা ও উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদের বাসনা তাহার মনে জাগরিত হয় এবং উহাতে সে আনন্দ অনুভব করে। এই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সে খেলাধুলা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে। পনের বৎসর বয়স হইতে রমণী-সম্ভোগের কামনা জাগিয়া উঠে এবং ইহাতে পরম আনন্দ অনুভব করে। এমন কি, তখন রমণীর পিছনে, পড়িয়া যথাসর্বস্ব বিসর্জন দেয়। তৎপর বয়স বিশ বৎসরের নিকটবর্তী হইলে প্রভুত্বপ্রিয়তা ও অহংকার বৃদ্ধি পায় এবং সম্মান-লিপ্সার আনন্দ মনে জাগ্রত হয়। ইহাই পার্থিব আনন্দের শেষ সোপান, যেমন আল্লাহর বলেন ঃ

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ –

অর্থাৎ "দুনিয়ার জীবন খেলা, তামাশা, শোভা সৌন্দর্যের আড়ম্বর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অহংকারের অবলম্বন এবং ধনেজনে অন্য অপেক্ষা আধিক্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

তৎপর বয়স বিশ বৎসরের বেশী হইলে দুনিয়া যদি তাহার অন্তর একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়া না থাকে এবং তাহার হৃদয় পীড়িত করিয়া না থাকে তবে বিশ্বজগত, ইহার সৃষ্টিকর্তা এবং গগনমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের পরিচয় লাভের আনন্দ তাহার মনে জাগিয়া উঠে। আর পরবর্তী প্রতিটি আনন্দের তুলনায় পূর্ববর্তী সকল আনন্দ যেমন তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ এই পরিচয়-জ্ঞানের আনন্দের তুলনায় পূর্ববর্তী সকল আনন্দই নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে। বেহেশ্‌তের আনন্দ এবং উদর, কাম ও চক্ষু চরিতার্থজনিত আনন্দ উভয়ই সমশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, বেহেশতেও লোকে সুরম্য উপবনে বিহার, অতি উপাদেয় উপাদেয় আহার গ্রহণ এবং নির্মল সলিলা স্রোতস্বতী ও নানারূপ কারুকার্যখচিত উচ্চ উচ্চ সৌধরাজি দর্শনে আনন্দ লাভ করিবে। বেহেশ্‌তের এই আনন্দের তুলনায় এই দুনিয়ার রাজত্ব, প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং শাসন-ক্ষমতা পরিচালনার আনন্দও তুচ্ছ হইয়া উঠে। এমতাবস্থায় মা'রিফাতজনিত আনন্দের

তুলনায় এই সকল ইন্দ্রিয়লব্ধ আনন্দ কত তুচ্ছ হইয়া পড়ে তাহা বলাই বাহুল্য। দেখ, খ্রীস্টান সন্ন্যাসী লোকের সম্মান পাইবার উদ্দেশ্যে কখন কখন নিজকে গীর্জায় আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং প্রত্যহ অতি সামান্য পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে। অতএব দেখা গেল যে, সন্ন্যাসী বেহেশতের আনন্দ অপেক্ষা দুনিয়াতে লোকের নিকট সম্মান পাওয়ার আনন্দকে অধিক পছন্দ করে। কারণ, বেহেশতেও উদর, কাম এবং চক্ষু চরিতার্থজনিত আনন্দ রহিয়াছে। সুতরাং যে-ব্যক্তি পূর্বেই সকল ইন্দ্রিয়লব্ধ আনন্দকে তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছে, মা'রিফাতের আনন্দে তাহার অন্য সকল আনন্দই বিলীন হইয়া যাইবে।

প্রিয় পাঠক, এখন তুমি সম্মান ও প্রভুত্ব ভালবাসিবার বয়সে উপনীত হইয়াছ বলিয়া তুমি রাজত্ব ও রাজকীয় ক্ষমতাকে আনন্দদায়ক পদার্থ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেছ। কিন্তু যে-বালক অদ্যাবধি রাজকীয় ক্ষমতার আনন্দ বুঝিতে পারে নাই সে ইহাতে বিশ্বাসী নহে এবং তুমি শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে রাজকীয় ক্ষমতার মাধুর্য বুঝাইতে পারিবে না। এইরূপ কোন আরিফ শত চেষ্টা করিয়াও এখন তোমার ন্যায় অন্ধকে মা'রিফাতের মাধুর্য বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না। কিন্তু তোমাতে যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে এবং তুমি গভীরভাবে মনোবিনেশ কর তবে মা'রিফাত যে সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক, তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে।

তৃতীয় উপায়–আরিফগণের অবস্থা অবলোকন করা এবং তাঁহাদের উক্তি শ্রবণ করা। কারণ, নপুংসক ও পুরুষত্বহীন লোক যদিও স্ত্রী-সম্ভোগের আনন্দ সম্বন্ধে কিছুই জানে না তথাপি তাহারা যখন দেখিতে পায় যে অন্য পুরুষগণ তাহাদের যথাসর্বস্ব রমণীর পিছে উড়াইয়া দিতেছে, তখন নপুংসক ও পুরুষত্বহীন লোকের মনে আপনা-আপনিই এ-কথা বোধগম্য হয় যে, স্ত্রীসহবাসে এমন আনন্দ নিহিত আছে যাহা তাহাদের অদৃষ্টে ঘটে না। হযরত রাবেয়ার (র) সম্মুখে লোকে বেহেশতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন–"সর্বপ্রথম গৃহস্বামী, তৎপরগৃহ।" হযরত সুলায়মান দারানী (র) বলেন–"আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক আছেন দোযখের ভয় ও বেহেশতের আশা যাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকির হইতে বিরত রাখে না। এমতাবস্থায় দুনিয়া কিরূপে তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকির হইতে বিরত রাখিবে?" হযরত মারূফ কারখীকে (র) তাঁহার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন–"ব-লুন ত, কোন্ পদার্থ আপনাকে দুনিয়া হইতে বিমুখ করিয়া ইবাদত ও নির্জনবাসে লিপ্ত করিয়াছে? মৃত্যু-ভয়, কবরের ভীতি, দোযখের সংশয় বা বেহেশতের লোভ কি আপনাকে লিপ্ত করিয়াছে?" তিনি বলিলেন–"এগুলির কি হাকীকত আছে? যে বাদশাহর ক্ষমতার হস্তে এই সমস্ত আছে, তাঁহার সহিত মহব্বত রাখিলে এই সমস্তই ভুলিয়া যাও। তাঁহার পরিচয় পাইলে এবং তাঁহার সহিত ভালবাসা জন্মিলে ঐ সমস্তের জন্য তুমি লজ্জাবোধ করিবে।"

হযরত বিশ্‌রে হাফীকে (র) কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– "আবূ নসর তাম্মার ও আবদুল ওহ্‌হাব দার্‌রাকের অবস্থা কেমন?" তিনি বলিলেন–'এখনই তাঁহাদিগকে বেহেশতে পানাহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া আসিলাম।" সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল–"আপনার অবস্থা কেমন?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ জানেন যে, পানাহারের প্রতি আমার মোটেই আগ্রহ নাই। তাই তিনি আমাকে তাঁহার দীদার দান করিয়াছেন।" হযরত আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফক (র) বলেন–"আমি একবার স্বপ্নে বেহেশ্‌ত দেখিলাম –বহু লোক সেখানে আহারে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং ফিরিশ্‌তাগণ উত্তম উত্তম খাদ্য তাঁহাদের মুখে তুলিয়া দিতেছিলেন। এক ব্যক্তিকে দেখিলাম আল্লাহ্‌র দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একদৃষ্টিতে হতভম্ব হইয়া চাহিয়া আছেন। আমি রেয্‌ওয়ানকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন–'তিনি মারূফ কারখী (র)। তিনি দোযখের ভয়ে বা বেহেশ্‌তের আশায় ইবাদত করেন নাই। এইজন্য আল্লাহ্ স্বীয় দীদার দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন–"যে ব্যক্তি আজ নিজকে লইয়া ব্যাপৃত সে কাল কিয়ামত দিবসও নিজকে লাইয়াই ব্যাপৃত থাকিবে; আর যে-ব্যক্তি অদ্য আল্লাহকে লইয়া ব্যাপৃত সে কাল কিয়ামত দিবসও আল্লাহকে লইয়া ব্যাপৃত থাকিবে।"

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মু'আয (র) বলেন–"এক রজনীতে দেখিলাম হযরত বায়েযীদ (র) পায়ের গোড়ালি উত্তোলনপূর্বক উভয় পায়ের অঙ্গুলির উপর উপবেশ করিয়া ঈশার নামাযের পর প্রভাত পর্যন্ত কাটাইলেন। অবশেষে সিজদা করিয়া পরে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং মুখ আকাশের দিকে তুলিয়া মুনাজাত করিতে লাগিলেন–"হে আল্লাহর, কত লোক তোমার অনুসন্ধান করিয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগকে এই কারামত দান করিয়াছ যে, তাঁহারা পানি উপর দিয়া চলিতে ও বাতাসে উড়িতে পারেন। আমি তাহা চাই না, আমাকে তাহা হইতে রক্ষা কর। অপর এক দলকে তুমি পৃথিবীর ধন-রত্ন দান করিয়াছ; অপর এক দলকে এমন কারামত দান করিয়াছ যে তাঁহারা এক রজনীতে বহু

দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা এরূপ কারামতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি এই সকল চাই না। উহা হইতে আমাকে রক্ষা কর।' তৎপর পশ্চাতে দৃকপাত করত আমাকে দেখিয়া বলিলেন-'হে ইয়াহ্ইয়া, তুমি এখানে! আমি বলিলাম-'হাঁ, হুযূর।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-'কতক্ষণ যাবত আছ? আমি বলিলাম-'অনেকক্ষণ যাবত।" আমি নিবেদন করিলাম-'আমাকে এই অবস্থা বুঝাইয়া দিন।" তিনি বলিলেন-"যাহা তোমাকে জানাইবার যোগ্য তাহা বলিতেছি-আল্লাহ আমাকে তাঁহার রাজ্যের উচ্চ ও নিচ সমস্ত প্রদেশ দেখাইলেন; আরশ, কুরসী, আকাশ এবং বেহেশত দেখাইয়া বলিলেন-'এই সমস্তের মধ্যে কি চাও বল; যাহা চাও তাহাই দিব।' আমি নিবেদন করিলাম-'এই সকলের আমি কিছুই চাহি না।' আল্লাহ বলিলেন-'সত্যই তুমি আমার বান্দা।'

হযরত আবূ তোরাব বখ্শীর (র) এক বড় মুরীদ ছিলেন, তিনি সর্বদা নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। হযরত আবূ তোরাব (র) একদা বলিলেন-"তুমি একবার হযরত বায়েযীদের সহিত দেখা করিলে ভাল হইত।" মুরীদ বলিলেন-"তাহার সহিত দেখা করার কোন আবশ্যকতা আমার নাই।" হযরত আবূ তোরাব (র) আরও কয়েকবার মুরীদকে ঐ কথাই বলিলেন। মুরীদ উত্তর দিলেন-"আমি বায়েযীদের খোদাকে দেখিয়া থাকি; বায়েযীদকে দেখিয়া কি করিব?" হযরত আবূ তোরাব (র) বলিলেন-"তোমার জন্য বায়েযীদকে একবার দর্শন করা খোদাকে সত্তর বার দর্শন অপেক্ষা উত্তম।" মুরীদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"ইহার অর্থ কি? হযরত আবূ তোরাব (র) বলিলেন-"হে নির্বোধ, তুমি তোমার মর্যাদা অনুযায়ী খোদাকে দেখিতেছ; তিনিও তদনুযায়ী তোমার নিকট প্রকাশ পাইতেছেন এবং হযরত বায়েযীদকে (র) খোদার নিকট তাঁহার মর্যাদা অনুযায়ী দেখিতে পাইবে।" এই সূক্ষ্ম কথা বুঝিয়া মুরীদ নিবেদন করিলেন-"চলুন, আমরা উভয়ে যাই।" হযরত আবূ তোরাব (র) বলেন-"আমরা উভয়ে হযরত বায়েযীদের (র) নিকট গেলাম। তিনি এক জঙ্গলে বসিয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার নিকটবর্তী হইলে উলটা পোস্তীন পরিহিত অবস্থায় তিনি বাহিরে আসিলেন। মুরীদ তাঁহাকে দেখিবামাত্র এক চিৎকার দিল এবং তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। আমি বলিলাম-'হে বায়েযীদ, আপনাকে একনযর দেখিলেই কি তাহাকে হত্যা করা উচিত?' তিনি বলিলেন-'না, তাহা নহে। তিনি সত্যপরায়ণ মুরীদ ছিলেন। তাঁহার মধ্যে এক

গোপন রহস্য ছিল। নিজ ক্ষমতায় তিনি সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। আমাকে দেখামাত্র তাঁহার সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল। তিনি দুর্বল ছিলেন বলিয়া ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন।"

হযরত বায়েযীদ (র) বলেন-"আল্লাহ যদি তোমাকে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের ন্যায় বন্ধুত্ব, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের ন্যায় মুনাজাতের শক্তি এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের ন্যায় রূহানী ক্ষমতা দান করেন তবুও তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিও না;' কারণ, তাঁহার নিকট হইতে আরও বহু কিছু পাইবার আছে।" হযরত বায়েযীদের (র) এক বন্ধু 'মুযাক্কী' বলেন-'আমি ত্রিশ বৎসর যাবত সারারাত্রি জাগিয়া নামায পড়ি এবং দিনে রোযা রাখি। কিন্তু যে-সকল অবস্থার কথা আপনার মুখে শোনা যায় উহার কোনটিই আমার ভাগ্যে প্রকাশ পায় নাই।" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন-"ত্রিশ শত বৎসর ইবাদত করিলেও তাহা প্রকাশ পাইবে না।" বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন-"ইহার কারণ এই যে, তুমি তোমার অহমিকার আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছ।" তিনি নিবেদন করিলেন-"ইহা হইতে অব্যাহতির উপায় কি?" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন-"ইহার উপায় তুমি অবলম্বন করিতে পারিবে না।" বন্ধু বলিলেন-"বলুন, আমি তাহা অবলম্বন করিব।" হযরত (র) আবার বলিলেন-"না তুমি তাহা করিবে না।" বন্ধু বার বার অনুরোধ করিতে থাকিলে হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন-"নাপিতের নিকট গিয়া এখনই দাড়ি মুণ্ডাইয়া ফেল এবং একখানি তহ্বন্দ পরিধানপূর্বক সমস্ত দেহ ও মস্তক অনাবৃত রাখ। তৎপর এক থলিয়াপূর্ণ আখরোট গলায় লটকাইয়া বাজারে যাইয়া ঘোষণা কর—যে-বালক আমার ঘাড়ে বেত্রাঘাত করিবে তাহাকে একটি আখরোট দিব। এই অবস্থায়ই কাযী ও শরীয়তের পাবন্দ লোকদের নিকট গমন কর।" সেই ব্যক্তি বলিলেন-"সুবহানাল্লাহ্, আপনি কেমন ব্যবস্থা দিলেন!" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন-"তুমি যেভাবে সুবহানাল্লাহ্ বলিলে তাহাতে শিরক করিলে। কারণ, তুমি স্বীয় সম্মানের জন্যই এরূপ বলিয়াছ।" মুযাক্কী বলিলেন-"অন্য কোন ব্যবস্থা দিন। ইহা আমি পারিব না।" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন-"আমি ত নিজেই যাহা বলিলাম ইহাই প্রথম ব্যবস্থা।" সেই ব্যক্তি বলিলেন-"আমি গ্রহণ করিতে পারিব না।" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন-"এইজন্যই ত বলিয়াছিলাম যে, তুমি সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না।" হযরত বায়েযীদ (র) স্বীয় বন্ধুর জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা এইজন্য

দিয়াছিলেন যে, তিনি সম্মান-প্রত্যাশী ও অহংকারী ছিলেন এবং এই রোগের এবংবিধ ঔষধই একমাত্র ব্যবস্থা।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী নাযিল হইল–"হে ঈসা, আমি আমার বান্দাগণের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন দেখি যে, উহাতে দুনিয়া ও আখিরাতের কিছুই নাই তখন আমার মহব্বত তথায় স্থাপন করিয়া ইহা রক্ষা করিয়া থাকি। হযরত ইবরাহীম আদ্হাম (র) মুনাজাতে বলিতেন–"হে আল্লাহ।, তুমি যে মহব্বত আমাকে দান করিয়াছ এবং তোমার যিকিরের প্রতি আসক্তি আমাকে দিয়াছ, তুমি জান, উহার তুলনায় বেহেশত আমার নিকট মশক-পালকের সমানও নহে।" হযরত রাবেয়াকে (র) লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কিরূপ ভালবাসেন?" তিনি বলিলেন–"ইহা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার মহব্বত আমাকে সৃষ্ট পদার্থের মহব্বত হইতে বিরত রাখিয়াছে।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"কোন্ কার্য সকল কার্য অপেক্ষা উত্তম?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্র মহব্বত এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্যে সন্তুষ্ট থাকা।"

মোটকথা, এই মর্মে বহু হাদীস ও বুযুর্গগণের উক্তি আছে। এই সকল বুযুর্গের অবস্থা দৃষ্টে স্বভাবতই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র মা'রিফাত ও তাঁহার মহব্বতের আনন্দ বেহেশ্তের আনন্দ অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। প্রিয় পাঠক, এ-দিকে তোমার গভীর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

আল্লাহ্র মা'রিফাত গুপ্ত থাকার কারণ–কোন জিনিসের অবস্থা জানা কঠিন হইলে সেই কাঠিন্য দুই কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম-ইহা গুপ্ত থাকে, প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয়–ইহা এত উজ্জ্বল যে, চক্ষু ইহার তেজ সহ্য করিতে পারে না। এজন্যই চামচিকা রাত্রিকালেই দেখিতে পায়, দিবসে দেখিতে পায় না। ইহার কারণ এই নহে যে, রাত্রিকালে জিনিস প্রকাশ পায়; এবং দিবসেই সমস্ত জিনিস নিতান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে চামচিকার দর্শনশক্তি নিতান্ত দুর্বল বলিয়া সূর্যের প্রখর আলোক ইহার চক্ষে সহ্য হয় না। তদ্রূপ আল্লাহ্র নূর অতীব উজ্জ্বল এবং মানব-হৃদয়ে ইহার পরিচয় লাভের ক্ষমতা নাই বলিয়াই আল্লাহ্র মা'রিফাত এত কঠিন।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্র নূর ও তাঁহার প্রকাশ বোধগম্য হইবে। একখানা লিখিত পত্র বা সেলাই করা একটি বস্ত্র দেখিয়া তুমি লেখক এবং

দর্জির শক্তি, জ্ঞান, অস্তিত্ব ও ইচ্ছা সম্বন্ধে সুন্দররূপে অবগত হইতে পার। কারণ, পত্র ও বস্ত্র তাহাদের ঐ গুণসমূহ এমনভাবে প্রকাশ করিতেছে যে, তৎসম্বন্ধে তোমার ধ্রুব জ্ঞান জন্মে। আল্লাহ যদি সমস্ত বিশ্বে একটি পক্ষী বা একটি উদ্ভিদমাত্র সৃজন করিতেন তবে তাহা দেখিয়া সকলেই সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় অবশ্যই লাভ করিত। কারণ, পত্র দ্বারা পত্রলেখকের অস্তিত্ব যেরূপ বুঝা যায়, শিল্পকার্য দর্শনে শিল্পীর অস্তিত্ব তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হইয়া থাকে। কিন্তু আসমান-যমীন, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, পাথর, মৃত্তিকাখণ্ড যত কিছু মানুষের চিন্তায় আসে, এই সমস্তই একবাক্যে এক মহান সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে। আল্লাহ্র পরিচয় লাভের এই সমস্ত অসংখ্য প্রমাণ ও তাঁহার নূরের অতীব প্রখর দীপ্তির কারণেই তাঁহার মা'রিফাত নিতান্ত গুপ্ত। কারণ, একটি দ্রব্য যদি আল্লাহ্র তৈয়ারী হইত এবং অপরটি অন্য কাহারও তৈয়ারী হইত তবেই মা'রিফাত প্রকাশ হইত। সকল শিল্পই এক নিয়মের অধীন হওয়ার কারণে শিল্পীকে বুঝা যাইতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, কোন বস্তুই সূর্যের আলোক অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল নহে। কারণ, সূর্যের আলোকেই সবকিছু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য যদি অস্ত না যাইত বা মেঘাবৃত না হইত তবে জগতে যে সূর্যের আলোকই একমাত্র আলোক তাহা কেহই বুঝিত না। সূর্য সর্বদা উদিত থাকিলে সাদা, কাল ও অন্যান্য বর্ণ চিরকাল একই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যাইত। সুতরাং বর্ণ ব্যতীত আলোক বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ কেহ বুঝিতে পারিত না। কিন্তু সূর্য অস্তমিত হওয়ার দরুন ভূপৃষ্ঠ অন্ধকার হইয়া গেলে সাদা, কাল ইত্যাদি সমস্ত বর্ণই অদৃশ্য হইয়া যায়; সূর্যের আলোকের ফলেই সমস্ত বর্ণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, শুভ্র-কৃষ্ণাদি বর্ণ ব্যতীত আলোক নামে অপর এক পদার্থ আছে। কাজেই সূর্যের বিপরীত পদার্থ অর্থাৎ অন্ধকার দ্বারা সূর্যের পরিচয় পাওয়া গেল। এইরূপ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যদি কখন অদৃশ্য হইতেন বা না থাকিতেন এবং তজ্জন্য আসমান-যমীন বিশৃঙ্খল ও ধ্বংস হইয়া যাইত তবে তাঁহাকে লোকে আপনা-আপনিই চিনিতে পারিত। কিন্তু সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রবল ও পরিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে এবং সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই একই নিয়মের অধীন। অতএব প্রমাণের বাহুল্যও চির ঔজ্জ্বল্যের কারণেই আল্লাহ্র মা'রিফাত (পরিচয়) গুপ্ত রহিয়াছে।

আল্লাহর পরিচয় গোপন থাকার অপর এক কারণ এই যে শৈশবকাল হইতেই আল্লাহ্র বিস্ময়কর শিল্প ও সৃষ্ট পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। তখন

বুদ্ধি বিকশিত হয় না বলিয়া আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থের পরিষ্কার সাক্ষ্য বুঝিতে পারা যায় না। বিস্ময়কর পদার্থ সর্বদা চক্ষের উপর দেখিতে দেখিতে অভ্যাসক্রমে উহার সহিত সখ্যতা জন্মে। তৎপর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচার-ক্ষমতা জন্মিলে পূর্বপরিচিত পদার্থগুলি আল্লাহ্‌র অসীম শিল্পনৈপুণ্যের উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতে থাকিলেও মানবমন সেই সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারে না। কিন্তু কোন অপরিচিত দুষ্প্রাপ্য জীব বা বিস্ময়কর উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হইলে লোকের মুখ হইতে বিস্ময় প্রকাশক 'সুবহানাল্লাহ' কলেমা আপনা-আপনিই বাহির হয়। কারণ, সেই অপরিচিত বস্তু সৃষ্টিকর্তার যে-সাক্ষ্য দেয়, অনভ্যস্ত হওয়ার দরুন মন তাহা সহজেই গ্রহণ করে।

মূলকথা, যাহার দর্শন ক্ষমতা দুর্বল নহে সে যে-পদার্থই দর্শন করুক না কেন, ইহাতে সৃষ্টিকর্তাকেই দেখিয়া থাকে, সৃষ্টি পদার্থকে দেখে না। কারণ, আল্লাহ্‌র শিল্পনৈপুণ্যের নির্দশন হিসাবেই সে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি লেখাপড়া জানে না সে কোন চিঠি দেখিলে কাগজ ও কালির দাগই দেখিয়া থাকে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি চিঠি দেখিলে উহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এমনকি চিঠির লেখককেই দেখিয়া থাকে। কারণ রচনার মাধ্যমে রচয়িতাই মানবের নিকট প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। রচনা করিতে যাইয়া রচয়িতা কাগজের উপর যে দাগ কাটে তৎপ্রতি লোকে মোটেই লক্ষ্য করে না। যাঁহার এইরূপ উন্নত শ্রেণীর দর্শন ক্ষমতা আছে তিনি যাহাই দেখেন না কেন, তাহাতে আল্লাহকেই দেখিয়া থাকেন। কারণ, এমন কোন পদার্থ নাই যাহা তাঁহার সৃষ্ট নহে; বরং সমস্ত বিশ্ব একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক, তুমি সমস্ত বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্ ও তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ আল্লাহ্‌র অসীম শক্তি, অনন্ত মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জগতে ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল আর কিছুই নাই। কিন্তু মানব স্বীয় দুর্বলতার জন্য আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে।

মহব্বত পয়দা করিবার উপায়

মহব্বত অতি শ্রেষ্ঠ মকাম। এই মকামে উপনীত হওয়ার উপায় জানা নিতান্ত আবশ্যক। কেহ কাহারও প্রতি আসক্ত হইতে চাহিলে সর্বদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কেবল তাহার দিকে চাহিয়া থাকা আবশ্যক। বদনমণ্ডল দৃষ্টিগোচর

হওয়ার পর হস্ত-পদের সৌন্দর্য যদি গোপন থাকে তবে উহাও দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, সৌন্দর্য যতই দেখা যায় অনুরাগ ততই বৃদ্ধি পায়। সর্বদা দর্শনে ব্যাপৃত থাকিলে দর্শকের মনে আপনা-আপনিই অনুরাগ জন্মিবে। আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত স্থাপনের নিয়মও ইহাই। আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত স্থাপনের প্রথম শর্ত এই যে, মানুষকে দুনিয়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে এবং এই জঘন্য দুনিয়ার মহব্বত হইতে হৃদয় পাক করিতে হইবে। কারণ, দুনিয়ার মহব্বত মানুষকে আল্লাহ্‌র মহব্বত হইতে বঞ্চিত রাখে। হৃদয় পাক করা, বীজ বপনের জন্য ক্ষেত্র হইতে আগাছা পরিষ্কার করা তুল্য। তৎপর আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করিতে হইবে; কেননা যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভালবাসে না সে তাঁহার পরিচয় পায় নাই বলিয়াই ভালবাসে না। কারণ, সৌন্দর্য ও চরম উৎকর্ষ স্বভাবতই মানবের প্রিয়। এমনকি, যে-ব্যক্তি হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভালরূপে চিনিতে পারিয়াছে সে তাঁহাদিগকে ভাল-না-বাসিয়া পারে না; কেননা সদ্‌গুণাবলী স্বভাবতই লোকে ভালবাসে।

আল্লাহ্‌র মা'রিফাত হাসিল করার ক্ষেত্রে হৃদয় পাক করা বীজবপন তুল্য এবং তৎপর যিকির-ফিকিরে মশগুল হওয়া সেই ক্ষেত্রে পানি সেচন সদৃশ। কারণ, কাহাকেও অতিরিক্ত স্মরণ করিতে থাকিলে স্মরণকারীর হৃদয়ে আপনা-আপনিই ভালবাসা জন্মিয়া থাকে।

আল্লাহ্‌র মহব্বতে তারতম্য হওয়ার কারণ—কোন মুসলমানই আল্লাহ্‌র মহব্বত শূন্য হইতে পারে না। তবে তিন কারণে এই মহব্বতে তারতম্য হইয়া থাকে। এক বস্তুর মহব্বত অপর বস্তুর মহব্বত কমাইয়া দেয়। দুনিয়া ও দুনিয়া অর্জনে কাহারও আকর্ষণ অধিক, কাহারও কম। সুতরাং এই তারতম্যের জন্যই আল্লাহ্‌র মহব্বতে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। **প্রথম কারণ**—দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ও দুনিয়া অর্জনে লিপ্ততা বিষয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য; কেননা, এক বস্তুর মহব্বত অপর বস্তুর মহব্বত কমাইয়া দেয়। **দ্বিতীয় কারণ**—আল্লাহ্‌র মারিফাত হাসিলে মানুষে মানুষে প্রভেদ। সাধারণ লোক হযরত ইমাম শাফিঈকে (র) একজন বড় আলিম বলিয়া ভালবাসিয়া থাকে। একজন ফকীহ্ ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া থাকেন। সাধারণ লোক তাঁহার সম্বন্ধে যে পরিমাণে পরিচয় পাইতে পারে, আলিম লোক তদপেক্ষা অধিক পরিচয় পাইয়া থাকেন। আবার, হযরত ইমাম

সাহেবের (র) মযনী নামক এক শাগরেদ ছিলেন। তিনি ইমাম (র) সাহেবের অধ্যাত্মিক অবস্থা, অসাধারণ জ্ঞান ও উন্নত স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি হযরত ইমাম সাহেবকে (র) সকল ফকীহ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। এইরূপ যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যত পরিচয় পাইয়াছেন তিনি তাঁহাকে তত ভালবাসিয়া থাকেন। **তৃতীয় কারণ**–যিকির ও ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত হয়। কিন্তু সব লোকে সমান যিকির ও ইবাদত করে না। সুতরাং যিকির ও ইবাদতে হ্রাস-বৃদ্ধির দরুন মহব্বতে তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

কেহ আল্লাহ্‌কে একেবারেই ভাল না বাসিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে আল্লাহ্‌কে কখনও চিনিতে পারে নাই। কারণ, লোকে যেরূপ বাহ্য সৌন্দর্য ভালবাসে, স্বভাবের অন্তর্গত সৌন্দর্যও তদ্রূপ ভালবাসে। সুতরাং পরিচয় হইতেই ভালবাসা জন্মে।

মা'রিফাত লাভের পন্থা– পূর্ণ মা'রিফাত লাভের দুইটি পন্থা আছে। **প্রথম পন্থা**–সূফীগণের অবলম্বিত পথে মুজাহাদা (সাধনা) ও সর্বদা যিকির দ্বারা হৃদয় পরিষ্কার করিয়া লওয়া। উহার ফলে সাধক নিজের ও আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। অবশেষে এমন অবস্থা হয় যে তখন আল্লাহ্‌র প্রতাপ চাক্ষুষ দর্শনের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে তাহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এই পন্থাকে শিকারীদের ফাঁদ পাতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই ফাঁদে শিকার ধরা পড়িতে পারে, আবার ধরা না-ও পড়িতে পারে; অথবা উহাতে ইঁদুর ধরা পড়িতে পারে, আবার বাজও আটকাইতে পারে। এই পন্থায় কাহার কি লাভ হইবে তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক সাধকের অদৃষ্ট-অনুসারে বড় প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। **দ্বিতীয় পন্থা**–ইলমে মা'রিফাত শিক্ষা করা তর্কশাস্ত্র ও অন্যান্য ইলম শিক্ষা করা নহে। আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্টিকৌশল লইয়া চিন্তা করা ইলমে মা'রিফাতের আরম্ভ। এই বিষয়ে এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ লইয়া চিন্তা করিতে করিতে উন্নতি করত আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য ও প্রতাপ লইয়া চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণের মর্ম পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ইলম। বুদ্ধিমান মুরীদ কামিল পীরের সাহায্যে এই ইলম শিক্ষা করিতে পারে। নির্বোধ ব্যক্তি এই ইলম শিক্ষা করিতে পারে না। এই পন্থা ফাঁদ পাতার ন্যায় নহে যে, ইহাতে শিকার পড়িবে, কি না-পড়িবে এই সন্দেহ হইবে; বরং এই পন্থা কৃষি-বাণিজ্যের ন্যায়। ছাগ-ছাগীর

মিলনে যেমন ছাগলের বংশ বৃদ্ধি হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়, এই পন্থাও ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু বজ্রপাত হইয়া ছাগীর মৃত্যু ঘটিলে অবশ্য ইহার উপর কাহারও হাত নাই।

মা'রিফাতের পন্থা ত্যাগ করিয়া কেহ আল্লাহ্‌র মহব্বত পাইতে চাহিলে দুরাকাঙ্ক্ষা করা হইবে। আবার মা'রিফাত লাভের যে দুই পথের সন্ধান উপরে দেওয়া হইল উহা পরিত্যাগ করত অন্য কোন পথ অবলম্বন করিলে অকৃতকার্য হইতে হইবে।

পরকালের সৌভাগ্য–যে-ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ্‌র মহব্বত ব্যতীত পরকালের সৌভাগ্য লাভ করিবে সে নিতান্ত ভুলে পড়িয়া রহিয়াছে। কারণ, পরকারের অর্থই হইল আল্লাহ্‌র নিকটে উপস্থিত হওয়া। মনে কর, একজন অপরজনকে ভালবাসে এবং তাহার সঙ্গে মিলনের জন্য মনে প্রবল অনুরাগ আছে। কিন্তু কোন প্রবল অন্তরায়ের জন্য মিলিত হইতে পারিতেছে না; বহুদিন সেই অনুরাগ হৃদয়ে লইয়া কালাতিপাত করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ সেই বাধা ঘুচিয়া গেল এবং প্রিয়জনের সহিত মিলন ঘটিল। এমতাবস্থায় তাহার আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না। পূর্ব হইতেই আল্লাহ্‌র প্রতি তদ্রূপ অনুরাগ রাখিয়া পরকালে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াকে সৌভাগ্য বলে। প্রথমাবধি প্রিয় বস্তুর প্রতি ভালবাসা না থাকিলে তাহার সঙ্গে মিলনে কিছুমাত্র আনন্দ পাওয়া যায় না। অল্প ভালবাসা থাকিলে অল্প আনন্দ পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, ইশ্‌ক ও মহব্বতের অনুপাতে সৌভাগ্য লাভ হয়।

অপরপক্ষে, প্রিয়জনের শত্রুর সহিত বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গেলে পরকালে তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির বিপরীত হইবে (অর্থাৎ তাহার আনন্দের লেশমাত্রও থাকিবে না।) এবং এই কারণেই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ও দুঃখকষ্টে নিপতিত হইবে। যে-বস্তু লাভে অপর লোক পরম সৌভাগ্যশালী হইবে ইহার কারণেই সে পরম দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্য উপমাস্বরূপ একটি গল্প বলা যাইতেছে। এক মেথর আতর প্রস্তুতের কারখানার গেল। সে সেই স্থানের সুগন্ধ আঘ্রাণে বেহুশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। লোকে তাহার মাথায় গোলাপজল দিতে লাগিল এবং মৃগনাভি তাহার নাকে ধরিল। কিন্তু ইহাতে তাহার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইতে লাগিল। এমন সময় এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; সে পূর্বে কিছুকাল মেথরের কাজ করিয়াছিল। সে তাহার অবস্থা বুঝিল এবং মানুষের মল আনয়ন করত ভিজাইয়া তাহার নাকে

মালিশ করিয়া দিল। সেই মেথরের তৎক্ষণাৎ হুশ হুইল এবং সে বলিতে লাগিল–"এই ত সুগন্ধ।" এইরূপ যাহারা দুনিয়া উপভোগে আনন্দ পায় এবং দুনিয়া যাহাদের নিকট অতি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তাহারা উক্ত মেথর সদৃশ।

উক্ত মেথর যেমন আতরের কারখানায় তাহার আকাঙ্ক্ষিত মল পায় নাই, বরং তথায় যে-সকল সুগন্ধিদ্রব্য ছিল উহা তাহার স্বভাবের বিরোধী ছিল বলিয়া তাহার দুঃখ-কষ্ট অধিক হইতেছিল, তদ্রূপ পরকালেও সংসারাসক্ত লোকে দুনিয়ার নিকৃষ্ট পদার্থের কিছুই পাইবে না এবং তথায় যে সকল নি'আমত থাকিবে উহা তাহার স্বভাবের বিরোধী হইবে বলিয়া ঐ সকল নি'আমতই তাহার দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। পরকালে কেবল আত্মা ও আল্লাহ্র সৌন্দর্যের রাজ্য। আল্লাহ্র অসীম সৌন্দর্য সেখানে প্রকাশ পাইবে। পরকালে যাইবার পূর্বেই এই পৃথিবী হইতে যে-ব্যক্তি স্বীয় স্বভাবকে তথাকার উপযুক্ত ও অনুযায়ী করিয়া লইতে পারে সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী। সকল রিয়াযত, ইবাদত ও মা'রিফাতের উদ্দেশ্যই হইল স্বভাবকে পরকালের উপযুক্ত করিয়া তোলা। পরকালের প্রতি আসক্তি জন্মিলেই বুঝা যায় যে, মানব-প্রকৃতি পরকালের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এই অর্থেই আল্লাহ্র বলেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا – অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে সে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যশালী হইয়াছে।" অপর দিকে দুনিয়ার যাবতীয় পাপ, কুপ্রবৃত্তি ও দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, স্বভাব পরকারের উপযোগী হয় নাই। এই মর্মে আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا – অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে অপবিত্র করিয়াছে সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছে।"

আরিফগণ উপরিউক্তি বিষয় এমন সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান যে, তাঁহাদিগকে উহা মানিয়া লইবার জন্য শুধু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করার প্রয়োজন হয় না। এই বিষয়ে তাঁহারা নবীগণের ন্যায় ধ্রুবজ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। বরং এই দ্রুবজ্ঞানের ফলে নবীগণের বিশ্বস্ততা মু'জিযা ব্যতীতই তাঁহারা অকাট্যরূপে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন। কারণ, অভিজ্ঞ চিকিৎসক অপর খাঁটি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দেখিয়াই ব্যবস্থা-দাতাকে যথার্থ চিকিৎসক বলিয়া বুঝিতে পারে এবং কোন অনভিজ্ঞ দোকানদার চিকিৎসকের কথা শুনিয়াই তাহাকে মূর্খ বলিয়া বুঝিয়া লয়। তদ্রূপ ধ্রুবজ্ঞান দ্বারা আরিফ লোক কে খাঁটি

নবী আর কে জাল নবী বুঝিতে পারেন। আর আরিফ লোক নিজ দর্শন-ক্ষমতালব্ধ ধ্রুবজ্ঞানে যাহা জানিতে পারেন নবীগণের মুখেও তাহাই শুনিতে পান। এই প্রকার জ্ঞান নিতান্ত সুদৃঢ় হইয়া থাকে। লাঠিকে সর্প হইতে দেখিয়া অর্থাৎ নবীগণের মু'জিযা দর্শনে যে জ্ঞান জন্মে উহা তদ্রূপ নহে। কারণ, মু'জিযালব্ধ জ্ঞান গোবৎসের হাম্বা রবে বিনাশ পাইতে পারে; কেননা যাদু ও মু'জিযার পার্থক্য বুঝা সহজ নহে।

আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতের নির্দশন– মহব্বত একটি অমূল্য রত্নসদৃশ অনুপম পদার্থ এবং মহব্বতের দাবী করা সহজ নহে। মহব্বতের কতকগুলি নিদর্শন আছে। এইগুলি নিজের মধ্যে আছে কিনা তালাশ না করিয়া নিজকে আল্লাহ-প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা কাহারও উচিত নহে। মহব্বতের সাতটি নির্দর্শন আছে।

প্রথম নিদর্শন– মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্ট না থাকা। কারণ, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে দেখিবার অভিলাষী না হইয়া থাকিতে পারে না। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দর্শন ভালবাসে আল্লাহ্ও তাহাকে দেখিতে ভালবাসেন।" হযরত আবুল আলী (র) এক সংসারবিরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি কি মৃত্যুকে ভালবাস?" সেই ব্যক্তি উত্তর দিতে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন–"তুমি অকপট হইলে মৃত্যুকে ভালবাসিবে।" পরকালের পাথেয় অদ্যাবধি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে অধিক পরমাণে সংগ্রহ করিয়া লইতে অবসর পাইবেন, এই উদ্দেশ্যে আসল মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে না করিয়া শীঘ্র মরাকে অপছন্দ করা আল্লাহ-প্রেমিকের পক্ষে জায়েয আছে। এই শ্রেণীর লোকের নিদর্শন এই যে, তাঁহারা সর্বদা আখিরাতের সম্বল সংগ্রহে লাগিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় নিদর্শন– আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিজের প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করা। আর যে-বস্তু আল্লাহ্র সহিত নিজের সান্নিধ্য ঘটাইতে পারে তাহা ত্যাগ না করা এবং যাহা আল্লাহ হইতে দূরবর্তী করিয়া দেয় তাহা হইতে দূরে থাকা। যিনি সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্কে ভালবাসেন তাঁহার অবস্থাই এইরূপ হইয়া থাকে; যেমন রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্কে ভালবাসে তেমন লোক যদি কেহ দেখিতে চায় তবে যেন সে হুযায়ফার মুক্ত গোলাম সালিমকে দেখে।" কাহারও দ্বারা পাপকার্য

ঘটিলেই প্রমাণিত হয় না যে, তাহার হৃদয়ে আল্লাহ্র মহব্বত নাই; বরং সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসে না ইহা তাহারই প্রমাণ। আমাদের এই উক্তির পক্ষে প্রমাণ এই যে, নু'মান নামক এক ব্যক্তিকে শরাব পানের অপরাধে কয়েক বার শাস্তি দেওয়া হইলে এক সাহাবী (র) তাহার উপর লা'নত করিলেন। ইহাতে রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন–"লা'নত করিও না, কারণ সে আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভালবাসে।" হযরত ফুযায়ল (র) এক ব্যক্তিকে বলিলেন–"লোকে যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন–'তুমি আল্লাহ্কে ভালবাস কি?' তবে চুপ থাক। কারণ, যদি বল–ভালবাসি না, তবে তোমাকে কাফির হইতে হইবে। আর যদি বল–ভালবাসি, তবে তোমার কার্যকলাপ আল্লাহ্র বন্ধুগণের কার্যকলাপের তুল্য হইবে না।"

তৃতীয় নিদর্শন– আল্লাহ্র যিকির সর্বদা হৃদয়ে সজীব থাকা এবং তাঁহার সহিত মিলনের জন্য অনায়াসে উদ্গ্রীব হইয়া থাকা। কারণ, লোকে যাহাকে ভালবাসে তাহাকে অধিক স্মরণ করিয়া থাকে। ভালবাসা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে নিমিষের তরেও প্রিয় পদার্থকে ভুলিতে পারা যায় না। চেষ্টাচরিত্র করিয়া মনকে আল্লাহ্র স্মরণে লাগাইতে হইলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র মহব্বত তাহার হৃদয়ে প্রবল নহে; বরং যে-পদার্থের মহব্বত তাহার হৃদয়ে প্রবল ইহাই তাহার প্রিয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র মহব্বত স্থাপন করিতে চায় তবে বলা যাইবে যে, আল্লাহ্র মহব্বতের প্রতি আকর্ষণ তাহার হৃদয়ে প্রবল। কারণ, মহব্বত এবং মহব্বতের প্রতি আকর্ষণ এক নহে।

চতুর্থ নির্দশন– কুরআন শরীফকে আল্লাহ্র কালাম বলিয়া ভালবাসা এবং রাসূল ও আল্লাহ্র সহিত সম্পর্কিত সকল পদার্থকে ভালবাসা। এই ভালবাসা প্রবল হইয়া উঠিলে আল্লাহ্র বান্দা বলিয়া সকল বিশ্বাসীর প্রতি এবং তাঁহার সৃষ্ট বলিয়া সকল পদার্থের প্রতি ভালবাসা জন্মে। কারণ, লোকে যাহাকে ভালবাসে তাহার রচনা এবং পত্রও ভাল লাগে।

পঞ্চম নির্দশন–নির্জনতা ও মুনাজাতের প্রতি আসক্তি এবং রজনী আগমনের প্রতীক্ষায় থাকা। কেননা, রজনী আগমনে দিবসে কর্মব্যস্ততা ও সমস্ত বাধাবিঘ্ন ঘুচিয়া যায় এবং তখন নির্জনে বন্ধুর নিকট আত্মনিবেদনের সুযোগ ঘটে। যে-ব্যক্তি সময়ে-অসময়ে নিদ্রা যায়, অনর্থক কথাবার্তায় সময় কাটায় এবং নির্জনবাস অপেক্ষা জনতা ভালবাসে, আল্লাহ্র প্রতি তাহার ভালবাসা থাকিলেও ইহা নিতান্ত কাঁচা। হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের উপর ওহী

নাযিল হইল–"হে দাঊদ, মানুষের সহিত ভালবাসা পাতাইও না। কারণ, দুই প্রকার লোক আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত থাকে– (১) যে-ব্যক্তি সওয়াব শীঘ্র পাইতে চায় এবং বিলম্বে পাইলে কার্যে শিথিল হইয়া পড়ে; (২) যে-ব্যক্তি আমাকে ভুলিয়া নিজ খেয়ালে ডুবিয়া থাকে। এইরূপ লোক যে আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত ইহার নিদর্শন এই, আমি তদ্রূপ লোককে তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেই এবং দুনিয়াতে তাহাকে ব্যস্ত রাখি।" যাহা হউক, আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ মহব্বত হইলে আল্লাহ ব্যতীত সকল পদার্থের মহব্বত একেবারে লোপ পায়।

বানী ইসরাঈল বংশের এক আবিদ রাত্রি জাগরণ করিয়া ইবাদত করিতেন। অনতিদূরে এক বৃক্ষের উপর একটি পক্ষী সুমিষ্ট গান গাহিল শুনিয়া তিনি সেই বৃক্ষের নিচে গিয়া নামাযে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তৎকালীন নবীর (আ) উপর ওহী অবতীর্ণ হইল–"ঐ আবিদকে জানাইয়া দাও, পক্ষীর মিষ্ট স্বর সে ভালবাসিয়াছে বলিয়া তাহার মর্যাদার এক দরজা কমিয়া গেল। তৎপর কোন আমল দ্বারাই সে সেই দরজা লাভ করিবে না।" আল্লাহ্-প্রেমিকগণের কতক লোক এমনও ছিলেন যে, তাঁহারা গৃহের এক কোণে অবস্থানকালে অপর কোণে আগুন লাগিয়া গেলেও তাঁহারা টের পাইতেন না। এক বুযুর্গের এক পায়ে রোগ ছিল। তিনি নামাযে প্রবৃত্ত হইলে পা খানি কাটিয়া ফেলা হইল; অথচ তিনি টেরও পান নাই। হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের উপর ওহী নাযিল হইল–"হে দাঊদ, যে-ব্যক্তি আমার ভালবাসার দাবী করে, অথচ সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করে, সে মিথ্যাবাদী। বন্ধু কি বন্ধুর নিদর্শন চায় না? আমাকে যে অন্বেষণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি।" হযরত মূসা আলায়হিস সালাম নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্ তুমি কোথায় আছ, আমি তোমাকে অন্বেষণ করিতে চাই।" উত্তর হইল–"হে মূসা, তুমি যখন আমাকে অন্বেষণের ইচ্ছা করিয়াছ তখনই আমাকে পাইয়া ফেলিয়াছ।"

ষষ্ঠ নিদর্শন–আল্লাহ-প্রেমিকের নিকট ইবাদত সহজসাধ্য হয়, ভারী বোধ হয় না। এক আবিদ বলেন–"আমি মৃত্যু-যন্ত্রণাতুল্য কষ্ট ভোগ করিয়া ত্রিশ বৎসর তাহাজ্জুদের নামায পড়িয়াছি, ইহার ফলে পরবর্তী ত্রিশ বৎসর সেই নামাযে আনন্দ পাইয়াছি।" আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত পরিপক্ব হইলে ইবাদতে যে-আনন্দ পাওয়া যায় তত আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ইবাদত কষ্টকর হইবে কিরূপে?

সপ্তম নিদর্শন– আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ সমস্ত বান্দার প্রতি আল্লাহ-প্রেমিকের ভালবাসা ও দয়া থাকে; কিন্তু কাফির ও পাপীদের প্রতি আল্লাহ্‌র নাফরমান বলিয়া স্বাভাবিক ঘৃণা থাকে; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ –

অর্থাৎ (মুসলমানগণ) কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠিন। (কিন্তু) তাহারা পরস্পর নিতান্ত দয়ালু।" এক নবী (আ) নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্, কোন ব্যক্তি তোমার প্রেমিক?" উত্তর হইল–"শিশু যেমন মাতার জন্য পাগল সেইরূপ যে-ব্যক্তি আমার জন্য পাগল থাকে, পক্ষী যেমন স্বীয় বাসায় আশ্রয় লয় তদ্রূপ যে-ব্যক্তি আমার যিকিরে আশ্রয় লয় এবং ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন কাহাকেও ভয় করে না তদ্রূপ যে-ব্যক্তি অপরকে কোন পাপ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হয়, এমন লোকই আমার প্রেমিক।"

আল্লাহ্-প্রেমিকের এই সাতটি এবং এই প্রকার আরও বহু নিদর্শন আছে। যাহার মহব্বত পরিপক্ক হইয়াছে তাঁহার মধ্যে সকল নিদর্শনই পাওয়া যায়। যাহার মধ্যে সকল নির্দশন দেখা যায় না তাহার মহব্বত পরিপক্ক হয় নাই।

অনুরাগ

আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত হইতে পারে না বলিয়া যাহারা অস্বীকার করে তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত মিলিবার এবং তাঁহাকে পাইবার অনুরাগেও অবিশ্বাসী; অথচ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুনাজাতে অনুরাগের উল্লেখ আছে। তিনি বলেন ঃ

أَسْئَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার নিকট তোমার সাক্ষাতের অনুরাগ প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার উদার মুখশ্রী দর্শনের সুখাস্বাদ লাভের প্রার্থনা জানাইতেছি।" হযরত (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ বলিয়াছেন–"নেককার লোকের আমাকে দেখিবার যেমন প্রবল অনুরাগ আছে, তাহাদিগকে দেখিবার আমার তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ আছে।"

অনুরাগের মর্ম– এখন শওক বা অনুরাগের মর্ম জানা আবশ্যক। লোকে যাহাকে মোটেই চিনে না তাহার প্রতি মনের টান হওয়া অসম্ভব। আবার জানা-বস্তু সম্মুখে থাকিলে এবং নয়ন ভরিয়া দেখিতে থাকিলেও তৎপ্রতি অনুরাগ থাকে না। যাহাকে জানা গিয়াছে বলিয়া এক হিসাবে প্রেমিকের মানস-চক্ষের সম্মুখে আছে, কিন্তু চাক্ষুষভাবে দেখা যাইতেছে না বলিয়া বর্তমানে নাই, তাহাকে পাওয়ার আশা-উদ্দীপনা মনে স্বতই জাগ্রত থাকে। প্রেমাস্পদের সহিত পূর্ণ মিলনের অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা লইয়া নিরন্তর তাহার অন্বেষণে থাকাকে অনুরাগ বলে। ইহাতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র সহিত মিলনের জন্য অনুরক্ত হইলেও দুনিয়াতে তাঁহার মিলন ঘটে না। কারণ, জ্ঞান-চক্ষের সম্মুখে ত তিনি বিরাজমান; কিন্তু চর্মচক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না। পূর্ণ মিলন যেমন এখন পর্যন্ত অপূর্ণ আশামাত্র, পূর্ণ দর্শনও তদ্রূপ জ্ঞানলব্ধ বিষয়মাত্র। মৃত্যু ব্যতীত এই অনুরাগ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

আবার, এক শ্রেণীর অনুরাগ পরকালেও অতৃপ্ত থাকিবে। কেননা আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান দুই কারণে এ জগতে অপূর্ণ থাকে। প্রথম, পরিচয়-জ্ঞান সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরাল হইতে দর্শনতুল্য অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ঊষার অন্ধকারে দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট। পরকালে এই পরিচয়-জ্ঞানও নিতান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং অনুরাগও পরিতৃপ্ত হইবে। দ্বিতীয়, এক ব্যক্তি কাহারও প্রতি নিতান্ত আসক্ত। কিন্তু সে প্রেমাস্পদের কেবল মুখমন্ডল দর্শন করিয়াছে, তাহার কেশপাশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন করে নাই অথচ সে জানে যে, প্রেমাস্পদের আপাদমস্তক অপার সৌন্দর্যের আধার। এমতাবস্থায় তাহার পূর্ণ দর্শন লাভের একান্ত অনুরাগ প্রেমিকের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র চরম সৌন্দর্যের পরিসীমা নাই। এই সৌন্দর্যের যত অধিকই জানা হউক না কেন, যাহা অজ্ঞাত থাকে তাহা নিতান্ত অধিক। কারণ, আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞানের সীমা নাই। আল্লাহ সম্বন্ধে সব কিছু পরিজ্ঞাত না হইলে তাঁহাকে জানাও পরিসমাপ্ত হয় না। এই পরিসমাপ্তি মানবের পক্ষে ইহকালে বা পরকালে কোথায়ও সম্ভবপর নহে; কেননা মানবের জ্ঞান কখনও অপরিসীম হইতে পারে না। সুতরাং পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার যত অধিক হইবে আনন্দও তত অধিক বৃদ্ধি পাইবে। এই আনন্দও হইবে নিতান্ত অধিক। যাহা দৃষ্ট হইতেছে তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে প্রেমিক আনন্দে একেবারে বিভোর হইয়া যাইবে। ইহাকে বলে উন্‌ছ (প্রীতি)। আর এখন পর্যন্ত যাহা অলক্ষিত রহিয়াছে, তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে প্রেমিকের মন তাঁহাকে পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য নিতান্ত

উদগ্রীব হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে অনুরাগ। দুনিয়া বা আখিরাতে কোথাও উন্‌ছ ও অনুরাগের শেষ নাই। আল্লাহ্-প্রেমিকগণ আখিরাতেও সর্বদাই বলিতে থাকিবেন ঃ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا –

অর্থাৎ, "হে আমাদের প্রভু, আমাদের জন্য আমাদের নূর পরিপূর্ণ কর।" এখানে নূর বলার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের যাহা কিছু মানব নয়নে প্রকাশ পায় তাহার সমস্তই নূর, তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ-প্রেমিকগণ তাঁহার নূর দর্শনের অভিলাষী হইয়া থাকেন; কিন্তু সমস্ত দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না। কারণ, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই আল্লাহ্‌কে পূর্ণভাবে চিনে না এবং তাঁহাকে পূর্ণভাবে চিনিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাকে পূর্ণভাবে দেখিতেও পারে না। এইজন্যই অনুরাগবিশিষ্ট লোকের পক্ষে নব নব সৌন্দর্য দর্শনের পথ খুলিতে থাকিবে, তাহাদের ভাগ্যে দীদার বাড়িয়া চলিবে এবং তাহাদের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। 'বেহেশতে আনন্দের সীমা নাই'–ইহাই এই কথার প্রকৃত অর্থ। তদ্রূপ না হইলে এক রকমের আনন্দ বারবার ভোগ করিতে করিতে সুস্বাদের মাত্রা কমিয়া যাইত। কারণ, একই জিনিস পুনঃ পুনঃ ভোগ করত মন ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে উহাতে আর আনন্দ পাওয়া যায় না। তবে নিত্যনূতন জিনিস মিলিলে আনন্দ পাওয়া যায়। যাহা হউক, বেহেশতবাসিগণ প্রতিপদেই নিত্যনূতন আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। পরবর্তী আনন্দ পূর্বভোগ্য আনন্দ অপেক্ষা সর্বদাই উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া চলিবে। কারণ, অনুক্ষণ তাহাদের নি'আমত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

এ-পর্যন্ত অনুরাগ ও উন্‌ছের কথা বর্ণিত হইল। আর বুঝিয়া লও যে, আনন্দদায়ক পদার্থের যাহা সম্মুখে নাই তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট না করিয়া যাহা সম্মুখে উপস্থিত পাওয়া গিয়াছে তাহা দর্শনে বা উপভোগে মনের প্রসন্নতাময় পরিতৃপ্ত ভাবের নাম উন্‌ছ। অপর পক্ষে আনন্দদায়ক পদার্থের যাহা এখনও পাওয়া যায় নাই তাহার দিকে মনের যে প্রবল টান থাকে তাহাকে অনুরাগ বলে। সুতরাং ইহপরকালে আল্লাহ্‌র সকল প্রেমিকই উন্‌ছ ও অনুরাগের ডোরেই আবদ্ধ থাকেন।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামকে সম্বোধন করিয়া বলেন–"হে দাঊদ, জগতবাসীকে আমার পক্ষ হইতে জানাইয়া দাও–যে-ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে আমি তাহাকে ভালবাসি। যে-ব্যক্তি নির্জনে আমার সহিত

উপবেশন করে আমি তাহার সঙ্গী। যে-ব্যক্তি আমার স্মরণে প্রীতি লাভ করে আমি তাহার প্রিয়। যে-ব্যক্তি আমার সাথী, আমি তাহার সঙ্গী। যে-ব্যক্তি অপরের মধ্য হইতে আমাকে বাছিয়া লয় আমি তাহাকে বাছিয়া লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করি। যে-ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করে আমি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। যে-ব্যক্তি আমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে আমি তাহাকে অবশ্যই অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি। যে-ব্যক্তি আমাকে অন্বেষণ করে সে অবশ্যই আমাকে পায় এবং যে অপরকে অন্বেষণ করে সে আমাকে পায় না। হে দুনিয়াবাসী, যে-কার্য লইয়া তোমরা মুগ্ধ হইয়াছ তাহার অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া দেখ। আমার সঙ্গ লাভ করিতে, আমার সহিত নির্জনে উপবেশ করিতে এবং আমার সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে মনোযোগী হও–আমিও তোমার সহিত প্রীতি স্থাপন করিব। আমার প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম (আ) আমার অভিপ্রায়ের মর্মজ্ঞ মূসা (আ) ও আমার নির্বাচিত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রকৃতি ও স্বভাব দিয়া আমি আমার প্রিয় বন্ধুগণের প্রকৃতি ও স্বভাব গঠন করিয়াছি। আমার প্রতি অনুরাগী লোকদের হৃদয় আমার নূর দ্বারা গঠন করিয়াছি এবং স্বীয় প্রতাপ প্রয়োগে উহা বর্ধন করিয়া থাকি।"

অপর এক নবীর (আ) প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইল–"আমার বান্দাগণের মধ্যে যে আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসি। যে-ব্যক্তি আমার আশাধারী, আমি তাহার প্রত্যাশী। যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে স্মরণ করি। যাহার দৃষ্টি আমার উপর থাকে, আমার দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে। তুমি যদি তাহাদের পথ অবলম্বন কর তোমাকেও আমি ভালবাসিব; কিন্তু যদি তাহাদের পথ পরিত্যাগ কর তবে তোমাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিব।"

মহব্বত, অনুরাগ (শওক) উন্‌ছ সম্বন্ধে এবংবিধ বহু হাদীস বর্ণিত আছে। এ-স্থলে যে-সকল হাদীস উদ্ধৃত হইল উহাই যথেষ্ট মনে করি।

সন্তোষ (রেযা)

আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্ট থাকা একটি অতি উচ্চ মকাম। ইহা অপেক্ষা উচ্চ মকাম আর নাই। কারণ মহব্বত একটি অতি শ্রেষ্ঠ মকাম এবং আল্লাহ্ যাহা করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা মহব্বতের ফল। কিন্তু যেমন—তেমন মহব্বত এই উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে না, বরং ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি একমাত্র চরম মহব্বতেরই

ফল। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর এক অতি বড় দরগাহ।" একবার তিনি এক কওমের লোককে তাহাদের ঈমানের নির্দশন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), আমরা বিপদে সবর করি, সম্পদে শোকর করি এবং আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্ট থাকি।" তখন তিনি বলিলেন–"এই কওমের লোক পরিপক্ব জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ আলিম। পূর্ণ জ্ঞানের কারণে তাহাদের মর্যাদা নবীগণের মর্যাদার নিকটবর্তী।" তিনি অন্যত্র বলেন–"কিয়ামত দিবস আমার উম্মতের কতক লোককে আল্লাহ্ তা'আলা পক্ষীর ন্যায় ডানা প্রদান করিবেন। তাহারা উড়িয়া বেহেশতে চলিয়া যাইবে। ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে–'তোমাদের পাপপুণ্যের হিসাব হইয়াছে কি? দাঁড়ীপাল্লাতে তোমাদে পাপপুণ্যের ওযন হইয়াছে কি?' এবং তোমরা পুলসিরাতের উপর দিয়া পার হইয়া আসিয়াছ কি?' তাহারা বলিবে–'আমরা ত এই সমস্তের কিছুই দেখিও নাই।" ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবে' তোমরা কী?' তাহারা বলিবে–'আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লামের উম্মত।' ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবে– "তোমার কি কাজ করিয়াছ যে, এমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলে?' তাহারা বলিবে–'আমাদের দুইটি অভ্যাস ছিল–(১) আল্লাহ্‌কে লজ্জা করিয়া নির্জনেও আমরা পাপ করিতাম না এবং (২) আল্লাহ আমাদিগকে সামান্য জীবিকা দিলেও আমরা উহাতে সন্তুষ্ট থাকিতাম।" ফিরিশ্‌তাগণ বলিবে– 'কেন হইবে না? এই শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদেরই প্রাপ্য।"

হযরত মূসা আলায়হিস সালামের নিকট কতক লোকে নিবেদন করিলেন– 'আপনি আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করুন, কিসে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় যেন আমরা তদনুরূপ আমল করিতে পারি।" ওহী আসিল–"তোমরা আমার কার্যে সন্তুষ্ট থাক; যাহা হইলে আমিও তোমাদরে উপর সন্তুষ্ট থাকিব।" হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের উপর আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন–"সাংসারিক দুশ্চিন্তায় আমার বন্ধুগণের কোন লাভ নাই বরং সাংসারিক দুশ্চিন্তা তাহাদের অন্তর হইতে মুনাজাতের মাধুর্য দূর করে। হে দাঊদ, আমি আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে ইহাই পছন্দ করি যে, তাহারা যেন রূহানী হইয়া থাকে অর্থাৎ পারলৌকিক ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে, সংসারের কোন চিন্তা না করে এবং সংসারে যেন মন না লাগায়।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ বলেন–"আমি এমন আল্লাহ যে আমা ব্যতীত কোন আল্লাহ্ নাই। যে-ব্যক্তি আমার প্রদত্ত বিপদে সবর ও সম্পদে শোকর না করিবে সে আমার বিধানে সন্তুষ্ট থাকিবে না। তাহাকে অন্য আল্লাহ্‌র অনুসন্ধান করিতে বলিয়া দিন।" তিনি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন–"আমি তকদীর অর্থাৎ ভাগ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি এবং তদবীর অর্থাৎ উপায়ও স্থির করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার সৃষ্টিকে অটল করিয়া দিয়াছি; আর যাহা কিছু হইবে সকলই বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যে-ব্যক্তি উহাতে সন্তুষ্ট থাকে আমিও তৎপ্রতি সন্তুষ্ট থাকি; আর যে অসন্তুষ্ট হয়, আমি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হই। আমার সেই ক্রোধ সে দেখিতে পাইবে।" তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন–"আমি মঙ্গল ও অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছি। মঙ্গলের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং মঙ্গল লাভ করা যাহার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী। আর যাহাকে অমঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং অমঙ্গল যাহার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি সেই ব্যক্তিই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত। যে-ব্যক্তি ইহাতে তর্কবিতর্ক করে তাহার জন্য আফসোস।" এক নবী আলায়হিস সালাম বিশ বৎসর যাবত দরিদ্রতার পীড়নে, অন্ন-বস্ত্রের কষ্টে এবং নানারূপ মসীবত ও দুঃখ-যন্ত্রণায় জর্জরিত ছিলেন। অথচ তাঁহার দু'আ আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইতেছিল না। অবশেষে ওহী অবতীর্ণ হইল–'আসমান-যমীন পয়দা করিবার পূর্বে তোমার অদৃষ্টে ইহাই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কি চাও, তোমার জন্য আমি আসমান-যমীন ও সমস্ত বিশ্বরাজ্য আবার নূতনভাবে পয়দা করি এবং আমি যাহা বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহার পরিবর্তন করিয়া ফেলি যাহাতে তুমি যাহা চাও তাহাই সংঘটিত হয়? আর তোমার ইচ্ছানুরূপ কাজ হউক এবং আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ না হউক? আমি নিজ গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার অন্তরে পুনরায় ঐরূপ চিন্তার উদয় হইলে তোমার নাম পয়গম্বরগণের তালিকা হইতে কাটিয়া দিব।"

হযরত আনাস (রা) বলেন–"আমি পূর্ণ বিশ বৎসর রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমত করিয়াছি। (এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) আমি যাহা করিয়াছি তজ্জন্য তিনি আমাকে তখনও এই কথা বলেন নাই যে, 'তুমি ইহা কেন করিলে?' আর যাহা করি নাই তজ্জন্যও তিনি কখনও বলেন নাই যে, 'তুমি ইহা কেন কর নাই?' বরং অপর কেহ (ঐ বিষয় লইয়া) আমার

সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলে তিনি বলিতেন, আল্লাহ্র বিধানে অন্যরূপ বিধিবদ্ধ হইলে তদ্রূপই হইত।" হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল—"হে দাঊদ, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমি কিন্তু অন্যরূপ ইচ্ছা করি। আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই হইবে। তুমি আমার ইচ্ছাতে সন্তুষ্ট থাকিলে তুমি যাহা চাও তাহাও দিব। কিন্তু অসন্তুষ্ট হইলে তোমার আকাঙ্ক্ষাতে তোমাকে দুঃখিত করিয়া রাখিব; আর কাজ ত আমার ইচ্ছানুরূপই হবে।" হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন—"আল্লাহ্র বিধানে যাহা নির্ধারিত আছে তাহা যেরূপই হউক না কেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি।" এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি পাইতে চাহেন?" তিনি বিললেন —"যাহা আল্লাহ্র বিধানে নির্ধারিত আছে তাহাই চাই।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন—"যাহা হয় নাই তাহা হইলে বড় ভাল হইত এবং যাহা হইয়াছে তাহা না হইলে উত্তম হইত' এরূপ বলা অপেক্ষা অগ্নি উদরস্থ করা আমি অধিক পছন্দ করি।" বানী ইসরাঈল বংশের এক বড় আবিদ বহু বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে ইবাদত করিতে ছিলেন। একদা তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিতেছেন—'অমুক মহিলা বেহেশতে তোমার সঙ্গিনী হইবে।" আবিদ সেই মহিলার ইবাদত জানিবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেই মহিলা শরীয়ত নির্ধারিত অতীব আবশ্যক ইবাদত ব্যতীত রাত্রি জাগিয়া নামায পড়িতেন না বরং নফল রোযাও রাখিতেন না। আবিদ মহিলাকে তাঁহার কার্যকলাপ জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহিলা বলিলেন—"আপনি যাহা দেখিলেন তাহা ব্যতীত আমার অপর কোন ইবাদত নাই।' আবিদ বহু অনুরোধ করিলে তিনি চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আমার একটা অভ্যাস আছে। আমি রোগে ও বিপদে নিপতিত হইলে নিরাময় হইতে ও আরাম পাইতে চাই না। রৌদ্রে পড়িলে ছায়া পাইতে চাই না এবং ছায়াতে থাকিলেও রৌদ্রের আশা করি না। আল্লাহ আমার অদৃষ্টে যে-ব্যবস্থা করেন তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকি।" আবিদ স্বীয় মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন—"ইহা সামান্য অভ্যাস নহে; অতি শ্রেষ্ঠ অভ্যাস।

সন্তোষের পরিচয়— কেহ কেহ বলেন বিপদাপদে ও অভিলাষের বিপরীত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব; তবে উহাতে সবর করা যাইতে পারে। তাঁহাদের এই ধারণা ভুল। মহব্বত প্রবল হইলে অভিলাষের বিপরীত বিষয়ে দুই কারণে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব।

প্রথম কারণ— মহব্বত নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠলে মানব যখন একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া প্রিয়জনের খেয়ালে নিমজ্জিত থাকে তখন শারীরিক কষ্ট ও বেদনা অনুভূত হয় না। রণক্ষেত্রে বীরপুরুষ যুদ্ধ জয়ের আশায় বিপক্ষকে যখন হত্যা করিতে ধাবিত হয় তখন অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইলেও স্বীয় দেহে রক্ত না দেখা পর্যন্ত সে বেদনা অনুভব করে না। লোভনীয় বস্তু পাওয়ার আশায় দৌড়াইবার সময়ে পায়ে কাটা বিঁধিলে মানুষ টেরও পায় না। ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া চলিবার কালে লোকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া যায়। সাধারণ মানুষের প্রতি মহব্বত এবং দুনিয়ার লোভে ইহা সম্ভব হইলে আল্লাহ্র মহব্বতে এবং পরকালের সৌভাগ্য-লোভে ইহা অসম্ভব হইবে কেন? ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বাহ্যসৌন্দর্য অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। কারণ যাহা আকৃতি চর্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই তাহা দ্বারা অশ্বকেও সুশোভিত করা হইয়াছে। যে-অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বুঝা যায়, তাহা চর্মচক্ষু অপেক্ষা বহুগুণে অধিক উজ্জ্বল। কেননা, চর্মচক্ষু অধিকাংশ সময়ে ভুল দেখে; ইহা কখন বড় জিনিসকে ছোট, আবার কখন দূরকে নিকট বলিয়া দেখিতে পায়।

দ্বিতীয় কারণ— দুঃখ-কষ্ট ত অনুভূত হয়, কিন্তু প্রিয়তমের প্রদত্ত বলিয়া সন্তোষের সহিত সহ্য করা হয়। প্রিয়জন প্রেমিকের দেহ হইতে রক্ত বাহির করিতে বা তিক্ত ঔষধ সেবক করিতে আদেশ দিলে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহার কষ্টও সে সন্তোষের সহিত বরণ করিয়া লয়। তদ্রূপ যদি বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র আদেশে সন্তুষ্ট থাকিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন তবে তাঁহার প্রদত্ত দরিদ্রতা, রোগ-শোক, কষ্ট, বিপদাপদে বান্দা সন্তুষ্ট থাকিবে। দুনিয়াদার লোভী ব্যক্তি যেমন বাণিজ্যার্থ দেশ পর্যটনের পরিশ্রম, সমুদ্র-যাত্রার ভয় এবং আরও বহুবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা সন্তোষের সহিত সহ্য করে পারলৌকিক সৌভাগ্য-লোভী ব্যক্তিও তদ্রূপ কষ্ট সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকে।

সন্তোষের দৃষ্টান্ত ও বুযুর্গগণের উক্তি — বহু আল্লাহ্-প্রেমিক সন্তোষের উচ্চ মরতবা লাভে ধন্য হইয়াছে। হযরত ফতেহ্ মুসেলীর (র) স্ত্রীর নখ নিষ্পেষিত হইয়া খসিয়া গেল, অথচ সেই অবস্থায়ও তিনি হাসিতেছিলেন। হযরত ফতেহ্ মুসেলী (র) জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, ইহাতে কি তুমি বেদনা অনুভব করিতেছ না" তিনি বলিলেন—"সওয়াবের আনন্দে আমার মন এত উৎফুল্ল হইয়াছে যে,

বেদনা ভুলিয়া গিয়াছি।” হযরত সহল তস্তরীর (র) দেহে ব্যথা ছিল। তিনি ইহার চিকিৎসা করিতেন না। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–“বুন্ধগণ, তোমরা কি জান না যে বন্ধুর প্রদত্ত জখমে বেদনা নাই?” হযরত জুনায়দ (র) বলেন–“আমি হযরত সররি সকতিকে (র) জিজ্ঞাসা করিলাম–“আল্লাহ্-প্রেমিক কি বিপদে দুঃখিত হন?” তিনি বলিলেন–‘না।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম– ‘যদি তাহাকে তলওয়ার দ্বারা আঘাত করা হয়?’ তিনি বলিলেন–এক আঘাত কেন, সত্তর আঘাত করিলেও প্রেমিক দুঃখিত হয় না।” এক আল্লাহ্-প্রেমিক বলেন–“আল্লাহ্ যাহা ভালবাসেন আমিও তাহাই ভালবাসি। আল্লাহ আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করিতে চাহিলেও আমি সন্তুষ্ট আছি এবং তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে দোযখই আমি পছন্দ করিব।

হযরত বিশ্‌রে হাফী (র) বলেন–“বাগদাদে এক ব্যক্তিকে এক হাজার বার লাঠি দ্বারা আঘাত করা হইয়াছিল, তথাপি তিনি ‘ওহ’ শব্দটি পর্যন্ত বলেন নাই। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম–‘ওহে তুমি একটি কথাও বলিলে না কেন?’ সেই ব্যক্তি বলিতে লাগিল–‘আমার প্রিয়তম আমার সম্মুখে থাকিয়া দেখিতেছিলেন।” আমি বলিলাম–‘তুমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে কি করিয়া?’ ইহা শুনামাত্র সেই ব্যক্তি এক চিৎকার দিয়া মরিয়া গেল।” হযরত বিশ্‌রে হাফী (র) অন্যত্র বলেন–“মুরীদ হওয়ার প্রথম ভাগে আমি আবাদান নগরে যাইতেছিলাম। দেখিতে পাইলাম, এক উন্মত্ত কুষ্ঠরোগী ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। পিপীলিকা তাহার দেহের মাংস খাইতে ছিল। দয়ার্দ্র হইয়া আমি তাহার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে লইলাম। কিন্তু চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ ‘এ কেমন বেহুদা কাজ! আমার ও আমার প্রভুর মধ্যে অন্যের অধিকার চর্চা।

কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামকে যেই সকল মহিলা দর্শন করিয়াছিলেন তাহারা তাঁহার রূপ-লাবণ্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের হস্তাঙ্গুলী কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ তাঁহারা উহা টেরও পান নাই। সেইকালে মিসর দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। লোকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলে হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামকে দেখিতে যাইত এবং তাহার রূপমাধুরী দর্শনে মোহিত হইয়া ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া যাইত। আল্লাহ্‌র একজন সৃষ্ট মানবের এরূপ প্রভাব।

এমতাবস্থায় যাহার অদৃষ্টে আল্লাহ্‌র অনন্ত সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে সেই ব্যক্তি বিপদাপদের কষ্ট ভুলিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

জনৈক ব্যক্তি এক অরণ্যে বাস করিতেন। আল্লাহ্ যাহা করেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন–“ইহাতেই মঙ্গল রহিয়াছে।” তাঁহার একটি কুকুর ছিল, সে প্রভুর দ্রব্যসামগ্রী পাহারা দিত। একটি গর্দভ ছিল, সে প্রভুর দ্রব্যজাত বহন করিত; একটি মোরগ ছিল, সে রজনী প্রভাতের সংবাদ দিত। ইতিমধ্যে এক ব্যাঘ্র আসিয়া গর্দভটি মারিয়া ফেলিল। সেই ব্যক্তি বলিলেন–“ইহাতেই মঙ্গল আছে।” তৎপর কুকুর মোরগটিকে হত্যা করিল। সেই ব্যক্তি বলিলেন–“ইহাতেই মঙ্গল রহিয়াছে।” অবশেষে সেই কুকুরটিও মরিয়া গেল। গৃহস্বামী এবারও বলিলেন–“ইহাতেও মঙ্গল আছে।” তাঁহার পরিবার লোকজন বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল–“যত দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন, তুমি বল–ইহাতেই মঙ্গল আছে।’ এ আবার কেমন কথা? এই কয়েকটি প্রাণী আমাদের হস্তপদের কাজ করিত। সবই ধ্বংস হইল।” সেই ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন–“ইহাতেই মঙ্গল আছে।” প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, দস্যুদল তাঁহাদের পাড়া-প্রতিবেশী প্রত্যেককে হত্যা করিয়া ধন-সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই ব্যক্তির বাড়ি বৃক্ষের অন্তরালে ছিল। কুকুর ও মোরগের কোন শব্দ না পাইয়া দস্যুদল সেই বাড়ির সন্ধান পায় নাই। সুতরাং পরিবারবর্গের ধন ও প্রাণ রক্ষা পাইল। তখন গৃহস্বামী তাঁহার পরিবার পরিজনকে বলিলেন–“তোমরা দেখিলে? কোন কার্যে মঙ্গল তাহা আল্লাহ্ই জানেন।”

হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম একদা এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অন্ধ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহের উভয় পার্শ্ব অবশ, হস্তপদ অকর্মণ্য ছিল; অথচ তিনি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিতেছিলেন–“হে আল্লাহ্, তুমি বহু লোককে যে-সকল বিপদাপদে নিপতিত রাখিয়াছ, তোমাকে ধন্যবাদ দেই যে, আমাকে উহা হইতে রক্ষা করিয়াছ।” হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–“এমন কোন বিপদ আছে যাহা হইতে আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন?” সেই ব্যক্তি বলিলেন– “আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে-জ্ঞান তিনি দয়া করিয়া আমার অন্তরে জন্মাইয়া দিয়াছেন ততটুকু জ্ঞান যাহার অন্তরে তিনি দান করেন নাই তাহা অপেক্ষা আমি নিরাপদে আছি।” হযরত ঈসা (আ) বলিলেন–“তুমি সত্য বলিয়াছ” এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন ও তাঁহার দেহে হস্ত বুলাইলেন।

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সকল পীড়া হইতে নিরোগ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেন। তিনি অবশিষ্ট জীবন হযরত ঈসার (আ) সহিত থাকিয়া ইবাদত করিতেন।

হযরত শিবলীকে (র) লোকে পাগল মনে করিয়া চিকিৎসালয়ে রাখিয়াছিল। কতক লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে?" তাহারা উত্তর দিল–"আপনার বন্ধু।" ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহাদের দিকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–"তোমরা আমার বন্ধু বলিয়া মিথ্যা দাবী করিতেছ। তোমরা আমার বন্ধু হইলে আমার প্রদত্ত দুঃখ প্রফুল্লচিত্তে সহ্য করিতে।"

সন্তোষ সম্বন্ধে ভুল ধারণা – (১) কোন কিছুর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ না করা, (২) অভাব মোচনের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট না চাওয়া, (৩) যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা, (৪) পাপ-কার্য আল্লাহ্‌র আদেশে হইতেছে বিবেচনায় ইহাকে মন্দ বলিয়া না জানা এবং (৫) যে-স্থানে পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে অথবা প্রবল মড়ক লাগিয়াছে তাহাও আল্লাহ্‌র বিধানে ঘটিতেছে মনে করিয়া তথা হইতে পলায়ন না করা–এই সকলকেই কেহ কেহ সন্তোষের শর্ত বলিয়া মনে করেন। অথচ এইরূপ ধারণা পোষণ করা ভুল। কারণ, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াস সাল্লামও দু'আ করিয়াছেন এবং অপর লোককেও দু'আ করিবার উৎসাহ দিয়া বলিয়াছেন–"দু'আ ইবাদতের মগজ।" বাস্তবপক্ষে দু'আর প্রভাব মানব মনে নম্রতা, দীনহীনতা, আল্লাহ্‌ নিকট অনুনয়-বিনয় ও আত্মানিবেদন ইত্যাদি সদগুণাবলীর সৃষ্টি হয়। পিপাসা নিবারণের জন্য পানি পান, ক্ষুধা দূর করিবার নিমিত্ত আহার, শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে শীতবস্ত্র পরিধান যেরূপ সন্তোষের বিরোধী নহে তদ্রূপ বিপদাপদ দূর হওয়ার জন্য দু'আ করাও সন্তোষের বিপরীত নহে। বরং আল্লাহ্‌ যে পদার্থকে যে-কার্যের কারণস্বরূপ সৃজন করিয়া উহা অবলম্বনের আদেশ দিয়াছেন সেই স্থলে উহা ব্যবহার না করাই সন্তোষের বিপরীত। তৎপর পাপকে মন্দ বলিয়া না জানা এবং পাপ-স্রোত দর্শনে তুষ্ট থাকা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কারণ পাপের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা নিষেধ। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি পাপের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে সে পাপের অংশ ভোগী হইবে।" তিনি অন্যত্র বলেন–"সুদূর পূর্বদেশে যদি কেহ কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা

করে এবং সুদূর পশ্চিম দেশের কোন অধিবাসীও এই হত্যা কার্যে সন্তুষ্ট থাকে তবে সে নরহত্যার সহযোগী।"

পাপ যদিও আল্লাহ্‌র বিধানচক্রের অন্তর্গত তথাপি ইহার দুইটা দিক আছে। একদিকে ইহা মানুষের দিকে সম্বন্ধে যুক্ত। ইহার অর্থ এই যে, পাপ করা না করার ক্ষমতা মানুষের আছে এবং পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করা মানুষের স্বাভাবিক গুণ; এই গুণ আল্লাহ্‌র গুণরাজির অন্তর্ভুক্ত। পাপের অপর দিক আল্লাহ্‌র দিকে প্রসারিত। কারণ, ইহা আল্লাহ্‌র বিধানে এবং তাঁহার বিধিবদ্ধ নিয়মে নির্বাহ হইয়া থাকে। আর তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ইহজগত কখনও পাপ এবং নাস্তিকতাশূন্য হইবে না। এই হিসাবে পাপ দেখিয়া সহ্য করিয়া যাওয়া আবশ্যক। অপর পক্ষে, পাপ করা, না করার ক্ষমতা মানুষের আছে এবং আল্লাহ্‌ পাপকে ঘৃণা করেন, এই দ্বিবিধ কারণে পাপের প্রতি মানুষের ঘৃণা থাকাও আবশ্যক।

আল্লাহ্‌র বিধান-শৃঙ্খলা দৃষ্টে পাপ সহ্য করা এবং মানুষের স্বাধীন ক্ষমতা দৃষ্টে পাপের প্রতি ঘৃণা করা সহজ দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও বিরুদ্ধ নহে। ইহা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তির শত্রু মরিয়া গেল; কিন্তু সে তাহার শত্রুরও শত্রু ছিল। এমতাবস্থায় সে দুঃখিতও হইবে এবং আনন্দিতও হইবে। শত্রু মরিয়াছে বলিয়া সে আনন্দিত হইবে এবং শত্রুর শত্রু মরিয়াছে বলিয়া দুঃখিত হইবে। একই কারণে আনন্দ ও দুঃখ হইলেই পরস্পর-বিরোধী হইত। এইরূপেই বুঝিয়া লও যে, যে-স্থলে পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তথা হইতে পলায়ন করা আবশ্যক; যেমন আল্লাহ্‌ বলেন

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্‌ আমাদিগকে এই গ্রাম হইতে বাহির কর; এ-স্থানের অধিবাসিগণ অত্যাচারী।" (সূরা নিসা, রুকূ ১০, পারা ৫।) কোন স্থানে পাপের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে পূর্বকালের বুযুর্গগণ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। কারণ, পাপের প্রভাব মানব-হৃদয়ে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করে। পাপের প্রভাব মানব-হৃদয়ে প্রবেশ না করিলেও ইহার বিপদাপদ পাপী ও নেককার সকলের উপরই নিপতিত হয়; যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً –

অর্থাৎ "পাপের বিপদ হইতে সভয়ে দূরে সরিয়া থাক; কারণ তোমাদের মধ্যে যাহারা পাপ করে কেবল তাহাদের উপরই বিপদ পতিত হইবে না।" (সূরা আনফাল, রুকূ ৩, পারা ৯।)

যে-স্থানে অবস্থান করিলে পরস্ত্রীর উপর দৃষ্টি পড়ে তথা হইতে সরিয়া যাওয়া আল্লাহ্র বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার বিপরীত নহে। এইরূপ, যে-নগরে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয় ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তথা হইতে বাহির হইয়া যাওয়া জায়েয আছে। কিন্তু যে-স্থানে মড়ক লাগে তথা হইতে পলায়ন করা নিষিদ্ধ। কারণ, সুস্থ লোক সেই স্থান হইতে পলাইয়া গেলে পীড়িত লোক সেবা-শুশ্রূষার অভাবে কষ্ট পাইয়া মারা পড়ে। তবে মড়ক ভিন্ন অন্য বিপদাপদ হইতে সরিয়া থাকা নিষিদ্ধ নহে। বরং আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী এই সকল বিপদাপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় অবলম্বন করা উচিত। উপায় অবলম্বনের পর যাহা ঘটে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক এবং মনে করা উচিত যে, ইহাতেই মঙ্গল নিহিত আছে।

দশম অধ্যায়

মৃত্যু-চিন্তা

মৃত্যু-চিন্তার ফযীলত– আমাদের পরিণাম মৃত্যু, কবর আমাদের বাসস্থান, মনকীর ও নকীর আমাদিগকে কবরে প্রশ্ন করিবে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী এবং পরিশেষে আমাদিগকে বেহেশতে বা দোযখে যাইতে হইবে, এই বিষয়গুলি যে ব্যক্তি উত্তমরূপে জানিয়া হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইয়াছে তাহার সামান্যমাত্র বুদ্ধি থাকিলেও সে মৃত্যু-চিন্তাই সবচেয়ে বেশী করিবে এবং আখিরাতের সম্বল সংগ্রহেই সর্বাদিক চেষ্টা করিবে; যেমন রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন –"যে-ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়াছে এবং পরকালের জন্য আমল করিয়াছে সে-ই বুদ্ধিমান।" যে-ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করে স্বভাবত সে পরকালের সম্বল সংগ্রহে লিপ্ত থাকিবে এবং মৃত্যুর পর কবরকে বেহেশতের বাগানসমূহের ন্যায় সর্বদা বাসন্তিক সৌন্দর্যে বিভূষিত একটি বাগানরূপে পাইবে। অপর পক্ষে, যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকিবে, সে দুনিয়াতে লিপ্ত হইয়া পরকারের পাথেয় সঞ্চয়ে উদাসীন থাকিবে এবং কবরকে দোযখের অগ্নিকুণ্ডসমূহের অন্যতম অগ্নিকুণ্ড রূপে পাইবে। এই জন্যই মৃত্যু-চিন্তার এত অধিক ফযীলত।

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"তোমরা সকল আনন্দ-বিনাশকারীর (অর্থাৎ মৃত্যুর) চিন্তা অধিক পরিমাণে কর।" তিনি বলিলেন–'তোমরা মৃত্যু অবস্থা যেরূপ জান, পশুপক্ষী যদি তদ্রূপ জানিত তবে কোন লোকের ভাগ্যে আর স্থূলকায় প্রাণীর গোশ্ত ভক্ষণ ঘটিত না।" অর্থাৎ মৃত্যু-চিন্তায় ইহারা মোটা-তাজা হইতে পারিত না। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, শহীদদের মরতবা কি কেহ পাইত পারে?" তিনি বলিলেন–"হাঁ, যে-ব্যক্তি প্রত্যহ বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করিবে সে পাইতে পারিবে।" রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক দল লোকের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা উচ্চহাস্য করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন–"হে লোকগণ, তোমাদের এই সভাতে এমন বিষয়ের আলোচনা

কর যাহা সকল আনন্দ বিনাশ করিয়া দেয়।” তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন–“উহা কি?” তিনি বলিলেন–“মৃত্যু।”

হযরত আনাস (রা) বলেন– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– “হে আনাস, অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা কর। উহা তোমাকে পৃথিবীতে সংসারবিরাগী বানাইবে এবং তোমার গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইবে।” রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا – অর্থাৎ “মানবের উপদেশের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট।” রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে সাহাবাগণ এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–“আচ্ছা বল ত, মৃত্যুর কথা তাহার হৃদয়ে কিরূপ আছে?” তাঁহারা নিবেদন করিলেন–“হে আল্লাহর রাসূল, আমরা মৃত্যুর আলাপ তাহার মুখে শুনি নাই।” ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন–“তোমরা যেমন জান সেই ব্যক্তি তেমন নহে।” হযরত ইবনে ওমর (র) বলেন–“আমি অপর দশজন লোকসহ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। জনৈক আনসার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–“যে-ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করে এবং পরকালের সম্বল সঞ্চয়ে অধিক লোলুপ থাকে, সেই-ই দুনিয়াতে সম্মান লাভ করে ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা পায়।”

হযরত ইবরাহীম তাইমী (র) বলেন–“দুই বস্তু আমার মন হইতে দুনিয়ার শান্তি হরণ করে; প্রথম-মৃত্যুকে স্মরণ ও দ্বিতীয়–আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয়।” হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রতি রাত্রে আলিমগণকে একত্র করিয়া মৃত্যু ও কিয়ামতের বিষয় শ্রবণ করিতেন এবং মৃতদেহের নিকট শোকার্ত লোকে যেমন রোদন করে তিনিও তদ্রূপ রোদন করিতেন। হযরত হাসান বসরী (র) লোকের সঙ্গে বসিলে কেবল মৃত্যু, দোযখ এবং আখিরাতের বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতেন। এক মহিলা হযরত আয়েশার (র) নিকট স্বীয় কঠিন হৃদয়ের অভিযোগ করিলেন। তিনি তাহাকে অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করিতে আদেশ দিলেন। সেই মহিলা তাহাই করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমেই কাঠিন্য বিদূরিত হইতেছে। অবশেষে তিনি হযরত আয়েশার (র) নিকট গিয়া হৃদয়ে কোমলতা প্রাপ্তির জন্য ধন্যবাদ দিলেন। হযরত রবী খায়সাম (র) নিজ গৃহে এক কবর খনন করিয়া

লইয়াছিলেন। প্রত্যহ কয়েকবার সেই কবরে প্রবেশ করত তিনি মৃত্যু-চিন্তা করিতেন এবং বলিতেন–“ঘণ্টাকাল মৃত্যু-চিন্তা না করিলে আমার মন মলিন হইয়া যাইত।” হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এক ব্যক্তিকে বলিলেন– “অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা কর; ইহাতে দুইটি উপকার আছে– (১) তুমি দুঃখ দারিদ্রে নিপতিত থাকিলে তোমার মনে শান্তি আসিবে; আর (২) তুমি ধন-সম্পদের আরামে ডুবিয়া থাকিলে উহা তোমার নিকট তিক্ত হইয়া উঠিবে।” হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন– “আমি হারূনের আম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম–“আপনি কি মৃত্যু ভালবাসেন?’ তিনি বলিলেন–‘না।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম –‘ইহার কারণ কি?” তিনি বলিলেন–আমি কাহারও নিকট অপরাধ করিলে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে চাই না। আমি আল্লাহ্‌র নিকট বহু অপরাধ করিয়াছি। এমতাবস্থায় কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করি?”

মৃত্যু-চিন্তাধারা–লোক-ভেদে মৃত্যু-চিন্তা ত্রিবিধ হইয়া থাকে।

প্রথম ধারা ঃ পরকালের প্রতি উদাসীন, সংসারে মত্ত লোকের মৃত্যু–চিন্তা। এই শ্রেণীর লোকে মৃত্যু-চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং ভয় করে যে, মৃত্যু তাহাদিগকে সংসারের সকল সম্ভোগ ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবে। তাহারা মৃত্যুকে গালি দিয়া বলে– “মৃত্যুরূপ আপদ ক্রমশ নিকটে আসিতেছে। হায়! ইহা আমাদের হাত হইতে এমন সুখের দুনিয়া কাড়িয়া লইবে।” এই প্রকার মৃত্যু-চিন্তা মানুষকে আল্লাহ্ হইতে অধিকতর দূরবর্তী করে। কিন্তু কোন কারণে দুনিয়া যদি মন্দ বলিয়া মনে হয় এবং দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা জন্মে তবে উপকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

দ্বিতীয় ধারা ঃ তওবাকারীর মৃত্যু-চিন্তা। তাহাদের মনে পরকালের ভয় প্রবল হয় এবং অধিকাংশ সময় তওবা ও অতীত পাপের ক্ষতিপূরণে প্রবৃত্ত থাকে বলিয়া তাহারা মৃত্যু-চিন্তা করে। এইরূপ মৃত্যু-চিন্তা বড় সওয়াবের কাজ। তাহারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে না, বরং মৃত্যুর শীঘ্র আগমন অপছন্দ করে। কারণ, শীঘ্র মৃত্যু ঘটিলে পরকালের পাথেয় সংগৃহীত হইবার পূর্বেই দুনিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই ভয়ে কেহ মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করিলে ইহাতে কোন দোষ নাই।

তৃতীয় ধারা ঃ আরিফগণের মৃত্যু-চিন্তা। আল্লাহ্‌র দীদার মৃত্যুর পরে ঘটিবে

এবং বন্ধু যে-সময় দর্শন দান করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়াছেন সেই সময়টি কেহই ভুলিতে পারে না। সর্বদা তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। বরং সেই শুভ মুহূর্ত শীঘ্র আগমনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। এইজন্যই আরিফগণ মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া থাকেন। যেমন হযরত হুযায়ফা (রা) মৃত্যুর সময় বলিয়াছেন –حَبِيْبٌ جَاءَ عَلٰى فَاقَةٍ অর্থাৎ "বন্ধু প্রয়োজনের সময়েই আসিয়া পড়িলেন।" তৎপর তিনি মুনাজাত করিলেন–"হে আল্লাহ্, তুমি যদি জান যে, আমি সম্পদ অপেক্ষা অভাবকে অধিক ভালবাসি, সুস্থাবস্থা অপেক্ষা পীড়িতাবস্থা পছন্দ করি এবং জীবন অপেক্ষা মরণকে অধিক ভালবাসিয়া থাকি তবে মৃত্যু আমার নিকট সহজ কর। তাহা হইলে আমি তোমার দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব।" অধ্যাত্মিক উন্নতির এই দরজা অপেক্ষা অতি উন্নত আর একট দরজা আছে। এই দরজায় উপনীত হইলে মানব মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্টও থাকে না বা সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্র মৃত্যু কামনাও করে না। এই শ্রেণীর লোকে মৃত্যু শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, ইহার কোনটিই কামনা করেন না। বরং তাঁহারা আল্লাহ্‌র আদেশে সন্তুষ্ট থাকেন এবং নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ও পছন্দ একেবারে বিসর্জন দিয়া থাকেন। তাঁহারাই তসলীম ও রেযার চরম উন্নত শিখরে উপনীত হন। এই অবস্থায় উন্নীত হইলে মৃত্যুর স্মরণ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ইহার খেয়াল আসে না। কারণ, এই জগতেই তাঁহারা জ্ঞানচক্ষে আল্লাহকে দেখিতে থাকেন; আল্লাহ্‌র যিকির তাঁহাদের অন্তর-রাজ্য তন্ময় করিয়া রাখে এবং জীবন-মরণ তাঁহাদের নিকট সমান বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য সর্বদা তাঁহারা আল্লাহ্‌র যিকির ও মহব্বতে ডুবিয়া থাকেন।

মৃত্যু-চিন্তার প্রভাব অন্তরে জন্মাইবার উপায়–মৃত্যু একটি গুরুতর বিষয় এবং মৃত্যকালে মানবের যে-ক্ষতি ঘটিতে পারে তাহার সীমা নাই। এই বিষয়ে লোকে নিতান্ত উদাসীন। কেহ কখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করিলেও ইহা তাহার হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কারণ দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা তাহার হৃদয় এমন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে, সেই হৃদয়ে অন্য কোন বস্তু স্থান পাইতে পারে না। এইজন্য সংসার-মুগ্ধ লোক আল্লাহ্‌র যিকির ও তসবীহের মাধুর্য ও আনন্দ পায় না। মৃত্যু-চিন্তার স্থায়ী প্রভাব মনে জন্মাইবার দুইটি উপায় আছে।

প্রথম উপায় –যাহাকে দুস্তর বিজন অরণ্য অতিক্রম করিতে হইবে সে যেমন সর্বদা ইহার উপায় উদ্ভাবন ও চিন্তায় ব্যস্ত থাকে এবং অপর কোন

জিনিসের চিন্তাই তাহার মনে স্থান পায় না, তদ্রূপ তুমিও প্রত্যহ কিছুকাল নির্জন স্থানে বসিয়া মন হইতে সংসারের সব খেয়াল দূর করিয়া দাও এবং আপন মনে চিন্তা কর–"মৃত্যু আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। হয়ত অদ্যই মরিতে হইবে। হে মন, তোমাকে যদি কেহ অন্ধকারপূর্ণ পাতালপুরীতে যাইতে বলে আর তথায় যাওয়ার পথে গভীর গর্ত আছে, কি প্রস্তর পতিত আছে অথবা কোন ভয়ের কারণ আছে কিনা, জানা না থাকে তবে তোমার হৃদয়ের রক্ত পানি হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পর তোমাকে এক ঘোর অন্ধকারে প্রবশ করিতে হইবে। তথায় তোমার অদৃষ্টে কি আছে এবং তোমাকে কোথায় পতিত হইতে হইবে, তাহা তুমি কিছুই জান না। কবরে তোমাকে কি বিপদে পড়িতে হইবে তাহাও অন্ধকারপূর্ণ পাতালপুরীতে প্রবেশ অপেক্ষা কম ভয়ের কথা নহে। এমতাবস্থায় মৃত্যু, কবর, পরকাল ইত্যাদি অজ্ঞাত বিপদের কথা কোন্ ভরসায় ভুলিয়া রহিলে?"

দ্বিতীয় উপায়–এই উপায় বিশেষ ফলপ্রদ। তোমার সময়ের যে সব লোক মরিয়া গিয়াছে তাহাদের কথা মনে কর। তাহারা কেমন জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জীবন যাপন করিতেছিল, সংসারে কত সুখ-আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তাহারা কত উদাসীন ছিল। সেই মোহময় উদাসীনতার মধ্যেই আখিরাতের সম্বলহীন অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। কবরে তাহাদের আকৃতি কেমন হইয়াছে, তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখ। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচিয়া গলিয়া একটি হইতে অপরটি খসিয়া পড়িয়াছে; মাংস, চর্ম, চক্ষু, জিহ্বা ইত্যাদিতে কীট ধরিয়াছে। কবরে ত তাহাদের এই অবস্থা, কিন্তু এদিকে তাহাদের পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তি ওয়ারিসগণ বণ্টন করিয়া লইয়া আরামের সহিত ভোগ করিতেছে; তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাগিকে ভুলিয়া গিয়া অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইয়াছে এবং তাহাদের সহিত আমোদ-আহলাদে মত্ত রহিয়াছে। এইরূপে তোমার সমসাময়িক এক একটি মৃত লোকের কথা স্মরণ কর। তাহাদের জীবন-চরিত হাস্য-পরিহাস, মনোযোগিতা ও উদাসীনতা এবং কর্মব্যস্ততা লইয়া চিন্তা কর। তাহারা এমন এমন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল যে, বিশ বৎসরেও উহার পরিসমাপ্তি অসম্ভব এবং সেই কার্য করিতে গিয়া তাহারা গুরুতর দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে। অথচ তাহাদের কাফনের কাপড় বস্ত্র বিক্রেতার দোকানে মৌজুদ

ছিল; কিন্তু উহার খবরও তাহারা জানিত না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তুমি নিজকে বলিবে-"হে মন, তুমিও তাহাদেরই মত; তুমিও তাহাদের ন্যায় পরকালের প্রতি অমনোযোগী, সংসারলোভী ও নির্বোধ। তবে তোমার জন্য ইহা এক মহা সুযোগ যে, তাহারা তোমার সম্মুখে মরিয়া গিয়াছে যেন তুমি তাহাদের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।" যে-ব্যক্তি অপরের অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করে সেই-ই ভাগ্যবান।

তৎপর নিজের হস্ত, পদ, চক্ষু, জিহ্বা, অঙ্গুলী ইত্যাদির পরিণাম চিন্তা কর। এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি হইতে অপরটি খসিয়া পড়িবে। অল্প দিনের মধ্যেই এইগুলি পোকা, পিপীলিকার খাদ্য হইবে। ইহারা তোমার দেহ ভক্ষণ করিবে, কবরে তোমার দেহের কিরূপ বীভৎস অবস্থা হইবে তাহাও চিন্তা কর। তোমার এমন কমনীয় শরীর পচিয়া-গলিয়া মর-দেহে পরিণত হইবে।

এই সকল কথা এবং এই প্রকার বিষয় লইয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ চিন্তা করিবে। তাহা হইলে সম্ভবত মৃত্যু-চিন্তা তোমার মনে জাগ্রত থাকিবে। কারণ, শুধু মুখে 'মৃত্যু মৃত্যু' করিলে অন্তরে ইহার প্রভাব পড়ে না। লোকে সর্বদা মৃতদেহ কবরস্থ করিতে লইয়া যাইতেছে, তোমরা উহা স্বচক্ষে দেখিতেছ; অথচ তোমাকেও যে একদিন মরিতে হইবে, ইহা জানা সত্ত্বেও মৃত্যুর প্রভাব তোমার অন্তরে পড়িতেছে না। ইহার কারণ এই যে, তোমার উপর মৃত্যু সংঘটিত হইতে তুমি দেখ নাই এবং মানুষ যাহা নিজের উপর সংঘটিত হইতে দেখে নাই তাহা তাহার খেয়ালে আসে না। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক খুতবাতে বলিয়াছিলেন- "সত্য করিয়া বল দেখি, এই মৃত্যু কি আমাদের ভাগ্যে বিধিবদ্ধ হয় নাই? লোকে যে এই মৃতদেহ কবরে লইয়া যাইতেছে, সে কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে? মৃতদেহ কি করবে মাটি হইবে না? তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কি তাহারা স্বয়ং ভোগ করিবে, অথচ (মৃত্যু সম্বন্ধে) কেন উদাসীন রহিলে?"

দীর্ঘ আশার কারণে লোকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়া থাকে এবং এইজন্যই সর্বপ্রকার ফাসাদের সৃষ্টি হয়।

ক্ষুদ্র আশার ফযীলত -যে-ব্যক্তি মনে করে, 'আমি দীর্ঘ জীবন পাইয়াছি, বহুদিন মরিব না' তাহার দ্বারা পরকালের কোন কাজ হয় না। কারণ, সে মনে করে,-"এখনও বহুদিন আছে, যখন ইচ্ছা তখনই করিয়া লইব, এখন কিছুদিন

আমোদ-আহলাদে দিন কাটাই।" অপর পক্ষে যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে নিকটবর্তী মনে করে, সে সর্বদা পরকালের কাজে লিপ্ত থাকে এবং ইহাই সর্ববিধ সৌভাগ্যের মূল। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে ওমরকে (র) বলেন-"সকালে শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিও না যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে। আবার সন্ধ্যার সময় মনে করিও না যে, সকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে। ইহকালেই পরকালের সম্বল সংগ্রহ করিয়া লও; সুস্থ অবস্থায়ই পীড়ার সম্বল হস্তগত কর। কারণ, আগামীকল্য আল্লাহ্‌র নিকট তোমার কি নাম (অর্থাৎ জীবিত কি মৃত, পীড়িত কি সুস্থ) হইবে তাহা তুমি জান না।" তিনি অন্যত্র বলেন-"তোমাদের সম্বন্ধে দুইটি স্বভাব হইতে আমি যত ভয় পাই তত ভয় অন্য কিছু হইতে পাই না। প্রথম, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা; দ্বিতীয়, দীর্ঘ জীবনের আশা করা।"

হযরত ওসামা (রা) একমাস চলিবার উপযোগী কোন দ্রব্য কিনিয়া লইলেন। ইহাতে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন -"ওসামা দীর্ঘ জীবনের আশা করেন; সুতরাং তাহার পক্ষে এক মাসের দ্রব্য সংগ্রহ করা বিচিত্র নহে। যে আল্লাহ্‌র হাতে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যখন চক্ষু মুদ্রিত করি তখন মনে করি চক্ষু খুলিবার পূর্বেই আমার মৃত্যু ঘটিবে এবং চক্ষু খুলিলে মনে করি চক্ষু মুদ্রিত করিবার পূর্বেই মরিয়া যাইব। আর মুখে এক লোকমা অন্ন স্থাপন করিবার সময় মনে হয় ইতিমধ্যেই মৃত্যু আসিয়া পড়িবে। ফলে মুখের অন্ন গলার নিচে নামিতে পারিবে না।" ইহা বলিবার পর তিনি বলিলেন-"হে লোকগণ, তোমরা বুদ্ধিমান হইলে নিজকে মৃত বলিয়া মনে কর। কারণ, যে আল্লাহ্‌র হাতে আমার জীবন, তিনি তোমাদের সম্বন্ধে যে-ওয়াদা করিয়াছেন তাহা আসিবে এবং তাহা হইতে তোমরা পলাইতে পারিবে না।" পায়খানা প্রস্রাবের পর রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ তাইয়াম্মুম করিয়া লইতেন। সাহাবাগণ (র) আরয করিতেন-"হে আল্লাহর রাসূল (সা), পানি নিকটেই আছে।" কিন্তু তিনি উত্তর দিতেন-"পানি পাইবার পূর্বেই হয়ত মরিয়া যাইব।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন- "রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি চতুর্ভুজ অঙ্কন করিলেন; ইহার মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা টানিলেন। সেই সরল রেখার উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাপাত করিলেন এবং সেই চতুর্ভুজের বাহিরে আর একটি রেখা টানিয়া

বলিলেন–"চতুর্ভুজের মধ্যস্থিত সরলরেখাকে মানুষ বলিয়া মনে কর। চতুর্ভুজের ঘেরকে তাহার মৃত্যু বলিয়া ধরিয়া লও; ইহা হইতে সে বাহিরে পলায়ন করিতে পারে না। অভ্যন্তরস্থ সরল রেখার উভয় পার্শ্বে অঙ্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাসমূহ মানবের বিপদাপদ। সে এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেও অপর বিপদে নিপতিত হইবে। মৃত্যু পর্যন্ত এইরূপই ঘটিবে। চতুর্ভুজের বাহিরের রেখা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। মানুষ এমন কাজের খেয়ালেই সর্বদা থাকে যাহা আল্লাহ্ জানেন যে, তাহার মৃত্যুর পূর্বে সমাপ্ত হইবে না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"মানুষ ক্রমশ বৃদ্ধ হইতে থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে দুই বস্তু ক্রমশ যৌবনের দিকে ধাবিত হইতে থাকে– (১) ধনলোভ ও (২) বাঁচিবার আশা।"

হাদীস শরীফে আছে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম এক বৃদ্ধকে কোদালী হস্তে ভূমি খনন করিতে দেখিয়া আল্লাহ্‌র নিকট বৃদ্ধের হৃদয় হইতে আশা বাহির করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। আল্লাহ তাহার হৃদয় হইতে আশা বিদূরিত করিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কোদালটি এক পার্শ্বে রাখিয়া শয়ন করিল। কিছুক্ষণ পর হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম পুনরায় দু'আ করিলেন–"হে আল্লাহ্, বৃদ্ধের মনে আশা দাও।" বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নিজ কাজে লাগিয়া গেল। হযরত ঈসা (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমার কি হইয়াছিল?" বৃদ্ধ বলিল–"হঠাৎ আমার মনে জাগিল–পরিশ্রম করিতে করিতে বৃদ্ধ হইলাম, আর কত পরিশ্রম করিব? শীঘ্রই মরিয়া যাইব। তাই কোদালী রাখিয়া দিয়াছিলাম। আবার মনে জাগিল–যখন মরণ আসিবে তখন ত মরিবই। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন ত আহার করিতেই হইবে। ইহা মনে হওয়াতে উঠিয়া নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইলাম।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমরা কি বেহেশতে যাইতে চাও?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন–"হাঁ চাই।" তখন তিনি বলিলেন–"আশা কম কর, মৃত্যুকে সর্বদা চক্ষুর সম্মুখে রাখ এবং আল্লাহকে যেরূপ শরম করা দরকার তাঁহাকে তদ্রূপ শরম কর।" এক বুযুর্গ তাঁহার ভাইকে পত্র লিখিলেন–"অতঃপর অবগত হও, দুনিয়া স্বপ্ন এবং পরকাল চৈতন্যের জগত। এই উভয়ের মধ্যে মৃত্যু অবস্থিত। আমরা যেই জগতে আছি তাহা বিশৃঙ্খল খেয়াল মাত্র।"

দীর্ঘ জীবনাশার কারণ–দুইটি কারণে মানুষ দীর্ঘ জীবনের আশা করে: যথা– (১) দুনিয়ার মহব্বত ও (২) অজ্ঞানতা।

দুনিয়ার মহব্বত– দুনিয়ার মহব্বত হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিলে হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া দুনিয়াকে মানব হইতে কাড়িয়া লইয়া যায়। এইজন্য লোকে মৃত্যুকে ভালবাসে না। আবার, মৃত্যু মানব-প্রকৃতির বিপরীত। যাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ তাহাকে লোকে নিজ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে এবং যাহা প্রকৃতি চায় তাহা গ্রহণ করিতে সর্বদা হৃদয়কে ফুসলাইতে থাকে; আর হৃদয়েও তাহার ছবি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য লোকে জীবন, ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার যাবতীয় আসবাবপত্রকে স্থায়ী বলিয়া মানিয়া লয় এবং তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ মৃত্যুকে সে ভুলিয়া থাকে। কোন সময় মৃত্যু-চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইলেও প্রবৃত্তি তাহা ভুলাইয়া দেয় এবং সে বলিতে থাকে–"হে, এখনও বহু সময় বাকী আছে। ইতিমধ্যে মৃত্যুর সম্বল সংগ্রহ করিয়া লইব।" বয়স অধিক হইলে বলিতে থাকে–"এখনই কি হইল? প্রতীক্ষা কর, বার্ধক্য আসিতে না আসিতেই সব ঠিক করিয়া লইব।" বৃদ্ধ হইলে বলিতে থাকে–"একটু থাম, এই ইমারত আরম্ভ করা হইয়াছে, শেষ করিয়া লই, এই পুত্রের জন্য একটি জাহাজ বানাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া লই; এই ক্ষেত্রে পানি সেচনের একটি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া লই। হাতের এই কাজগুলি শেষ হইলে মনের টান আর কোন দিকে থাকিবে না এবং ইবাদতেও স্বাদ পাইব। আবার দেখ, অমুক ব্যক্তি আমার অনিষ্ট করিয়াছে; তাহাকে শায়েস্তা করিয়া লই।" এইরূপ সে দুনিয়ার সমস্ত কাজ সমাপ্ত করত নিশ্চিন্ত হইবার জন্য পরকারের কাজে বিলম্ব করে। কিন্তু দুনিয়ার কাজগুলি পরস্পর জড়িত রহিয়াছে এক কাজে হাত দিলে আর দশটা সেই সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নির্বোধ ইহাও জানে না যে, সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া দুনিয়া হইতে অবসর লওয়া অসম্ভব কথা। তবে হাতের কাজ অসম্পূর্ণই থাকুক না কেন, ইচ্ছাপূর্বক দুনিয়া বর্জন করিলে অবসর হওয়া যায়। কিন্তু সেই নির্বোধ মনে করে, দুনিয়ার সকল কাজ সমাপ্ত করিয়াই অবসর গ্রহণ করিবে। এইরূপে সে আখিরাতের কাজে বিলম্ব করিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন অলক্ষ্যে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বৃথা অনুতাপ অনুশোচনায় তাহার মন দগ্ধ হইতে থাকে। এইজন্যেই দোযখবাসিগণ ক্ষোভ ও অনুশোচনায় চিৎকার সহকারে ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। দুনিয়ার মহব্বতই এই সকলের মূল এবং এই কারণেই মানুষের মধ্যে পরকালের প্রতি অসতর্কতা জন্মে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে বস্তুকে তুমি ভালবাসিতে ইচ্ছা কর ভালবাস। কিন্তু অবশেষে তাহা তোমা হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।"

অজ্ঞানতা–অজ্ঞানতা এই যে, লোকে দীর্ঘ জীবনের উপর ভরসা করিয়া থাকে এবং বুঝে না যে, বহু লোক বৃদ্ধ হইবার পূর্বেই মরিয়া যায়। হাজার হাজার যুবক ও বালক মরিয়া যাইতেছে। কম লোকই বৃদ্ধ হইয়া মরে। এইজন্যই বৃদ্ধ লোক কম পাওয়া যায়। অপর অজ্ঞানতা এই যে, লোকে সুস্থাবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু অসম্ভব মনে করে। তাহারা বুঝে না যে, হঠাৎ মৃত্যু অসম্ভব হইলেও হঠাৎ পীড়িত হওয়া অসম্ভব নহে। সকল পীড়াই হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পীড়িত ব্যক্তির মৃত্যু অসম্ভব নহে। ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া লও যে, মৃত্যু আমাদের সম্মুখে সূর্যসদৃশ। ইহার কিরণ আমাদের উপর পতিত আছে। মনে করিও না যে, ছায়ার ন্যায় মৃত্যু আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইতেছে এবং ছায়াকে যেমন আমরা ধরিতে পারি না মৃত্যুকেও তদ্রূপ ধরিতে পারিব না।

দীর্ঘ জীবনাশার প্রতিকার– যে-কারণে পীড়া জন্মে, তাহা বিনাশ করিলে পীড়া বিদূরিত হয়। দীর্ঘ জীবনাশার কারণ যখন তুমি জানিয়াছ তখন সেই কারণ বিনাশে সচেষ্ট হও। দুনিয়ার মহব্বত দীর্ঘ জীবনাশার কারণ। ইহা বিদূরণের ব্যবস্থা বিনাশন খণ্ডে ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুযায়ী আমল করিতে হইবে। মোটকথা এই, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্যক পরিচয় পাইয়াছে, সে কখনও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় না। কারণ, দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ সামান্য কয়েক দিনের জন্য মাত্র। মৃত্যু আসিলে উহা আপনা-আপনিই লোপ পায়। আবার দুনিয়াও নানাবিধ পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ এবং দুঃখকষ্টের দুনিয়াতে কাহারও অদৃষ্টে অবিমিশ্র সুখ মিলে না। যে-ব্যক্তি পরকালের দীর্ঘতা এবং দুনিয়ার জীবনের অল্পতা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে যে, পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করা জাগ্রত অবস্থায় স্বর্ণমুদ্র পাওয়া অপেক্ষা স্বপ্নে এক কপর্দক পাওয়াকে অধিক পছন্দ করার ন্যায়। কারণ, দুনিয়া স্বপ্নসদৃশ। 'মানব নিদ্রিত আছে, মরিলেই জাগিয়া উঠিবে।'

প্রকৃত মা'রিফাত ও যথার্থ চিন্তা দ্বারা অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়। মানুষের বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক, মৃত্যু তাহার ক্ষমতাধীন নহে যে, সে যে-সময়ে ইচ্ছা করে, সেই সময়ে মৃত্যু আসিবে। এইজন্যই সে দীর্ঘ জীবনের আশায় দুনিয়ার

সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করত পরকালের কাজে মনোনিবেশ করিবার ভরসায় থাকিতে পারে না।

দীর্ঘ জীবনাশার শ্রেণী-বিভাগ – দীর্ঘ জীবন যাহারা আশা করে, তাহাদের সকলেই এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। কেহ চিরকাল দুনিয়াতে থাকিতে ইচ্ছা করে। ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ –

অর্থাৎ "তাহাদের কেহ কেহ হাজার বৎসর বাঁচিবার আশা করে।" কেহ কেহ আবার বৃদ্ধ হইবার আশা রাখে, কেহ কেহ এক বৎসরের অধিক বাঁচিবার আশা করে না। সুতরাং তাহারা আগামী বৎসরের জন্য কোন আয়োজন-উদ্‌যোগও করে না। আবার কেহ কেহ এক দিনের অধিক জীবনাশা করে না। তাহারা আগামীকল্যের জন্যও কোন আয়োজন করে না। যেমন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন– "আগামীকল্যের জন্য জীবিকা জমা করিও না। কারণ, পরমায়ু অবশিষ্ট থাকিলে জীবিকাও পাইবে। আর কল্য পর্যন্ত জীবন না থাকিলে অপরের যিন্দেগীর জন্য কেন তুমি কষ্ট ভোগ করিবে?" কেহ কেহ আবার একটি নিশ্বাস ফেলিবার সময় পর্যন্তও বাঁচিবার আশা করে না। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পানি নিকটবর্তী থাকা সত্ত্বেও ইহা হস্তগত হইবার পূর্বেই মৃত্যু আসিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি তাইয়াম্মুম করিয়া লইতেন। আবার কেহ কেহ এমনও আছেন যে, মৃত্যু সর্বদাই তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকে, কখনও অদৃশ্য হয় না। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আযকে (রা) ঈমানের হাকীকত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"কোন বস্তু হস্তগত হইলে আমার আশঙ্কা হয়, মৃত্যু তখনই আমার হাত হইতে ইহা ছিনাইয়া লইবে।" হযরত আস্‌ওয়াদ হাব্‌শী (র) নামাযে দণ্ডায়মান হইবার সময় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনি কি দেখেন?" তিনি বলিলেন–"মৃত্যু কোন্ পথে আসিতেছে তাহাই দেখিতেছি।"

মোটকথা, দীর্ঘ বা হ্রস্ব জীবনাশা সম্বন্ধে মানুষের শ্রেণী-বিভাগ আছে। যেই ব্যক্তি এক মাসের অধিক বাঁচিবার আশা রাখে না, সেই ব্যক্তি চল্লিশ দিন বাঁচিবার আশাধারী ব্যক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই উভয় শ্রেণীর কাজ ও ব্যবহারে তদ্রূপ দীর্ঘাশার প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়। কারণ, যে-ব্যক্তির দুই ভাই বিদেশে

আছে, তন্মধ্যে একজন এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং অপর ভাই এক বৎসর পরে আসিবে এমন স্থলে যে-ভাই এক মাসের মধ্যে আসিবে সে তাহার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন-উদ্যোগ অগ্রে করে এবং যে ভাই বৎসরান্তে আসিবে তাহার আয়োজনে বিলম্ব করিয়া থাকে।

যাহা হউক, প্রত্যেকেই নিজকে স্বল্প আশাধারী বলিয়া মনে করে। কিন্তু যে-ব্যক্তি শীঘ্র শ্রীঘ্র সৎকর্ম সম্পাদনে তৎপর থাকে এবং আর একটি মুহূর্ত জীবিত থাকিলেও মহা সুযোগ মনে করিয়া ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, তাহাকেই জীবনে স্বল্প আশাধারী বলা যাইতে পারে। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"পাঁচ বস্তুকে অপর পাঁচটির পূর্বে মহা সুযোগ মনে কর–(১) বার্ধক্য আসিবার পূর্বে যৌবনকে, (২) রোগ আসিবার পূর্বে স্বাস্থ্যকে, (৩) অভাব আসিবার পূর্বে সঙ্গতিকে, (৪) কর্ম-ব্যাপৃতির পূর্বে অবসর কালকে এবং (৫) মৃত্যু আসিবার পূর্বে জীবনকে।" তিনি অন্যত্র বলেন–"দুইটি নি'আমত এমন যে, অধিকাংশ লোক উহাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; (উহারা হইতেছে) স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতা।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণের মধ্যে গাফলতের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলে তিনি তাঁহাদের মধ্যে উচ্চৈস্বরে বলিতেন–"মৃত্যু আসিতেছে; ইহা কাহারও জন্য সৌভাগ্য আনিতেছে, কাহারও জন্য দুর্ভাগ্য।"

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন যে, প্রত্যহ প্রাতে 'প্রস্থান, প্রস্থান' বলিয়া আকাশবাণী হয়। হযরত দাঊদ তাঈকে (রা) নামাযের দিকে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"নগর-দ্বারে সৈন্যগণ আমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।" অর্থাৎ কবরস্থানে মৃত ব্যক্তিগণ আমাকে না লইয়া ফিরিবে না। হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত পরিশ্রম ও কঠোর রিয়াযত করিতেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"এত কঠিন পরিশ্রম না করিলে কি নয়?" তিনি বলিলেন–"দৌড়ের মাঠে ঘোড়াগুলি দৌড় আরম্ভ করিলে মাঠের শেষভাগে গিয়া দেহের সমস্ত বল-প্রয়োগে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। এখন আমার জীবন-দৌড়ের শেষ ভাগ। মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে। তাই আপ্রাণ শক্তি প্রয়োগে পরিশ্রম ও রিয়াযত করিয়া লই।"

প্রাণবায়ু বহির্গমন ও মৃত্যু-যন্ত্রণা– মৃত্যুকালে অন্য কোন পারলৌকিক বিপদাপদের সম্মুখীন না হইয়া শুধু যদি প্রাণবায়ু বহির্গমনের যন্ত্রণা পাইতে

হইত তবেও সেই যন্ত্রণার ভয়ে দুনিয়ার সকল আনন্দ পরিত্যাগ করা মানুষের উচিত ছিল। যদি এই ভয় থাকে যে, কোন দুর্ধর্ষ সিপাহী গৃহে প্রবেশ করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাকে আঘাত করিবে তবে সেই ব্যক্তি কখনই আহার-নিদ্রায় আনন্দ পাইবে না। অথচ সিপাহীর আগমন নিশ্চিত নহে এবং মৃত্যুর আগমন ও প্রাণবায়ু বাহির করিয়া লওয়া ধ্রুব সত্য। আবার সিপাহীর দণ্ডাঘাত অপেক্ষা মৃত্যুকষ্ট ভীষণতর যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু মোহভ্রমে পতিত আছে বলিয়া মানুষ সেই ভয়ে ভীত নহে। সকল বুযুর্গ এক বাক্যে বলিয়াছেন প্রাণবায়ু বাহির করিবার সময় যে-কষ্ট হয়, তাহা তলোয়ারের আঘাতে ঠুকরা টুকরা হওয়ার কষ্ট অপেক্ষা কঠিনতর। আঘাতে কষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, আঘাতের ব্যথা আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের জীবনীশক্তি পর্যন্ত পৌঁছে এবং আঘাতের স্থানে তলোয়ার জীবনীশক্তিকে কি পরিমাণে স্পর্শ করে, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। অগ্নি দ্বারা দেহের কোন অংশ দগ্ধ হইলে ইহার সন্তাপ সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হয়। এইজন্যই তলোয়ারের আঘাত অপেক্ষা অগ্নি দ্বারা দহনে অধিক কষ্ট হয়। জীবনীশক্তি বা প্রাণ দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মৃত্যুকালে এই প্রাণ ছিন্ন করিয়া বাহির করিতে গেলে দেহের সর্বত্র ইহার বেদনা অনুভূত হয়। ইহার প্রভাবে সর্ব শরীর অবশ হইয়া পড়ে এবং বাকযন্ত্রও চলিতে পারে না– নীরব হইয়া যায়; আর বুদ্ধিও তখন ঠিক থাকে না। যাহারা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে কেবল তাহারাই ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু নবীগণ নবুওতের আলোকে ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

মৃত্যু-যন্ত্রণা সম্বন্ধে হাদীস ও বুযুর্গগণের উক্তি –হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন –"হে বন্ধুগণ, আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর যেন তিনি আমার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করেন। মৃত্যু-যন্ত্রণা কেমন কঠিন বুঝিতে পারিয়া সেই ভয় আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি।" ইন্তিকালের সময় রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ করিতেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, মুহাম্মদের (সা) উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ কর।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন–"যাহার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ হয়, তাহার (সৌভাগ্যের) কোন আশা আমি করি না। কারণ, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পবিত্র দেহ হইতে জীবন বহির্গত হইবার সময়ের মৃত্যু-যন্ত্রণা আমি

স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই সময় তিনি বলিতেছিলেন–"হে আল্লাহ্, অস্থি ও শিরাসমূহের ভিতর হইতে তুমি রূহ টানিয়া বাহির করিতেছ–এই যন্ত্রণা আমার উপর সহজ কর।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুযন্ত্রণা ও কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন– "তলোয়ার দ্বারা তিন শত আঘাত করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, মৃত্যু-যন্ত্রণা তদ্রূপ।" তিনি অন্যত্র বলেন–"যে মৃত্যু সর্বাপেক্ষা সহজ হয় তাহাও লৌহ কন্টকের যন্ত্রণার ন্যায় যাহা পদে বিদ্ধ হইলে বাহির করাই সম্ভবপর নহে।"

এক রোগী মৃত্যু-শয্যায় যাতনা পাইতেছিল। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহার নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন–"তাহার যন্ত্রণা সম্বন্ধে আমি অবগত আছি। তাহার শরীরে এমন কোন শিরা-উপশিরা নাই যাহাতে পৃথক পৃথকভাবে যাতনা অনুভূত হইতেছে না।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন–"হে মুসলমানগণ, কাফিরদের সহিত ধর্মযুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হও। কারণ, বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া মৃত্যু-যাতনা সহ্য করা অপেক্ষা হাজার হাজার তলোয়ারের আঘাতজনিত মৃত্যুকে আমি অধিক সহজ মনে করি।" বানী ইসরাঈলের কতক লোক এক কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে দু'আ করিল–"হে আল্লাহ, এই মৃতদের একজনকে জীবিত করিয়া তোল।" আল্লাহ একজনকে জীবিত করিলেন। সেই ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল–"হে লোকগণ, তোমরা আমার নিকট কি চাও? পঞ্চাশ বৎসর হইল আমার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি আমার শরীরে মৃত্যু-যন্ত্রণার কষ্ট অনুভূত হইতেছে।" এক সাহাবী (রা) বলেন– "মুসলমান স্বীয় আমল দ্বারা যে মরতবা লাভ করিতে পারে না, আল্লাহ্ তাহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা দিয়া সেই মরতবায় উন্নীত করেন। আর কাফির সৎকর্ম করিয়া থাকিলে আল্লাহ্ ইহার বিনিময়ে তাহার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা লঘু করিয়া দেন যাহাতে পরকালে তাহার কোন প্রাপ্য না থাকে।" হাদীস শরীফে আছে–"হঠাৎ মৃত্যু মুসলমানের পক্ষে আরাম এবং কাফিরের পক্ষে ক্ষোভ।" হাদীস শরীফে আছে : হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মৃত্যুকালে আল্লাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"মৃত্যু-যন্ত্রণা কিরূপ মনে করিতেছ?" তিনি নিবেদন করিলেন–"এমন পক্ষীর ন্যায় যাহাকে জীবিতাবস্থায় ভাজা করা হইতেছে: আর ইহা উড়িয়া যাইতে পারিতেছে না বা মরিয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতেছে না।" হযরত কা'বুল আহ্‌বার (রা) হযরত ওমরকে (রা) মৃত্যু-যন্ত্রণার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"কণ্টকযুক্ত

একটি শাখা উদরস্থ হইলে এবং এক একটি কাঁটা এক একটি রগে ফুটিয়া গেলে সেই শাখা টানিয়া বাহির করিবার সময় যেরূপ কষ্ট হয় মৃত্যুযন্ত্রণা তদ্রূপ।"

মৃত্যুকালীন বিভীষিকা–প্রাণ বাহির হওয়ার সময় যে-ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে হয় ইহা ব্যতীত আরও তিনটি ভীষণ বিভীষিকা মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। **প্রথম বিভীষিকা**–মালাকুল মওত হযরত আযরাঈল আলায়হিস সালামের রূপ দর্শন। হাদীস শরীফে আছে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম মালাকুল মওতকে বলিলেন–"তুমি পাপীর প্রাণ হরণকালে যে-রূপ ধারণ কর আমি তোমার সেই রূপ দেখিতে চাই।" মালাকুল মওত বলিলেন–'আপনি সহ্য করিতে পারিবেন না।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–"তোমার সেই রূপ আমাকে অবশ্যই দেখাইতে হইবে।' মালাকুল মওত সেই রূপ ধারণ করিলেন। পাপীর প্রাণ হরণকালে তাঁহার রূপ কিরূপ ভয়াবহ হয়, তাহা প্রকাশ পাইল। সম্মুখেই এক কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকার এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান, মস্তকে মোটা মোটা রুক্ষ কেশ, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ পোশাক,; অগ্নিশিখা ও ধূয়া তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সেই ভীষণ রূপ দর্শনে বেহুশ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন এবং মালাকুল মওত স্বীয় স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন–'হে মালাকুর মওত (মৃত্যুর ফিরিশতা), পাপীকে তোমার ভীষণ রূপ প্রদর্শনই তাহার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি।"

নেক্‌কারের মৃত্যুকালে মালাকুল মওতের মনোরম সূরত– নেক্‌কার লোক মালাকুল মওতকে তদ্রূপ ভীষণ আকারে দর্শন করে না; বরং তাঁহাকে মনোরম আকারে দর্শন করিয়া থাকে। নেক্‌কার লোকে যে-সকল আরাম ভোগ করিতে পায়, তাহা ছাড়িয়া দিলেও মালাকুল মওতের মনোরম সূরত দর্শনই তাহার পুণ্যের যথেষ্ট পুরস্কার। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম মালাকুল মওতকে জিজ্ঞসা করিলেন–"তুমি লোকের প্রতি সমবিচার কর না কেন? একজনের প্রাণ শীঘ্র বাহির করিয়া লও, আবার অপরকে অস্থিরভাবে নাড়াচড়া করিয়া আস্তে আস্তে মারিয়া থাক।" হযরত আযরাঈল (আ) বলিলেন–"এই সম্বন্ধে আমার কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির নামের তালিকা আমি পাইয়া থাকি। ইহাতে যেরূপে প্রাণ হরণের আদেশ লিপিবদ্ধ থাকে আমি তদনুযায়ী কাজ করিয়া থাকি।"

মালাকুল মওতের আগমন সম্বন্ধে বুযুর্গগণের উক্তি– হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রা) বলেন –"একদা এক বাদশাহ অশ্বারোহণে বাহির হইতে চাহিলেন। তিনি পোশাক চাহিলে উহা উপস্থিত করা হইল। কিন্তু সেই পোশাক তাঁহার পছন্দ হইল না। পরিশেষে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করিলেন। তৎপর কতকগুলি উৎকৃষ্ট অশ্ব উপস্থিত করা হইল। উহাও তাঁহার পছন্দ হইল না। বাদশাহ্ অনন্তর সকল অশ্ব হইতে বাছিয়া লইয়া সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিলেন। ইহার পর আড়ম্বরপূর্ণ সৈন্য-সামন্ত লইয়া বাদশাহ্ বহির্গত হইলেন। অহংকারে ফুলিয়া তিনি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। এমন সময় মালাকুল মওত মলিন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্র বেশে বাদশাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সালাম বলিলেন। বাদশাহ্ সালামের জওয়াব পর্যন্ত দিলেন না। মালাকুল মওত বাদশাহ্র অশ্বের লাগাম ধরিয়া ফেলিলেন। বাদশাহ্ বলিলেন–"কত বড় বেআদবী! তাহাকে সরাইয়া দাও।" মালাকুল মওত বলিলেন–"মহারাজ, আপনার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে।' বাদশাহ্ বলিলেন–'থাম, আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া লই।' মালাকুল মওত বলিলেন–না, আমি এখনই বলিব।' বাদশাহ্ বলিলেন-'তবে বল।' মালাকুল মওত তাঁহার কানে কানে বলিলেন–'আমি যমদূত। এই মুহূর্তেই তোমার প্রাণ বাহির করিয়া লইবার জন্য আমি আসিয়াছি।' ইহা শুনামাত্র তাহার বদনমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হইল; মুখে কোন কথা সরিল না। অতি কষ্টে বাদশাহ বলিতে লাগিলেন–'গৃহে ফিরিয়া স্ত্রী-পুত্রদের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার অবকাশ দিন।' মালাকুর মওত তাঁহাকে সময় দিতে অস্বীকার করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ বাহির করিয়া লইলেন। বাদশাহ্ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলেন এবং মালাকুল মওত প্রস্থান করিলেন।"

মালাকুল মওত একজন মুসলমানকে দেখিয়া বলিলেন–"একটি গোপন কথা আপনাকে শুনাইতে চাই।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"কি কথা বলুন।" মালাকুল মওত বলিলেন–"আমি যমদূত।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"মারহাবা, বহুদিন যাবত আমি আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। আপনার শুভাগমন আমার অতি প্রিয়। এখন আমার প্রাণ বাহির করিয়া লউন।" মালাকুল মওত বলিলেন–"যে সকল প্রয়োজনীয় কাজ রহিয়াছে উহা আগে সমাধা করিয়া লউন।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"আল্লাহ্কে দর্শন করা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ আমার আর নাই।" মালাকুল মওত বলিলেন–"এখন আপনি যে-অবস্থায় ইচ্ছা করেন সেই অবস্থায়ই আমি আপনার প্রাণ বাহির করিয়া লইব।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"তবে এতটুকু বিলম্ব করুন যাহাতে আমি ওযু করিয়া নামায আরম্ভ করিতে পারি। যখন আমি সিজদায় প্রণত হইব তখন আমার প্রাণ বাহির করিয়া লইবেন।" মালাকুল মওত তাহাই করিলেন।

হযরত ওহাব ইব্নে মুনাব্বেহ (রা) আরও বলেন–"এক দেশে এক মহা পরাক্রান্ত বাদশাহ্ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী বাদশাহ্ তখন ইহজগতে আর কেহই ছিলেন না। মালাকুল মওত তাঁহার রূহ কবয করিয়া আকাশে উপস্থিত হইলে ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন–'হে মালাকুল মওত, প্রাণ হরণ করিবার সময় কখনও কি তোমার মনে কাহারও প্রতি দয়া জন্মিয়াছিল?' মালাকুল মওত বলিলেন –'হাঁ, এক বিজন অরণ্যে এক গর্ভবতী মহিলা অসহায় পতিত ছিল। এমন সময় তাহার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হইল; ঠিক সেই সময় ঐ মহিলার প্রাণ হরণ করিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ হইল। আমি তাহার প্রাণ বাহির করিয়া লইলাম। সেই অসহায় সদ্যপ্রসূত শিশুকে ধ্বংসের মুখে রাখিয়া আসিলাম। বিজন অরণ্যে সেই অসহায়া মহিলা ও নির্জনে ধ্বংসের মুখে পতিত সেই শিশু সন্তানের জন্য আমার মনে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল।' ফিরিশতাগণ বলিলেন–'তুমি ত সেই বাদশাহ্কে দেখিয়াছ যাহার ন্যায় পরাক্রমশালী নরপতি ধরাতলে আর কেহই ছিল না?' মালাকুর মওত বলিলেন–'হাঁ দেখিয়াছি।' ফিরিশতাগণ বলিতে লাগিলেন–'এই বাদশাহ্ সেই শিশু যাহাকে তুমি বিজন বনে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছিলে।' ইহা শুনিয়া মালাকুল মওত আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন।

এক সাহাবী (রা) বলেন– "শাবানের ১৫ই রজনীতে মালাকুল মওত একটি তালিকাপ্রাপ্ত হন; সেই তালিকায় সেই বৎসরের মধ্যে যত লোক মরিবে তাহাদের নাম লিখিত থাকে। ঐ লোকদের কেহ তখন দুনিয়াতে দালান-কোঠা বানাইতে থাকে, কেহ বিবাহ-শাদী করিতে থাকে, কেহ বা ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত থাকে; অথচ তাহাদের নাম সেই মৃত্যু তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।" হযরত আমাশ (র) বলেন–"মালাকুল মওত হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের নিকট গিয়া তাঁহার জনৈক সঙ্গীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। মালাকুল মওত বাহির হইয়া গেলে সেই ব্যক্তি হযরত সুলায়মানকে (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন–'যে ব্যক্তি আমার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিল সে কে?' হযরত

সুলায়মান (আ) বলিলেন–'মালাকুল মওত।' সেই ব্যক্তি বলিলেন–'মনে হয় মালাকুল মওত আমার প্রাণ বাহির করিয়া লইবে। আমাকে হিন্দুস্তানে লইয়া যাইবার জন্য আপনি বায়ুকে আদেশ করুন যেন, মালাকুল মওত পুনরায় এখানে আসিলে আমাকে না পায়।' হযরত সুলায়মান (আ) বায়ুকে আদেশ করিলেন। বায়ু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্তানে পৌছাইয়া দিল। তৎপর মালাকুল মওত পুনরায় আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–'আপনি আমার অমুক সঙ্গীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন কেন?' মালাকুল মওত বলিলেন–'সেই সময় হিন্দুস্তানে সে ব্যক্তির প্রাণ বাহির করিবার জন্য আল্লাহ্‌র আদেশ হইয়াছিল; অথচ সে আপনার দরবারে ছিল। আমি চিন্তা করিলাম সেই দণ্ডে সে কিরূপে হিন্দুস্তানে উপস্থিত হইবে? আমি সেখানে যাইয়া তাহাকে তথায়ই পাইলাম। ইহাতে আমি বড় আশ্চর্যান্বিত হইলাম।"

সকলের সঙ্গেই মৃত্যুর সাক্ষাত ঘটিবে, এই কথা যেন বুঝিতে পার, এইজন্যই উপরের ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় বিভীষিকা–পাপ-পুণ্য লেখক ফিরিশতাদ্বয়কে দর্শন। হাদীস শরীফে আছে, মৃত্যুর সময় এই দুই ফিরিশতা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। নেককার ব্যক্তিকে ফিরিশতা বলেন– "আল্লাহ্ তোমাকে মঙ্গল দিয়া পুরস্কৃত করুন। আমাদের সম্মুখে তুমি সৎকাজ করিয়া আমাদিগকে খুব আরাম দিয়াছ।" কিন্তু বদকার লোককে ফিরিশতাদ্বয় বলেন–"আল্লাহ্ তোমাকে মঙ্গল দিয়া পুরস্কৃত না করুন। তুমি আমাদের সম্মুখে বহু মন্দ ও পাপ কাজ করিয়াছ।" ইহা শুনিয়া তাহার চক্ষু এমনভাবে ঊর্ধ্বদিকে খুলিয়া যাইবে যে, আর বন্ধ হইবে না।

তৃতীয় বিভীষিকা–মৃত্যুকালে লোকে বেহেশতে বা দোযখে তাহার বাসস্থান দেখিতে পায়। কারণ, তখন মালাকুল মওত নেককার লোককে বলেন–"হে আল্লাহ্‌র বন্ধু, তুমি বেহেশতে প্রবেশের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" এবং পাপীকে বলেন–"হে আল্লাহ্‌র শত্রু, তোমাকে দোযখে প্রবেশের খবর দিতেছি।"

যাহাই হউক, উক্ত তিন প্রকার বিভীষিকা দর্শনে যে কষ্ট হয়, তাহা মৃত্যু-যন্ত্রণার সহিত মিলিত হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। – نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا "হে আল্লাহ্, এই সকল যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।" ইহকালে মানুষ যত বড় কঠিন বিভীষিকাই দেখুক না কেন, উহা কবর ও তৎপরের বিভীষিকা হইতে নিতান্ত তুচ্ছ।

মৃতের সহিত কবরে কথাবার্তা – রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন– "মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখামাত্র কবর বলিবে, –'হে আদম সন্তান, তুমি কি জন্য আমার কথা ভুলিয়া ছিলে? তুমি কি জান না যে, আমি দুঃখ-কষ্ট, অন্ধকার, নির্জনতা ও কীটের গৃহ? একথা তুমি কিরূপে ভুলিয়াছিলে? আমার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় কেন এত হতভম্ব হইয়া এক পদ আগে আবার এক পদ পাছে হটিয়াছিলে?' মৃত ব্যক্তি নেককার হইলে তাহার পক্ষ হইতে একজনে উত্তর দিবে–'হে কবর, তুমি কি বলিতেছ? এই ব্যক্তি নেককার ছিল; সে সৎকাজে আদেশ করিয়াছে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করিয়াছে।' তখন কবর বলিবে–'তবে আমি তাহার নিকট উদ্যানে পরিণত হইতেছি।' তৎপর মৃত্যু ব্যক্তির দেহ অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে এবং তাহার আত্মা আকাশে চলিয়া যাইবে।" অপর এক হাদীসে আছে, মৃতু ব্যক্তিকে কবরে রাখামাত্র তাহার উপর শাস্তি আরম্ভ হয়। পার্শ্ববর্তী কবরস্থ মৃত ব্যক্তি তাহাকে উচ্চৈস্বরে বলিতে থাকে–"হে পশ্চাতে আগমনকারী, তোমাকে (দুনিয়াতে) জীবিত রাখিয়া তোমার পূর্বেই আমরা চলিয়া আসিয়াছিলাম। আমাদিগকে মরিতে দেখিয়া তুমি উপদেশ গ্রহণ করিলে না কেন? তুমি কি দেখ নাই যে, আমরা এই জগতে চলিয়া আসিয়াছি এবং আমাদের কাজ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে? (আমাদের পর) তুমি (সৎকর্ম করিবার) অবকাশ পাইয়াছিলে। যে-সকল সৎকাজ আমাদের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়াছিল উহা তুমি করিলে না কেন?' এইরূপে ভূতলের সকল কোণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলে–"হে বাহ্য দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি, যাহারা তোমার ন্যায় দুনিয়ার প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিল এবং তোমার পূর্বে মরিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি উপদেশ গ্রহণ কর নাই কেন।"

হাদীস শরীফে আছে, নেককার বান্দাকে কবরে রাখামাত্র তাঁহার সৎকর্ম তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া লয় এবং তাঁহাকে আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখে। আযাবের ফিরিশতা বামদিক হইতে আসিতে থাকিলে নামায আসিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং বলে–"বিরত হও, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য নামাযে দণ্ডায়মান থাকিত।" শিয়রের দিক হইতে আসিতে থাকিলে রোযা বলে–"ক্ষান্ত হও, এই ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র জন্য প্রচণ্ড ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়াছে।" শরীরের পার্শ্ব হইতে আসিতে থাকিলে হজ্জ ও জিহাদ বলে –"সরিয়া যাও, এই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সর্বাঙ্গে পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়াছে।" হস্তের দিক হইতে আসিতে

থাকিলে সদকা বলে–"হে ফিরিশতাগণ, বিরত হও, এই ব্যক্তি এই হস্তে আল্লাহর পথে বহু দান করিয়াছে।" তৎপর আযাবের ফিরিশতাগণ মৃত ব্যক্তিকে বলিতে থাকে–"তুমি সুখে থাক, তোমার মঙ্গল হউক।" অবশেষে রহমতের ফিরিশতা আসিয়া তাঁহার জন্য কবরে বেহেশতী ফরাশ বিছাইয়া দেয়, কবরকে দৃষ্টি-সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেয় এবং বেহেশতের এক প্রদীপ আনয়নপূর্বক লটকাইয়া দিয়া থাকে, যেন, সেই মৃত ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত সেই আলোকে থাকিতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবায়দ (রা) বলিয়াছেন–"রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–'মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করিলে যাহারা তাহাকে কবরস্থ করিবার জন্য আগমন করিয়াছে তাহাদের পদধ্বনি সে শুনিতে পায়; কিন্তু কবর ব্যতীত কেহই তাহার সহিত কথা বলে না। কবর তাহাকে বলে–'লোকে কি বার বার তোমার নিকট আমার বিভীষিকা ও বিপদের কথা বর্ণনা করে নাই? তুমি আমার নিকট আসিবার কি আয়োজন করিয়াছ ?"

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন –রাসূলে মাকবূল সাল্লল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলেন – "মানুষ মরিয়া গেলে দুই ফিরিশতা তাহার নিকট আগমন করে। তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণ, চক্ষু নীল বর্ণ; একজনের নাম মুনকার, অপরজনের নাম নাকীর। তাহারা মৃত ব্যক্তিকে পয়গম্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। মৃত ব্যক্তি মুসলমান হইলে বলে–'পয়গম্বর আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ এক এবং (হযরত) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তৎপর তাহার কবরকে সত্তর গজ চওড়া, সত্তর গজ লম্বা করত আলোকমালায় প্রদীপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং ফিরিশতা তাহাকে বলে–বিবাহ বাসরের ন্যায় এখন সুখে নিদ্রা যাও। তুমি যাহাকে ভালবাস, সেই ব্যতীত অপর কেহই তোমাকে জাগাইবে না।" আর মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হইলে সে ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিবে–'আমি ত কিছুই জানি না। লোকদিগকে কিছু বলিতে শুনিতাম এবং আমিও তাহাই বলিতাম।' তখন মাটিকে উভয় পার্শ্ব হইতে আসিয়া মিলিয়া যাইতে আদেশে দেওয়া হইব। মৃত ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরিয়া উভয় পার্শ্বের মাটি মিলিয়া যাইবে, এমন কি তাহার অস্থি-পঞ্জর পরস্পর মিলিত হইবে। কিয়ামত পর্যন্ত সে এইরূপ আযাবে নিপতিত থাকিবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "হে ওমর, যখন তুমি মরিবে, তোমার আপন লোকে তোমার জন্য চারি গজ লম্বা ও সোয়া গজ চওড়া কবর খনন করিবে, তৎপর তোমাকে গোসল দিয়া কাফন পরাইয়া উক্ত করবে স্থাপন করিবে এবং তোমাকে কবরে প্রোথিত করিয়া (স্ব স্ব গৃহে) ফিরিয়া আসিবে, আর কবরে প্রশ্নকালী ফিরিশতা মুনকার ও নাকীর আসিয়া উপস্থিত হইবে; তাহাদের শব্দ বজ্রধ্বনির ন্যায় (ভয়ঙ্কর), চক্ষু বিদ্যুতের ন্যায় (ভীষণ), কেশ পদ পর্যন্ত লম্বিত, তাহাদের দাঁত দ্বারা কবরের মাটি এলোমেলো করিতে থাকিবে, তখন তোমার অবস্থা কেমন হইবে? হযরত ওমর (র) নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তখন কি আমার বুদ্ধি ঠিক থাকিবে?" তিনি বলিলেন–"হাঁ ঠিক থাকিবে।" হযরত ওমর (র) নিবেদন করিলেন–"তাহা হইলে আমার কোন ভয় নাই; আমি তাহাদের প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়া দিব।"

কবরের শাস্তি– হাদীস শরীফে আছে–"কবরে কাফিরের প্রতি শাস্তি প্রদানের জন্য দুইজন অন্ধ ও বধির ফিরিশতা নিযুক্ত হইবে। উভয়ের হস্তে লৌহ মুদ্গর থাকিবে। ইহার অগ্রভাগ উটের পান-পাত্র ডোলের ন্যায় হইবে। ফিরিশ্তাদ্বয় (এই লৌহ-মুদ্গর দ্বারা) তাহাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম প্রহার করিতে থাকিবে। তাহাদের চক্ষু নাই যে, তাহার দুরবস্থা দেখিয়া দয়া করিবে। আবার কান নাই যে, তাহার ক্রন্দনধ্বনি ও অনুনয় বিনয় শুনিবে।" হযরত আশেয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"কবর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরে। কেহ এই চাপ হইতে বাঁচিলে সা'দ ইবনে মু'আয বাঁচিত।"

হযরত আনাস (রা) বলেন– "হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কন্যা ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করিলে হযরত (সা) তাঁহাকে করবে রাখিলেন। কিন্তু তখন হযরতের (সা) বদনমণ্ডল নিতান্ত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু (কবর হইতে) বাহিরে আসিবার কালে তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্বের ন্যায় নূরানী হইল। আমরা আরয করিলাম– 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল কেন?' তিনি বলিলেন–'কবরের চাপ ও ইহার আযাবের কথা আমার মনে হইয়াছিল। তৎপর আমি জানিলাম যে, আল্লাহ্ যয়নবের উপর কবরের চাপ ও শাস্তি সহজ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু

তথাপি কবর তাহাকে এমন জোরে চাপ দিতেছে যে, সকল প্রাণী উহার আওয়ায শুনিতে পাইতেছে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"কবরে কাফিরকে শাস্তি দিবার জন্য নিরানব্বইটি বিষধর অজগর নিযুক্ত করা হয়। সেই অজগর কিরূপ তোমরা জান কি? নিরানব্বইটি সর্প, প্রত্যেকটির নূতন নূতন মস্তক হইয়া থাকে। উহারা সেই কাফিরকে দংশন করে, তাহাকে জড়াইয়া ধরে এবং ফোঁস ফোঁস করিতে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিবে।" তিনি বলেন—"কবর আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। ইহা নিরাপদে পার হইতে পারিলে তৎপরে যাহা ঘটিবে তাহাও নিতান্ত সহজ হইবে। আর কবরেই যাহার কষ্ট হইবে, ইহার পরবর্তী ঘটনাবলী তাহার জন্য ইহা অপেক্ষা বহুগুণে কষ্টদায়ক ও কঠিন হইবে।"

কবর-আযাবের পরবর্তী বিভীষিকা–কবর-আযাবের পরও মৃত ব্যক্তিকে আরও অনেক বিভীষিকার সম্মুখীন হইতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমটি প্রলয়ের শৃঙ্গধ্বনি। তাহার পর কিয়ামত-দিবসের বিভীষিকা, হিসাবের দিনের দীর্ঘতা, প্রখর গ্রীষ্ম ও অত্যধিক ঘর্ম। তৎপর পাপের জন্য প্রশ্ন, আমলনামা ডান বা বাম হস্তে প্রাপ্তি, আমলনামা প্রাপ্তিজনিত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, তুলাদণ্ডে পুণ্য বা পাপের পাল্লা ভারী হয় দেখিবার অধীর প্রতীক্ষা, দাবীদার হকদার ও উৎপীড়নের ক্ষতিপূরণের দায়, পুলসিরাত পার হইবার বিভীষিকা, দোযখ ও ইহার ফিরিশতাগণ, গলবন্ধনের শৃঙ্খল, 'যক্কুম' নামক বিষবৃক্ষ, সাপ-বিচ্ছুর দংশন ইত্যাদি নানাবিধ শাস্তির ভয়। এই সকল শাস্তি দুই প্রকার; যথা–(১) মানসিক শাস্তি, (২) শারীরিক শাস্তি। শারীরিক শাস্তির অবস্থা 'ইয়াহ্ইয়াউল-উলূম' গ্রন্থের শেষ ভাগে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার প্রমাণাদিও দেওয়া হইয়াছে। মৃত্যুর পরিচয়–ইহা কি? আত্মার পরিচয়–মৃত্যুর পর ইহা কি অবস্থায় থাকে, এই সব বিষয় 'দর্শন-পুস্তকে' বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি শারীরিক শাস্তি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি 'ইয়াহ্ইয়াউল-উলূম' গ্রন্থে দেখিবেন এবং মানসিক শাস্তি সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে এই গ্রন্থের দর্শন-পুস্তকে অনুসন্ধান করিবেন। শারীরিক ও মানসিক শাস্তির কথা পুনরুক্তি করিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। বুযুর্গগণ স্বপ্নে মৃতদের যে-সকল অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন কেবল তাহাই এইস্থলে বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

মৃত ব্যক্তিদের অবস্থা– জীবিত লোকে মৃতদের অবস্থা কাশ্‌ফ দ্বারা,

নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে এবং জাগ্রতাবস্থায় জানিতে পারে বটে; কিন্তু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইহা জানা যায় না। কারণ, মৃত ব্যক্তি যেই রাজ্যে গিয়াছে, সেই রাজ্যের অবস্থা পঞ্চ ইন্দ্রিয় জানিতে পারে না। কর্ণ যেমন বর্ণ বুঝিতে পারে না, চক্ষু শব্দ শুনিতে পায় না, ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ পরজগতের অবস্থা জানিতে পারে না। তবে মানবের মধ্যে ইন্দ্রয়াতীত এমন এক বিশেষ শক্তি আছে যদ্বারা সে পরজগতের ব্যাপারে অবগত হইতে পারে। কিন্তু এই শক্তি ইন্দ্রিয়াদির ব্যস্ততা ও দুনিয়ার কর্মব্যাপৃতির কোলাহলে লুকাইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানব এই সকল কর্মব্যস্ততা হইতে নিস্তার পায়। তখন মানবের সেই গুপ্ত শক্তি মৃতদের অবস্থার কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হয় এবং মৃতদের অবস্থা তাহার নিকট প্রকাশ হইতে থাকে। এই কারণেই মৃত ব্যক্তিগণও জীবিতদের খবর পাইয়া থাকে; এমন কি তাহারা আমাদের সৎকার্যে সন্তুষ্ট এবং পাপকার্যে দুঃখিত হয়। এই মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রকৃত কথা এই– মৃতের অবস্থা জীবিতের নিকট এবং জীবিতের অবস্থা মৃতের নিকট কেবল লওহে মাহ্‌ফূযের মধ্যবর্তিতায় প্রকাশ পায়। কারণ, আমাদের ও তাহাদের সকল অবস্থা লওহে মাহ্‌ফূযে অঙ্কিত আছে। নিদ্রিত অবস্থায় লওহে মাহ্‌ফূযের সহিত মানব-মনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিয়া স্বপ্নযোগে মৃতদের অবস্থা তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে, মৃতদেরও লওহে মাহ্‌ফূযের সহিত সম্বন্ধ হয়। সুতরাং তাহারাও ইহা হইতে আমাদের অবস্থা জানিয়া লয়।

লওহে মাহ্‌ফূয–লওহে মাহ্‌ফূয এমন আয়নার সদৃশ যাহাতে বিশ্বজগতের সকল বস্তুর চিত্র বর্তমান আছে। মৃত ও জীবিত উভয় প্রকার লোকের আত্মাই আয়নাতুল্য। এবং আয়নার ছবি যেমন অপর আয়নাতে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ লওহে মাহ্‌ফূযের ছবিগুলিও জীবিত ও মৃত লোকের আত্মার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। লওহে মাহ্‌ফূযকে কাঠ বা বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত এমন একটি ফলক বলিয়া মনে করিও না যাহা বাহ্য চক্ষে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে এবং ইহাতে লিখিত বিষয় পাঠ করা যাইতে পারে। লওহে মাহ্‌ফূয কোন্ বস্তুর সদৃশ জানিতে চাহিলে তুমি নিজের মধ্যেই অনুসন্ধান কর। কারণ, সমস্ত বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে উহার নমুনা ও মিশ্রণ আল্লাহ তোমার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন যাহাতে তুমি সকল পদার্থই চিনিতে পার। কিন্তু তুমি নিজেই নিজেকে চিনিতে পার নাই; এমতাবস্থায় অপরকে চিনিবে কিরূপে?

লওহে মাহ্‌ফূযের নমুনা হাফিযের মস্তিষ্ক। হাফিয সমস্ত কুরআন শরীফ স্মরণ করিয়া রাখেন। সমগ্র কুরআন যেন তাঁহার মস্তিষ্কে চিত্রিত থাকে এবং তিনি ইহার অক্ষর ও ছত্র দেখিতে পান। কিন্তু কেহ হাফিযের মস্তিষ্ক উন্মোচন করিয়া উহাকে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত করত তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেও বাহ্য চক্ষে উহাতে কুরআন বা অন্য কিছু লিখিত দেখিতে পাইবে না। বিশ্ব জগতের সমস্ত ব্যাপার লওহে মাহ্‌ফূযে লিখিত আছে, এই কথার অর্থ তোমরা এই উপমা হইতে বুঝিয়া লইবে। লওহে মাহ্‌ফূযে অনন্ত ব্যাপার চিত্রিত আছে। তোমার চক্ষু সসীম। কাজেই সসীম সীমাবদ্ধ স্থানে অসীম অনন্ত ব্যাপার চিত্রিত হওয়া সম্ভবপর নহে। আল্লাহ যেমন তোমার সদৃশ নহেন তদ্রূপ তাঁহার মুখ, হাত বা তাঁহার লওহে মাহ্‌ফূয, কলম ইত্যাদি তোমার কোন বস্তুর অনুরূপ নহে।

যাহা হউক, এই পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝিতে পারিবে–আমাদের খবর মৃতদের নিকট এবং তাহাদের খবর আমাদের নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে জীবিত লোকে মৃতদের অবস্থা দেখিতে পায়। মৃত ব্যক্তি ভাল অবস্থায় দৃষ্ট হওয়া, এইকথার এক বড় প্রমাণ যে, সে পরকালে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে; আর মন্দ অবস্থায় দৃষ্ট হওয়াও তদ্রূপ প্রমাণ যে, সেই ব্যক্তি আযাব ও বিপদে কালাতিপাত করিতেছে। মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত থাকে এবং একেবারেই অস্তিত্বহীন ও অচেতন হইয়া পড়ে না, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا اِلٰى قَوْلِهٖ مِنْ فَضْلِهٖ –

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বিবেচনা করিও না; বরং জীবিত (মনে কর)। তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট জীবিকা পাইতেছে আল্লাহ্‌র দান হইতে। তিনি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত আছে।" (সূরা আলে ইমরান, রুকূ ১৭)।

স্বপ্নে পরিজ্ঞাত মৃতদের অবস্থা – রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যেই ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিল সে যেন আমাকে জীবিত দর্শন করিল। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধরিতে পারে না।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"আমি রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম যে, তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ আছেন। আমি নিবেদন

করিলাম–'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার কি অপরাধ হইয়াছে?' তিনি বলিলেন–'রোযা রাখিয়া পত্নীকে চুম্বন না করিয়া থাকিতে পার না?" হযরত ওমর (র) আজীবন আর কখনও তদ্রূপ কার্য করেন নাই। যদিও রোযা রাখিয়া স্ত্রীকে চুম্বন করা হারাম নহে, তথাপি না করাই উত্তম। সাধারণ লোকের পক্ষে যাহা সঙ্গত তাহা হইতেও সিদ্দীকগণ দূরে থাকেন। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত আমার ভালবাসা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিবার আমার ইচ্ছা হইল। এক বৎসর পরে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, তিনি চক্ষুদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন–'এখন অবসর পাইলাম। আল্লাহ করুণাময় ও দয়ালু না হইলে বড় বিপদ হইত।" হযরত আব্বাস (রা) বলেন–"আমি স্বপ্নে আবূ লাহাবকে দোযখের অগ্নিতে জ্বলিতে দেখিয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন— 'সর্বদাই আযাবে নিপতিত থাকি। কিন্তু যেহেতু রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সোমবার রজনীতে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার জন্মের সুসংবাদ আমার নিকট পৌঁছে এবং আমি এই আনন্দে একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দিয়াছিলাম, এই সওয়াবের বিনিময়ে সোমবার রজনীতে আমার উপর আযাব হয় না।"

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন–"আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) সহিত উপবিষ্ট দেখিলাম। আমিও সেই মাহফিলে বসিয়াছিলাম। এমন সময় হঠাৎ হযরত আলী (রা) ও আমীর মু'আবিয়াকে (রা) তথায় উপস্থিত করানো হইল। তাঁহাদিগকে এক গৃহে প্রবেশ করাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। পরক্ষণেই দেখিলাম, হযরত আলী (রা) বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন– 'আল্লাহর শপথ, আমার হক সাব্যস্ত হইল।' তৎপর আমীর মু'আবিয়া (রা) সত্বর বাহিরে আসিয়া বলিতে রাগিলেন–'আল্লাহ্‌র শপথ, আমাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু শহীদ হইবার পূর্বে একদা হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ – অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং

অবশ্যই আমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।” লোকে জিজ্ঞাসা করিল–“ব্যাপারি কি?” তিনি বলিতে লাগিলেন–“যালিমগণ হযরত হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করিয়াছে।” লোকে জিজ্ঞাসা করিল–“আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?” তিনি বলিলেন– আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্ন দেখিলাম; তাঁহার নিকট রক্তে পরিপূর্ণ একটি কাঁচপাত্র আছে। তিনি বলিলেন–‘হে ইব্‌নে আব্বাস, দেখিলে, আমার উম্মত আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল? তাহারা আমার দৌহিত্র হুসায়নকে (রা) হত্যা করিল! তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গীদের এই রক্ত বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে লইয়া যাইতেছি।” এই স্বপ্নের চব্বিশ দিন পর খবর আসিল বাস্তবিক হযরত হুসায়নকে (রা) যালিমগণ শহীদ করিয়াছে।

হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া বলিলেন–“আপনি সর্বদা রসনার দিকে ইশারা করিয়া বলিতেন–‘এই মাংসখণ্ড আমার উপর বহু কার্যের ভার চাপাইয়া দিয়াছে।’ তিনি বলিলেন– হাঁ, এই রসনা দ্বারা আমি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ‘কলেমা পাঠ করিয়াছি এবং ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্ আমার সম্মুখে বেহেশ্‌ত রাখিয়া দিয়াছেন।” হযরত ইউসুফ ইব্‌নে হুসায়নকে (র) কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–“আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলিলেন– “আমার প্রতি দয়া করিয়াছেন।” সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন–“কোন্ আমলের জন্য?” তিনি বলিলেন–“এই কারণে যে, আমি কখনও সত্য কথার সঙ্গে হাসি তামাশা মিলাই নাই।” হযরত মনসূর ইব্‌নে ইসমাঈল (র) বলেন–“আমি আবদুল্লাহ্ বস্ত্র বিক্রেতাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–‘আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কি ব্যবহার করিলেন?’ তিনি বলিলেন–‘যে পাপ আমি স্বীকার করিয়াছি, আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু একটি পাপ স্বীকার করিতে আমার বড় লজ্জা হইল। উহা তিনি ক্ষমা করেন নাই। তজ্জন্য আল্লাহ আমাকে ঘর্মের মধ্যে দাঁড় করিয়া রাখিলেন। ইহাতে আমার বদনমণ্ডলে মাংস সম্পূর্ণ পচিয়া গলিয়া পড়িল।’ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–‘সেই পাপটি কি?’ তিনি বলিলেন–‘আমি একদা এক সুন্দর বালককে দেখিয়া তাহাকে বড় মনোরম বলিয়া মনে করিলাম। আল্লাহ্‌র নিকট এই পাপ স্বীকার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইল।” হযরত আবূ জাফর জন্দলানী (র) বলেন–“আমি স্বপ্নে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কতিপয় সূফীর সহিত উপবিষ্ট দেখিলাম। এমন সময় দুইজন ফিরিশতা আকাশ হইতে

নামিয়া আসিলেন। একজনের হাতে বদনা ও অপর জনের হাতে চিলমচি ছিল। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পবিত্র হস্ত ধৌত করিলেন এবং তৎপর সূফীগণও নিজ নিজ হস্ত ধৌত করিলেন। আমার হস্তও ধৌত করিবার জন্য ফিরিশতাদ্বয় আমার সম্মুখে চিলমচি ও বদনা আনিলেন। ইতিমধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন–‘তাঁহার হস্তে পানি ঢালিও না; তিনি এ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন।’ আমি নিবেদন করিলাম–‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল, বর্ণিত আছে যে আপনি বলিয়াছেন–যে-ব্যক্তি যে সম্প্রদায়কে ভালবাসে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আমি এই সম্প্রদায়কে ভালবাসি।’ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফিরিশতাদিগকে বলিলেন–‘তাহার হাতও ধোয়াইয়া দাও, এই ব্যক্তিও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।”

‘মজমা’ নামক এক বুযুর্গকে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–“আপনি কিরূপ ব্যবহার দেখিলেন?” তিনি বলিলেন –“সংসারবিরাগী ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হস্তগত করিল?” এক ব্যক্তি হযরত যাররাহ ইব্‌নে আবূ আওফাকে (র) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল– “কোন কার্য আপনি উত্তম দেখিলেন?” তিনি বলিলেন–“আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্ট থাকা এবং আশা কম রাখা।” ইয়াযীদ ইবনে মাযউর বলেন– “আমি আযরাঈলকে (আ) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–‘কোন আমল উত্তম আমাকে জানাইয়া দিন যেন আমি তদনুযায়ী কাজ করিয়া আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হইতে পারি।” তিনি বলিলেন–“আলিমের মর্যাদা অপেক্ষা উন্নত মর্যাদা আমি দেখি নাই, তৎপরই শোক-দুঃখ-ভারাক্রান্ত ব্যক্তির মরতবা দেখিতে পাইয়াছি।” এই ইয়াযীদ একজন বৃদ্ধ লোক ছিলেন। এই স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে তিনি সর্বদা রোদন করিতেন। এমন কি রোদন করিতে করিতে অন্ধ হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। হযরত ইব্‌নে আয়নিয়া (র) বলেন–“আমি স্বপ্নে আমার ভ্রাতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–‘আল্লাহ তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলিলেন–‘ পাপের জন্য আমি ক্ষমা চাহিয়াছি তাহা তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং যে পাপের ক্ষমা চাই নাই তাহা তিনি ক্ষমা করেন নাই।” হযরত যুবায়দকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–“আল্লাহ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলিলেন–“তিনি আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।” সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন–‘যে ধন আপনি মক্কা শরীফের পথে ব্যয় করিয়াছিলেন তজ্জন্য কি তিনি আপনার উপর অনুগ্রহ

করিয়াছেন?” তিনি বলিলেন—“না। ইহার সওয়াব ত সেই ধনের মালিক পাইয়াছেন। আমি কেবল আমার নিয়তের কারণে অনুগ্রহ পাইয়াছি।”

হযরত সুফিয়ান সাওরীকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার সঙ্গে আল্লাহ্ কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলিলেন—“আমি এক পদ পুলসিরাতের উপর এবং অপর পদ বেহেশ্‌তে রাখিলাম।” হযরত আহমদ ইবনে হাওয়ারী (র) বলেন—“আমি আমার পত্নীকে স্বপ্নে এত সৌন্দর্যশালিনী দেখিতে পাইলাম যে, এমন সৌন্দর্য আমি কখনও কাহারও মধ্যে দেখি নাই। অনুপম সৌন্দর্য ও নূরে তাহার বদনমণ্ডল ঝকমক করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘তোমার বদনমণ্ডল এত উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কি?’ সে বলিতে লাগিল—‘আপনার হয়ত মনে আছে, অমুক রজনীতে আপনি আল্লাহ্‌র যিকিরে নিমগ্ন থাকিয়া রোদন করিতেছিলেন।’ আমি বলিলাম—‘হাঁ, আমার মনে আছে।’ সে আবার বলিতে লাগিল—‘আপনার অশ্রু আমি আমার মুখমণ্ডলে লেপন করিয়াছিলাম। ইহাই আমার মুখমণ্ডলের সকল সৌন্দর্যের একমাত্র কারণ।” হযরত কাত্তানী (র) বলেন—“আমি হযরত জুনায়দকে (র) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—‘আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?’ তিনি বলিলেন— ‘আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। সকল রচনা ও উপদেশবাণী বরবাদ হইয়াছে; এই সকল হইতে আমি কোন উপকারই পাই নাই। কিন্তু শেষরাতে আমি যে-দুই রাকা'আত নামায পড়িতাম তাহা কাজে লাগিয়াছে।” হযরত যুবায়দকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আল্লাহ্ আপনার সহিত কেমন ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলিলেন —“এই চারি কলেমার জন্য আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَفْنِیْ بِهَا عُمْرِیْ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَدْخُلُ بِهَا قَبْرِیْ -

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَخْلُوْ بِهَا وَحْدِیْ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَلْقٰی بِهَا رَبِّیْ -

অর্থাৎ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ কলেমার সঙ্গে যেন আমি আমার জীবন শেষ করিতে পারি। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ কলেমা লইয়া যেন আমি কবরে যাইতে পারি। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, কলেমার সঙ্গে যেন আমি নির্জনে একাকী থাকি।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ কলেমা লইয়া যে আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করি।”

হযরত বিশরে হাফীকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলিলেন—“আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—‘তুমি কি আমার লজ্জা বোধ কর নাই যে, আমাকে এত অধিক ভয় করিয়াছ?” হযরত আবূ সুলায়মানকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলিলেন—“তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পুণ্যবান লোকদের মধ্যে বিখ্যাত হওয়া ব্যতীত অপর কোন বিষয়ই আমার কোন ক্ষতি করে নাই।” হযরত আবূ সাঈদ খাররায (র) বলেন—“আমি শয়তানকে স্বপ্নে দেখিয়া তাহাকে মারিবার জন্য লাঠি উঠাইলাম। কিন্তু ইহাতে সে মোটেই ভীত হইল না। তখন গায়েবী আওয়ায শুনিলাম—‘লাঠি দেখিয়া শয়তান ভয় পায় না। বরং হৃদয়ের নূর দেখিয়া সে ভয় পাইয়া থাকে।” হযরত সুব্বুহী (র) বলেন—“আমি শয়তানকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— ‘মানুষ দেখিতে কি তোর লজ্জা হয় না?’ সে বলিল—‘এই সকল লোক মানুষ নহে। তাহারা মানুষ হইলে বালকেরা ফুটবল লইয়া যেরূপ খেলা করে আমি তাহাদিগকে লইয়া তদ্রূপ খেলা করিতে পারিতাম না। তাহারাই ত মানুষ যাঁহারা আমাকে পীড়িত ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।” এখানে সূফীগণকে মানুষ বলিয়া শয়তান লক্ষ্য করিয়াছিল। হযরত আবূ সাঈদ খাররায (র) বলেন—“দামেশকে অবস্থানকালে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) স্কন্ধে হাত রাখিয়া তশরীফ আনিতেছেন। তখন আমি স্বীয় বক্ষস্থলে অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিতে করিতে একটি কবিতা পাট করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন—‘এই কার্যে উপকার অপেক্ষা ক্ষতি অধিক।’

হযরত শিবলীর (র) মৃত্যুর তিন দিন পরে এক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলেন— “খুব কঠিনভাবে আমার হিসাব লওয়া আরম্ভ হয়। ইহাতে আমি নিরাশ হইয়া পড়ি। আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন।” হযরত সুফিয়ান সাওরীকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল— “আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?” তিনি বলিলেন—“আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।” সেই ব্যক্তি আবার

জিজ্ঞাসা করিল–"আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক কি অবস্থায় আছেন?" তিনি বলিলেন–"প্রত্যহ তিনি দুইবার আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিয়া থাকেন।" হযরত মালিক ইব্‌নে আনাসকে (রা) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–"আমি হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট শুনিয়া যে-কলেমা লিখিয়াছিলাম ইহার বরকতে আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। তিনি মৃত ব্যক্তিকে কবরে লইয়া যাইতে দেখিয়া বলিতেন– سُبْحَانَ اللهِ الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ –

"এবং ইহার বরকতেই আমি আল্লাহর রহমত পাইয়াছি।" যে রাত্রে হযরত হাসান বস্‌রী (র) ইন্তিকাল করেন ঠিক সেই রাত্রে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁহার জন্য বেহেশতের সমস্ত দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে এবং গায়েবী আওয়ায হইতেছে– "হাসান বসরী (র) আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।" হযরত জুনায়দ (র) বলেন–"আমি শয়তানকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'মানুষ দেখিয়া কি তোর লজ্জা হয় না?' সে বলিল–'ইহারা মানুষ নহে। শোনীযে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারাই মানুষ; তাঁহারা আমাকে শোচনীয় অবস্থায় রাখিয়াছেন।" তিনি বলেন–'আমি প্রত্যুষে শোনীয গ্রামের মসজিদে গেলাম এবং দেখিতে পাইলাম সেই স্থানের লোকগণ জানুর উপর মস্তক স্থাপনপূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন–"হে জুনায়দ (র), অভিশপ্ত শয়তানের কথা শুনিয়া প্রতারিত হইবেন না।"

হযরত ওতবা ইবনে গোলাম (র) স্বপ্নে বেহেশতের এক হূর দেখিতে পাইলেন। হূর তাঁহাকে বলিল– "সাবধান, এমন কাজ করিবেন না যাহাতে আল্লাহ্ আমাকে আপনি হইতে বঞ্চিত রাখেন।" তিনি বলিলেন–"আমি দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়াছি; আর কখনও ইহার নিকটে পর্যন্ত যাইব না। তাহা হইলে সেই হূরকে পাইতে পারিব।" হযরত আবূ আইয়্যুব সেজেস্তানী (র) এক কলহপ্রিয় লোকের মৃতদেহ দেখিয়া তাহার জানাযার নামাযে যোগ না দিবার অভিপ্রায়ে গৃহের উপর-তলায় আরোহণ করিলেন। এক ব্যক্তি এই মৃত লোকটিকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন" সেই ব্যক্তি বলিল–"আল্লাহ আমার উপর অনুগ্রহ করিলেন।" তৎপর সেই ব্যক্তি আরও বলিল–"আবূ আইয়্যুবকে বলিয়া দিবেন–'তোমাদের

হাতে আমার প্রভুর ধনভাণ্ডারের অনুগ্রহ বন্টনের ভার দেওয়া হইলে কৃপণতাবশত তোমরা কিছুই ব্যয় করিতে না।" যে-রাত্রে হযরত দাঊদ তাঈ (র) ইন্তিকাল করেন সেই রাত্রে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিলেন, আকাশের ফিরিশতাগণ যাতায়াত করিতেছেন। তিনি ফিরিশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"অদ্য কোন রাত্রি?" তাঁহারা বলিলেন –"অদ্য হযরত দাঊদ তাঈ (র) ইন্তিকাল করিয়াছেন। তাঁহার জন্য বেহেশ্‌ত সাজানো হইয়াছে।" হযরত আবূ সাঈদ শিহাম (র) বলেন–"আমি সহল সালুকীকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিলাম–'হে খাজা।" ইহা শুনামাত্র তিনি বলিলেন–'খাজার প্রভুত্ব আর নাই; মান-সম্ভ্রম সব নিষ্ফল হইয়াছে।' আমি বলিলাম–'আপনার এত কাজকর্ম কি হইল?' তিনি বলিলেন–'সেই সকল আমার কোন উপকারে আসে নাই; কিন্তু বৃদ্ধা মহিলাগণ আমার নিকট যে-সকল মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিতেন এবং আমি জওয়াব দিতাম কেবল সেইগুলি কাজে আসিয়াছে।"

হযরত রবী ইবনে সুলায়মান (র) বলেন–"আমি হযরত ইমাম শাফীঈ (র)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'আল্লাহ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?' তিনি বলিলেন–'আমাকে সিংহাসনে বসাইয়া আমার জন্য অতি উজ্জ্বল মণিমুক্তা উৎসর্গ করিলেন।" হযরত ইমাম শাফীঈ (র) বলেন– "আমার সম্মুখে এক কঠিন কার্য উপস্থিত হয়। এইজন্য আমি হয়রান ছিলাম। ইতিমধ্যে আমি এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলাম; তিনি বলিলেন–'হে ইদরীস, পড়ুন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا وَّلَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ اِلَّا مَا اَعْطَيْتَنِىْ وَلَا اَتَّقِىْ اِلَّا مَا وَقَيْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِىْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِىْ عَافِيَةٍ –

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমার জীবন সম্বন্ধে আমার কোন ক্ষমতা নাই–আমার লাভ-ক্ষতি জীবন-মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কোন ক্ষমতাই আমার নাই। তুমি যাহা দান না কর, তাহা গ্রহণের ক্ষমতাও আমার নাই। আর যাহা তুমি ত্যাগ করাইয়াছ তাহা ব্যতীত আমার কোন কিছু পরিত্যাগের ক্ষমতাও নাই

হে আল্লাহ্, যে-কথা ও কাজ তুমি ভালবাস এবং যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক, তাহা আমাকে নিরাপদে করিতে দাও।" প্রভাতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া আমি 'দু'আ পাঠ করিলাম। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই উক্ত কাজ আমার জন্য সহজ হইয়া পড়িল।" প্রিয় পাঠক, তোমাদেরও এই দু'আ মনে রাখা আবশ্যক।

এক ব্যক্তি হযরত ওতবা ইবনে গোলামকে (র) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আল্লাহ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন—"যে-দু'আখানা ঘরের দেওয়ালে লিখিত আছে তাহার বরকতে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।" সেই ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া হযরত ওতবার (র) হস্তাক্ষরে নিম্নলিখিত দু'আখানি দেওয়ালে লিখিত দেখিতে পাইলেন—

يَا هَادِيَ الْمُضِلِّيْنَ وَيَا رَاحِمَ الْمُذْنِبِيْنَ وَيَا مُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ - اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَالْخَطَرِ الْعَظِيْمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ كُلَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْاَحْيَاءِ الْمَرْزُوْقِيْنَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ "হে (আল্লাহ্), তুমি পথভ্রষ্টদের পথপ্রদর্শক; হে পাপীদের প্রতি করুণাকারী, দুর্বলচেতা উদভ্রান্তদিগের সুমতি বিধানকারী. তোমার এই ভীতিবিহ্বল দাসের প্রতি এবং সকল মুসলমানের প্রতি তুমি করুণা কর এবং আমাদিগকে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককার ও লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর যাঁহারা তোমার নিকট হইতে জীবিকা পাইতেছেন এবং তুমি যাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ। আমীন, হে বিশ্বজগতের প্রভু, আমীন।"

মৃত্যু-চিন্তা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট।

উপসংহার

এই পর্যন্ত লিখিয়া 'কীমিয়ায়ে সা'আদত' (সৌভাগ্যের পরশমণি) গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম। আশা করি যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করত ফললাভ করিবেন তাঁহারা মূল গ্রন্থকার ও অনুবাদকের মঙ্গলের জন্য দু'আ করিতে ভুলিবেন না এবং আল্লাহ্র নিকট তাঁহাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিবেন। রচনায় ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকিলে বা বাহ্যাড়ম্বর ও রিয়া প্রবেশ করিয়া থাকিলে আল্লাহ যেন নিজ করুণায় ও সহৃদয় পাঠকগণের দু'আর বরকতে ক্ষমা করেন এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদের সওয়াব হইতে মাহরূম না করেন। কারণ, যে-ব্যক্তি মানব জাতিকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করেন, অথচ নিজে রিয়ার দোষে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে বঞ্চিত থাকে তাহার ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আর কেহই নহে। আল্লাহ্ এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। তাই এই দু'আর সহিত গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছি—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَنَعُوْذُ بِرِضَائِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ -

"হে আল্লাহ্, তোমার শাস্তি হইতে (বাঁচিবার জন্য) আমরা তোমারই ক্ষমার আশ্রয় চাহিতেছি; আর তোমার ক্রোধ হইতে (রক্ষা পাইতে) তোমারই সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি; এবং তোমা হইতে (ভয়শূন্য হইতে) তোমারই আশ্রয় চাহিতেছি। তোমার গুণ কীর্তন করিয়া শেষ করা আমার সাধ্যের অতীত। তুমি নিজে তোমার যে-প্রশংসা করিয়াছ উহাই তোমার জন্য শোভন। সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র; তিনি এক ও অদ্বিতীয়।"

ইফাবা—২০০৩-২০০৪—প্র/৫৭৩২(উ)—৭,২৫০
প্রকাশনা নম্বর ঃ ১৬২৯